বাংলার ইতিহাস

মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত

[১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ]

আবদুল করিম

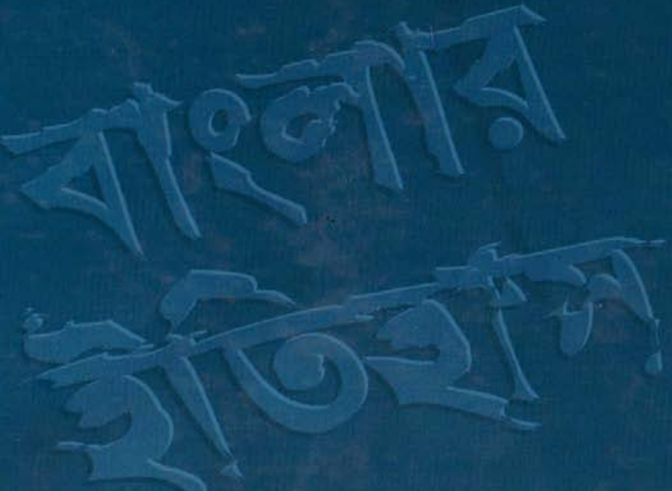

বাংলার ইতিহাস

মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত

[১২০০ - ১৮৫৭]

প্রফেসর ড. আবদুল করিম
প্রাক্তন উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

DR. MD. ABDULLAH AL-AMIN
MBBS (Dhaka) DDV (D.U.)
WHO Fellow (U.S.A.)
Professor & Head
Department of Dermatology & Venereology
Rajshahi Medical College & Hospital

বড়াল প্রকাশনী

প্রকাশক
জে. বড়াল
বড়াল প্রকাশনী
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
আগস্ট ১৯৯৯

প্রচ্ছদ
সুখেন দাস

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

কম্পোজ
বর্ণনা কম্পিউটারস
১৩/১ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন, ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
৬৭, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ভূমিকা

মুসলিম বিজয় থেকে আরম্ভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হওয়া পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস লিখিত হল। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের ফলে বাংলায় এক নতুন যুগ শুরু হয়, এই যুগের শেষ হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ; আসে আর এক নতুন যুগ, ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে এক রক্তক্ষয়ী সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর ফলে ইংরেজদের শাসন শেষ হল না, তবে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়, ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করে। মুসলিম শাসন এবং কোম্পানী শাসন আমল এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলার ইতিহাস ডিগ্রি পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস উভয় বিভাগের পাঠ্যসূচীতে তা অন্তর্ভুক্ত হলেও ইতিহাস বিভাগের সিলেবাসে আদিকাল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সিলেবাসে মুসলিম বিজয় থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিহাস বিভাগের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এক খানি বই রচিত হলেও ইসলামের ইতিহাসের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বই নেই, অবশ্য সহায়ক গ্রন্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব ইসলামের ইতিহাসের ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা এবং বিষয়বস্তু আত্মস্থ করার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই পুস্তকটি লিখিত হল।

জাতিগঠনে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিহাস জাতির দর্পন, ইতিহাস পাঠেই জাতি তার অতীতকে জানতে পারে এবং ভবিষ্যত গঠনের প্রেরণা লাভ করে। বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধরা কেন এবং কিভাবে মুসলমাদের পদানত হয় এবং কেন ও কিভাবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সকলে ইংরেজদের পদানত হয়, এই পুস্তক পাঁঠে ছাত্র-ছাত্রীরা তা জানতে পারবে। প্রাচীন কালে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে কোন একটি দেশ ছিল না, রাঢ়, বরেন্দ্র (গৌড়), বঙ্গ, সমতট নামে পরিচিত ছিল বিভিন্ন অংশ। মুসলমান আমলে সকল অংশ একত্রিত এবং একক শাসনভুক্ত হয়ে বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়। বাংলার শান্ত প্রাচীন সমাজে মুসলমানদের আগমনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে, যুক্ত হয় গ্রামীন সমাজের সঙ্গে নাগরিক সমাজ ; হিন্দু জাতিভেদ প্রথা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। কিন্তু মুসলমানেরা যেই উন্নত সমাজপ্রথা ও

জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে বাংলা তথা ভারতে আসে সেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ধারা ধরে রাখতে পারেনি। বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে নতুন কিছু জানার বা শেখার উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে। নবাবী আমলের শেষ দিকে দেখা যায় দেশপ্রেমের স্থলে বিশ্বাসঘাতকতা প্রবল হয়ে উঠে। ফলে নতুন আবিষ্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত বিদেশীদের ছল-চাতুরি, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং স্বদেশ প্রেমের নিকট তারা হেরে যায়। এই কাহিনী আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা দরকার। মুসলমানেরা প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে ব্যর্থ হয় এবং পশ্চাৎপদ হয়ে যায় কিন্তু হিন্দুরা তা গ্রহণ করে কিভাবে অগ্রসর হয় ও উন্নতি লাভ করে তাও ছাত্র-ছাত্রীদের জানা দরকার। এই পুস্তক তাদের চিন্তা-চেতনায় সামান্য ভাবে হলেও নাড়া দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

বড়াল প্রকাশনীকে ধন্যবাদ, তাঁরা যত্ন করে স্বল্প সময়ে বইখানি প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তক শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকদের উপকারে এলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

সি/৩৪ হিলভিউ হাউজিং কোং
নাসিরাবাদ
চট্টগ্রাম
১.৭.৯৯

আবদুল করিম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলাদেশ / ৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুসলিম বিজয় ঃ বখতিয়ার খলজী থেকে ইওজ খলজী / ১৫
তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে তুর্কী শাসন / ৩১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বলবনী শাসন, শামস-উদ-দীন ফীরূজ ও তাঁর বংশের শাসন, তুগলক শাসন এবং স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা / ৪৫
পঞ্চম অধ্যায় ঃ সলতনত-ই-বাঙ্গালা ঃ ইলিয়াস শাহী শাসন / ৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রাজা গণেশের বংশ ঃ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ হাবশী শাসন / ৭৯
সপ্তম অধ্যায় ঃ হোসেন শাহী বংশ / ৯৫
অষ্টম অধ্যায় ঃ বাংলায় আফগান শাসন / ১১৩
নবম অধ্যায় ঃ সুলতানী আমলে সমাজ ও সভ্যতা / ১২১
দশম অধ্যায় ঃ আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় মোগল অভিযান / ১৩৫
একাদশ অধ্যায় ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ঃ বারভূঁঞাদের দমন ও মোগল আধিকার প্রতিষ্ঠা / ১৪৭
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ শাহজাহানের অধীনে বাংলাদেশ / ১৫৯
এয়োদশ অধ্যায় ঃ আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে বাংলাদেশ / ১৭৩
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ নবাবী আমল / ১৯৩
পঞ্চদশ অধায় ঃ মোগল আমলে শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতি / ২৪৫
ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ কোম্পানীর শাসন বিস্তার / ২৬৯
সপ্তদশ অধ্যায় ঃ কোম্পানী আমলে মুসলমানদের অবস্থা / ২৮৯
অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলন / ৩০৫
ঊনবিংশ অধ্যায় ঃ কোম্পানী আমলে মুসলিম শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা / ৩১৩
বিংশ অধ্যায় ঃ সিপাহী বিপ্লবে বাংলার ভূমিকা /৩২৯

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলাদেশ

বাঙ্গালা নামটি মুসলমান আমলে প্রচলিত হয়, ইতিপূর্বে এই জনপদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন উত্তর বঙ্গ প্রথমে পুণ্ড্র, পরে বরেন্দ্র ; পশ্চিম বঙ্গ প্রথমে সুম্ম, পরে রাঢ়, পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল বঙ্গ এবং মেঘনা-পূর্ববর্তী এলাকা সমতট নামে পরিচিত হত। ভারতের এই পূর্ব জনপদের রাজধানী ছিল গৌড়, মুসলিম বিজয়ের সময় এর নাম হয় লক্ষণাবতী, তাই ফারসি ইতিহাসে ইহা লখনৌতি নাম লাভ করে। মুসলিম বিজয়ের পরেও প্রায় দেড়শত বছর ধরে এই জনপদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ সর্বপ্রথম সমগ্র জনপদ একক শাসনাধীনে আনয়ন করলে এর নাম হয় বাঙ্গালা এবং তিনি 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' ও "সুলতান-ই-বাঙ্গালা" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর থেকে বাঙ্গালা নাম প্রচলিত হয়ে যায় এবং মোগল আমলে সারা সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত হলে এই প্রদেশ সুবা বাঙ্গালা নাম ধারণ করে। সুলতানী আমলে সুলতানদের অধিকার বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করত, কিন্তু মোগল আমলে সুবা গঠিত হওয়ায় বাঙ্গালার সীমানা স্থিতি লাভ করে। মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাঙ্গালার সীমানা উল্লেখ করে বলেন যে তা চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তরে পর্বত মালা থেকে দক্ষিণে হুগলী জিলার মান্দারন পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজেরা এর নাম লেখে 'বেঙ্গল', এবং বাংলায় ইহা বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্গদেশ ভাগ হয়ে পূর্ব অংশ পাকিস্তানের এবং পশ্চিম অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব অংশ প্রথমে পূর্ব বাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হয়, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে ইহা বাংলাদেশ নাম লাভ করে, আমাদের সংবিধানে বাংলাদেশ নামটিই গৃহীত হয়েছে।

বাঙ্গালা একটি প্রাকৃতিক সীমান্ত বেষ্টিত দেশ, এর উত্তরে হিমালয় পর্বত মালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া এবং চট্টগ্রাম পাহাড় এবং পশ্চিমে রাজমহলের পাহাড়, বীরভূমের সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড এবং ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। উত্তর-দক্ষিণে বাঙ্গালা ছিল সুরক্ষিত, বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না, পূর্ব দিক থেকেও বহিরাক্রমণের ঘটনা দেখা যায় না, দক্ষিণে আরাকানের সঙ্গে বাঙ্গালার সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেলেও আরাকান তেমন একটা বিপদ ঘটাতে পারত না, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে পশ্চিম দিক থেকে বাঙ্গালা প্রায়ই আক্রান্ত হত। বাঙ্গালার শাসকেরাও যে পশ্চিম দিকে অভিযান পরিচালনা করতনা তা নয়, তবে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বহিরাক্রমণের ফলেই বাঙ্গালার রাজনৈতিক পট পরির্তন হয়েছে বেশী। বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত গঙ্গানদী, আক্রমণকারীরা গঙ্গা দিয়েই অগ্রসর হত, এই নদীর ধারে রাজমহলেই গিরিপথে অবস্থিত ছিল তেলিয়াগড় এবং সিকড়িগড় নামে দুইটি সুরক্ষিত

গড় বা দূর্গ। এই দুইটি গড় রক্ষা করতে পারলে বঙ্গদেশ বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পেত। প্রাচীন কাল থেকে মুসলিম আমলের শেষ পর্যন্ত এই গিরিপথ এবং দূর্গগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গদেশ প্রাকৃতিক সীমা বেষ্টিত হলেও এবং প্রাকৃতিক সীমা যে কোন দেশের মৌলিক অধিকার রূপে ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ কমিশন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সীমানার প্রয়োজন বিবেচনা করেনি। এতে বাংলাদেশ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষ করে ফারাক্কা, দক্ষিণ তালপট্টি সমস্যা এর প্রত্যক্ষ ফল। বাংলাদেশ নদী মাতৃক, এর উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে পাহাড় থাকলেও এগুলো নাতি-উচ্চ, কিন্তু এখানে ছোট বড় অনেক নদীর অস্তিত্ব রয়েছে, নিম্ন বঙ্গে নদীর সংখ্যা এত বেশি যে এখানে প্রতি ২৫ মাইলের মধ্যে ছোট বড় নদী দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দুইটি বৃহৎ নদী অনেক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সারা বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। গঙ্গার প্রধান শাখা বাংলা দেশে পদ্মা নামে পরিচিত, ইহা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হওয়ার আগে দক্ষিণ দিকে অনেক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। গঙ্গার অন্য শাখা ভাগিরথী নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হওয়ার আগে বঙ্গ এবং রাঢ়কে বিভক্ত করেছে। ব্রহ্মপুত্র এককালে অনেক বড় নদী ছিল, কিন্তু এখন ক্ষীণ, এটা মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, ব্রহ্মপুত্রেরও অনেক শাখা-প্রশাখা ছিল। করতোয়া উত্তর বঙ্গের একটি বৃহৎ নদী, এর উত্তর অংশ তিস্তা নামে পরিচিত, বর্তমানের বৃহৎ যমুনা নদী অবশ্য প্রাচীন কালে ছিলনা, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এর সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলার নদ-নদীর একটি বৈশিষ্ট হল গতি পরিবর্তন। এর ফলে বাংলাদেশে অনেক শহর বন্দরের উত্থান হয়েছে আবার অনেক শহর বন্দর নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও নদীর গতি পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমান আমলেই বাংলার রাজধানী কয়েকবার স্থানান্তরিত হয়েছে, এর কারণ হয় নদীর গতি পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে রাজধানী শহরের গুরুত্ব কমে যাওয়া। সুলতানী আমলের প্রথম প্রায় তিন শত বৎসর রাজধানী লখনৌতি এবং পাণ্ডুয়ায় (ফীরুজাবাদ) পরিবর্তিত হত। ষোল শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সোলায়মান কররানী তাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তর করেন, মোগল অধিকারের সময় এখানেই রাজধানী ছিল। রাজা মানসিংহ রাজধানী তাঁড়া থেকে রাজমহলে নিয়ে যান, কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর পরে জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শীদকুলী খান ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরিয়ে নেন, এখানেই ছিল মোগলদের শেষ রাজধানী। ইংরেজেরা কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করে। সকল রাজধানীই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, ফলে রাজধানী ব্যবসা বাণিজ্য , সামরিক এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। কৃষি কাজে নদ-নদীর ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখে না, নদী-নদী প্লাবনের সময় পলিমাটি জমা করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, প্লাবন ছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে পানির সমস্যা দূর করে। নদ-নদী অবশ্য থাকলেও

কম করে না, শহর-বন্দর নদীগর্ভে বিলীন হওয়া ছাড়াও প্লাবনের সময় ফসল বিনষ্ট হয়, এমন কি শষ্য ক্ষেত্রও বিলীন হয়ে যায়। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিতে বাংলাদেশে ফসল ক্ষতি প্রায় প্রতি বছরেই হয়। নদ-নদী কোন কোন সময় জনগণের জন্য অভিশাপ বয়ে আনলেও সামগ্রিক বিচারে আশীর্বাদের মাত্রাই বেশি। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সীমান্ত এবং আবহাওয়া দেশের ইতিহাসকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। সুলতানী আমলে বাংলা প্রায় সময় স্বাধীন থাকতো, দিল্লীর সুলতানেরা মাঝে মাঝে দখল করলেও তাদের অধিকার স্থায়ী হতো না, প্রবল মোগল শক্তিকেও সারা বাংলা দখল করতে প্রচুর বেগ পেতে হয় এবং দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করতে হয়। এর কারণ দূরত্ব, যোগাযোগের অসুবিধা, নদ-নদীর আধিক্য এবং বন্যা জনিত কারণে আভ্যন্তরীন যোগাযোগ এবং বিশেষ করে মধ্যযুগে যুদ্ধের প্রধান বাহন ঘোড়া চলাচলের অসুবিধা এবং প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অবস্থা :

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় সেন বংশের রাজারা রাজত্ব করত। সেনরা দাক্ষিণাত্যের কর্নাটক থেকে এই দেশে আসে এবং শেষ পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সামন্ত সেন বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজ-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রমাণ নেই, তবে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় এলাকায় প্রথম ক্ষমতা অধিকার করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। তবে তিনি ছিলেন পাল বংশের সামন্ত রাজা এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র বিজয় সেনই সর্বপ্রথম সামন্ত রাজ্যকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন শেষ পাল রাজাকে পরাভূত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দীদের পরাস্ত করে এবং বহুযুদ্ধে জয়লাভ করে সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হন। বিজয় সেন বিচক্ষণ যোদ্ধা, সফল রাজনীতিবিদ, এবং একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশকে উৎখাত করে সারা বাংলার অধীশ্বর হওয়া গৌরবের কথাই বটে। তাছাড়া তিনি বর্মদের শেষ রাজা ভোজবর্মকে পরাজিত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা জয় করেন এবং তাদের রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করেন। দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর রাজত্ব করে বিজয় সেন মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে বসেন। বিজয় সেনের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হল, তিনি সারা বাংলাকে তাঁর অধীনে আনয়ন করেন। বল্লাল সেন পিতার মত যোদ্ধা ছিলেন বলে মনে হয় না, তবে তিনি একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখেন এবং ১৮ বছর রাজত্ব করে ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহন করেন।

লক্ষণ সেন একজন যোগ্য নরপতি ছিলেন, সিংহাসনে বসার সময় তিনি প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হন। তিনি পিতামহ বিজয় সেনের সময় অনেক যুদ্ধে অংশ নেন এবং

বীরত্ব প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাঁর পিতা ও নিজের রাজত্ব কালে তাঁর কোন যুদ্ধে অংশ নিতে হয় কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। পিতামহের সময়েই সারা বাংলা পদানত হয়, সুতরাং মনে হয় তিনি সুখে শান্তিতেই পিতৃরাজ্য ভোগ করেন। সেনদের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ জিলার বিক্রমপুরে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের চন্দ্র এবং বর্ম বংশীয় রাজাদের রাজধানীও ছিল বিক্রমপুরে। বিজয় সেন বর্মদের পরাজিত করে বিক্রমপুর জয় করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়, গৌড় দখল করে গৌড়েশ্বর উপাধি নেওয়া রাজাদের জন্য সম্মান ও গৌরবের প্রতীক মনে করা হত। কিন্তু বিজয় সেন ও বল্লাল সেন গৌড়েশ্বর উপাধি নেননি, তাঁদের উৎকীর্ণ তাম্রলিপিতে এই উপাধি নেই। লক্ষণ সেনই প্রথম এই উপাধি নেন, তাও তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে। শুধু তাই নয়, তিনি গৌড়ের নাম লক্ষণাবতী রাখেন, অর্থাৎ তিনি গৌড়ে রাজধানী স্থাপন না করলেও গৌড়ের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

লক্ষণ সেন পিতামহের গঠিত এবং পিতার রেখে যাওয়া বিশাল সাম্রাজ্যে সুখে শান্তিতেই রাজত্ব করছিলেন, তাঁর সভায় কাব্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বুঝা যায় যে যুদ্ধবিগ্রহজনিত কোন অশান্তি তাঁর রাজত্বকালে ছিল না, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ফলে তাঁর সামরিক প্রস্তুতি শিথিল হয়ে পড়ে। তাই মনে হয় তিনি বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং রাজত্বের শেষ দিকে তিনি অশান্তিতে দিন কাটান। প্রথমত, সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয়, এই রাজ্যের রাজা ডুম্মন পালের ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রলিপি আবিস্কৃত হয়েছে। ডুম্মন পাল বৌদ্ধ ছিলেন, পরাভূত বৌদ্ধরা হয়ত শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমুদ্র তীরের নিকটে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে ডুম্মন পাল লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ইহা নিঃসন্দেহে লক্ষণ সেনের দূর্বলতার পরিচয় বহন করে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের বাংলা বিজয়। তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজী যখন নদীয়া আক্রমণ করেন, তখন লক্ষণ সেন নদীয়াতেই অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার নদীয়া জয় করলে লক্ষণ সেন নদীয়া ছেড়ে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। লক্ষণ সেন তখন রাজধানী বিক্রমপুরের পরিবর্তে নদীয়ায় কেন যান, সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়। আগে মনে করা হত যে বৃদ্ধ বৈষ্ণব রাজা লক্ষণ সেন গঙ্গার তীরবর্তী নদীয়ায় পূণ্যলাভের আশায় গমন করেন। কিন্তু ডুম্মন পালের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দ্যেশ্যে লক্ষন সেন নদীয়ায় গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন মনে করাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। পূর্ব সীমান্তেও লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায় ; রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব নামের একজন রাজার তাম্রলিপি ময়নামতিতে পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে অন্তত পক্ষে দ্বাদশ শতকের প্রথম থেকে, অর্থাৎ লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে মেঘনা পূর্ববর্তী সমতট অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে লক্ষণ সেনের প্রতি খুব বড় আঘাত আসে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। এটা মুসলমানদের বাংলা বিজয়, তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজী বিহার থেকে বাংলা আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন তখন ভাগীরথীর তীরে নদীয়ায় অবস্থান

করছিলেন, অতএব বখতিয়ার খলজীর লক্ষ্যস্থল হয় নদীয়া। বখতিয়ার খলজী প্রায় বিনা বাধায় নদীরা জয় করেন, লক্ষণ সেন নদীয়া ছেড়ে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি আরো কিছুদিন রাজত্ব করে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষণ সেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন বিক্রমপুরে আরো কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন, তবে শেষ পর্যন্ত সেই অঞ্চলও মুসলমানদের অধিকারে আসে।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ঃ

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি ছিল গ্রামীন এবং কৃষিনির্ভর। তখনো নগর সভ্যতার পুরাপুরি বিকাশ হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের সকল ভোজ্য দ্রব্য মোটামুটিভাবে গ্রামেই উৎপন্ন হত, জনগণের চাহিদা কম থাকায় তাদের বাইরের উপর বিশেষ নির্ভর করতে হত না। লোক সংখ্যা কম থাকায় পতিত অনাবাদী জমির অভাব ছিলনা, অতএব প্রত্যেক গ্রামে কৃষিভূমি যেমন ছিল, গোচারণ ভূমিরও অভাব ছিল না। তবে বর্তমানে যেমন, সেকালেও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি কৃষকদের উদ্বেগের কারণ ঘটাত। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিলের অস্তিত্ব থাকায় মাছেরও কোন অভাব ছিল না। তরিতরকারি গৃহবধুরাই উৎপন্ন করত, গবাদি পশুর অভাব ছিল না, দুধ এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যও পাওয়া যেত। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলাকে সুজলা সুফলা রূপে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণ কতটুকু সুখে ছিল তা বলা যায় না, অভাবী লোক সকল সময়েই ছিল। প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও ঘটে, তবে তা ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ, বিদেশী বণিকেরা তাঁতে তৈরি বস্ত্র, সুগন্ধ দ্রব্য, মসলা জাতীয় দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী করত, বাংলার মসলিন বস্ত্র প্রাচীন কালেও খ্যাতি অর্জন করে।

সেন আমলের সমাজে বর্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বলবৎ ছিল। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সমাজের নেতা, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁদের দেবতা তুল্য মনে করত। ব্রাহ্মণদের নীচে ছিল ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধারা, তৃতীয় স্তরে ছিল বৈশ্য, তারা ছিল পেশাজীবি, এবং সর্ব নিম্ন স্তরে ছিল শূদ্র অত্যন্ত নিগৃহীত। সেনরা বৌদ্ধদের প্রতি উদার ছিল না, বরং বৌদ্ধদের চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সেনদের আগের পাল রাজারা ছিল বৌদ্ধ, তারা ধর্ম বিষয়ে উদার ছিল এবং ব্রাহ্মণদের সম্মান করত এবং উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দান করত। পাল রাজবংশের পতনের মধ্য দিয়েই সেন রাজ্যের উৎপত্তি। সেন রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শৈব, লক্ষণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণদের জাতিভেদ প্রথার ফলে বৌদ্ধরা এবং শূদ্ররা সমাজে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত নির্যাতিত ছিল। রাজা লক্ষণ সেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বেষ্টিত হয়ে থাকতেন বিধায় রাষ্ট্রের এবং সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই ভোগ করত। তাদের অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। যেই বৌদ্ধরা কয়েক শত বৎসর রাজত্ব করে, সেনদের অত্যাচারের ফলে নিশ্চিহ্ন হওয়া সেই বৌদ্ধদের অস্তিত্ব খুজে বের করতে গবেষণার প্রয়োজন হয়। বর্ণ বৈষম্যের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনেতিক এবং সামাজিক অবস্থা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে

মুসলিম বিজয় সহজ হয়। বৌদ্ধরা যে মুসলমানদের বিজয়ে সন্তুষ্ট হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে বল্লাল সেন কুলীন প্রথা প্রবর্তন করেন। কুলীন প্রথা হিন্দু সমাজে এক জঘন্য মনোবৃত্তি এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ; কুলীন -অকুলীন দ্বন্দ, বিশেষত কুলীনদের সামাজিক অনাচার হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকেও কুলীন প্রথার বিষময় ফল সমাজকে কলুষিত করে বেশি। এই সময়ের সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কুলীন প্রথা সম্বন্ধে অনেক কুলজী গ্রন্থ বা কুলজী শাস্ত্র পাওয়া যায়, এগুলি ব্রাহ্মণ ঘটকদের দ্বারা লিখিত, কিন্তু এই শাস্ত্রের কোন পুস্তক বল্লাল সেনের সমসাময়িক নয়, বরং কয়েকশত বৎসর পরে লিখিত। এই প্রথার উদ্যোক্তা যেমন ব্রাহ্মণ, এই শাস্ত্রের লেখকও ব্রাহ্মণ। তবে তারা এর ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপনের জন্য প্রচার করে যে, এই প্রথা সেন যুগে প্রবর্তিত হয় এবং রাজা বল্লাল সেন এর প্রবর্তক। তাই আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কুলীন প্রথার সঙ্গে বল্লাল সেনের কোন সম্পর্ক নাই।

সেনযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন উভয়ে কবি ছিলেন। বল্লাল সেন 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুইখানি বই লেখেন, শেষোক্ত বইখানি শেষ করার আগে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছেলে লক্ষণ সেন তা শেষ করেন। লক্ষণ সেন নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন, তাঁর দরবারে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবির সমাবেশ ঘটে। এঁদের মধ্যে ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন ও উমাপতি ধর প্রমুখ কবিদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনিও বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। ঈশান, পুরুষোত্তম ও পশুপতি প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' এবং ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যদ্বয় সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য অবদান রূপে স্বীকৃত। লক্ষণ সেনের দরবারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রভাব অত্যধিক থাকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবও অত্যাধিক ছিল, তাই বাংলা সাহিত্য দরবারে প্রবেশ করার অবকাশ ছিল না। বাংলা সাহিত্যের আদি-রূপ চর্যাগীতি, কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতের দাপটে মুসলমানদের আগমন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি হয়নি, চর্যাগীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথম বাংলা কাব্য চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' মুসলমান আমলেই রচিত হয়। উপরে আলোচিত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলায় মুসলিম বিজয় সূচিত হয়।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ১৯৮১।
R.C. Majumdar: History of Bengal, vol. I. Dhaka University. 1943.
A. M. Chowdhury: Dynastic History of Bengal, Dhaka. 1967

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম বিজয় ঃ বখতিয়ার খলজী থেকে ইওজ খলজী পর্যন্ত

বাংলার সঙ্গে আরবদের প্রাথমিক যোগাযোগ ঃ

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার আগেও বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। প্রাচীনকাল থেকে আরবেরা ব্যবসায়িক জাতি, প্রাক্-ইসলামী যুগে তারা যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল, ইসলামী যুগেও তারা সেই তৎপরতা বজায় রাখে। ইসলামী যুগে আরব আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্পর্কে আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে পাওয়া যায়। এই ভৌগোলিকগণ হলেন প্রধানত সোলায়মান, ইবনে খুরদাদবিহ, আল -মাসুদী এবং আল-ইদ্রিসী। এঁদের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, আরব বণিকেরা পণ্য ভর্তি জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, চীন সাগর ইত্যাদি উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করত। বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাংলার সঙ্গেও আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ আছে, যাকে তারা পাল রাজা ধর্মপালের রাজ্য রূপে পরিচিতি দেয় বলে মনে করা হয়। তাছাড়া তাদের বিবরণে উপকূলের একটি বন্দরকে সমন্দর নাম দেওয়া হয়েছে। এই সমন্দরকে চট্টগ্রাম বলে মনে করা হয়। তাছাড়া কামরূপ থেকে নদী পথে সুগন্ধ দ্রব্য সমুদ্র বন্দরে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, এবং বাংলার গৌরব মসলিন বস্ত্রের প্রশংসা করেছে। এই বিবরণ সমূহে তাই বাংলার সঙ্গে প্রাচীন কালে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দী থেকে আরবদের যোগাযোগের কথা জানা যায়।

পাহাড়পুর এবং ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কালে আব্বাসী খলিফা হারুন-উর-রশীদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে আরবের মুসলমানেরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এইদেশে আসেন এবং তাদের সঙ্গে মুদ্রাগুলো এইদেশে প্রবেশ করে। তবে এই মুদ্রাগুলোও যে ব্যবসার মাধ্যমে এসেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। সেই সুদূর অতীতে কোন মুসলমান শুধু ধর্ম প্রচারের জন্যই এই দেশে এসেছিলেন, এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত একে সমর্থন করা যায় না। বাংলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন সূফী সাধকের মাযার পাওয়া যায়, যেমন, বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ, নেত্রকোনার শাহ সুলতান রুমী, বগুড়ায় মহাস্থানের শাহ সুলতান মাহিসওয়ার এবং পাবনার শাহজাদপুরের মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ ইত্যাদি। এঁদের সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতিতে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের অনেক পূর্বের লোক বলে পরিচিতি দেয়া হয়। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এঁদের সঠিক সময় নিরূপণের সহায়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না, বরং মনে করা অযৌক্তিক নয় যে এঁরা সকলে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পরে এই দেশে আগমন করেন, এবং হয় স্বাভাবিকভাবে বা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। জনশ্রুতি যাই বলুক না কেন, তাঁরা মুসলিম বিজয়ের পরবর্তী লোক। আরাকানে প্রচলিত কিংবদন্তী 'রাজদাওয়ে' তে আরাকানের জনৈক রাজার 'সুরতন' বিজয়ের কথা বলা হয়, কেউ কেউ মনে করেন যে 'সুরতন' হল চট্টগ্রামের তৎকালীন রাজার উপাধি এবং এই কারনে তাঁরা মনে করেন যে, চট্টগ্রামে সেই প্রাচীন কালেই একটি মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুক্তিতে বাংলায় বা তার কোন অংশে এয়োদশ শতাব্দীর বিজয়ের আগে কোন মুসলিম রাজ্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব প্রাচীন কালে বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল বাণিজ্যিক। বাণিজ্য সূত্রে এসে কোন আরব মুসলমান হয়ত অস্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে বসবাস করতে পারে, তবে চট্টগ্রামে বা বাংলার অন্য কোন স্থানে তখন কোন মুসলিম বসতি ছিল, সেইরূপ কোন প্রমাণ নাই। অতএব বাংলা বা চট্টগ্রামের সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল বাণিজ্যিক, ধর্মীয় নয়।

মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয় ঃ

তিন পর্যায়ে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে। প্রথমত, আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়, মুহাম্মদ বিন কাসিম উমাইয়া খলিফা ওলিদের আমলে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে এই বিজয়ের নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে গজনীর সবুক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদের বারম্বার ভারত আক্রমন। সুলতান মাহমুদ সতর বার ভারতের বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করেন এবং প্রত্যেকবার অজস্র ধন সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান, তিনি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেননি, তবে শুধু লাহোরকেন্দ্রীক পশ্চিম সীমান্তের কিছু এলাকা স্বীয় গজনী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সবুক্তগীন ও সুলতান মাহমুদ ছিলেন তুর্কী। তৃতীয় পর্যায়ে যারা আক্রমণ করে তারাও ছিল তুর্কী, নেতৃত্ব দেন সুলতান মুইজ্জ-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন সাম, যিনি ভারত ইতিহাসে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী নামে সমধিক পরিচিত। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী দিল্লী ও আজমিরে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দিল্লীকে রাজধানী করে একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন এবং কুতব-উদ-দীন আইবককে দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে শাসক নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘোরী ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে কুতব-উদ-দীন আইবক দিল্লীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সিংহাসনে বসেন। বাংলাদেশে মুসলিম বিজয় সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর বিজয়েরই অংশবিশেষ।

বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় ঃ

যে মহান বীর বাংলাদেশ আক্রমণ করে সেখানে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন তিনি বখতিয়ার খলজী, পুরো নাম ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী।

সংক্ষেপে ঐতিহাসিকেরা তাঁকে মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বা বখতিয়ার খলজী নামে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর নাম ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী, অর্থাৎ তিনি বখতিয়ার খলজীর ছেলে ইখতিয়ার-উদ-দীন, কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি সিস্তানের গরমসির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গোর অধিবাসী ছিলেন, এবং তুর্কীদের খলজী গোত্র ভুক্ত ছিলেন। তাঁর আর কোন বিশেষ পরিচিতি পাওয়া যায় না। সেকালে আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার ভাগ্যন্বেষী লোকেরা উন্নত জীবিকা অর্জনের আশায় ভারতবর্ষে আগমন করত এবং প্রধানত তুর্কী বিজয়ীদের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে ভারতে আসার পথ উন্মুক্ত ও সহজ ছিল। বখতিয়ার খলজী ভাগ্য অন্বেষণে ভারতে আসার সংকল্প করেন এবং মুহাম্মদ ঘোরীর সৈন্যদলে যোগাদানের উদ্দেশ্যে গজনীতে আসেন। কিন্তু গজনীতে মুহাম্মদ ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি প্রার্থী হয়ে তিনি ব্যর্থ হন। ঐ সময়ে প্রত্যেক সৈন্যকে নিজ নিজ ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র (ন্যূনপক্ষে ঢাল তলোয়ার) যোগাড় করতে হত, বখতিয়ার খলজীর মত একজন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে তা যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বখতিয়ার ছিলেন খাট আকৃতির, কুৎসিত চেহারার এবং তাঁর হাত দু'টি ছিল অস্বাভাবিক দীর্ঘ। তাই হয়ত তিনি মুহাম্মদ ঘোরীর আরিজের (সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষ) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লীতে কুতব-উদ-দীন আইবকের দরবারে যান, কিন্তু সেখানেও তিনি চাকুরি লাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বদাউনে যান, সেখানে শাসনকর্তা মালিক হিজবর-উদ-দীন বখতিয়ারকে নগদ বেতনে চাকুরীতে ভর্তি করেন। কিন্তু বখতিয়ার এইরূপ চাকুরীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই কিছুদিন পরে তিনি আরো পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে পৌছেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাম-উদ-দীন বখতিয়ার খলজীর প্রতিভা অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং তাঁকে ভিউলি এবং ভাগত নামক দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন। ভিউলি এবং ভাগত বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জিলায় অবস্থিত, এবং এটা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাজ্যের শেষ পূর্ব-সীমা, এতে বোঝা যায় যে বখতিয়ার খলজী তৎকালীন মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত হন। বখতিয়ার খলজী এই দায়িত্ব পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি এই দুই পরগণাকে তাঁর ভবিষ্যত উন্নতির সোপান রূপে ব্যবহার করেন।

সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় ভিউলী ও ভাগত পরগণা দু'টির পাশে ছিল হিন্দু শাসিত এলাকা। হিন্দুদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না, তাই এই এলাকা অনেক ছোট ছোট হিন্দু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বখতিয়ার খলজী ছোট ছোট রাজ্যগুলো একে একে অধিকারের পরিকল্পনা করেন। সুলতান মাহমুদের বারংবার আক্রমণ এবং সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর সারা উত্তর ভারত জয়ের ফলে হিন্দুদের মনে তুর্কী আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে আতংকের সৃষ্টি হয়। বখতিয়ার খলজী এর সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে এক এক করে হিন্দু রাজ্য আক্রমণ করে লুট করতে থাকেন। তাঁর বীরত্বের

কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে তাঁর স্বগোত্রীয় খলজীরা এসে তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিতে থাকে। এই ভাবে একদিকে যেমন তিনি ধন সম্পদ হস্তগত করেন, তেমনি অন্যদিকে ঐ ধন-সম্পদের সাহায্যে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করতেও সক্ষম হন। এইভাবে জয় করে করে অগ্রসর হওয়ার সময় একদিন তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে উপস্থিত হন। মুসলমান সৈন্যরা তৎক্ষণাত তরবারি চালনা করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বখতিয়ার খলজী মনে করেছিলেন প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটি একটি দূর্গ, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল, সেখানে সকল লোক মুন্ডিত মস্তক এবং সেখানে বই পুস্তকে পরিপূর্ণ। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, স্থানটি একটি বৌদ্ধ বিহার, এবং লোকগুলি সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু। বখতিয়ার খলজী আসলে ওদন্তপুরি বিহার জয় করেন, মুসলমানেরা সেই থেকে এর নাম দেয় বিহার। বৌদ্ধ বিহার হল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ভিক্ষুরা জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকেন।

বিহার জয় করে বখতিয়ার খলজীর সাহস বেড়ে যায়। তিনি আরো নতুন এলাকা জয় করার চিন্তা করেন। কিন্তু তার আগে তিনি বিপুল ধনরত্ন নিয়ে কুতব-উদ-দীন আইবকের সাথে সাক্ষাতের জন্য দিল্লীতে যান। কুতব-উদ-দীন আইবক ছিলেন ভারতে মুহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি। কিন্তু দিল্লীতে গিয়ে দেখনে যে সেখানে কয়েকজন আমীর তাঁর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত, তাঁরা বখতিয়ার খলজীর বিরুদ্ধে কুতব-উদ-দীনের নিকট কুৎসা রটনা করে তাঁর মন বিষাক্ত করে তোলেন। কুতব-উদ-দীন বখতিয়ারের সাহসিকতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে একটি পাগলা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন। বখতিয়ার খলজী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কুতব-উদ-দীন তাঁকে পুরস্কৃত করেন। বখতিয়ার আবার বিহারে ফিরে আসেন, আরো সৈন্য সংগ্রহ করে পরের বছর তিনি নদীয়া আক্রমণ করেন।

বিহার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা বিজয়ের ফলে বখতিয়ার খলজীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকে আতংকের সৃষ্টি হয়। বাংলার রাজা লক্ষণ সেন তখন নদীয়ায় ছিলেন, একদিন তাঁর দরবারের ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা তাঁকে বলেন যে, তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে বাংলাদেশ তুর্কীদের অধিকারে যাবে। সারা উত্তর ভারতে মুসলিম তুর্কীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বিহার পর্যন্ত জয় করে নিয়েছেন। অতএব তুর্কীরা বাংলাদেশও আক্রমণ করবে, এবং তাঁরা রাজাকে পরিবার পরিজন এবং পারিষদসহ নদীয়া ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার অনুরোধ জানান। রাজা জিজ্ঞেসা করলেন, তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থে বাংলা বিজয়কারী তুর্কী বীরের কোন রূপ পরিচিতি আছে কিনা? পণ্ডিতেরা বললেন যে, যে তুর্কী বীর বাংলা জয় করবেন তাঁর দেহাবয়ব এরকম হবে যে তিনি আকৃতিতে খাট, দেখতে কুৎসিত হবেন এবং তাঁর হাতদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। লক্ষণ সেন বিহারে গোয়েন্দা পাঠিয়ে জানতে পারেন যে বখতিয়ার খলজী সত্যিই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বর্ণনা

মত খাট এবং কুৎসিত ছিলেন এবং তাঁর দুটি হাতও লম্বা ছিল। কিন্তু রাজা নদীয়া ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা রাজাকে ফেলে চলে গেলেন এবং যে যেখানে পারে আশ্রয় নিলেন এবং তুর্কীদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। লক্ষণ সেনের দরবারে সত্যিই এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল কিনা বলা যায় না। তবে সমসাময়িক ইতিহাসে এই তথ্য পাওয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন। বখতিয়ার খলজী এরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নদীয়া এসে পৌছেন যে তাঁর সঙ্গে মাত্র ১৮জন অশ্বারোহী সৈন্য নদীয়ায় পৌছে। তিনি সোজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদে যান এবং রক্ষীদের হত্যা করেন। রাজা লক্ষণ সেন তখন মধ্যাহ্ন ভোজে লিপ্ত ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি খালি পায়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং নদী পথে রাজধানী বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। নদীয়া বিনা যুদ্ধে বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হয়। রাজার ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ, ভৃত্যবর্গ এবং অনেক হাতি বিজয়ীদের অধিকারে আসে।

সমসাময়িক ইতিহাসে বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয়ের এই কাহিনী পাওয়া যায়, এই কারণে আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে ১৭ জন তুর্কী অশ্বারোহী বাংলাদেশ জয় করে। রাজা লক্ষণ সেন সারা বাংলাদেশ অর্থাৎ এক বিস্তীর্ণ এলাকায় অধীশ্বর ছিলেন। তাঁকে কাপুরুষও বলা যায় না, তিনি পিতামহের রাজত্বকালে অনেকযুদ্ধে অংশ নেওয়ার প্রমাণ আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সময় থাকতে নদীয়া ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেও লক্ষণ সেন পালিয়ে যাননি। তাতে মনে হয় বখতিয়ার খলজীর সহজ বিজয়ের অন্য কারণ আছে।

লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে। কিন্তু তিনি হয় পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গা তীরে (ভাগিরথী শাখা) নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন, বা সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলের ডুম্মন পালের বিদ্রোহ দমনের জন্য নদীয়ায় যান। ইতোমধ্যে তুর্কী আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে গঙ্গার ধারে রাজমহলের পার্বত্য গিরিপথে তেলিয়াগড় দূর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং দূর্ভেদ্য ছিল। পশ্চিম দিক থেকে আগত আক্রমণকারীরা সহজে এই দূর্গ জয় করে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না। লক্ষণ সেন মনে হয় এই দূর্গে সৈন্য সমাবেশ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেন। লক্ষণ সেনের মত অভিজ্ঞ রাজার পক্ষে তা-ই ছিল স্বাভাবিক, অর্থাৎ লক্ষণ সেন তেলিয়াগড় দূর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজী শুধু একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি একজন সমরকুশলীও ছিলেন। তাঁর কোন যুদ্ধ নৌকা বা রণপোত ছিল না, তাঁর পক্ষে গঙ্গা নদী পথে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তিনি তেলিয়াগড়ের দক্ষিণ দিকে বাংলার পশ্চিম সীমান্তে বিস্তীর্ণ দূর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ঝাড়খন্ড দিয়ে অগ্রসর হন। ঝাড় জঙ্গল ভেদ করে বিশাল সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি সৈন্যবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে এক দলের পর অন্য দল অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। বখতিয়ার খলজী নিজেই প্রথম দলটির নের্তৃত্ব দেন, এবং তিনি যখন নদীয়া পৌছেন তখন তাঁর সঙ্গে ১৮

জন সৈন্য ছিল। পেছনে পেছনে অন্যান্য দলও চলে আসে এবং বখতিয়ার খলজী যখন প্রাসাদ দ্বারে এসে পৌছেন তখন অন্য দু'একটি দল শহরে প্রবেশ করে। কেউ বুঝতেই পারে না যে তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজী আক্রমণ করেছেন, বরং সকলেই মনে করে যে তারা ঘোড়া ব্যবসায়ী এবং রাজা লক্ষণ সেনের নিকট ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছে। সকলের অজ্ঞাতে এবং অলক্ষ্যে বাংলায় একটি বিপ্লব সংঘটিত হল, যার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী।

বখতিয়ার খলজী যেই নদীয়া আক্রমণ করেন তা ভাগিরথী তীরে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আধুনিক কালে কেউ কেউ মনে করেন যে, বখতিয়ার খলজীর অধিকৃত নদীয়া হল উত্তর বঙ্গের নওদা (নওয়াদেহ), গৌড় বা লখনৌতির নিকটে, কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বখতিয়ার খলজী নদীয়াতে অবস্থান করেন নি; লক্ষণ সেনের পলায়নের পরে তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, তাই বখতিয়ার খলজীকে বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। তিনি নদীয়ায় ৩ দিন থেকে লুঠ করে অনেক ধন-রত্ন, হাতী ঘোড়া হস্তগত করেন এবং নদীয়া ছেড়ে উত্তরবঙ্গে এসে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন এবং সেখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তখন গৌড়ের নাম ছিল লক্ষণাবতী (রাজা লক্ষণ সেনের নামানুসারে), মুসলমানদের নিকট এবং ফারসি ইতিহাসে তা লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লখনৌতি অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাতে মনে হয় তিনি লখনৌতিও বিনাযুদ্ধে জয় করেন। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের তারিখ নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিস্তর গবেষণা করেন, কারণ সমসাময়িক ইতিহাসে এই তারিখ পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি বখতিয়ার খলজীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী শীত মৌসুমে তিনি নদীয়া বিজয় করেন।

বখতিয়ার খলজীর অধিকৃত মুসলিম রাজ্য উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোট হয়ে রংপুর পর্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা শাখা) নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পশ্চিমে বখতিয়ার খলজীর অধিকৃত বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকাও তাঁর অধীনে ছিল। লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করে বখতিয়ার খলজী স্বীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে সুলতান ছিলেন না, সুলতান উপাধিও নেননি, গৌড় বিজয়ের পরে তিনি সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর নামে মুদ্রা জারী করেন, অর্থাৎ তিনি মুহাম্মদ ঘোরীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন এবং মুহাম্মদ ঘোরীর নামেই রাজ্য অধিকার এবং শাসন করেন। তিনি অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি ইকতা বা কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিট বা খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ইকতায় একজন করে মুকতা (ইকতার শাসক) নিযুক্ত করেন। এই সময়ের তিনজন মুকতার নাম পাওয়া যায়—আলী মর্দান খলজী, মুহাম্মদ শীরান খলজী এবং হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী। এঁরা সকলেই তাঁর উচ্চ পদস্থ সেনাপতি ছিলেন। শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও তাঁর অধিকৃত রাজ্যে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার

জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ তৈরী করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুসলমান সমাজই হল সামরিক শক্তির ভিত্তি, সমাজের সমর্থন ছাড়া সামরিক শক্তি বেশিদিন টিকতে পারবে না। তাই তিনি উপাসনার জন্য মসজিদ, শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা এবং সুফীদের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য খানকাহ নির্মাণ করেন।

বখতিয়ার খলজীর জীবনের শেষ কাজ তিব্বত আক্রমণ। বখতিয়ার খলজীর অধিকৃত লখনৌতি রাজ্যের বাইরেও দক্ষিণ ও পুর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ অনধিকৃত ছিল। এই নিকটের এলাকা জয় না করে বা বাংলাদেশ বিজয় সম্পূর্ণ না করে তিনি কেন সুদূর পার্বত্য তিব্বত জয় করার মনস্থ করেন তা বুঝা মুস্কিল। কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি তিব্বত জয় করেই স্বদেশ তুর্কিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ভেবে তিব্বত জয় করেত যান। তবে এর প্রধান কারণ বোধহয় অন্য কিছু। তিনি বুঝতে পারেন যে, নদীমার্তৃক পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা জয় করতে হলে যে নৌ-বাহিনী প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না, নৌ-বাহিনী গঠন করাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বখতিয়ার খলজী কিন্তু চুপচাপ বসে থাকারও লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যোদ্ধা, তাই তিনি তিব্বত অভিযানের সংকল্প করেন, তুর্কিস্তানের পথ আবিষ্কার করাও তাঁর উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যাই হোক, বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান কোন হঠাৎ সিদ্ধান্ত ছিল না, তিনি অনেক বিচার বিবেচনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি নিয়েই এই অভিযানে বের হন। তিববতের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি একজন পার্বত্য লোককে মুসলমান করে পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। তিনি অনেক প্রস্তুতির পরে দশহাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি পূর্বদিকে কয়েকদিন কুচ করে যাওয়ার পরে বর্ধনকোট শহরে উপনীত হন, সম্মুখে একটি বৃহৎ নদী থাকায় তিনি নদী পার না হয়ে উত্তর দিকে দশ দিন চলার পরে পাথরের নির্মিত একটি পুল দেখতে পান, পুল পার হয়ে তিনি দুইজন সেনাপতিকে পুল পাহারায় নিযুক্ত করে আবার অগ্রসর হন। তখন তিনি কামরূপে পৌছে গেছেন, কমরূপের রাজা দূত পাঠিয়ে বলেন যে, ঐ বৎসর তিব্বত আক্রমণ করা সমীচিন হবে না, তিনি ফিরে গিয়ে পরের বছর আসলে কামরূপের রাজাও তাঁর সঙ্গে তিব্বত অভিযানে যাবেন। বখতিয়ার খলজী কামরূপের রাজার কথায় কান না দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বখতিয়ার খলজী যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি অনেক সৈন্য হারান এবং বুঝতে পারেন যে তিব্বত জয় করা সম্ভব হবে না। তিনি ফিরে আসেন কিন্তু পাথরের নির্মিত পুলে পৌছে দেখেন যে পুলটি ভাঙ্গা, সেখানে কামরূপের রাজা সকল খাদ্যশয্য পুড়িয়ে দেওয়ায় বখতিয়ারের সৈন্য ও ঘোড়া অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে বখতিয়ার খলজী সৈন্যবাহিনীসহ নদী সাঁতরিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু বিশাল সৈন্যবাহিনী নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। মাত্র শ' খানিক সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজী দেবকোটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে মৃত সৈন্যদের স্ত্রীপুত্র পরিজনেরা বখতিয়ার খলজীকে অভিশাপ দিতে থাকে। বিমর্ষ হতাশ

বখতিয়ার খলজী শোকে-দুঃখে অল্পদিন অসুখে থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর সেনাপতি এবং বরসৌলের মুকতা আলী মর্দান খলজী অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে এসে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন।

খলজী মালিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ঃ

বখতিয়ার খলজীর মৃত্যু বা হত্যার সংবাদ পেয়ে তাঁর একজন প্রধান অমাত্য লখনৌর (বীরভূমের নগৌর) এর মুকতা মুহাম্মদ শীরন খলজী দ্রুত দেবকোটে আসেন। তিনি পরলোকগত নেতার দাফন সম্পন্ন করেন এবং শোক প্রকাশ করেন। দেবকোটের খলজী আমীর এবং সৈনিকবৃন্দ তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেন এবং তিনি বখতিয়ার খলজীর গঠিত মুসলিম রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি বখতিয়ার খলজীর কথিত হন্তা আলী মর্দান খলজীর ইকতা বরসৌল আক্রমণ করেন এবং তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হন। তিনি আলী মর্দানকে হাজী বাবা ইসপাহানী নামক একজন কোতোয়ালের অধীনে বন্দী রাখেন।

মুহাম্মদ শীরন খলজী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন, যোগ্যমত বখতিয়ারের আমীরদের স্বস্ব পদে বহাল রাখেন বা নতুন নিযুক্তি দেন। কিন্তু হঠাৎ করে আলী মর্দান খলজী বন্দী দশা থেকে পলায়ন করে আবার লখনৌতির শান্তিভঙ্গ করেন। আলী মর্দান সোজা দিল্লীতে গিয়ে কুতব-উদ-দীন আইবকের শারণাপন্ন হন এবং তাঁকে লখনৌতি আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কুতব-উদ-দীন তাঁর এক সেনাপতি কায়েমাজ রূমীকে লখনৌতি গিয়ে খলজী আমীরদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার আদেশ দেন। কায়েমাজ রুমী সসৈন্যে অগ্রসর হলে লখনৌতির পশ্চিম সীমান্তের মুকতা (এবং বখতিয়ার খলজীর আর একজন আমীর) হুমাস-উদ-দীন ইওজ খলজী বিনা যুদ্ধে দিল্লীর সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পন করেন। মুহাম্মদ শীরন খলজীও দিল্লীর সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করা নিরর্থক মনে করে দেবকোট ছেড়ে উত্তর দিকে পলায়ন করেন। কায়েমাজ রূমী বিনা যুদ্ধে লখনৌতি দখল করে হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজীকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ফিরতি পথে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ শীরন খলজী দেবকোটে ফিরে এসে হুসাম-উদ-দীন ইওজকে আক্রমণ করেন। কায়েমাজ রূমীও দেবকোটের ঘটনাবলীর কথা শুনে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসে মুহাম্মদ শীরন খলজীকে আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ শীরন খলজী পরাজিত হয়ে মাসেদা-সন্তোষের (মাহি-সন্তোষ, দিনাজপুর) দিকে পলায়ন করেন। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু শুনা যায় না। তিনি ১২০৭-১২০৮ পর্যন্ত বছর খানেক ক্ষমতায় ছিলেন। কায়েমাজ রূমী আবার হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। এখানে উল্লেখ্য যে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর থেকে দেবকোট মনে হয় রাজধানীর মর্যাদা পায়, কারণ এই কয়েক বছরের ইতিহাসে লখনৌতির উল্লেখ নেই।

হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী দিল্লীর অধীনস্থ গবর্ণর রূপে শাসন করতে থাকেন। এদিকে আলী মর্দান খলজী কুতব-উদ-দীন আইবকের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মর্যাদা লাভ করেন। কুতব-উদ-দীন গজনী অধিকার করলে আলী মর্দানও তাঁর সঙ্গে গজনী যান, এবং ৪০ দিন কুতব-উদ-দীন গজনীতে অবরুদ্ধ থাকাকালে আলী মর্দানও অবরুদ্ধ থাকেন। পরে কুতব-উদ-দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে আলী মর্দানও কিছুদিন পরে ফিরে আসেন। এইবার কুতব-উদ-দীন আলী মর্দানকে লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। আলী মর্দান খলজী গবর্ণর রূপে লখনৌতি আসলে হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী আলী মর্দানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে কুতব-উদ-দীনের মৃত্যু হলে লখনৌতিতে আলী মর্দান খলজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান আলা-উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করেন। বখতিয়ার খলজী এবং মুহাম্মদ শীরন খলজী স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করলেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, কিন্তু আলী মর্দান খলজী স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান উপাধি নেন। অতএব সুলতান আলা-উদ-দীন (আলী মর্দান) লখনৌতির প্রথম মুসলিম সুলতান। সুলতান আলা-উদ-দীন আলী মর্দান খলজী সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি বুঝে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতেন কিন্তু তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিনা কারণে রক্তপাত করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। হঠাৎ শাসন ক্ষমতা পেয়ে তাঁর মাথা ঘুরে যায় এবং তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকেন। তিনি লখনৌতির সিংহাসনে বসে খোরাসান, ঘোর, গজনী ইত্যাদি এলাকায় জায়গীর প্রদান করতে থাকেন এবং কেউ আপত্তি করলে বলতেন যে তিনি ঐ সকল এলাকা দখল করে নেবেন। এক কথায় বলা যায় যে তিনি সিংহাসনে বসে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকেন, এমনকি স্বগোত্রীয় আমীরদের প্রতিও অত্যাচার করতে থাকেন। খলজী আমীরেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গোপনে আলী মর্দান খলজীকে হত্যা করেন। হুসাম-উদ-দীন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। (১২১২ খ্রিঃ)।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী ১২১২-১২২৭ খ্রিঃ

ইওজ খলজীর পিতার নাম হোসেন। তিনিও বখতিয়ার খলজীর মতো সিস্তান এলাকার গরমশির বা দশত-ই-মার্গোর লোক ছিলেন এবং ভাগ্য অন্বেষণে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথম বয়সে অতি দরিদ্র ছিলেন এবং গাধার পিঠে করে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে মালামাল পরিবহন করতেন। এইরূপ কাজে লিপ্ত থাকার কোন এক দিনে দুইজন দরবেশ তাঁর নিকট খাবার চান, তিনি তাঁদের শুকনো রুটি এবং পানি দেন। দরবেশদ্বয় সন্তুষ্ট হন এবং বিদায়ের সময় আশীর্বাদের সুরে তাঁকে বলেন যে, হিন্দুস্তানে যাও, সেখানে যেখানে একজন মুসলমান আছে, সেই এলাকা তোমাকে দান করা হল। ইওজ খলজী তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন, কালক্রমে তিনি বখতিয়ার খলজীর সৈন্যদলে যোগ দেন এবং বুদ্ধি, সাহস ও চরিত্রগুণে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের অধীশ্বর হন।

ইওজ খলজীর গঠনমূলক কর্মকান্ড ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন, তিনি লখনৌতির মুসলিম রাষ্ট্রকে সুসংহত ও সুগঠিত করার জন্য লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করলেও তিব্বত অভিযানের পরে তাঁর শেষ জীবন কাটে দেবকোটে। পরবর্তী কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করে দেখা যায় যে রাজধানী দেবকোটেই থাকে; মুহাম্মদ শীরন, আলী মর্দান বা গবর্নর থাকা কালে হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী দেবকোট থেকে রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করার প্রমাণ নেই। রাজধানী হিসেবে দেবকোট ও লখনৌতি উভয় শহরের গুরুত্ব ছিল, দেবকোট উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু লখনৌতি ছিল নদী তীরে। ইওজ খলজী লখনৌতিকে গুরুত্ব দেন কারণ লখনৌতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। নৌকাযোগে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। তাই তিনি লখনৌতিতে রাজধানী ফিরিয়ে আনেন এবং লখনৌতির প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার জন্য বসকোট (বা বসনকোট) নামে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন।

পরে ইওজ খলজী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে নজর দেন। তিনি একটি সুদীর্ঘ এবং সুউচ্চ রাজপথ নির্মাণ করেন। এই রাজপথের দ্বারা তিনি একদিকে লখনৌতিকে দেবকোটের সঙ্গে এবং অন্যদিকে লখনৌর (নগৌর) এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই রাজপথ নির্মাণের দুইটি লক্ষ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং সামরিক বাহিনীর চলাচলের সুবিধা। বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চলাচল উভয় কারণে নদী পথ এবং নৌকার গুরুত্ব ছিল বেশি। মুসলমান সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। তাই এই বাহিনীর জন্য প্রয়োজন ছিল রাজপথ, লখনৌতি রাজ্যের উত্তর প্রান্ত দেবকোট এবং দক্ষিণ প্রান্ত লখনৌর এর সঙ্গে সামরিক যোগাযোগের জন্য এই রাজপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানত সামিরক কারণে নির্মিত হলেও এই রাজপথ জনগণের যাতায়াত সুবিধা এবং স্থলপথে বাণিজ্যিক সুবিধাও বৃদ্ধি করে।

ইওজ খলজী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম নৌবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তুর্কীরা আসে পার্বত্য অঞ্চল থেকে। কিন্তু বাংলাদেশ নদী বহুল দেশ, বৎসরের অধিকাংশ সময় পানির নীচে ডুবে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা, চতুর্দিকস্থ হিন্দু রাজাদের আক্রমণ এবং সর্বোপরি দিল্লীর অভিযান প্রতিহত করতে হলে নৌবাহিনীর সাহায্য অপরিহার্য। তাছাড়া ক্ষুদ্র লখনৌতি রাজ্য নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণের জন্যও নৌবাহিনীর প্রয়োজন। সকল দিক বিবেচনা করে ইওজ খলজী একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। বাংলাদেশে নৌবাহিনী গঠন করা কোন কঠিন কাজ ছিল না, বাংলার মিস্ত্রি কারিগরেরাই নৌকা তৈরী করতে জানত। মাঝি মাল্লাও বাংলাদেশে প্রচুর পাওয়া যেত। তবে নৌবাহিনী গঠনের আর একটা সুফল এই ছিল যে, মুসলিম শাসনের সঙ্গে স্থানীয় হিন্দু মিস্ত্রি কারিগর, মাঝি মাল্লার সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

লখনৌতির মুসলিম রাজ্যে মুসলিম সমাজ গঠনেও ইওজ খলজী বিশেষ অবদান রাখেন। বখতিয়ার খলজীর মত ইওজ খলজীও বুঝতে পারেন যে, মুসলিম সমাজ হবে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি। তাই তিনি বখতিয়ার খলজীর অনুসরণ করে স্থানে স্থানে সমজিদ মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ এই কারণে ইওজ খলজীর ভূয়সী প্রসাংসা করেন। বর্তমানে ইওজ খলজীর নির্মিত ইমারতাদির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়না, কিন্তু ঐতিহাসিক মিনহাজ এগুলো স্বচক্ষে দেখেন। তিনি আলেম, সৈয়দ ও সূফীদের বিশেষ ভক্তি করতেন এবং তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি, পুরস্কার দিতেন এবং জায়গীর প্রদান করতেন। সম্প্রতি বীরভূম জিলার (পশ্চিম বঙ্গ) বোলপুরের অন্তর্গত সিয়ান গ্রামে ইওজ খলজীর একটি আরবী শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, ইওজ খলজীর রাজত্ব-কালে যুবরাজ আলী শের একখানি খানকাহ নির্মাণ করেন, সেখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে আরাধনা করার সুযোগ পায়। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে অনেক মুসলমান আলেম, সূফী, দরবেশ এবং পেশাধারী লোক ভারতে এবং বাংলাদেশে চলে আসে, ইওজ বাংলাদেশে আগতদের আশ্রয় দেন। আফগানিস্তানের ফিরূজ্‌কোহ এর মওলানা জামাল-উদ-দীন গজনভীর ছেলে মওলানা জালাল-উদ-দীন গজনভী ইওজ খলজীর সমর্থন লাভ করেন। তিনি ইওজ খলজীর সভাকক্ষে বক্তৃতা করেন এবং ইওজ ও তাঁর আমীরেরা মওলানাকে বিপুল ধন-রত্ন দেন। তাঁর সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে অনেক বহিরাগত মুসলমান বাংলাদেশে আসে এবং মুসলিম সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে অবদান রাখে।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী সুলতান উপাধি নিয়ে স্বনামে মুদ্রা জারী করেন। বখতিয়ার খলজী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর নামে, আলী মর্দান খলজী স্বনামে (সুলতান আলা-উদ-দীন) মুদ্রা জারী করেন, কিন্তু বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজীই সর্বপ্রথম যাঁর অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ইওজ খলজীর সমসাময়িক দিল্লীর সুলতান ছিলেন সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ (১২১০-১২৩৬ খ্রিঃ); ইলতুতমিশের বেশ কিছু মুদ্রা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হওয়ায় আগে মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা মনে করতেন যে ইওজ ইলতুতমিশের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু এখন কেউ এই অভিমত গ্রহণ করে না। ইওজ আলী মর্দানের পরে উত্তরাধিকার সূত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেন। ইওজ খলজী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাধীনতার প্রতীক সুলতান উপধিসহ মুদ্রা জারী করেন। তিনি সুলতান-উল-মুয়াজ্জম ও সুলতান-উল-আজম উভয় উপাধি গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি মুদ্রায় নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসী খলিফার নামও উৎকীর্ণ করেন এবং নিজেকে খলিফার সাহায্যকারী রূপে ঘোষণা করেন। আব্বাসী খলিফাকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক মনে করা হত এবং আব্বাসী খলিফারা যখন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে তখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রভাবশালী মুসলমান শাসকেরা তাঁদের নিকট থেকে সনদ লাভ করে নিজেদের শাসন আইনানুগ করতেন। আব্বাসী লেখাফতের পতনের পরেও

কোন কোন মুসলিম শাসক শেষ আব্বাসী খলিফার নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ করতেন। তাই ইওজ খলজী কর্তৃক আব্বাসী খলিফার নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ করায় পূর্বে ঐতিহাসিকেরা মনে করতেন যে ইওজ খলজী আব্বাসী খলিফার সনদ লাভ করেন। কিন্তু বর্তমানে এই মত কেউ সমর্থন করে না। ইওজ খলজী কর্তৃক খলিফার সনদ লাভ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু খলিফার নাম উৎকীর্ণ করে তিনি খলিফা এবং খেলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইওজ খলজীর রাজ্য বিস্তার ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী তাঁর গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বীয় রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি এখন রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন। উপরে বলা হয়েছে যে, মুসলিম রাজ্যটি বাংলাদেশের মাত্র একটি অংশে স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পরে খলজী মালিকদের অন্তর্বিরোধের ফলে মুসলিম রাজ্যের সীমানা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ইওজ খলজীই সর্বপ্রথম রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, পাশ্ববর্তী হিন্দু রাজারা যেমন, কামরূপ, উড়িষ্যা, বঙ্গ (পূর্ব বাংলা) এবং ত্রিহুতের রাজারা ইওজ খলজীর নিকট কর পাঠান। এই সকল দেশের রাজার সঙ্গে ইওজ খলজীর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও মিনহাজের উক্তির সত্যতা সন্দেহ করা যায় না। বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে করতোয়া নদীর পূর্ব দিকে কামরূপ রাজ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অস্তিত্ব ছিল, এরা সকলে একযোগে বারভূঁঞা নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে একতা ছিল না, বরং অন্তর্বিরোধ লেগে থাকত। বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের সময় কামরূপের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় হয়। ইওজ খলজী হয়ত কামরূপের কোন কোন ভূঁঞাকে পরাজিত করে কর দিতে বাধ্য করেন। উড়িষ্যার রাজা ৩য় অনঙ্গভীমের এক শিলালিপিতে দেখা যায় যে, আনুমানিক ১২২০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু এক 'যবন' রাজার সঙ্গে যুদ্ধে সাহসের পরিচয় দেন। অন্যদিকে মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, বীরভূমস্থ্ লখনৌর (নগৌর) মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু ইওজ খলজী তা পুনরুদ্ধার করেন, এবং অনেক হাতি, ঘোড়া, ধনসম্পদ হস্তগত করে সেখানে স্বীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতএব উভয় সূত্রে এটা পরিষ্কার যে, ইওজ খলজী এবং উড়িষ্যার রাজার মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তবে সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এই সংঘর্ষের ফলে ইওজ কর্তৃক ধন-সম্পদ হস্তগত করাকেই মিনহাজ উড়িষ্যা কর্তৃক কর দেওয়ার কথা বলেছেন। ইওজ খলজী ইহার পরে দক্ষিণ দিকে আরো রাজ্য বিস্তার করেন এবং অজয় নদী থেকে দামোদর নদী পর্যন্ত জয় করেন। ত্রিহুত পশ্চিম দিকে দিল্লী সাম্রাজ্য এবং পূর্ব দিকে লখনৌতির মুসলিম রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ত্রিহুতের শাসকদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ ছিল। তাই ইওজ খলজী

কর্তৃক ত্রিহুত আক্রমণ করা এবং ত্রিহুতের রাজার নিকট থেকে কর আদায় করার কথা সত্য বলে মনে হয়। তাছাড়া ত্রিহুত তখন কোন শক্তিশালী রাজ্যও ছিল না। কামরূপ, উড়িষ্যা এবং ত্রিহুত ছিল লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশ, কিন্তু বাংলার অভ্যন্তরেই বিস্তীর্ণ অংশ মুসলিম অধিকারের বাইরে ছিল। বখতিয়ার খলজীর নৌ-বাহিনী না থাকায় তিনি নিম্নবঙ্গ জয়ের চেষ্টা না করে তিব্বত আক্রমণে বের হন, কিন্তু ইওজ খলজী নৌ–বাহিনী গঠন করায় তাঁর জন্য বাংলার অন্য অংশ জয় করার পথে বাধা অপসারিত হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে ইওজ খলজী বঙ্গকে অর্থাৎ পূর্ব বাংলার শাসনকর্তাকে কর দিতে বাধ্য করেন। মিনহাজের এই বক্তব্য সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এর সমর্থনে তথ্যও পাওয়া যায়। হরিমিশ্রের কুলজী গ্রন্থ 'কারিকা'য় বলা হয় যে, লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেন 'যবন রাজার' ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং তিনি গৌড়দেশ পরিত্যাগ করে যান। লক্ষণ সেনের আর এক ছেলে বিশ্বরূপ সেন তখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন। তাঁর শাসন পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি নেন। তাঁর সময়েই ইওজ খলজী পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন এবং কর আদায় করেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পরে খলজী মালিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে লখনৌতির রাজ্য সীমা স্থিতিশীল হয়ে পড়লেও সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী রাজ্যবিস্তারে মন দেন এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল দিকেই তাঁর রাজ্য সীমা কিছু কিছু বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তিনিই সর্বপ্রথম লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। দিল্লীর সুলতান তাঁর প্রতি বৈরী ভাব পোষণ না করলে তাঁর স্বপ্ন হয়তো বা সফল হত।

ইওজ খলজীর প্রতি দিল্লীর বৈরিতা ঃ

দিল্লীর সুলতান বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নেননি। লখনৌতি জয় করেন বখতিয়ার খলজী, দিল্লীর সুলতান তাঁকে সমর্থন বা সাহায্য করেনি। বখতিয়ার খলজী এবং তাঁর পরবর্তী খলজীরা মনে করত, লখনৌতি তাদেরই অধিকৃত, বখতিয়ার খলজী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও তাঁর পরবর্তী খলজীরা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেনি। খলজী মালিকদের অন্তর্দ্বন্দের ফলে দিল্লীর সুলতান কুতব-উদ-দীন আইবক লখনৌতি জয় করার সুযোগ পান, এবং কুতব-উদ-দীনের উত্তরাধিকারী সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশও লখনৌতিকে দিল্লীর অংশ মনে করতেন এবং তাই তিনি ইওজ খলজীর স্বাধীনতা সহ্য করলেন না। ইলতুতমিশ প্রথমে তাঁর সিংহাসন নিষ্কন্টক করার জন্য প্রতিদ্বন্দী সুলতানদের পরাজিত করেন এবং দিল্লীতে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের দমন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হলে ইলতুতমিশ লখনৌতি আক্রমণ করেন ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে লখনৌতির দিকে

অগ্রসর হলে ইওজ খলজী তাঁকে বাধা দেন। তিনি তাঁর নৌ-বাহিনী কাজে লাগান এবং গঙ্গা নদী ধরে রণতরী নিয়ে তেলিয়াগড়ে দিল্লীর সুলতানের পথ রোধ করেন। তথ্যের অভাবে উভয় পক্ষে যুদ্ধের ফলাফল জানা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, উভয় পক্ষে সন্ধি হয়, যার শর্ত মতে ইওজ খলজী ইলতুতমিশকে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ এবং ৩৮টি হাতি দিতে সম্মত হন। ইওজ খলজী ইলতুমিশের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর নামে মুদ্রা জারী করতে এবং খুতবা পাঠ করতে স্বীকৃত হন। অতপর ইলতুতমিশ মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লীর দিকে পা বাড়ালেই ইওজ খলজী মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দেন। ইওজ সন্ধির অন্যান্য শর্তগুলোও পালন করেন কিনা সন্দেহ। সুলতান ইলতুতমিশও ভবিষ্যতে সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে তখনকার মত দিল্লী ফিরে যান।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী বুঝতে পারেন যে ইলতুতমিশ এই অপমান সহ্য না করে পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করবেন। তাই ইওজ প্রায় এক বৎসর লখনৌতি ছেড়ে কোথাও যাননি। তিনি ইলতুতমিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে অযোধ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়, সেখানে হিন্দুরা বিদ্রোহ করে। ইলতুতমিশ-তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ অযোধ্যায় পাঠান। ইওজ খলজী মনে করেন যে দিল্লীর সৈন্যরা অযোধ্যায় ব্যস্ত থাকবে, লখনৌতির দিকে দৃষ্টি দিতে পারবে না। তাই তিনি পূর্ববঙ্গ জয় করার পরিকল্পনা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলা অভিযানে যান। এদিকে যুবরাজ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতির দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং ইওজ খলজী পূর্ববঙ্গ অভিযানে বের হলে তাঁর অনুপস্থিতিতে হঠাৎ করে লখনৌতি আক্রমণ করেন। ইওজ খলজী সংবাদ পেয়ে পূর্ববঙ্গ অভিযান স্থগিত করে রাজধানীতে ফিরে আসেন, কিন্তু পৌছার আগেই লখনৌতি দিল্লীর সৈন্যদের অধিকারে চলে যায়। লখনৌতি পর্যন্ত পৌছে তিনি আবার ভুল করেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নেয়ার চেষ্টা না করে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সৈন্যদের আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। লখনৌতি দিল্লীর অধিকারে চলে যায় এবং দিল্লীর প্রদেশে পরিণত হয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতির গবর্ণর নিযুক্ত হন।

ইওজ খলজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উদার ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। কূটনীতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতি করে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করতে

সক্ষম হন। তিনি বখতিয়ার খলজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে সেনাপতির পদ এবং তার শাসনকর্তা মুকতার পদ লাভ করেন। কুতব-উদ-দীন আইবকের সেনাপতি কায়েমাজ রূমী লখনৌতির দিকে অগ্রসর হলে লখনৌতির পশ্চিমাঞ্চলীয় ইকতার শাসনকর্তা হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী তাঁকে বাধা না দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। কায়েমাজ রূমী এতে এইরূপ সন্তুষ্ট হন যে লখনৌতি জয় করে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি হুসাম-উদ-দীন ইওজকেই খলনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করে যান। কুতব-উদ-দীন আইবক আবার আলী মর্দান খলজীকে লখনৌতির গবর্ণর করে পাঠালে এইবারও হুসাম-উদ-দীন ইওজ আলী মর্দানকে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। হুসাম-উদ-দীন ইওজ বুঝতে পারেন যে কায়েমাজ রূমী বা আলী মর্দানের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি সফল হবেন না। কিন্তু আলী মর্দান খলজীর অত্যাচারে খলজী মালিকেরা অতিষ্ঠ হলে ইওজ খলজী সুযোগ পান, তিনি আলী মর্দানের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে আলী মর্দান নিহত হলে খলজী মালিকেরা ইওজ খলজীকেই সুলতান রূপে বরণ করে নেন। এতেই ইওজ খলজীর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইওজ খলজী রাজ্য বিস্তারের উদ্যোগ নেন এবং লখনৌতির ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইওজ খলজীর সময়ে মুসলিম রাজ্যের সীমানা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায় না, তবে এইটুকু বোঝা যায় যে, তিনি চতুর্দিকে সীমানা বৃদ্ধি করেন, এমন কি সীমান্তবর্তী রাজাদের নিকট থেকে কর আদায় করতে সক্ষম হন। লখনৌতিতে রাজধানী স্থানান্তর, দূর্গ নির্মাণ এবং রাজপথ নির্মাণ করে রাজধানীর সঙ্গে সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবকোট ও নগৌরের সংযোগ স্থাপন, মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে সমর্থন ইত্যাদি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কূটনীতি এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে। তবে ইওজ খলজীর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব বোধ হয় নৌ-বাহিনী গঠন। ইওজ খলজীর পূর্বে মুসলিম শাসকেরা নৌ-বাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি, কিন্তু নৌ-বাহিনী গঠনের ফলেই পরবর্তীকালে মুসলিম সুলতানেরা সারা বাংলা জয় করতে সক্ষম হন। মোগল আমলে বাংলার সুবাদারেরাও নৌ-বাহিনীর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। ইওজ খলজীর নির্মিত রাজপথও মুসলিম শাসন বিস্তারে সহায়ক হয়। পরবর্তীকালে শের শাহও রাজপথের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

ইওজ খলজী প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং মুসলিম আলেম, সৈয়দ, সূফীদের জন্য বৃত্তি ও জায়গীরের ব্যবস্থা করেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁর নির্মিত প্রতিষ্ঠানাদির কোন নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না। তাঁর সময়ে উৎকীর্ণ একমাত্র শিলালিপিতেও খানকাহ নির্মাণের কথা আছে। তিনি স্বনামে মুদ্রা জারী করে সার্বভৌমত্বের পরিচয় দেন, এবং মুদ্রায় আব্বাসী খলিফাদের নাম উৎকীর্ণ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতি সংহতি ঘোষণা করেন এবং খেলাফতের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইওজ খলজীর রাজ্য বিস্তার, গঠনমূলক কার্যক্রম, মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও সমর্থন, ইত্যাদি সব কিছুই তাঁর

শ্রেষ্টত্বের প্রমাণ বহন করে। তাঁর প্রতিদ্বন্দী দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইলতুতমিশ ইওজ খলজীর কথা উঠলে বলতেন যে, ইওজ খলজী মনে প্রাণে বাদশাহ্ ছিলেন এবং বলতেন যে, ইওজের মত প্রজাহিতৈষী সুলতানকে সম্মান না করে পারা যায় না। দিল্লীর ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজও ইওজ খলজীর প্রশংসা করেন, তাও ইওজ খলজীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

ইওজ খলজীর সময়ে উৎকীর্ণ সিয়ান শিলালিপিতে দেখা যায় যে ইওজের এক ছেলে আলী শের বীরভূম এলাকার (বোধ হয় নগৌরের) শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁর নাম শিয়ান শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। মুদ্রায় ইওজ খলজীর আরো দুই জন পুত্রের নাম পাওয়া যায়, আলা-উল-হক ওয়াদ-দীন (আলা-উদ-দীন) এবং মুইজু-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন (মুইজ্জ-উদ-দীন)। ইওজ খলজীর মৃত্যুর পরে তাঁদের কি পরিণাম হয় তা জানা যায় না, কারণ সমসাময়িক তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে তাঁরা কেউ ইওজ খলজীর পরে পিতৃ সিংহাসন অধিকার করার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে তুর্কী শাসন

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লীর সুলতান শাসন-উদ-দীন ইলতুতমিশের জ্যেষ্ঠ ছেলে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতিতে ক্ষমতা অধিকার করেন। লখনৌতি দিল্লীর অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে মাত্র স্বল্প সময়ের কথা বাদ দিলে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লীর অধীনেই ছিল।

তুর্কী শাসন আমলের বৈশিষ্ট্য ঃ

১২২৭ থেকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বৎসর সময়কালে বাংলার ইতিহাসের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথম, এই সময়ে তুর্কীরাই লখনৌতি শাসন করে, পরাজিত খলজী আমীরেরা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে বিফল হয়। দিল্লীতে ইলতুতমিশ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে, ইহার পরে গিয়াস-উদ-দীন বলবন ও তাঁর উত্তরাধিকারী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁরা সবাই ছিলেন তুর্কী, অতএব, লখনৌতির ইতিহাসেও ইহা তুর্কী আমল রূপে পরিচিত। অবশ্য গিয়াস--উদ-দীন বলবনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র-পৌত্র আরো কয়েক বৎসর লখনৌতিতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন, সেই সময়টাও তুর্কী আমল, কিন্তু তখন লখনৌতির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ হয় বলে আমরা বলবনের পুত্র পৌত্রের স্বাধীনতার আমলকে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়, লখনৌতির এই ষাট বৎসরের শাসন আমলে অধিকাংশ দিল্লীর গবর্নর প্রথম জীবনে মমলুক বা ক্রিতদাস ছিলেন বিধায় এই আমলকে বাংলার ইতিহাসের মমলুক আমল বা দাস আমল বলার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এই আমলকে তুর্কী শাসন আমল বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কারণ এঁরা সবাই দাস ছিলেন না, কিন্তু সবাই তুর্কী ছিলেন। এই সময়ে লখনৌতি দিল্লীর অধীনে ছিল, এবং দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে ইলতুতমিশ ও বলবন ছাড়া আর কেউ দাস ছিলেন না। তৃতীয়, এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ছিল, ইলতুতমিশের মৃত্যুর পরে তাঁর দূর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে সুলতানদের অকর্মন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে উজীর সেনাপতিরা প্রবল হয়ে উঠে, তাদের দলাদলির ফলে শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের উপর কড়া নজর রাখতে ব্যর্থ হয়। তাই প্রাদেশিক গবর্নরেরা নিজ নিজ এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবে কর্ম পরিচালনা করতেন, শুধু খুতবা পাঠ এবং মুদ্রা চালু করে সুলতানদের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতেন। চতুর্থ, দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় লখনৌতির মর্যাদা অধিক ছিল। ভৌগোলিক কারণে, অর্থাৎ

লখনৌতি দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় দিল্লীর সরকার লখনৌতির ব্যাপারে দৈনন্দিন ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখা সম্ভব ছিল না এবং এই জন্য সময়মত হস্তক্ষেপও করতে পারত না। তাই দিল্লীর অমাত্যেরা লখনৌতির শাসন ভার পাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করত, এবং লখনৌতির শাসন ভার পাওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা করত। লখনৌতির কোন কোন গবর্নর 'মালিক-উশ-শরক' উপাধি নিয়ে নিজের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করত। পঞ্চম, এই আমলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি বন্ধ হয়ে যায়, অভ্যন্তরীন কোন্দলের ফলে লখনৌতির গবর্নরেরা পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভে ব্যর্থ হয়। গবর্নরদের মধ্যে সাহসী যোদ্ধা ও সেনাপতির অভাব ছিল না, তাদের কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য আক্রমণের প্রমাণও আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও সমর্থনের অভাবে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অন্যদিকে লখনৌতির মুসলমান শাসকদের দূর্বলতার সুযোগে সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজারা তৎপর হয়ে উঠে, উড়িষ্যা, কামরূপ ও পূর্ববঙ্গের রাজারা শক্তি সঞ্চয় করে, কামরূপের উপজাতিগুলো যুদ্ধে পটু হয়ে উঠে এবং করতোয়ার অপর দিকে মুসলিম অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কামরূপের পূর্বে আসামে গৌহাটিকে কেন্দ্র করে অহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ, লখনৌতি রাজ্যের অভ্যন্তরে মুসলমান শাসনের প্রতি হিন্দুদের আস্থা ফিরে আসে। স্মরণ থাকতে পারে যে, বখতিয়ার খলজী বিহার জয় করার সংবাদ শুনে হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নদীয়া ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে হিন্দুদের উপর অযথা অত্যাচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং দেশে শাসন ব্যবস্থা সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং মুসলিম শাসকদের জনহিতকর কর্মকাণ্ডের ফলে, মুসলিম-অমুসলিম জনগণ সকলেই এর সুবিধা ভোগ করে। মুসলিম শাসকেরাও হয়ত অমুসলিম প্রজাদের আস্থা লাভের চেষ্টা করে, এই জন্য এই আমলে মুসলিম শাসনের প্রতি অমুসলিমদের আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। লখনৌতির মুসলিম রাজ্য ধীরে ধীরে লখনৌতি রাজ্যে পরিণত হয়।

লখনৌতিতে গোলযোগ এবং ইলতুতমিশের হস্তক্ষেপ ঃ

যুবরাজ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন, ইলতুতমিশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাসন ক্ষমতায় আস্থাশীল ছিলেন, তাই তাঁকে অযোধ্যা থেকে লখনৌতি পর্যন্ত সমগ্র এলাকার শাসন ভার দেন। আব্বাসী খলিফার সনদ পত্র এবং খেলাত দিল্লী পৌছলে সুলতান খেলাতের অংশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট লখনৌতি পাঠান। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত খেলাত এসে পৌছার আগেই লখনৌতিতে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ইলতুতমিশ শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সুলতান তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নাসির-উদ-দীন মাহমুদ রাখেন। তিনিই পরবর্তী কালের দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিঃ)।

যুবরাজ নাসির-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে লখনৌতিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, মনে হয় উচ্চ পদস্থ আমীরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস খুব পরিষ্কার নয়। মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন যে, ইখতিয়ার উদ-দীন বলকা খলজী ক্ষমতা দখল করেন। আবার দওলত শাহ বিন মওদুদ নামে এক ব্যক্তি ইলতুতমিশ এবং নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন, সুলতানের নাম অংকন করায় মনে হয় তিনি সুলতানের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে, যুবরাজ নাসির-উদ-দীন মাহমুদের আকস্মিক মৃত্যু হলে লখনৌতি নেতৃত্ব শূণ্য হয়ে পড়ে, শান্তি বিঘ্নিত না হওয়ার জন্য উচ্চ পদস্থ একজন আমীর দওলত শাহ নাম নিয়ে মুদ্রা জারী করেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খলজী বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করেন, মনে হয় তিনি খলজী ছিলেন এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীর সমর্থক ছিলেন। সে যাই হোক, সুলতান ইলতুতমিশ লখনৌতির গোলযোগের সংবাদ পেয়ে লখনৌতি ছুটে আসেন। তিনি ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খলজীকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে গবর্নর নিযুক্ত করে দিল্লী ফিরে যান। দওলত শাহ বিন মওদুদের কি হল, তা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না।

মালিক আলা-উদ-দীন জানী তুর্কিস্তানের শাহজাদা ছিলেন। মোঙ্গলদের অত্যাচারে তিনি ভারতে পালিয়ে আসেন এবং ইলতুতমিশের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এক বৎসরের বেশী সময় ধরে তিনি লখনৌতির গবর্নর ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইলতুতমিশ তাঁকে সরিয়ে মালিক সাইফ-উদ-দীন আইবককে লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি কারা খিতাই গোত্রের তুর্কী ছিলেন এবং ইলতুতমিশের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন, তিনি বঙ্গ (পূর্ব বাংলা) আক্রমণ করে অনেক হাতি হস্তগত করেন এবং সুলতানকে উপহার দেন। বিনিময়ে সুলতান তাঁকে 'য়ুগন-তৎ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ পরলোক গমন করেন, প্রায় একই সময়ে লখনৌতির গবর্নর সাইফ-উদ-দীন আইবকও প্রাণত্যাগ করেন, কারো কারো মতে তাঁকে হত্যা করা হয়।

এর পরে লখনৌতিতে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কারণ খুব পরিষ্কার নয়। তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য বক্তব্যে মনে হয় যে সাইফ-উদ-দীন আইবক য়ুগান-তৎ-এর মৃত্যুর পরে লখনৌতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উত্তর ভাগে অর্থাৎ লখনৌতি দেবকোট অংশে তুগরল তুগান খান এবং দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ লখনৌতি নগৌর অংশে আওর খান গবর্নর ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তুগরল তুগান খান জয়লাভ করেন। আওর খান নিহত হন এবং সমগ্র লখনৌতি রাজ্য তুগরল তুগান খানের শাসনাধীনে আসে।

তুগরল তুগান খান ঃ

এই সময়ের তুর্কী গবর্ণনরদের মধ্যে তুগরল তুগান খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তুর্কীদের কারা-খিতাই গোত্রের লোক ছিলেন। সুলতান ইলতুতমিশ তাঁকে খরিদ করে স্বীয় পরিবারে লালন-পালন করেন এবং সুশিক্ষা দেন। তিনি প্রথমে সুলতানের দরবারে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন, যেমন সাকী-ই-খাস (সুলতানের ব্যক্তিগত পানীয় পাত্র বাহক), সর-ই-দওয়াতদার (সুলতানের দোয়াত-কলম রক্ষকদের নেতা), এবং আমীর-ই-আখুর (অশ্বশালার রক্ষক) ইত্যাদি। পরে তিনি বদাউনের গবর্নর নিযুক্ত হন এবং আরো পরে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হন। বিহারের গবর্নর থাকাকালেই তিনি লখনৌতি অধিকার করেন এবং আওর খানকে পরাজিত করে সমগ্র লখনৌতির গবর্নর হন। ইলতুতমিশের মৃত্যুর পরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, সেই সময়েই বোধ হয় তুগরল তুগান খান এবং আওর খান লখনৌতির ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হন এবং তুগরল তুগান খান জয়ী হয়ে সারা লখনৌতি রাজ্যের গবর্নর পদে আসীন হন।

১২৩৬ থেকে ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নয় বৎসর তিনি লখনৌতির গবর্নর ছিলেন। জোরপূর্বক লখনৌতি দখল করলেও সুলতানা রাজিয়ার নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠিয়ে তিনি স্বীয় ক্ষমতা বৈধ করে নেন। একই সময়ে তিনি বিহার ও লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত হন, রাজিয়া তাঁকে ছত্র, লাল চাদর এবং নিশান ইত্যাদি রাজকীয় উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেন। তাঁর সময়ে দিল্লীতে একের পর এক চারজন সুলতান সিংহাসনে বসেন; যিনিই সিংহাসনে বসতেন, তুগরল তুগান তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে উপহার পাঠাতেন।

তুগরল তুগাল খান রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন। তিনি প্রথমে ত্রিহুত আক্রমণ করে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করেন। তিনি বিশাল সৈন্য ও নৌ-বাহিনী গঠন করে দিল্লীর পূর্ব দিকের প্রদেশগুলি অর্থাৎ অযোধ্যা, কারা-মানিকপুর এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল জয় করার জন্য অগ্রসর হন। তিনি একজন উচ্চাভিলাষী লোক ছিলেন, তাঁর উৎকীর্ণ একমাত্র শিলালিপিতে তিনি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি নিজে সুলতান উপাধি না নিলেও দিল্লীর সুলতানের নামও সেখানে উৎকীর্ণ করেননি। কিন্তু তাঁর উচ্চভিলাষ ছিল ক্রটিপূর্ণ, তিনি তাঁর নবগঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা জয়ের চেষ্টা না করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন ; তিনি গঙ্গানদী ধরে অগ্রসর হয়ে কারা সীমান্ত পার হয়ে চুনার, বারানসী ও এলাহাবাদে পৌছেন এবং সেখানে থেকে দিল্লীর সুলতানের নিকট উপহার পাঠান। সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহও তাঁর নিকট খেলাত পাঠিয়ে সম্মানিত করেন। এই সময় ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তুগরল তুগান তাঁর এই সম্মানিত মেহমানকে নিয়ে লখনৌতি ফিরে আসেন। তুগরল তুগান খানের এই অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না, হয়ত তিনি পূর্ব

ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু তুগরল তুগানের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, তাঁর এই অভিযান তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর পতন ত্বরান্বিত করে।

তুগান খান পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁর সকল সৈন্য নিয়ে যান, তাঁর রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি করে যাননি, পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য যে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারে এই চিন্তা তাঁর মনে আসেনি। উড়িষ্যায় তখন নরসিংহদেব নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি বঙ্গ এবং রাঢ় আক্রমণ করেন এবং লখনৌতির দক্ষিণ সীমান্ত শহর লখনৌর (নগৌর) অধিকার করে নেন। তুগান খান সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন এবং শত্রুদের বাধা দেন। ঐতিহাসিক মিনহাজও এই যুদ্ধে যোগাদন করেন। তুগান খানের বাহিনী শত্রুদের পিছু হটিয়ে দিয়ে বাঁকুড়া জেলার কাটাসিন দুর্গ অধিকার করেন। তিনি স্বীয় রাজ্য শত্রুর কবল থেকে পুনরুদ্ধার করে শত্রুর অধীনস্থ কিছু এলাকাও জয় করেন। কিন্তু এই বিজয়ে উল্লাসিত হয়ে তিনি আরাম আয়াসে লিপ্ত হন। মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল হওয়ায় শত্রুরা আবার সুযোগ নিয়ে তুগান খানের শিবির আক্রমণ করে মুসলিম সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সীমান্ত শহর লখনৌর হস্তচ্যুত হয়। আসলে তুগান খান উড়িষ্যার রাজার রণকৌশল বুঝতে পারেননি। তুগরল তুগানের আক্রমণের মুখে উড়িষ্যা বাহিনী ইচ্ছে করেই পিছু হটতে হটতে মুসলিম বাহিনীকে তাদের সীমান্তের অনেক দূরে নিয়ে যায়। জয়ের আনন্দে তুগান খান অসতর্ক হলে উড়িষ্যার রাজা পাল্টা আক্রমণ করে তুগান খানকে রাজধানী পর্যন্ত তাড়া করে। তুগান খান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পেরে দিল্লীর সুলতানের সাহায্য কামনা করেন। সুলতান কারা মানিকপুরের গবর্নর মালিক কারাকশ খান এবং অযোধ্যার গবর্নর মালিক তমর খান কিরানকে তুগান খানের সাহায্যে গমন করার আদেশ দেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার সৈন্যরা লখনৌরের শাসক ফখর-উল-মূলক সহ অনেক মুসলমানকে হত্যা করে রাজধানী লখনৌতি অবরোধ করে। তুগরল তুগান খান লখনৌতি দূর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু দিল্লীর বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে উড়িষ্যার বাহিনী দুই দিকে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে রাজধানীর অবরোধ তুলে নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে।

তুগরল তুগান তখন বলেন যে, যেহেতু শত্রুরা রাজধানী ছেড়ে চলে গেছে, দিল্লী থেকে আগত বাহিনীর ফিরে যাওয়া উচিত। এই প্রশ্নে আবার মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত হয়। মুসলমানদের উচিত ছিল তুগরল তুগান, তমর খান এবং কারাকশ খান সকলে মিলে উড়িষ্যার সৈন্যদের বিরুদ্ধে গমন করা। কিন্তু তারা এখন নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তমর খান কিরান ফিরে যেতে রাজী হলেন না, তিনি লখনৌতিতে ক্ষমতা অধিকারের জন্য তুগান খানকে আক্রমণ করেন এবং দূর্গে

অবরুদ্ধ করেন। তিনি কৌশলে তুগান খানকে পরাজিত করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দেন, স্থির হয় যে তুগান খান তাঁর সকল সৈন্য, হাতি-ঘোড়া এবং সম্পদ নিয়ে লখনৌতি ছেড়ে যাবেন এবং তমর খান কিরান লখনৌতির গবর্নর পদ দখল করবেন। তুগরল তুগান খান প্রথমে দিল্লী যান, কারাকাশ খান এবং মিনহাজও তাঁর সঙ্গে যান। সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহ এতই দূর্বল ছিলেন যে, তিনি তমর খান কিরানকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন শাস্তি দিতে পারেননি, তুগরল তুগান খানকেও কোন সাহায্য করতে পারেননি। পরবর্তী সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ তুগান খানকে অযোধ্যায় গবর্নর নিযুক্ত করেন। তমর খান কিরান প্রায় দুই বৎসর লখনৌতি শাসন করলেও তিনি রাজ্য বিস্তার করেন বা অন্য ভাবে লখনৌতির শক্তি বৃদ্ধি করেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তমর খান লখনৌতিতে এবং তুগরল তুগান খান অযোধ্যায় একই তারিখে অর্থাৎ ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চ তারিখে পরলোক গমন করেন।

পরবর্তী গবর্নরগণঃ

তমর খানের মৃত্যুর পরে মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানী লখনৌতির গবর্নর থাকলেও তাঁর শাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে দেখা যায় যে, তিনি ইলতুতমিশের সময়ে নির্মিত একখানি মসজিদ সংস্কার করেন। শিলালিপিতে তিনি "মালিক-উশ-শরক" উপাধি নেন। এই লিপিখানি মালদহ জেলার গঙ্গারামপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়। জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানীর পরে অযোধ্যার গবর্নর মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক লখনৌতির গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি উজীর উলুঘ খান বলবনের স্নেহভাজন ছিলেন, তাই ইতোপূর্বে দুই দুইবার বিদ্রোহ করেও তিনি সুলতানের ক্ষমা লাভ করেন এবং লখনৌতির গবর্নরের পদ লাভ করেন।

সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবক ঃ

নতুন গবর্নর মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক অত্যন্ত সাহসী এবং বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীব পরে তিনিই সর্বপ্রথম রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, তুগরল তুগান খানের সময় উড়িষ্যারাজ লখনৌতি রাজ্যের দক্ষিণে কিছু এলাকা অধিকার করেন, ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক শত্রুদের শস্তি দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। উড়িষ্যার সবনতর নামক এক সামন্ত হুগলী জেলার গড় মন্দারনে দুর্গ নির্মাণ করে এক সামন্ত রাজ্য গঠন করেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেন। ইউজবক শবনতরকে আক্রমণ করেন এবং প্রথম দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তৃতীয় যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এর পরে ইখতিয়ার উদ-দীন ইউজবক সতর্ক হয়ে যান এবং সুপরিকল্পিত ভাবে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন।

তিনি তাঁর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং অশ্ববাহিনীকে সুসজ্জিত করেন। উড়িষ্যার বাহিনীতে অনেক হাতি থাকায় তিনি সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে অতর্কিত আক্রমণ করে হাতিগুলো ঘায়েল করতে থাকেন। এই পরিকল্পনায় তিনি শত্রুদের পরাজিত করেন, শবনতরের রাজধানী মন্দারণ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জয় করেন। এই বিজয়ের পরেই ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক তৃতীয়বারের মত বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবক উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ৬৪৩ হিজরী বা ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্দারণ ও নদীয়ার রাজস্ব দ্বারা স্বনামে স্বাধীন মুদ্রা প্রচলন করেন।

দিল্লীতে তখন আমীরদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ চলছিল। ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ ছেলে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু ক্ষমতা ছিল উজীর উলুঘ খান বলবনের হাতে। এই কারণে ইমাদ-উদ-দীন রায়হান নামক অন্য একজন আমীরের নেতৃত্বে কয়েকজন আমীর বলবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবক লখনৌতিতে বসে দিল্লীর অমাত্যদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বুঝতে পারেন যে এই সুযোগে তাঁর আক্রমণকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তিনি সসৈন্যে পশ্চিম সীমানা পার হয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত জয় করেন এবং তিনি লখনৌতি বিহার এবং অযোধ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হন।

এর পরে সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবক কামরূপে অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময়ে কামরূপে বার-ভূঁঞা নামধারী বেশ কয়েকজন শাসক ছিলেন, করতোয়া নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে বর্তমান কোচবিহার, গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ এলাকায় এরা শাসন করত। আরো পূর্বদিকে গৌহাটিকে কেন্দ্র করে অহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কামরূপের ভূঁঞারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে, মিনহাজের তবকাত-উ-নাসিরীতে তাকে কামরূপের রায় বলা হয়েছে। মুগীস-উদ-দীন ইউজবক ঘোড়াঘাটের নিকট নদী পার হয়ে কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনি কোন বাধা পেলেন না, রাজধানীও জনমানব শূন্য দেখতে পান। আসলে কামরূপের সৈন্য বাহিনী সমগ্র এলাকা ছেড়ে পর্বতে আশ্রয় নেয়। মুগীস-উদ-দীন ইউজবক অনেক ধন সম্পদ হস্তগত করেন এবং কামরূপের ধন-সম্পদ দেখে তিনি কামরূপ জয় করার মনস্থ করেন। কামরূপের রাজা তাঁকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হলেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে রাজধানী অধিকার করে সেখানে বর্ষাকালেও থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কামরূপের আবহাওয়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতেন না। তাই তিনি সৈন্যবাহিনী, ঘোড়া এবং অন্যান্য সহায়ক লোকজন, ভারবাহী পশুর জন্য বর্ষাকালের উপযোগী খাদ্য শষ্য বা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করেননি। কামরূপের লোকেরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব দেখায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকল প্রকার খাদ্যশষ্য দূর

দূরান্তরে চালান দেয়। কামরূপের রাজা ছোট ছোট নদী নালা নীচের দিকে বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। প্রবল বর্ষা আরম্ভ হলে মুগীস-উদ-দীন ইউজবক দেখেন যে, তিনি সৈন্যবাহিনীসহ বাহিরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তাঁর শিবির প্লাবিত হয়ে যায় এবং তাঁর অনেক সৈন্য এবং ঘোড়া খাদ্যের অভাবে মারা যায়। কামরূপের রাজা এর অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি মুসলমান সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন, ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর মুসলমান সৈন্যরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, মুগীস-উদ-দীন ইউজবক সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁকে বিদ্ধ করে, আহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন, মুসলিম সৈন্যরাও বন্দী হয়। মুগীস-উদ-দীন নিজ পুত্রের মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনা ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। মুগীস-উদ-দীন ইউজবক বিদ্রোহী হলেও তিনি লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এবং লখনৌতির সীমানাও দক্ষিণ দিকে মন্দারন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

লখনৌতি আবার দিল্লীর অধীনে

সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবকের মত্যুর পরে লখনৌতি আবার দিল্লীর একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইজ্জ-উদ-দীন বলবন-ই-ইউজবকী নামক ইলতুতমিশের আর একজন ক্রিতদাস লখনৌতির শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবকের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং মনে হয় দিল্লীর সুলতানের অনুমতি ছাড়াই ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তিনি সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সুলতানের নামে মুদ্রা জারী করেন। তিনি ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ (বা পূর্ব বাংলা) আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কারা প্রদেশের গবর্নর তাজ-উদ-দীন আরসলান খান লখনৌতি আক্রমণ করে অধিকার করেন, সংবাদ পেয়ে ইজ্জ-উদ-দীন বলবন-ই-ইউজবকী ফিরে আসেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হন।

সমসাময়িক ইতিহাস মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ইত-নাসিরী এখানেই অর্থাৎ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী ইতিহাস জিয়া-উদ-দীন বরানীর তারীখ-ই-ফিরোজশাহী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের সিংহাসন আরোহন অর্থাৎ ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। মধ্যবর্তী ৬ বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু লখনৌতির পরবর্তী গবর্ণর তাতার খানের একখানি শিলালিপিতে দেখা যায় যে তাজ-উদ-দীন আরসলান খান ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করলে তাতার খান লখনৌতি ও বিহারের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করলে উজীর উলুঘ খান বলবন সুলতান গিয়াস-উদ-

দীন বলবন উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। লখনৌতির গবর্নর তাতার খান দিল্লীর সুলতান বলবনের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছে উপহার সামগ্রী পাঠান।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের লখনৌতি অভিযান ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইলতুতমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসন আমল শেষ হয়। অশান্তি, বিশৃংখলা এবং বিদ্রোহ ইত্যাদি নির্মূল করে সুলতান বলবন একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশের সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়।

লখনৌতির গবর্নর তাতার খান মৃত্যু বরণ করলে তাঁর স্বগোত্রীয় শের খান নামক একজন সেনাপতি লখনৌতিতে ক্ষমতা অধিকার করেন এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। তিনি আনুমানিক এক বৎসর লখনৌতির গবর্নর ছিলেন, কিন্তু ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে বলবন আমীন খানকে লখনৌতির গবর্নর এবং তুগরল খানকে ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ত করেন। লখনৌতিতে ডেপুটি বা সহকারি গবর্নর নিযুক্তির উদাহরণ এই প্রথম, সম্ভবত ইহা বলবনের কূটনীতির অংশ। লখনৌতিতে প্রায়ই বিদ্রোহ হত, দুইজন গবর্নর থাকলে একজন অন্যজনের বিদ্রোহী কার্যকলাপ সম্পর্কে সুলতানকে সময়মত অবহিত করতে পারবেন মনে করেই বলবন এই নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। পরে দেখা যাবে যে বলবনের এই নীতি ফলপ্রসূ হয়নি।

লখনৌতির নতুন গবর্নর আমীন খান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি হয় মৃত্যুবরণ করেন বা তাঁর সহকারি তুগরল খান তাঁকে সরিয়ে দেন। অতঃপর তুগরল খান বিদ্রোহ করেন এবং মুইজ্জ-উদ-দীন তুগরল উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (এতদিন পর্যন্ত তুগরলের নাম মুগীস-উদ-দীন তুগরল মনে করা হত, বর্তমানে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় দেখা যাচ্ছে যে তাঁর নাম বা উপাধি ছিল মুইজ্জ-উদ-দীন তুগরল)। দিল্লীর সুলতান বলবন তখন পাঞ্জাব সীমান্তে মোঙ্গলদের দমন করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মোঙ্গলরা প্রায় প্রত্যেক বৎসর আক্রমণ করত এবং দিল্লীর সুলতান তাদের আক্রমণের ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। এই কারণে বলবন অন্যদিকে রাজ্য বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি তাঁর দুই ছেলে যুবরাজ মুহাম্মদ (খান-ই-শহীদ) এবং বুগরা খানকে পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং রাজ্যের সকল বাছাই করা সেনাপতিকেও একই কাজে নিযুক্ত করেন। বলবন নিজেও সীমান্ত রক্ষার কাজ তদারক করতেন এবং একবার সেখানে গিয়ে প্রায় একটানা দুই বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়ে একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন দরবারে উপস্থিত হতে অপারগ হয়ে পড়েন। ফলে বাইরে রটে যায় যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন

বলবনের মৃত্যু হয়েছে। লখনৌতিতে এই সংবাদ পৌছুলে তুগরলের অনুচরেরা তাঁকে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিতে থাকে।

ঐতিহাসিক বারানী তাঁর তারীখ-ই- ফীরূজশাহীতে তুগরলের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে বাংলাদেশ সর্বদা বিদ্রোহী প্রদেশ রূপে গণ্য ছিল। দিল্লীর লোকেরা বাংলাদেশকে 'বলগাকপুর' বা বিদ্রাহী এলাকা নামে অভিহিত করত। বাংলাদেশ দিল্লী থেকে দূরে ছিল, বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশও ছিল ভিন্ন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে পারতনা, দিল্লীর সুলতানেরা বাংলার বিদ্রোহের সংবাদ পেতে দেরী হয়, সংবাদ পেলেও দ্রুত এসে বিদ্রোহ দমন করা সোজা ছিল না। বারানী আরো বলেন যে বাংলার শাসকেরা স্বভাবতই বিদ্রোহী ছিল, নতুন শাসক আসলে অনুচর-অমাত্য সকলে মিলে তাঁকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত; যদি কোন শাসক বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করত, তাহলে অনুচর অমাত্যেরা সকলে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। সুতরাং শাসককে বাধ্য হয়ে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হত। এক্ষেত্রেও অনুচর অমাত্যেরা তুগরলকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করে। তাদের বক্তব্য ছিল, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যু হয়েছে, দুই যুবরাজ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের দমনে ব্যস্ত, অতএব তাদের পক্ষে লখনৌতির দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। তুগরল অমাত্যদের সঙ্গে একমত হয়ে মুইজ্জ-উদ-দীন তুগরল উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন মুদ্রা জারী করেন। তাঁর ৬৭৮ হিজরী (১২৭৯-৮০ খ্রিঃ) সালে উৎকীর্ণ রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

তুগরল লখনৌতি রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির দিকে মনযোগ দেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ জয় করেন এবং সোনারগাঁয়ের অদূরে একটি দূর্ভেদ্য দূর্গ নির্মাণ করেন। বরানী এই দুর্গকে 'তুগরলের কিল্লা' বা 'নারকিল্লা' নামে উল্লেখ করেন, ইহাকে আধুনিক পণ্ডিতেরা ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে ফিরাঙ্গীদের "লারিকল" এর সঙ্গে পরিচিতি দেন। তুগরল এই বিজিত অঞ্চল জয় করে জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং সেখান থেকে বিপুল ধনরত্ন এবং কিছু সংখ্যক হাতি হস্তগত করে তাঁর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত বিপুল ধনরত্ন সৈন্যবাহিনী এবং লখনৌতির অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করে দেন। ফলে দিল্লীর লোকজন (যারা লখনৌতিতে ছিল) এবং লখনৌতির লোকজন তুগরলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, তিনি পাঁচ মণ সোনা দান করে দরবেশদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দরবেশরাও তাঁর পক্ষে যান। তাঁর অকাতর দানের ফলেই ইউক বা যে কারণেই হোক. সৈন্যবাহিনী এবং লখ্নৌতির অধিবাসীরা সকলেই তার পক্ষ অবলম্বন করে।

তুগরল খানের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ পেয়ে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে তাঁর এককালীন বিশ্বস্ত সেনাপতি তুগরল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। তিনি রোগমুক্তির পরে তুগরল খানকে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় পূর্বক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতে বলেন। প্রকৃতপক্ষে তুগরল খানকে দিল্লীর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের সুযোগ দেওয়ার জন্যই তিনি এই আদেশ দেন। কিন্তু দিল্লীর প্রতি বা বলবনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ইচ্ছা তুগরল খানের ছিল না, তিনি বরং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিহারের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন এবং দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বলবন তুগরল খানের এই হঠকারিতা সহ্য করলেন না, তিনি অযোধ্যার গবর্নর মালিক তুরমতীর অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তুগরলের বিরুদ্ধে পাঠান, তমর খান শামসী এবং মালিক তাজ-উদ-দীনকেও তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়। দিল্লীর বাহিনীতে অশ্বারোহী সৈন্য অধিক থাকলেও তুগরলের অনেক পদাতিক বাহিনী এবং হাতি ছিল, তাই মালিক তুরমতীর পক্ষে তুগরলকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। উভয় পক্ষ সামনা সামনি শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করতে থাকে। মালিক তুরমতী কালবিলম্ব না করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হয়ত তাঁর জন্য সুবিধা হত, কিন্তু দেরী করায় অবস্থা তুগরলের অনুকূলে চলে যায়। কারণ তুগরল এই সময়টা হেলায় হারালেন না, তিনি অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং অর্থের বিনিময়ে দিল্লীর বেশ কয়েকজন সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর লোককে হাত করে ফেলেন। ফলে যুদ্ধ শুরু হলে তাদের অনেকেই নিষ্ক্রিয় থাকে। মালিক তুরমতী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। দিল্লী বাহিনীর অনেকেই বলবনের ভয়ে দিল্লীতে ফিরে না গিয়ে লখনৌতিতেই থেকে যায় এবং তুগরল খানের পক্ষ অবলম্বন করে। মালিক তুরমতী অযোধ্যায় ফিরে গেলে সুলতান বলবনের ইঙ্গিতে তাঁকে হত্যা করা হয়। তুগরলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ে তাঁর এই শাস্তি। বলবন পরের বৎসর তুগরলের বিরুদ্ধে আর এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। সেনাপতির নাম শাহাব-উদ-দীন বা অন্য সূত্রে বাহাদুর। তিনি বলবনের নিকট প্রতিজ্ঞা করে আসেন যে, তিনি তুগরলকে জীবিত ধরে নিয়ে বলবনের নিকট উপস্থিত করবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা মত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর কিছু সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি পরাজিত হন। সম্ভবত তুগরল উৎকোচ প্রদান করে এই সৈন্যদেরও বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্ররোচিত করেন। বলবন বাহাদুরকেও হত্যা করে শাস্তি দেওযার সঙ্কল্প করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রেহাই দেন।

মুইজ্জ-উদ-দীন তুগরলের নিকট দিল্লীর বাহিনী দুই দুই বার পরাজিত হলে সুলতান বলবন অত্যন্ত লজ্জিত এবং মর্মাহত হন। বলবন কোনরূপ বিরোধিতা সহ্য করতেন না, শত্রুকে ধ্বংস না করে তিনি শান্তি পেতেন না। তাঁর একজন প্রাদেশিক

গবর্নরের নিকট দুই দুইবার পরাজিত হয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং নিজে লখনৌতি অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন রেখে প্রথমে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি সীমান্তে গিয়ে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থাদি তদারক করে যুবরাজ মুহাম্মদকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সঠিক দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা তদারক করার জন্য কোতোয়াল ফখর-উদ-দীনকে দায়িত্ব দেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্বে লখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হন। তাঁর এই অভিযান ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শুরু হয়, কথিত আছে যে, একমাত্র অযোধ্যা থেকেই তিনি দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এইভাবে সৈন্য সগ্রহ করে করে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি পথিমধ্যে নৌকার পুল তৈরী করে নদী পার হন এবং তিনি প্রচুর রসদও সংগ্রহ কবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বিদ্রোহী তুগরলকে ধ্বংস না করে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন না।

তুগরল বলবনকে ভাল করে জানতেন, তিনি বুঝতে পারেন যে বলবনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পেরে উঠবেন না। তাই তিনি রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন। বলবন লখনৌতি অধিকার করেন, এবং সেখানে একজন সেনাপতি রেখে নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুগরলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তুগরল প্রথমে জাজনগরের (উড়িষ্যা) দিকে যান, কিন্তু বলবনের তাড়া খেয়ে পূর্ববঙ্গে তাঁর নির্মিত নারকিল্লা দূর্গের দিকে যান। বলবন সেদিকে গেলে তুগরল আবার পলায়ন করেন। বলবন সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমঝোতায় পৌছেন যে তুগরল স্থলপথে পলায়ন করলে বলবন বাধা দেবেন, কিন্তু জলপথে পলায়ন করলে দনুজ রায় বাধা দেবেন। যাই হোক তুগরল শেষ পর্যন্ত জাজনগর বা উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন। বলবন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর না হয়ে কয়েকটি ছোট ছোট সৈন্যদলকে তুগরলের খোঁজে পাঠান। এইরূপ এক ক্ষুদ্র দলের সেনাপতি শের আন্দাজ তুগরলকে কিছু সংখ্যক সৈন্য ও ঘোড়াসহ এক নদীর তীরে বিশ্রাম নিতে দেখেন। শের আন্দাজ সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করেন। তুগরল এবং তাঁর সঙ্গীরা মনে করে যে, বলবনের মূলবাহিনী তাদের আক্রমণ করেছে। তুগরলের সঙ্গীরা যে যেদিকে পারে পলায়ন করে। তুগরল সাঁতরিয়ে নদী পার হতে গেলে হঠাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান, একজন সৈন্য তাঁর মাথা কেটে নেন।

মুইজ্জ-উদ-দ্বীন তুগরল একজন সুশাসক, সাহসী সৈনিক ও যোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি লখনৌতিতে শান্তি স্থাপন করেন এবং লখনৌতি রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন নিজে লখনৌতি ছুটে এসে তাঁকে দমন করেন। তুগরলকে হত্যার পরে তাঁর পরিবার পরিজনকে বন্দী করা

হয়। তাঁর সমুদয় অর্থ সম্পদ, হাতি ঘোড়া বলবনের হস্তগত হয়। বলবন বিজয়ী বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং লখনৌতিতে এক বিভীষীকার রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি তুগরলের অনুচর সমর্থক, কর্মকর্তা কর্মচারী, সেনাপতি সকলকে নির্বিচারে হত্যা করেন। তাঁর অত্যাচারে দিল্লী থেকে আগত তাঁর অনুচর সমর্থকরাও হতবাক হয়ে পড়ে। সকলেই বলাবলি করতে থাকে যে, এইরূপ নির্বিচার হত্যার পরিণাম শুভ হবে না।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন কিছুদিন লখনৌতিতে অবস্থান করেন এবং লখনৌতির শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করে তাঁকে রাজকীয় প্রতীক ছত্র ইত্যাদি উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। অতঃপর তিনি বুগরা খাকে রাজ্য শাসন ব্যাপারে লিখিত উপদেশ দেন, মদ্যপান এবং আরাম আয়েশ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন এবং লখনৌতির সীমা বিস্তৃত করার নির্দেশ দেন এবং শেষে বিজয়ের আনন্দে রাজধানী দিল্লীতে ফিরে যান। আপাতদৃষ্টিতে বলবনের লখনৌতি পুনরুদ্ধার করা ছাড়া আর কোন প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্টি গোচর না হলেও, বলবনের পরে তাঁর পুত্র পৌত্রই লখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতির প্রক্রিয়া শুরু করে।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন বুগরা খানকে গবর্নর নিযুক্ত করলেও সুলতান তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের প্রজ্ঞা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি জানতেন যে, বুগরা খান ছিলেন আরাম প্রিয়, অথচ লখনৌতি শাসন করার জন্য একজন অত্যন্ত দক্ষ, কর্মঠ এবং সাহসী গবর্নরের প্রয়োজন। তাই তিনি বুগরা খানকে উপদেশ দেওয়ার জন্য দুইজন সুদক্ষ অফিসার লখনৌতিতে রেখে যান। তাঁদের দুইজনের নামই ফীরূজ। একজন 'ফরখোন্দারায়' বা উত্তম বিবেচনার জন্য প্রসিদ্ধ, অন্যজন কোহ-ই-জুদের অধিবাসী। তিনি ছিলেন "কিশওর কুশা" বা রাজ্য বিজয়ী। অতএব বলবন বুগরা খানকে সাহায্য করার জন্য একজন সমর বিশেষজ্ঞ এবং একজন রাজনীতিবিদ লক্ষনৌতিতে রেখে যান। বুগরা খান ১২৮১ থেকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবর্নর হিসেবে লখনৌতি শাসন করেন। তিনি তাঁর পিতার উপদেশ ভুলে যান এবং আরাম আয়াশে গা ঢেলে দেন। তিনি সবুজ বাংলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর শাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় তাঁর উপদেষ্টারা সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের জ্যেষ্ট ছেলে মুহাম্মদ মোঙ্গলদের সঙ্গে একযুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি নিজে নিহত হন। সুযোগ্য পুত্রের শোকে বলবন বিমূঢ় হয়ে পড়েন, এবং তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় বলবন তাঁর মৃত্যু নিকটে মনে করে কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতি থেকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মৃত্যুর পরে বুগরা খান দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। বুগরা খান দিল্লী যান, কিছু দিন অবস্থান করেন কিন্তু শেষে বিরক্ত হয়ে লখনৌতি ফিরে আসেন। তিনি দিল্লীর

সিংহাসনের চেয়ে শ্যামল বাংলার গবর্নরের পদকে বোধ হয় লোভনীয় মনে করেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত মুহাম্মদের পুত্র কায়খসরুকে উত্তরাধিকারী মানোনীত করেন। কিন্তু উজীর নিজাম-উদ-দীন পরলোকগত সুলতানের মনোনয়ন নাকচ কবে বুগরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আঠার বৎসর বয়স্ক কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। লখনৌতিতে বুগরা খান পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে এক সপ্তাহ কাল শোক পালন করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর সিংহাসনের লোভ না করে লখনৌতিতেই সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এই ভাবে লখনৌতি এবং দিল্লীতে একই সঙ্গে পিতা পুত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

চতুর্থ অধ্যায়

বলবনী শাসন, শামস-উদ-দীন ফীরূজ ও তাঁর বংশের শাসন, তুগলক শাসন এবং স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা

দিল্লীতে কায়কোবাদ এবং লখনৌতিতে বুগরা খান সুলতান হলে দিল্লী এবং লখনৌতি উভয় স্থানে বলবনী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দিল্লীতে কায়কোবাদ বেশি দিন টিকতে পারেননি। তিনি ছিলেন বলবনের অত্যন্ত প্রিয় পৌত্র, বলবন তাঁকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ করেন। কথিত আছে যে, তিনি সিংহাসনে বসার আগে পর্যন্ত মদ স্পর্শ করেননি এবং কোন নারীর সাহচর্য লাভ করেন নি। হঠাৎ করে সিংহাসনে বসে তিনি নিয়ম শৃঙ্খলার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। ফলে শাসন ব্যাপারে সুলতানের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং উজীর নিজাম-উদ-দীন সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হাতে নেন। উজীর কায়কোবাদকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নও দেখেন। কায়কোবাদের পিতা বুগরা খান লখনৌতিতে বসে ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুশাসনের খোঁজ খবর রাখেন। তিনি পুত্রকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন এবং অযোধ্যার সরযু নদীর তীরে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। কায়কোবাদ যথাসময়ে এই সংবাদ পান কিন্তু উজীর নিজাম-উদ-দীন তাঁকে বুঝান যে বুগরা খান দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য আসছেন। তাই কায়কোবাদ সসৈন্যে সরযু নদীর তীরে পৌছেন। উজীর নিজাম-উদ-দীন পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করলেও পুত্র বৎসল বুগরা খানের ধৈর্য্য ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে নিজাম-উদ-দীনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। অত্যন্ত সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে পিতা -পুত্রের মিলন হয়। বুগরা খান প্রকাশ্যে কায়কোবাদকে শাসন ব্যাপারে অনেক উপদেশ দেন, কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় কায়কোবাদকে কানে কানে বলেন যে উজীর নিজাম-উদ-দীন এবং তাঁর সহকর্মী কিয়াম-উদ-দীনকে যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয় ততই কায়কোবাদের জন্য মঙ্গল হবে। এর পরে বুগরা খান লখনৌতিতে ফিরে আসেন। অপর দিকে কায়কোবাদ দিল্লী ফিরে গিয়ে পিতার সকল উপদেশের কথা ভুলে যান, কিন্তু নিজাম-উদ-দীন সংক্রান্ত উপদেশ মনে রাখেন। তিনি নিজাম-উদ-দীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। কিন্তু তখন আর এক বিপদ দেখা দেয়, নিজাম-উদ-দীনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল। আমীরদের দলাদলির ফলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং এই সময়ে কায়কোবাদ জালাল-উদ-দীন ফীরজ খলজীকে আরিজ-ই মমালিক বা সৈন্য বিভাগের কর্তা করে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। খলজীরাও ছিল তুর্কী, কিন্তু কুতব-উদ-দীন আইবকের পর থেকে তুর্কীদের ইলবরী গোত্র দিল্লী শাসন করত। খলজী গোত্রের একজন আরিজ-ই-মমালিকের মত উচ্চ পদ লাভ করায় ইলবরিরা খলজীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে।

ফলে গোলযোগ বৃদ্ধি পায়, ইলবরী-খলজী প্রতিদ্বন্দিতায় খলজীরা জয়লাভ করে, তারা কায়কোবাদকে সরিয়ে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে খলজী বংশ প্রতিষ্ঠা করে।

কায়কোবাদের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ শুনে লখনৌতিতে বুগরা খান অত্যন্ত মর্মাহত হন। জীবনে তাঁর বিতৃষ্ণা আসে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কায়কাউসকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। এর পরে বুগরা খান কতদিন বেঁচে ছিলেন তা জানা যায়নি। তিনি সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ উপাধি নিয়ে স্বাধীন মুদ্রা জারী করেন। বুগরা খান একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত ফারসি কবি আমীর খসরু তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন। বুগরা খান কায়কোবাদকে যে উপদেশ দেন তাতে বুঝা যায় যে তিনি একজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অবদান এই যে, তিনি বাংলার স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করেছেন। তিনি বোধহয় রাজ্য বিস্তারের নীতিও গ্রহণ করেন।

সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস ১২৯১-১৩০০ খ্রিঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লখনৌতিতে স্বাধীন বলবনী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং বুগরা খান এই স্বাধীন সলতনতের প্রতিষ্ঠাতা। বুগরা খানের পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কায়কাউস সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস উপাধি নিয়ে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। দিল্লীর সঙ্গে লখনৌতির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় দিল্লীর ইতিহাসে এই সময়ের লখনৌতির ইতিহাস পাওয়া যায় না। বাংলাদেশেও কোন সমসাময়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই মুদ্রা এবং শিলালিপিই এই সময়ের ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও কায়কাউস যে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনিই সর্ব প্রথম লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করেন।

এই পর্যন্ত সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের ৫ খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, একখানি মুঙ্গের জিলার মহেশ্বরে, একখানি ঐ একই জিলার লক্ষীসেরাইতে, একখানি দিনাজপুর জিলার দেবকোট থেকে, একখানি হুগলী জিলার ত্রিবেণীতে এবং আর একখানি বগুড়া জিলার মহাস্থান গড়ে আবিষ্কৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বিহার থেকে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কায়কাউসের মুদ্রা লখনৌতি টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ, কিন্তু তাঁর কোন কোন মুদ্রায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে মুদ্রাগুলো বঙ্গের (পূর্ব বাংলার) রাজস্ব দ্বারা জারী করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কায়কাউস পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে সাফল্য অর্জন করেন এবং করও আদায় করেন।

কায়কাউসের শিলালিপিতে আরো জানা যায় যে, তাঁর অধীনে ইখতিয়ার-উদ-দীন ফীরূজ ইতগীন এবং জাফর খান বাহরাম ইতগীন নামে দুইজন অত্যন্ত দক্ষ এবং সাহসী অফিসার ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বিহারে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ

শাসন করতেন। কায়কাউস উচ্চ রাজকীয় উপাধি নেন, গবর্নরেরাও উচ্চ উপাধি নেন। মুদ্রায় কায়কাউস আব্বাসী খলিফা আল্-মুস্তাসিমের নাম উৎকর্ণ করেন যদিও আব্বাসী লেখাফত অনেক পূর্বে ধ্বংস হয় এবং আল-মুস্তাসিম ও ঐ সময়ে নিহত হন। তাছাড়া মুদ্রায় কায়কাউস নিজেকে খলিফা ও আমীর-উল-মোমেনীনের দক্ষিণ হস্ত রূপে ঘোষণা করেন।

১৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরে উৎকীর্ণ কায়কাউসের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি। পরের বৎসর থেকে শামস-উদ-দীন ফীরূজের নামে মুদ্রা জারী হয়। অতএব সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের রাজত্বকাল ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। কিভাবে তাঁর রাজত্বের অবসান হয় স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পরে শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ সিংহাসনে বসেন, এতে মনে হয়, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, বা তাঁকে হত্যা করে পরবর্তী সুলতান সিংহাসনে বসেন। পরে দেখব যে শামস-উদ-দীন রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের বংশের লোক ছিলেন না।

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ ও তাঁর বংশ ঃ

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতিতে রাজত্ব করেন। তাঁর পরিচিতি নিয়ে মতভেদ আছে। মরক্কোর বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বলেন যে, সুলতান শামস-উদ-দীন বলবনী বংশের লোক ছিলেন। তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের পৌত্র এবং বুগরা খানের পুত্র ছিলেন, অর্থাৎ সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের ভাই ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা ইবনে বতুতার বক্তব্য গ্রহণ করে তাঁকে বলবনী বংশের লোক বলে মনে করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে এবং আধুনিক পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেন যে সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ বলবনী বংশের লোক ছিলেন না। এর কতকগুলো কারণ আছে। প্রথম, মুদ্রার সাক্ষ্য। সেকালে সুলতানেরা সুলতানের পুত্র হলে সেকথা গর্ব করে স্বীয় মুদ্রায় উল্লেখ করতেন। রুকন-উদ-দীন কায়কাউস, বুগরা খান, এমনকি শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের নিজের ছেলেরা তাঁদের স্ব স্ব মুদ্রায় 'সুলতানের পুত্র সুলতান' কথাটি উল্লেখ করেন। কিন্তু শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ কোন মুদ্রায় দাবী করেননি যে তিনি সুলতানের পুত্র ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর পিতা সুলতান ছিলেন না। দ্বিতীয়, বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরু তাঁদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বলবনের রাজত্বকাল দেখেন, বুগরা খানের পোষকতা লাভ করেন, এবং কায়কোবাদ্ ও খলজী সুলতানদের রাজত্বকাল দেখেন। তিনি বুগরা খানের দুই ছেলে কায়কোবাদ এবং কায়কাউস এর নাম উল্লেখ করেছেন। বুগরা খানের শামস-উদ-দীন বা ফীরূজ নামের আরো একটি ছেলে থাকলে আমীর খসরু অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। তৃতীয়, বুগরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়কোবাদ যখন ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বৎসর। তখন কায়কোবাদের ২য় ভাই এর বয়স ১৬/১৭ এর বেশি ছিল না।

শামস-উদ-দীন ফীরূজ যদি কায়কোবাদের ৩য় ভাই হয়, তাহলে তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪/১৫ বৎসর। তাহলে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসার সময় শামস-উদ-দীন ফীরূজের বয়স ছিল ২৭/২৮ বৎসর। মুদ্রা এবং শিলালিপির সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে শামস-উদ-দীন ফীরূজের এক ছেলে জালাল-উদ-দীন মাহমুদ স্বনামে পূর্ণ রাজকীয় উপাধিসহ মুদ্রা জারী করেন এবং ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আর এক ছেলে হাতিম খান বিহারের গবর্নর ছিলেন। তখন শামস-উদ-দীন ফীরূজের বয়স ৩৩/৩৫ হওয়ার কথা। এই বয়সে শামস-উদ-দীন ফীরূজের এক ছেলে মুদ্রা জারী করার জন্য এবং অন্য ছেলে গবর্নর নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া অসম্ভব না হলেও সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। চতুর্থ, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন পারস্যের সম্রাটের দরবারের রীতিনীতি, আদব কায়দা, শান শওকত জাঁকজমকের প্রশাংসা করতেন এবং নিজেও তা অনুকরণের চেষ্টা করতেন। এই কারণে তিনি তাঁর পৌত্রদের পারস্য সম্রাটদের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নামকরণ করেন। যেমন কায়কোবাদ, কায়কাউস, কায়খসরু, কাইমুরস ইত্যাদি। শামস-উদ-দীন ফীরূজ নাম এর ব্যতিক্রম। অতএব শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ বলবনের বংশের লোক ছিলেন না, তিনি নিজেই একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বলবন বুগরা খানকে গবর্নর নিযুক্ত করে যাওয়ার সময় ফীরূজ নামক দুই জন উপদেষ্টা রেখে যান, তাঁরা বুগরা খানের পরামর্শক ছিলেন। কায়কাউসের সময় বিহারের গবর্নর ছিলেন ইখতিয়ার-উদ-দীন ফীরূজ ইতগীন। ধারণা করা যেতে পারে যে, এই ফীরূজ ইতগীন কায়কাউসের পরে শামস-উদ-দীন ফীরূজ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। উপরে বলেছি যে কায়কাউস হয় নিঃসন্তান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন, নতুবা তাঁকে হত্যা করা হয়। লিখিত কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও ঘটনা পরম্পরায় তাই মনে হয়।

রাজ্য বিস্তার

যে ভাবেই সিংহাসন অধিকার করুক না কেন সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ সুলতান হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। বখতিয়ার খলজীর পরে তাঁর সময়েই লখনৌতি রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের সময় হুগলী জিলার ত্রিবেণী বিজিত হয় এবং বঙ্গের রাজস্ব দ্বারা মুদ্রা জারী করা হয়। শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময় ত্রিবেণীতে মুসলিম শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, বঙ্গ বা পূর্ব বাংলার অনেকাংশ বিজিত হয় এবং সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা জারী করা হয়। এছাড়া মুসলিম রাজ্য ময়মনসিংহ হয়ে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ত্রিবেণী বিজয় সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের সময়ে শুরু হয়। ঐ সময়ে সেনাপতি জাফর খান বাহরাম ইতগীন ত্রিবেণী জয় করেন। ইতোপূর্বে এই জাফর খান বাহরাম ইতগীন উত্তরবঙ্গের গবর্নর ছিলেন, দিনাজপুরের দেবকোট থেকেও তাঁর উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। জাফর খান ত্রিবেণীর নিকটস্থ সাতগাঁও

(প্রাচীন সপ্তগ্রাম) জয় করেন, সাতগাঁও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। জাফর খান সেখানে মসজিদ এবং মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। জাফর খান পরবর্তী সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরুজ শাহেব সময়েও সেখানে গবর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতেও জাফর খান কর্তৃক মাদ্রাসা নির্মাণের কথা আছে। মাদ্রাসা একটি, যা কায়কাউসের সময়ে নির্মিত হয় এবং যা শাসম-উদ-দীন ফিরূজের সময়েও শিক্ষা দান কাজে লিপ্ত ছিল। সাতগাঁও বিজয়ের সঙ্গে শাহ সফী-উদ-দীন নামক একজন সূফীর নামও জড়িত। হুগলী জিলার ছোট পাণ্ডুয়ায় শাহ সফী-উদ-দীনের দরগাহ অবস্থিত। মুসলমানদের ত্রিবেণী-সাতগাঁও বিজয়ের সঙ্গে অনেক কল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী জড়িত, তবে কল্প-কাহিনী বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক সত্য যতটুকু নিরূপণ করা যায় তা নিম্নরূপ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু আগে থেকে ত্রিবেণী এলাকায় মুসলিম বিজয় শুরু হয়। দিনাজপুর এলাকা বা উত্তর বঙ্গের গবর্নর জাফর খান ত্রিবেণী-সাতগাঁও আক্রমণ করেন। কায়কাউস কর্তৃক লখনৌতি রাজ্য বিস্তৃতির অংশ হিসেবে তিনি এই আক্রমণ পরিচালনা করেন। জাফর খান প্রথম চোটেই বিজয় লাভ করে সাতগাঁও-এ একখানি মসজিদ ও একখানি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে, মাদ্রাসার শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ এলাকা জয় করতে আরো কয়েক বৎসর সময় লাগে, তিনি অন্ততঃ ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সাতগাঁও এলাকা সম্পূর্ণ জয় করেন এবং 'দার-উল-খয়রাত' নামে একখানি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন বা আগে নির্মিত মাদ্রাসাখানি পরিবর্ধন করেন। শাহ সফী-উদ-দীন ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা জাফর খানকে সাতগাঁও বিজয়ে সাহায্য করেন। শাহ সফী-উদ-দীনের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ প্রথমে হয় কিনা বলা যায় না। তবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের ভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যায় যে সূফীরা প্রথমে ধর্ম প্রচারে বের হতেন, হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে তাঁরা সুলতানের সাহায্য নিতেন। শাহ সফী-উদ-দীন সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিতেও এইরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে শাহ সফী-উদ-দীনকে সুলতানের পক্ষ থেকে জাফর খান সাহায্য করেন। মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রাঙ্গনেই জাফর খানের সমাধি রয়েছে। জনশ্রুতিতে তিনি এখন জাফর খান গাজী এবং সুফী রূপে পরিচিত।

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ে সোনারগাঁও বিজয় সম্পূর্ণ হয়। উপরে বলা হয়েছে যে সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের সময় পূর্ব বঙ্গ বিজয় শুরু হয়, কিন্তু তখন সোনারগাঁও বিজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ বিজয় অসমাপ্ত থাকে। কিন্তু শামস-উদ-দীন ফীরূজ এই বিজয় সম্পূর্ণ করেন। এর প্রমাণ সোনারগাঁও টাকশাল থেকে সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ ও তাঁর ছেলেদের মুদ্রা প্রচলন। সোনারগাঁ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রা সমূহের প্রথমটির তারিখ ৭০৫ হিজরী বা ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ, এতে বুঝা যায় যে, শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের রাজত্বের প্রথম দিকেই সোনারগাঁও বিজিত হয়। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পূর্ববঙ্গ বা

সোনারগাঁ অভিযানের যে প্রক্রিয়া সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস শুরু করেন, সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ তা শেষ করেন। তাঁর ময়মনসিংহ বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর ছেলে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর কর্তৃক গিয়াসপুর টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গিয়াসপুরকে ময়মনসিংহ থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই একই নামের একটি গ্রামের সঙ্গে পরিচিতি দেয়া হয়। তাছাড়া এই আলোচনাতেই একটু পরে আমরা দেখব যে শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ সিলেট জয় করেন। সুতরাং সিলেট জয়ের আগে তিনি অবশ্যই ময়মনসিংহ এলাকা জয় করেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ সিলেট জয় করেন। তাঁর সিলেট বিজয়ের কথা শিলালিপি এবং অন্যান্য প্রামাণ্য সূত্র এবং জনশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত, তবে সকল সূত্রে শাহ জালালের কথা বলতে গিয়েই মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাতগাঁও বিজয়ের সঙ্গে যেমন শাহ সফী-উদ-দীনের নাম যুক্ত, তেমনি সিলেট বিজয়ের সঙ্গে শাহ জালালের নাম জড়িত। কথিত আছে যে সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ে সিলেটে গৌর গোবিন্দ নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর শাসিত এলাকায় বুরহান-উদ-দীন নামক একজন মুসলমান বাস করতেন। বুরহান-উদ-দীন তাঁর শিশু সন্তানের জন্ম বা খতনা উপলক্ষে একটি গরু জবাই করলে একটি চিল হঠাৎ করে এক টুকরা মাংস নিয়ে রাজার মন্দিরে বা কোন ব্রাহ্মণের ঘরে নিক্ষেপ করে। গরু জবাই করার অপরাধে রাজা বুরহান-উদ-দীনের হাত কেটে দেয় এবং শিশু সন্তানটির মৃত্যুদণ্ড দেয়। বুরহান-উদ্দীন গৌড়ের সুলতানের নিকট এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করে আবেদন জানালে সুলতান তাঁর সেনাপতি ও ভাগিনেয় সিকান্দর খান গাজীকে সিলেট আক্রমণের আদেশ দেন। সিকান্দর খান গাজী গৌর গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসলে সুলতান সেনাপতি নাসির-উদ-দীন কে তাঁর সাহায্যার্থে পাঠান। ঠিক ঐ সময়ে শাহ জালাল ৩১৩ জন শিষ্য সঙ্গী নিয়ে বাংলায় আসেন। তিনি জিহাদের সুযোগ পেয়ে সুলতানের বাহিনীকে সাহায্য করেন, এবং মিলিত ভাবে আক্রমণ করে গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেন। গৌর গোবিন্দ পলায়ন করে এবং সিলেট মুসলমানদের অধিকারে আসে। জনশ্রুতি এবং অন্যান্য সূত্রে সিলেট বিজয়ে শাহজালালের কেরামত বা অতিলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কাহিনীটি জনশ্রুতি নির্ভর হলেও মূল কথা অর্থাৎ সিলেট বিজয়ের কথা প্রামাণ্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত। একখানি শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম সিলেট বিজয় করে। শিলালিপি খানি শাহ জালালের নামে উৎসর্গ করা হয়, এবং এতে সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীর নামও সিলেট বিজয়ের নায়ক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ সিলেট জয় করেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার ইতিহাসে শাহ্ জালাল একজন অতি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সিলেটে তাঁর দরগায় এখনো হাজার হাজার লোক গমন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত যে, শাহ্-জালাল ইয়েমেন থেকে এই দেশে আসেন, অতএব তাঁকে শাহ্ জালাল ইয়েমেনী বলা হত, এবং ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'সুহেল-ই-ইয়েমেন' (ইয়েমেনের বুলবুল) নামে ফারসি ভাষায় একখানি বইও লিখিত হয়। আধুনিক গবেষণায় শাহ্ জালাল সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো হচ্ছে শাহ্ জালালের দরগায় প্রাপ্ত এবং সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের সময়ের দুই খানি শিলালিপি এবং সপ্তদশ শতকে লিখিত গওসীর গুলজার-ই-আবরার নামক একখানি ফারসি ভাষায় লিখিত সূফীদের জীবনীগ্রন্থ। এই তথ্যে জানা যায় যে, শাহ্ জালাল তুরস্কের কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শিষ্য-সঙ্গী নিয়ে ভারতে আসেন এবং লখনৌতির সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগদিয়ে সিলেট জয় করেন। সিলেট বিজয়ের পরে শাহ্ জালাল সঙ্গী-সাথীসহ সিলেটে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিজিত সিলেটকে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং তাঁদের বিয়েশাদী করে সংসারী হওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু শাহ্ জালাল নিজে চিরকুমার ছিলেন এবং সিলেট জয়ের পরেও অকৃতদার থেকে যান। মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সফরে এসে সিলেটে গিয়ে শাহ্ জালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন যে শাহ্ জালাল মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস এবং শেষ আব্বাসী খলিফা আল-মুস্তসিমকে মোঙ্গলরা হত্যা করায় সময় (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে) বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন। মনে হয় যে, মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অনেক সূফী দরবেশ, সেনাপতি, সৈনিক, রাজনীতিক, প্রশাসনিক এবং বিভিন্ন পেশার লোক যখন মধ্য এশিয়া ছেড়ে নানা দেশে, বিশেষ করে ভারতে আশ্রয় নেয়, তখন শাহ্ জালাল এবং তাঁর সঙ্গীরাও তুর্কিস্তান ছেড়ে এই দেশে আসেন। ইবনে বতুতা শুনেছিলেন যে, শাহ্ জালাল একশত পঞ্চাশ বৎসর বেঁচেছিলেন এবং ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অতএব লখনৌতির সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের এবং সিলেট বিজয়ে শাহ্ জালাল ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পৃক্ততার মোটামুটি একটা প্রামাণ্য সূত্র পাওয়া যায়।

শিলালিপি এবং মুদ্রায় শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের বেশ কয়েকজন ছেলের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে হাতিম খানের নাম পাওয়া যায় শিলালিপিতে। তিনি বিহারের গবর্নর ছিলেন ; জালাল-উদ-দীন মাহমুদ, শিহাব-উদ-দীন বুগদা শাহ, গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর এবং নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমের নাম মুদ্রায় এবং কতলু খানের নাম ইবনে বতুতার বিবরণে পাওয়া যায়। গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের নাম তাঁর রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। সম্প্রতি জালাল-উদ-দীন কুরবন (বা কবীর) শাহের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের ছয়জন ছেলের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ চারিজন ছেলে পিতার জীবিতাবস্থায় স্বাধীন উপাধি নিয়ে মুদ্রা জারী করেন। কুরবন শাহ্ তাঁর ছেলে ছিলেন

কিনা সঠিক বলা যাচ্ছেনা। এতে কেউ কেউ মনে করেন যে, যাঁরা পিতার জীবিতাবস্থায় সুলতান উপাধি নিয়ে মুদ্রা জারী করেন তাঁরা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ে লখনৌতির মুসলিম রাষ্ট্র আশাতীতভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি কি এতদূর রাজ্য বিস্তার করতে পারতেন? এই প্রশ্ন মনে রেখে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ তাঁর বয়:প্রাপ্ত এবং উপযুক্ত পুত্রদের স্বাধীন মুদ্রা জারীর সুযোগ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতা ভাগাভাগি করেন। ফলে তাঁর ছেলেরা তাঁর প্রতি অনুগত থাকেন এবং পিতা ও পুত্রদের সমবেত চেষ্টায় মুসলিম রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ একজন অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান রাজনীতিক ছিলেন। তিনি রাজবংশের লোক ছিলেন না, কিন্তু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিভাবে সিংহাসন অধিকার করেন নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, তবে ইহা বোধ হয় সত্য যে, তিনি বলবন কর্তৃক নিযুক্ত বুগরা খানের উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। এটাও সত্য হতে পারে যে রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের সময় তিনি একজন উচ্চপদস্থ সেনাপতি ও গবর্নর ছিলেন। হয় তিনি রুকন-উদ-দীন কায়কাউস নিঃসন্তান মারা যাওয়ায় বা রুকন-উদ-দীন কায়কাউসকে বলপূর্বক সরিয়ে লখনৌতির ক্ষমতা দখল করেন। প্রথম সম্ভাবনা সঠিক হলে তাঁকে কৃতিত্ব দেয়া যায় কারণ তিনি লখনৌতিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা সত্য হলে তিনি অবশ্যই নিমক হারামী এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হবেন। সেকালে অবশ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার ঘটনা খুব বিরল ছিল না। সে যাই হোক, সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ সুলতান হিসেবে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। প্রথমত তিনি চতুর্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। লখনৌতি রাজ্য তাঁর সময়ে বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর সময়ে দিল্লীতে খলজীরা রাজত্ব করতেন এবং (বাংলা ছাড়া) সারা ভারত বিজয়ী দিল্লীর সুলতান আলা-উদ-দীন খলজী তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু আলা-উদ-দীন খলজী সারা ভারত জয় করলেও লখনৌতি জয় করেননি বা লখনৌতি জয়ের পরিকল্পনা করেন বলেও প্রমাণ নেই। মনে হয় শামস-উদ-দীন ফীরূজের ক্ষমতা, বিশেষ করে তাঁর প্রতি তাঁর পুত্রদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা আলা-উদ-দীনকে লখনৌতি জয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তৃতীয়ত, তিনি তাঁর বয়স্ক ও যোগ্য পুত্রদের যথাযথ মূল্যায়ন করে বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। এই কারণে তিনি ছেলেদের মুদ্রা জারীরও অনুমতি দেন। ফলে তিনি পুত্রদের বিরাগভাজন না হয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন। চতুর্থত, তাঁর সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার বৃদ্ধি পায়। ত্রিবেণী বা সাতগাঁও এলাকায় এবং সিলেটে ইসলাম প্রচার তাঁর সময়েই হয়। ফলে

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও এ শাহ সফী-উদ-দীনের প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত হয়। তবে শাহ জালালের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য, শাহ জালাল শুধু সিলেটেই নয়, সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত। সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ে সাতগাঁও এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসার শিলালিপি সুলতানের কীর্তি বহন করে। বাংলার দুটি শহর সুলতান শামস-উদ-দীন শাহের নাম বহন করে। একটি মালদহ জিলার পাণ্ডুয়া আরেকটি হুগলী জিলার পাণ্ডুয়া। ঐতিহাসিকেরা একই নামের উভয় শহরের পার্থক্য বুঝাবার জন্য প্রথমটিকে হজরত পাণ্ডুয়া এবং দ্বিতীয়টিকে ছোট পাণ্ডুয়া নামে অভিহিত করে। ফীরূজ শাহের নামানুসারে দুইটি শহরের নাম ফীরূজাবাদ রাখা হয়।

অতএব সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ একজন উন্নত চরিত্র ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের লোক ছিলেন। তিনি যেমন রাজ্য বিস্তার করেন, তেমনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-চর্চার পথ উম্মুক্ত করেন। তিনি পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসেন এবং প্রবীণ হিসেবে প্রজ্ঞারও পরিচয় দেন। তাঁর সময়ে শুধু রাজ্য বিস্তারই হয়নি, বাংলায় ইসলাম প্রচারও বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমসাময়িক কোন ইতিহাস আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁর গৌরবময় শাসনের কাহিনী থেকে আমরা বঞ্চিত, শুধু শিলালিপি ও মুদ্রার সাহায্যেই আমরা তাঁর ইতিহাস পুনর্গঠন করতে পেরেছি। তবে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে তিনি রাজ্য বিস্তারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তার পথ ধরেই পরবর্তীতে সারা বাংলায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ ২২ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সুলতান গিয়াস উদ-দীন বাহাদুর ঃ

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজের মৃত্যুর পরে তাঁর দুইজন ছেলের কার্যকলাপ সম্পর্কে মুদ্রা শিলালিপি এবং সমসাময়িক দিল্লীর ইতিহাস গ্রন্থ জিয়া-উদ-দীন বরানীর তারীখ-ই-ফীরূজ শাহীতে পাওয়া যায়। তাঁর অন্য ছেলেদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, অথচ তাঁদের কেউ কেউ পিতার সময়ে মুদ্রা জারী করেন, অন্তত একজন গবর্নরের মত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব অনুমান করতে হয় যে, ফীরূজ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে কেউ কেউ নিহত হন, কেউ কেউ হয়ত স্বাভাবিক মৃত্যুও বরণ করতে পারেন। সে যাই হোক গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর সিংহাসনে বসেন এবং মুদ্রা জারী করেন। সম্প্রতি ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ তাঁর একখানি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম নামক এক ভাই তাঁর শাসন মেনে না নিয়ে দিল্লীর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে দিলীতে খলজী বংশের পতন হয় এবং তুগলকরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম দিল্লীর সুলতানকে

লখনৌতি আক্রমণ করার আবেদন জানান। ঐতিহাসিক বরানী বলেন যে, বড় ভাই-এর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম নিজ ভাই-এর বিরুদ্ধে এই কাজটি করেন। দিল্লীর সুলতান এইরূপ একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন, নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমের আবেদন পেয়ে তিনি বাংলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন, ত্রিহুত পর্যন্ত পৌছুলে নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম সেখানে গিয়ে দিল্লীর সুলতানকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে সহায়তা করার আশ্বাস দেন। দিল্লীর সুলতান তাঁর পালক পুত্র বাহরাম খান ওরফে তাতার খানকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য পাঠান, নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমও তাঁর সৈন্য সামন্ত সহ দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পালাবার সময় কোন এক নদীর বালুকাময় তীরে তাঁর ঘোড়ার পা আটকে গেলে তিনি ধরা পড়ে যান। বন্দী অবস্থায় তাঁকে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

যুদ্ধে জয়লাভ করে গিয়াস-উদ-দীন তুগলক বাংলার মুসলিম রাজ্যকে ৩ ভাগে বা ৩টি প্রদেশে বিভক্ত করেন-লখনৌতি, সাওগাঁও এবং সেনারগাঁও এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক গবর্নর নিযুক্ত করেন। বিশ্বাসঘাতক নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত হন এবং বাহরাম খানকে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এর গবর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পরে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলক গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সুলতান দিল্লী পৌছার আগেই দিল্লীর অদূরে আফগানপুর নামক স্থানে দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম লখনৌতির গবর্নর থাকাকালে স্বনামে মুদ্রা জারী করেন, কিন্তু মুদ্রায় দিল্লীর সুলতানের নামও উৎকীর্ণ করেন। একজন সুলতানের ছেলে হওয়ায় এবং দিল্লীর সুলতানকে লখনৌতি বিজয়ে সাহায্য করায় বোধ হয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তাঁকে এই সুবিধা দেন যে, তিনি দিল্লীর সুলতানের নামে মুদ্রা জারী করলেও সঙ্গে নিজের নামও যেন যুক্ত করতে পারেন। দিল্লীতে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক সিংহাসনে বসে লখনৌতির শাসন ব্যাপারে পরিবর্তন করেন। তিনি নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান এবং তাঁর স্থলে কদর খানকে গবর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরকে মুক্তি দিয়ে বাহরাম খানের সঙ্গে যুগ্মভাবে সোনারগাঁয়ের গবর্নর নিযুক্ত করেন এবং ইজ্জ-উদ-দীন ইয়াহায়কে আজম মালিক উপাধি দিয়ে সাতগাঁও-এর গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরকে দিল্লীর সুলতানের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার এবং খুতবা পাঠ করার আদেশ দেওয়া হয়। আনুগত্যের নিশ্চয়তা স্বরূপ গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের ছেলে মুহাম্মদ (ওরফে বারবাত)কে জামিন স্বরূপ দিল্লীর সুলতানের দরবারে পাঠাবার আদেশ দেওয়া হয়।

গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর কিছু সময় দিল্লীর সুলতানের অনুগত থাকলেও তিনি তাঁর ছেলে মুহাম্মদকে দিল্লীতে পাঠাননি। তিনি স্বনামে মুদ্রা জারী করেন এবং মুদ্রায় দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের নামও অংকন করেন। মুদ্রায় এও উল্লেখ করেন যে

মুদ্রাগুলো দিল্লীর সুলতানের আদেশে উৎকীর্ণ করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুগ্ম গবর্নর বাহরাম খান তাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত ও হত্যা করেন। ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের পতন হয়।

অতঃপর বাংলার তিন প্রদেশে তিনজন গবর্নর শাসন করতে থাকেন, লখনৌতিতে কদর খান, সাতগাঁও-এ আজম মালিক এবং সোনারগাঁয়ে বাহরাম খান। এর পরে প্রায় ১০ বৎসর বোধ হয় বাংলায় শাসন শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের ইতিহাস বা কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা পাওয়া যায় না। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ের গবর্নর বাহরাম খান মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর সিলাহদার বা বর্ম রক্ষক ফখরা ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন সোনারগাঁও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক তখন সাম্রাজ্যের অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যস্ত থাকায় তিনি বাংলার দিকে মনযোগ দিতে পারলেন না। এদিকে লখনৌতির গবর্নর কদর খান এবং সাতগাঁও এর গবর্নর আজম মালিক ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের বিরুদ্ধে গমন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পরাজিত হয়ে সোনারগাঁও ছেড়ে নদীর অপর তীরে পালিয়ে যান। কদর খান সোনারগাঁও দখল করে সেখানে থাকেন, অন্যরা স্ব স্ব স্থানে ফিরে যান। কথিত আছে যে, কদর খান সোনারগাঁয়ে লুণ্ঠিত সম্পদ বিলি না করে নিজেই সব রেখে দেন। ফলে বর্ষাকাল আসলে সৈন্যরা কদর খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে হত্যা করে। অন্যদিকে ফখর-উদ-দীন সোনারগাঁয়ের অবস্থার খোঁজ খবর রাখতেন। হয়ত তিনিই কদর খানের সৈন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করেন। সে যাই হোক, কদর খান নিহত হলে ফখর-উদ-দীন পুনরায় সোনারগাঁও দখল করে সিংহাসনে বসেন। এদিকে কদর খানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে লখনৌতিতে আরিজ-ই-মমালিক (সৈন্য বিভাগের কর্তা) আলী মুবারক সিংহাসনে বসেন এবং সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ উপাধি ধারণ করেন। আলী মুবারক ও ফখরু-উদ-দীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা শুরু হয় এবং কয়েক বৎসর উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। ফখর-উদ-দীন দীনের নৌ-বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অন্যদিকে আলী মুবারকের স্থল বাহিনী ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তাই কেউই প্রতিপক্ষকে হারাতে পারেনি। এই সময়ে সাতগাঁও এর পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ইতোমধ্যে বাংলার রাজনীতিতে হাজী ইলিয়াস নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। কথিত আছে যে, আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে তিনি লখনৌতির আলী মুবারকের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন, পরে সৈন্যদের হাত করে তিনি তাঁর মনিব আলী মুবারককে হত্যা করেন এবং লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে হাজী ইলিয়াস প্রথমে সাতগাঁও-এ ক্ষমতা দখল করেন। সাতগাঁও এর শাসন

কর্তা আজম মালিক ফখর-উদ-দীনের বিরুদ্ধে সোনারগাঁ যাওয়ার পরে তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই জন্যই কেউ কেউ মনে করেন যে, আজম মালিক হয় যুদ্ধে নিহত হন বা অন্য ভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন। হাজী ইলিয়াস এই সুযোগে সাতগাঁও দখল করেন এবং সেখান থেকে লখনৌতি এসে ঐ শহরও দখল করেন। এই সম্ভাবনাও নাকচ করে দেয়া যায় না। তবে হাজী ইলিয়াস যে লখনৌতির সুলতান আলী শাহকে সরিয়ে লখনৌতি অধিকার করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে তিনি সোনারগাঁও অধিকার করেন এবং সারা বাংলার অধীশ্বর হন। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় তুগলক শাসনের অবসান হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

নামে বাংলার একজন সুলতান চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে জয় করেন এবং শ্রীপুরের উল্টো দিকে নদীর অপর তীরে অবস্থিত চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেন। চট্টগ্রামে ফখর-উদ-দীনের নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ভবন বিদ্যমান ছিল। শিহাব-উদ-দীন তালিশের সমসাময়িক এবং অগ্রবর্তী একজন বাঙ্গালী কবি মুহাম্মদ খানও তাঁর 'মকতুল হোসেন' গ্রন্থে চট্টগ্রাম বিজয়ের বর্ণনা দেন। কবি মুহাম্মদ খান ইতিহাস লিখেননি বা মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী লিখেননি, বরং তিনি নিজ বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে অলক্ষ্যে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয় এবং চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের কাহিনী প্রচার করেছেন। কবি বলেন যে কদল খান গাজী পীর তাঁর একাদশ মিত্র সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে শক্রদের পরাজিত করে এক আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার করেন বা ইসলাম প্রচার করেন। জনশ্রুতি মতে চট্টগ্রাম বারো আউলিয়ার দেশ, অর্থাৎ কবির বক্তব্য জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করে। কবি মুহাম্মদ খান 'পুস্তক বাড় এ হেতু' বারো আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেননি, তবে কবি তাঁর মাতৃকুল পরিচয় দেওয়ার সময় শয়খ শরীফ-উদ-দীনের নাম দেন যিনি মাতার দিক দিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন। পিতৃকুল পরিচয় দিয়ে কবি বলেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষ মাহি আসোয়ার আরব দেশ থেকে আসেন। চট্টগ্রামে পৌছুলে বদর আলম তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। বদর আলম বা বদর শাহ বারো আউলিয়ার নেতা এবং চট্টগ্রামের অভিভাবক পীর ছিলেন। তাঁর দরগাহ এখনো চট্টগ্রামে সুপরিচিত এবং হিন্দু মুসলমান সকলের ভক্তি শ্রদ্ধার আধার। জনশ্রুতি মতে কদল খান গাজী চট্টগ্রাম বিজয়ে সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। অতএব সাতগাঁও বিজয়ে যেমন শাহ সফী-উদ-দীন এবং সিলেটে শাহ জালাল সুলতানের সৈন্য বাহিনীর সহায়তা করেন, চট্টগ্রাম বিজয়েও বারো আউলিয়া বা বদর শাহ প্রমুখ সূফীরা সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সৈন্যদলের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতা করেন। চট্টগ্রামে মোগল পূর্ব প্রাচীন ইমারত বিশেষ দেখা যায় না তবে বদর শাহের সমাধি ভবনটির স্থাপত্য শিল্প পরীক্ষা করে মনে হয় যে, এই ইমারত খানি সুলতানী আমলে নির্মিত হয়।

চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ কর্তৃক নির্মিত রাজপথটির কিছু অংশ এখনো 'হদ্দীনের হথ' (ফদ্দীনের পথ বা ফখর-উদ-দীনের পথ) নামে এখনো নোয়াখালী-ত্রিপুরা অঞ্চলে পরিচিত। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের গুনবতী রেল ষ্টেশনের নিকটে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং ভরাট হাজামাজা দীঘি এখনো বর্তমান। মসজিদ খানি এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। এটাও ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের একটি বড় প্রমাণ। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশ সফর করেন। তিনি সমুদ্র পথে এসে চট্টগ্রাম বন্দরের ভিতর দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন যে, তখন সুলতান ছিলেন ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ। অতএব ঐতিহাসিক শিহাব-উদ-দীন তালিশ, কবি মুহাম্মদ খান, বদর শাহের মাযারের স্থাপত্য রীতি, ইবনে বতুতার বিবরণ এবং জনশ্রুতি সকল সূত্রেই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে,

ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করেন, এবং চট্টগ্রাম বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব দিকে সিলেট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত মুসলিম বিজয় বিস্তৃত হয় এবং ইসলাম প্রচারিত হয়।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় বাংলাদেশ ঃ

দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক ইবনে বতুতাকে চীনে তাঁর দূত করে পাঠান। ইবনে বতুতা চীন যাওয়ার সময়ে সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি যেইস্থানে প্রবেশ করেন তার নাম দেন সোদকাওয়ান। এই স্থানটিকে কেউ কেউ সাতগাঁও এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করলেও আজকাল এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, সোদকাওয়ান চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ ইবনে বতুতা বাংলার চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম প্রবেশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, তাঁর বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্য শয়খ জালাল নামক এক বিখ্যাত দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি আরো বলেন যে, ঐ সময়ে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ রাজত্ব করতেন, এবং তিনি দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন বলে ঐ সুলতানের সঙ্গে দেখা করেননি। অতঃপর ইবনে বতুতার বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিলেটে গিয়ে হজরত শাহ জালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। শাহ জালাল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি একজন উচ্চ স্তরের দরবেশ ছিলেন। তিনি বিয়ে শাদী করেননি, তিনি এক সঙ্গে চল্লিশ দিন ধরে রোজা রাখতেন, দশ দিন পর পর রোজা খুলতেন। তিনি সারা রাত এবাদত উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। পাশ্ববর্তী এলাকার লোকেরা তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ জালাল ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং পরের বৎসর ইবনে বতুতা চীনে গিয়ে শোনেন যে, শাহজালালের মৃত্যু হয়েছে। (আনুমানিক ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে)। ইবনে বতুতা শাহজালালের অনেক কারামত বা অতিলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিবরণও দেন। সিলেট থেকে ফিরতি পথে ইবনে বতুতা সোনারগাঁও আসেন এবং সেখানে থেকে জাহাজ করে জাভায় চলে যান।

ইবনে বতুতা পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে চীন দেশ পর্যন্ত অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, বাংলার মত জিনিষপত্রের এত সস্তা দাম তিনি আর কোথাও দেখেননি। তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দাম উল্লেখ করেন। তবে তাঁর প্রদত্ত দাম বর্তমানের টাকার হিসাবে নির্ণয় করা খুব সোজা নয়। তবুও পঞ্চাশ বৎসর আগে নির্ধারিত মূল্য নিম্নরূপ। মনে রাখতে হবে যে গত পঞ্চাশ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতি অনেক গুণ বেড়ে গেছে ঃ

চাউল	আনুমানিক	৮ মণ	৭.০০ টাকা
ধান	"	২৮ মণ	৭.০০ টাকা
ঘি	"	১৪ মণ	৩.৫০ টাকা
তিল তেল	"	১৪ মণ	১.৫০ টাকা
গোলাপ জল	"	১৪ মণ	৭.০০ টাকা

চিনি	১৪ মণ	৩.৫০ টাকা
৮টি তাজা মুরগী		০০.৮৮ টাকা
৮টি তাজা ভেড়া		১.৭৫ টাকা
১টি দুধেল গাভী		২১.০০ টাকা
১৫টি পায়রা		০০.৮৮ টাকা
১৫গজ সূক্ষ্ম সুতী কাপড়		১৪.০০ টাকা

ইবনে বতুতার সামনে একজন সুন্দরী দাসী ৭ টাকায় বিক্রি হয় এবং তিনি নিজেও অনুরূপ দামে একটি সুন্দরী দাসী খরিদ করেন তার নাম ছিল আশুরা। ইবনে বতুতার এক সঙ্গী ১৪০ টাকায় এক সুন্দর অল্প বয়স্ক চাকর খরিদ করেন। মুহাম্মদ আল-মাশমাদী নামক মরক্কোর এক ভদ্রলোক কিছুদিন সপরিবারে বাংলাদেশে বাস করেন। তিনি ইবনে বতুতাকে বলেন যে, তাঁরা তিনজনের এক পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করতে সারা বৎসরে ৭ টাকা ব্যয় হত। ইবনে বতুতা বলেন যে, সারা পৃথিবীতে এইরূপ সস্তা জিনিষপত্র আর কোথাও পাওয়া যেত না, কিন্তু এই দেশের লোকেরা তাঁকে জানান যে, তখন জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল। খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশকে খুব পছন্দ করলেও তারা এই দেশের আবহাওয়া মোটেই সহ্য করতে পারত না। তাই তারা বাংলাদেশকে 'দোজখ-পুর-আজ-নিমত' বা ধনসম্পদে পরিপূর্ণ এক নরক রূপে অভিহিত করত।

ইবনে বতুতা নদী পথে ভ্রমণ করেন এবং নদীর উভয় তীরের প্রাকৃতিক শোভা দেখে অভিভূত হন। তিনি সবুজের ছড়াছড়ি দেখে ভূয়াসী প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ সময়ে বাংলাদেশে ফকির দরবেশের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। জনগণ তাদের এত ভক্তি শ্রদ্ধা করত যে, নৌকায় যাতায়াত করতে তাদের কোন পয়সা খরচ হত না। তাদের আহার এবং বাসস্থানের জন্য চিন্তা করতে হত না, অভাবীদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত। ফকির দরবেশেরা কোন শহরে প্রবেশ করলে তাদের অর্ধ দিনার (আট আনার মত) দেওয়া হত। সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহও ফকির দরবেশদের ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি শয়দা নামক একজন দরবেশকে সোদাকাওয়ানের গবর্নর নিযুক্ত করেন, কিন্তু শয়দা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলতানের পুত্রকে হত্যা করেন এবং বিদ্রোহ করেন। সুলতান শয়দাকে এইকারণে শাস্তি দিতে বাধ্য হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। শয়দার সাহায্যকারীদেরও হত্যা করা হয়। ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ দেখতে পান। তাতে বুঝা যায় যে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের পরে ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর রাজত্ব করেন এবং স্বনামে মুদ্রা জারী করেন। ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জানা যাচ্ছে না। কারণ গাজী শাহ মুদ্রায় দাবী করেননি যে তিনি ফখর-উদ-দীনের পুত্র ছিলেন।

যাই হোক ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে সোনারগাঁও দখল করে নেন।

লখনৌতির সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ ঃ

উপরে বলা হয়েছে যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের লখনৌতিস্থ গবর্নর কদর খান নিহত হলে তাঁর আরিজ-ই-মমালিক আলী মুবারক সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ উপাধি নিয়ে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এর পরে তাঁর দুধ ভাই হাজী ইলিয়াস তাঁকে হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন (এই বিষয়ে নীচে আলোচিত হচ্ছে)।

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ঃ

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির আলা-উদ-দীন আলী শাহকে হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রাজধানী ছিল ফীরূজাবাদে (পাণ্ডুয়া)। হাজী ইলিয়াস ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সিংহাসনে বসে তিনি সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি নেন। এই বংশ প্রায় সত্তর বৎসরেরও বেশি সময় ধরে সারা বাংলাদেশে যশ ও কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করে এবং বাংলার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, এই বংশের সুলতানেরা উদার ও বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যা ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব পরিচিতি বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি সিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন, কোন এক সময় তিনি বা তাঁর পরিবার দিল্লীতে আসেন। কথিত আছে যে হাজী ইলিয়াস আলী মুবারকের দুধ ভাই ছিলেন, এবং আলী মুবারক দিল্লীতে মালিক ফীরূজের (পরে সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলক) অধীনে চাকুরি করতেন। এই সময় হাজী ইলিয়াস মালিক ফীরূজের দরবারে কোন এক অপকর্ম করে পালিয়ে যান। রাগ করে মালিক ফীরূজ আলী মুবারককেও দরবার থেকে বের করে দেন। আলী মুবারক লখনৌতিতে এসে গবর্নর কদর খানের অধীনে চাকুরি নেন। হাজী ইলিয়াসও সেখানে আসেন এবং আলী মুবারকের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। আলী মুবারক সুলতান হলে হাজী ইলিয়াস ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন এবং সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি নিয়ে ফীরূজাবাদের সিংহাসনে বসেন।

ইলিয়াস শাহের রাজ্য বিস্তার ঃ

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ যখন ফীরূজাবাদে সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি শুধু উত্তর বঙ্গের শাসক হন, অর্থাৎ পূর্বের শুধু লখনৌতি রাজ্যই তাঁর অধীনে ছিল। পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁওকে রাজধানী করে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ রাজত্ব করতেন

এবং সাতগাঁও কেন্দ্রী দক্ষিণ বঙ্গ বোধহয় তখনো দিল্লীর অধীনে ছিল। কিন্তু উত্তর বঙ্গের অধীশ্বর হয়ে ইলিয়াস শাহ সন্তুষ্ট থাকার মত লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তিনি প্রথমে সাতগাঁও এর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে সাতগাঁও জয় করে সেখান থেকে স্বনামে মুদ্রা জারী করেন এবং ইলিয়াস শাহ উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের অধীশ্বর হন। কয়েক বৎসর পরে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও আক্রমণ করেন এবং সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনরগাঁও দখল করেন। এর ফলে ইলিয়াস শাহ সারা বাংলাদেশের অধীশ্বর হন। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান সুলতান সারা বাংলাদেশের অধীশ্বর ছিলেন না, তাঁরা হয় লখনৌতি বা সোনরগাঁও এর সুলতান ছিলেন। ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সারা বাংলার সুলতান হন। বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি এই সময় থেকে, ইতোপূর্বে বাংলাদেশ প্রাচীন আমলের বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, বা সুলতানী আমলের প্রথমদিকের লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, বাংলা নামে প্রচলিত ছিল না। ইলিয়াস শাহের সময়েই বাঙ্গালা নামে সারা বাংলাদেশ পরিচিত হয়। এই কারণে দিল্লীর ঐহিহাসিক শামস-সিরাজ আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গলা' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'সুলতান-ই-বাঙ্গালিয়ান' অর্থাৎ বাঙ্গালিদের সুলতান, এই উক্তিতে আমাদের জাতিয়তাবাদের বীজ নিহিত এবং ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সোনারগাঁও অধিকার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ঘটনা।

সোনারগাঁও অধিকারের পূর্বে ইলিয়াস শাহ নেপাল আক্রমণ করেন। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করে অনেক ধনসম্পদ হস্তগত করেন। বিশাল ধন সম্পদের মালিক হয়ে ইলিয়াস শাহ দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করে জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত গিয়ে ৪৪টি হাতিসহ অনেক ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। এর পরে তিনি বিহার আক্রমণ করেন। দক্ষিণ বিহার দিল্লীর অধীনে ছিল এবং দিল্লীর গবর্নর বিহার শরীফে অবস্থান করতেন। উত্তর বিহার ত্রিহুত নামে পরিচিত ছিল এবং তা দিল্লীর করদ রাজ্য ছিল। ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত জয় করলে বিহারস্থ দিল্লীর গবর্নর ইবরাহীম বায়ু তাঁকে আক্রমণ করেন। ফলে ইবরাহীম বায়ুর সঙ্গে ইলিয়াস শাহের যুদ্ধ হয়। বখতিয়ার খলজীর সময় থেকে বিহার লখনৌতির অধীনে ছিল। সুতরাং ইলিয়াস শাহও বিহার জয়ের ইচ্ছা করেন বলে মনে হয়। ইবরাহীম বায়ুর সঙ্গে ইলিয়াস শাহের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে শিলালিপি সূত্রে অল্পদিনের মধ্যে ইবরাহীম বায়ুর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে ইলিয়াস শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ইবরাহীম বায়ুর মৃত্যু হয়, অর্থাৎ ইলিয়াস শাহ বিহার অধিকার করেন। এর পরে ইলিয়াস শাহ আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং দিল্লী সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করে বিহার ছাড়িয়ে চম্পারণ গোরখপুর এবং কাশী জয় করে এক বিরাট এলাকা তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন এবং বাহরাইচে গিয়ে শয়খ মাসুদ গাজীর দরগায় গিয়ে দুইবার ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কথিত আছে যে, বাংলায় ফিরে এসে ইলিয়াস শাহ দুঃখ করে বলেন যে, দিল্লীতে গিয়ে শয়খ নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ার দরগায় ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করলে কি না ভাল হত।

ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। একমাত্র ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস রাজমালায় এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ত্রিপুরার রাজা ডাঙ্গর-ফার ১৮টি ছেলে ছিল। রাজার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসার জন্য তাঁর কোন্ ছেলে বেশি উপযুক্ত হবে সেই বিষয়ে রাজা খুব চিন্তিত ছিলেন। এই জন্য তিনি পুত্রদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই রাজা রত্ন-ফাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, কিন্তু রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর অন্য ছেলেরা রত্ন-ফাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। রত্ন-ফা বাংলার সুলতানের আশ্রয় নেন, এবং সুলতান রত্ন-ফাকে সসৈন্যে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রত্ন-ফা বাংলার সুলতানকে একটি মানিক উপহার দেন এবং বাংলার সুলতান তাঁকে মাণিক্য উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। সেই সময় থেকে ত্রিপুরায় রাজারা নিজেদের নামের সঙ্গে মাণিক্য উপাধি ব্যবহার করেন। রত্ন-ফার মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন জানা যাচ্ছে যে, সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহই ত্রিপুরার রাজা রত্ন-ফাকে আশ্রয় দিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দেন। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজারা বাংলার সুলতানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ বোধহয় রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপের কিছু অংশও জয় করেন যার ফলে ইলিয়াস শাহের ছেলে ও পরবর্তী সুলতান সিকান্দর শাহ রাজত্বের প্রথম বর্ষে কামরূপ টাকশাল থেকে মুদ্রা জারী করেন। অতএব সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ চতুর্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। উত্তরে কামরূপ, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে বাহরাইচ পর্যন্ত জয় করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পূর্ব সীমান্তে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করেন।

ফীরূজ শাহ তুগলকের বাংলা আক্রমণ ঃ

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যুর পরে ফীরূজ শাহ তুগলক দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পরে ফীরূজ শাহ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ফীরূজ শাহ ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং ফিরে গিয়ে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী পৌছেন। ফীরূজ তুগলকের বাংলা আক্রমণ করার কারণ ছিল। প্রথমত, বাংলাদেশ গিয়াস-উদ-দীন তুগলক ও মুহাম্মদ বিন তুগলকের অধীনে ছিল। ফীরূজ তুগলক মনে করেন যে-বাংলার উপর তাঁর অধিকার ছিল। দ্বিতীয়ত, ইলিয়াস শাহ দিল্লীর অধীনস্থ বিহার ও অন্যান্য এলাকা জয় করে ফীরূজ তুগলকের সার্বভৌমত্বে আঘাত করেন। ফীরূজ তুগলক বাংলায় এসে এক নিশান বা ফরমান জারী করে প্রচার করেন যে ইলিয়াস শাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় এবং নিরীহ লোকদের প্রতি অত্যাচার করায় তিনি ইলিয়াসকে শাস্তি দেওয়ার

উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছেন। ফীরূজ শাহ বাংলার লোকদের তাঁর দলে টানার জন্য কর মওকুফ করে দেন এবং ভবিষ্যতে তাদের আরো সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ফীরূজ শাহ যখন বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন। ইলিয়াস প্রথমে ত্রিহুতের দিকে চলে আসেন। পরে তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়ায় চলে আসেন এবং আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ফীরূজ বাংলায় পৌঁছুলে ইলিয়াস শাহ রাজধানী ছেড়ে একডালা নামক দূর্গে আশ্রয় নেন এবং দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। একডালার একদিকে জল এবং অন্যদিকে জঙ্গল ছিল। ইলিয়াস সৈন্যবাহিনী ও পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্গে গিয়ে দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এতে বুঝা যায় যে, ইলিয়াস শাহ এক নিপুণ সমরবিদ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে জল ও জঙ্গল বেষ্টিত একাডালা দূর্গ জয় করা ফীরূজ শাহের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিছুদিন পরে বর্ষাকাল এসে গেলে ফীরূজ শাহ এবং দিল্লীর সৈন্যদের বাংলাদেশে যুদ্ধকরা সম্ভব হবে না এবং ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। ফলে হলও তাই, ফীরূজ শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া পর্যন্ত সহজে দখল করে নেন। ইলিয়াস শাহ কোন বাধা দিলেন না, বরং তিনি দূর্গেই সতর্ক অবস্থায় দিন কাটান। উভয় পক্ষে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হল কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ফীরূজ শাহ বুঝতে পারেন যে সম্মুখ যুদ্ধ করে একডালা দূর্গ জয় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর সৈন্যদের শিবির গুটিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন। তিনি মনে করেন দিল্লীর সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করার সংবাদে ইলিয়াস শাহ দূর্গের বাইরে আসবেন এবং সেই সুযোগে তিনি ইলিয়াস শাহকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারবেন। ফীরূজ শাহের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইলিয়াস শাহ মনে করেন যে ফীরূজ শাহ সত্যি সত্যিই ফিরে যাচ্ছেন। তিনি দূর্গের বাইরে আসেন কিন্তু তিনি দিল্লীর বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। এই যুদ্ধের কাহিনী শুধু দিল্লীতে লেখা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ফীরূজ শাহ সত্যিই ফিরে যাচ্ছেন মনে করে ইলিয়াস শাহ ১০ হাজার ঘোড়া, ৫০টি হাতি এবং ২ লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ ফীরূজ শাহকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করেন। এদিকে ফীরূজ শাহ সৈন্য নিয়ে একডালার ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থান নেন। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাই ইলিয়াস শাহকে দেখা মাত্র যুদ্ধ শুরু করেন। উভয় পক্ষে তীর, ধনুক, বর্শা এবং তবরারির যুদ্ধ চলে ; বাংলার সৈন্যরা যুদ্ধ জয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধও করে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ফীরূজ শাহ জয়লাভ করেন, ইলিয়াস শাহ পরাজিত হয়ে আবার একডালা দূর্গে আশ্রয় নেন। ফীরূজ শাহের সৈন্যরা একডালা শহর দখল করে একডালা দূর্গ অবরোধ করলে দুর্গে অবরুদ্ধ সম্ভ্রান্ত মহিলারা দূর্গের ছাদে উঠে ঘোমটা খুলে গভীর শোক প্রকাশ করতে থাকে। এতে ফীরূজ শাহ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং মহিলাদের অমর্যাদা হবে ভেবে অবরোধ প্রত্যাহারের এবং সৈন্যদের দিল্লী ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন।

উপরোক্ত বিবরণে দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা দিল্লীর সুলতানের পক্ষপাতিত্ব করেন বলে মনে করার কারণ আছে। তাঁরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ ফেরৎ সৈন্যদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, যারা নিজেদের বীরত্ব ফলাও করে প্রকাশ করে। হয়ত-বা যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ পরাজিত হন, কিন্তু শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি শোচনীয় পরাজিত হলে ফীরূজ শাহ বাংলাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা না করে ফিরে যেতেন না। দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা সুলতানের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বাঙ্গালি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অমর্যাদা থেকে রক্ষা করার প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা পরে দেখব যে ফীরূজ শাহ তুগলক ইলিয়াস শাহের ছেলে ও পরবর্তী সুলতান সিকান্দর শাহের সময়ে দ্বিতীয় বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ফীরূজ শাহ তুগলক যদি মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতেন তাহলে তিনি দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করতেন না। যুদ্ধের সময় লোক এবং সম্পদ ক্ষয় হয়, দূর্গ অবরোধ এবং পতনের সময় মহিলাদের মর্যাদাহানিও হয়। দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলক তা জেনেই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাই মনে হয় ইলিয়াস শাহ যুদ্ধে পরাজিত হলেও ফীরূজ শাহ বুঝতে পারেন যে, ইলিয়াস শাহকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বাংলাদেশ জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে হয় যুদ্ধের পরে ফীরূজ শাহ এবং ইলিয়াস শাহের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফীরূজ শাহ তাড়াতাড়ি দিল্লী ফিরে যাওয়ার জন্যে এবং ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতান যাতে তাড়াতাড়ি দিল্লী ফিরে যান সেই লক্ষ্যে, অর্থাৎ উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির ফলে উভয় সুলতানের মধ্যে দূত ও উপহার বিনিময় হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করে ফীরূজ শাহ পাণ্ডুয়ার নাম ফীরূজাবাদ এবং একডালার নাম আজাদপুর রাখেন। ফীরূজ শাহ তুগলকের বাংলাদেশ আক্রমণের আগেও পাণ্ডুয়ার নাম ফীরূজাবাদ ছিল বলে মুদ্রায় প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই ফীরূজ তুগলক কর্তৃক পাণ্ডুয়ার নাম ফীরূজাবাদ রাখার কথাটা সত্য নয়। ফীরূজ-শাহ তুগলক কর্তৃক একডালার নাম আজাদপুর রাখার কথা সত্য হলেও আজাদপুর নামটি বিশেষ চালু হয়নি। ফীরূজ শাহ বাংলাদেশকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তিনি ইলিয়াস শাহ কর্তৃক অধিকৃত দিল্লীর অন্যান্য এলাকা পুনর্দখল করেন এবং ইলিয়াস শাহের উচ্চাভিলাষ রোধ করেন। ইহাই ফীরূজ শাহ তুগলক কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের ফল। প্রায় এক বৎসর বাংলাদেশ অভিযানে ব্যস্ত থেকে ফীরূজ শাহ তুগলক ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী পৌছেন।

শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ থেকে ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি লখনৌতির সুলতানরূপে সিংহাসনে বসেন কিন্তু বাঙ্গালার সুলতান রূপে মৃত্যুবরণ করেন। এটা তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং সাহসের মাধ্যমে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। সত্য বটে সিংহাসন দখলের জন্য তিনি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেন কিন্তু সেকালে

মনে করা হত যে রাজত্ব আত্মীয়তা স্বীকার করে না। সিংহাসন অধিকারের পরেও ইলিয়াস শাহ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় দেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান সুলতান যিনি সারা বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সারা বাংলাদেশের জন্য 'বাঙ্গালা' নামটি তাঁর সময় থেকেই শুরু হয় এবং এই বাঙ্গালা নামটি নানা বিবর্তনের মাধ্যমে এখনও টিকে আছে। 'বাঙ্গালা' বাংলাদেশের জন্য এবং 'বাঙ্গালি' বাংলার অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হতে থাকে। সুলতানী আমলের 'বাঙ্গালা', মোগল আমলে 'সুবা বাঙ্গালা', ব্রিটিশ আমলে 'বেঙ্গল' বা 'বঙ্গদেশ', পাকিস্তানী আমলে 'পূর্ব বাংলা' (পূর্ব পাকিস্তান) এবং সব শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ নাম ধারণা করেছে। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্যবিস্তার করেন এবং দিল্লীর দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করতে সমর্থ হন। ফীরূজ শাহ তুগলকের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন, ইহা তাঁর বিজ্ঞ সমরনীতির পরিচায়ক। একডালা দূর্গে আশ্রয় নিয়ে ইলিয়াস শাহ এমন এক নীতি গ্রহণ করেন, যার ফলে ফীরূজ শাহকে বাংলাদেশ পদানত না করেই দিল্লী ফিরে যেতে হয়। ইলয়াস শাহের নীতি ছিল দূর্গে অবরুদ্ধ হয়ে কাল ক্ষেপণ করা, কারণ তিনি জানতেন যে ফীরূজ শাহ বেশি দিন দিল্লী ছেড়ে থাকতে পারবেন না। কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই ফিরূজ শাহকে ফিরে যেতে হবে। ফলে হলও তাই, ফিরূজ শাহ বাংলা জয় না করেই দিল্লী ফিরে যান।

দিল্লীর সুলতানদের সমর্থনপুষ্ট ঐতিহাসিকেরা সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের চরিত্রের দূর্বলতার দিকগুলোই তুলে ধরেন। তারা বলেন যে ইলিয়াস শাহ ভাঙখোর ছিলেন এবং কারো কারো মতে কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। তাঁরা আরো বলেন যে ইলিয়াস শাহ প্রজাদের উপর অত্যচার করতেন, ফীরূজ শাহ বাংলায় এসে যেই প্রচার পত্র জারী করেন, তাতেও ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রজাদের উপর অত্যাচারের কথা আছে। কিন্তু ইলিয়াস শাহ ভাঙখোর বা কুষ্ঠরোগী ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ভাঙ বা সিদ্ধি খাওয়া সেকালে দোষের কিছু ছিল না, দিল্লীর সুলতানদের মধ্যেও কেউ কেউ মদ পান করতেন, কুষ্ঠ রোগী হওয়াও অবশ্যই দোষের কথা নয়। ইলিয়াস শাহের সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যই এই সব কথা লিখিত হয়। বাংলার জনগণের উপর ইলিয়াস শাহের অত্যাচারের কথাও সমর্থন করা যায় না, বরং দেখা যায় যে, তিনি উদার ছিলেন, এমনকি হিন্দুদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। সহদেব নামক তাঁর একজন হিন্দু সেনাপতি দিল্লীর সৈন্যদের প্রবল বাধা দেন, বাঙ্গালি হিন্দু সৈন্যরাও তাঁর পক্ষে অস্ত্রধারণ করে। দিল্লীর ঐতিহাসিক আফীফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙ্গলা', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' এবং 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' উপাধিতে অভিহিত করেন। শেষোক্ত উপাধিতে বোঝা যায় যে ইলিয়াস শাহ শুধু মুসলমানদের সুলতান ছিলেন না, তিনি হিন্দু-মুসলিম সকল বাঙ্গালির সুলতান ছিলেন। দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ইলিয়াস শাহের সফলতা ও তাঁর জনপ্রিয়তা দিল্লীর ঐতিহাসিকদের চক্ষুশূল

ছিল এবং তাই মনে হয় দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা ইলিয়াস শাহকে ভাঙখোর ও কুষ্ঠরোগী রূপে চিহ্নিত করেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ জনকল্যাণের নিমিত্তে একটি দীঘি খনন করেন। তিনি মুসলমান সূফী দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সময়ে শয়খ আখী সিরাজ-উদ-দীন উসমান এবং তাঁর শিষ্য শয়খ আলা-উল-হক রাজধানীর অভিভাবক দরবেশরূপে পরিচিত ছিলেন। শয়খ আখী ছিলেন দিল্লীর শয়খ নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ার খলিফা বা অন্যতম প্রধান শিষ্য। ইলিয়াস শাহ্ শয়খ আলা-উল-হকের সম্মানার্থে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু মসজিদের শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একজন সূফী ছিলেন শয়খ রাজা বিয়াবানী, ফীরূজ শাহ্ কর্তৃক ইলিয়াস শাহ্ একডালা দূর্গে অবরুদ্ধ থাকা কালে শয়খ বিয়াবানীর মৃত্যু হয়। ইলিয়াস শাহ ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে এসে শয়খ রাজা বিয়াবানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন।

ইলিয়াস শাহের একখানি শিলালিপি ও বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রায় তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি নেন। অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইলিয়াস শাহ বাংলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি বাঙ্গালি জাতিয়তাবাদের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ দীর্ঘ দিন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

সিকান্দর শাহ্ ঃ

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ্ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়ায় বা ফীরূজাবাদে। সিকান্দর শাহ্ পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘ দিন রাজ্য শাসন করেন। তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ্ তুগলকের দ্বিতীয় বার বাংলা আক্রমণ।

উপরে আমরা দেখেছি যে সিকান্দর শাহের পিতা ইলিয়াস শাহের সময়ে ফীরূজ তুগলক বাংলা অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান, উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় এবং দূত বিনিময়ও হয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর সংবাদ শুনে এবং সিকান্দর শাহ্ সিংহাসনের বসার সঙ্গে সঙ্গে ফীরূজ শাহ্ তুগলক দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ফীরূজ শাহের দ্বিতীয় অভিযানের কারণ স্বরূপ ঐতিহাসিক আফীফ নিম্নরূপ বলেন। ফীরূজ শাহের প্রথম আক্রমণের পরে ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁ আক্রমণ করে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহকে হত্যা করেন। ফখর-উদ-দীনের জামাতা জাফর খান তখন চট্টগ্রামে ছিলেন, তিনি সেখান থেকে জলপথে সিন্ধুর থাট্টায় পৌছেন এবং সেখান থেকে দিল্লী গিয়ে সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলককে বাংলা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু আফীফের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইলিয়াস শহ্ সোনারগাঁও

আক্রমণ করেন ফীরূজ শাহ্ তুগলকের বাংলা আক্রমণের পূর্বে, পরে নয়। দ্বিতীয়ত, ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহকে পরাজিত করেন, ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহকে নয়। আসলে ফীরূজ শাহ্ তুগলক ইলিয়াস শাহের মৃত্যু সংবাদ শুনে মনে করেন যে নতুন সুলতান সিকান্দার শাহ দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবেন না। তাই তিনি বাংলা জয়ের জন্য আরেকবার চেষ্টা করে দেখেন।

যাই হোক, ফীরূজ শাহ্ তুগলক এক বিরাট সৈন্য বাহিনী এবং অনেক হাতি এবং বহু রণপোত নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এদিকে সিকান্দর শাহ এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে মুকাবিলা করার জন্য পিতার নীতি অনুসরণ করেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়া (ফীরূজাবাদ) ছেড়ে একডালা দূর্গে আশ্রয় নেন। ফীরূজ শাহ একডালা দূর্গ অবরোধ করেন, উভয় পক্ষে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময়ে হঠাৎ একডালা দূর্গের এক দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হয়। দিল্লীর সৈন্যরা ঐ ফাটলের মধ্য দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে চাইলে ফীরূজ শাহ তাঁর সৈন্যদের বাধা দেন। তিনি মনে করেন যে, এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে দূর্গ অধিকৃত হলে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী সৈন্যদের হাতে দূর্গের ভিতরের মুসলমান মহিলাদের মানসম্ভ্রমের হানি হবে। এদিকে বাংলাদেশের মিস্ত্রি কারিগরেরা দ্রুত দূর্গের ফাটল মেরামত করে ফেলে। ফলে উভয় পক্ষে গোলাগুলি বিনিময় হতে থাকে এবং জয় পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে যায়। উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য অস্থির হয়ে যায় এবং অমাত্যদের কূটনীতিক প্রচেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম অভিযানের মত ফীরূজ শাহ তুগলকের দ্বিতীয় বাংলা অভিযানও ব্যর্থ হয়। ফীরূজ শাহ তুগলকের দ্বিতীয় বাংলা অভিযানে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগে। অনেক অর্থ ও লোক ক্ষয় হয়, কিন্তু ফলাফল হয় শূণ্য। প্রকৃতপক্ষে ফীরূজ শাহ তুগলক সাম্রাজ্যের অন্যদিকেও যুদ্ধে সফল হতে পারেননি। সে যাই হোক ফীরূজ শাহ তুগলক দিল্লী ফিরে যাওয়ার পরে সিকান্দর শাহ শান্তিতে নির্বিঘ্নে শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ায় সিকান্দর শাহের সময়ে বাংলার ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। শুধু শিলালিপি, মুদ্রা এবং পরবর্তী ইতিহাস রিয়াজ-উস-সলাতীনের মাধ্যমে সামান্য কিছু জানা যায়।

সুলতান সিকান্দর শাহ একজন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। একমাত্র ফীরূজ শাহ তুগলকের আক্রমণ প্রতিহত করা ছাড়া তাঁকে বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই পর্যন্ত তাঁর চারিখানি শিলালিপি এবং অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলো পরীক্ষা করলে বেশ সুন্দর তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ৪টি টাকশাল থেকে মুদ্রা জারী করেন। পূর্বের তুলনায় মুদ্রাগুলো উন্নতমানের এবং চিত্তাকর্ষক। তাঁর সময়ে বিভিন্ন ডিজাইনের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়, এতে তাঁর সময়ে হস্ত লিপি শিল্প ও মুদ্রা শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রায় সিকান্দর শাহ খেলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়াও নিজে ইমাম বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। আব্বাসী ফেলাফত ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়ে যায়, এর পরেও বেশ কিছুদিন দিল্লীর এবং বাংলার সুলতানেরা শেষ আব্বাসী খলিফা আল-মুসতাসিমের নাম

মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেন। সিকন্দার শাহ্ বুঝতে পারেন যে প্রায় এক শতাব্দী আগে বিলুপ্ত আব্বাসী খেলাফতের প্রতি সম্মান দেখানোর কোন অর্থ হয় না। তাই বোধহয় তিনি নিজে ইমাম বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। শিলালিপি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি সূফী দরবেশদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি দিনাজপুর জিলার দেবকোটে মোল্লা আতার দরগায় একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। বিহারের শয়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহয়া মানেরীর সঙ্গে সিকান্দর শাহের হৃদ্যতা ছিল এবং উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ ছিল। পাণ্ডুয়ার শয়খ আল-উল-হকের সঙ্গেও সিকান্দর শাহের ভাল সম্পর্ক ছিল, কিন্তু পরে সম্পর্কের অবনতি হয়। কথিত আছে যে শয়খ আলা-উল-হক তাঁর খানকায় ছাত্র, ফকির-মিসকিন এবং পথিকদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন। এত বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন যে, সুলতানের পক্ষেও এইরূপ ব্যয় করা সম্ভবপর ছিলনা। এতে সুলতান উদ্বিগ্ন হন এবং শয়খ আলা-উল-হকের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পড়েন। তাই সুলতান শয়খকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। কিন্তু সোনারগাঁয়ে শয়খ আলা-উল-হক দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে থাকেন, অথচ তাঁর একটি বাগান ছাড়া তেমন কোন অর্থসম্পদ ছিল না।

সুলতান সিকন্দার শাহের একটি প্রধান কীর্তি আদিনা সমজিদ নির্মাণ। তিনি প্রায় দশ বৎসর সময়ে এই বিশাল আকারের মসজিদখানি নির্মাণ করেন। মসজিদখানি এখন ধ্বংস প্রাপ্ত, কেবল পশ্চিম দিকের কিছু অংশ এখনো অক্ষত আছে। পাণ্ডুয়ার সকল মুসলমান যাতে মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারেন, সেইভাবেই বোধহয় মসজিদখানির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, সিকান্দর শাহ্ তাঁর মুদ্রায় ইমাম অর্থাৎ খলিফা উপাধি নেন।

সিকান্দর শাহের মৃত্যু ঃ

সিকান্দর শাহের মৃত্যু কাহিনী করুণ, তিনি পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। সিকান্দর শাহের দুই স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম গিয়াস-উদ-দীন, তিনি বিদ্বান এবং গুণী লোক ছিলেন এবং বৈমাত্রেয় ভাইদের তুলনায় সকল বিষয়ে শ্রেয় ছিলেন, শাসন ব্যাপারেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর বিমাতা গিয়াস-উদ-দীনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তিনি ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন নিষ্কন্টক করতে চান। অতএব হয় তাকে বন্দী করা হোক বা অন্ধ করে দেয়া হোক। সুলতান এতে বিরক্ত হলেন, কিন্তু রাণীর পীড়াপিড়িতে ঠিক করলেন যে গিয়াস-উদ-দীনকে রাজ্য পরিচালনার ভার ছেড়ে দেবেন। কারণ গিয়াস-উদ-দীন উপযুক্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ ছেলে, শাসন ক্ষমতায়ও দক্ষ। তিনি সত্যিই গিয়াস-উদ-দীনের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দেন কিন্তু গিয়াস-উদ-দীন বিমাতার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ভাবলেন এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্যে রাজ্যশাসন করেও সুখ নেই। তাই তিনি সোনারগাঁয়ে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে

রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন এবং সোনারগাঢ়ীতে শিবির স্থাপন করেন এবং পিতার নিকট থেকে সিংহাসন দাবী করেন। সিকান্দর শাহও সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে গমন করেন। গোয়ালপাড়া প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। গিয়াস-উদ-দীন সৈন্যদের আদেশ দেন যেন কোনক্রমেই সুলতানকে হত্যা করা না হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্য ক্রমে একজন সৈন্য সিকান্দর শাহকে না চিনে বা আত্মরক্ষার খাতিরে আঘাত করেন। গিয়াস-উদ-দীন সংবাদ পেয়ে পিতার নিকট যান এবং পিতার মাথা কোলে তুলে নেন। কিন্তু সিকান্দর শাহ মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর গিয়াস-উদ-দীন পাণ্ডুয়ায় গিয়ে সিংসাহসন অধিকার করেন এবং গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ উপাধি নেন। সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ থেকে ১৩৮৯ পর্যন্ত প্রায় ৩১ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ একজন অতি উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় এবং যুদ্ধে পিতা নিহত হওয়ায় তাঁর বিরূপ সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যতটুকু জানা যায়, তিনি এক ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। তাঁর বিমাতাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি সিংহাসনে বসে বৈমাত্রেয় ভাইদের হয় অন্ধ করে দেন বা হত্যা করেন। মধ্যযুগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্ধ করা বা হত্যা করার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এর উপর ভিত্তি করে আজম শাহের চরিত্র বিচার করা যায় না। সিংহাসন আরোহণের পরে তিনি উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং সুশাসক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর সঙ্গে আজম শাহের যুদ্ধের সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এক সূত্রে জানা যায় যে, শাহাব নামক এক শত্রুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিন যুদ্ধে করতে হয়, যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী শয়খ নূর কুতব-উল-আলম (শয়খ আলা-উল-হকের ছেলে ও খলিফা) তাঁদের মধ্যে সমঝোতা করে দেন। এতে মনে হয় শাহাব বাংলাদেশরই কোন সামন্ত বা সেনাপতি হবেন। অবশ্য পরে আজম শাহ শাহাবকে বন্দী করতে সক্ষম হন। কামরূপের সঙ্গেও আজম শাহের যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের কোন মুদ্রা বা শিলালিপেতে এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। আজম শাহের একমাত্র আবিষ্কৃত শিলালিপি গৌহাটি জাদুঘরে রক্ষিত আছে। কিন্তু এই শিলালিপি কোন এলাকা থেকে আবিষ্কৃত হয় তার হদিস পাওয়া যায় না, তবে যদি শিলালিপিখানি কামরূপ থেকেই আবিষ্কৃত হয়, তা হলে বলা যায় যে, কামরূপের কিছু অংশ গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের অধীনে ছিল। যোগিনীতন্ত্র নামক একখানি গ্রন্থেও বলা হয় যে, ১৩১৬ শকাব্দে (বা ১৩৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানেরা কামরূপ জয় করে ও বারো বৎসর শাসনাধীনে রাখে। এই সূত্রেও মনে হয় গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ কামরূপ অধিকার করেন এবং স্বীয় শাসনাধীনে রাখেন। অহোম বুরঞ্জী নামক স্থানীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, একবার অহোম রাজা সুদঙ্গ-ফা কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ কামতার রাজা অহোম রাজার স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়ী তাই-সুলাইকে

স্বীয় রাজ্যে আশ্রয় দেন। তাদের যুদ্ধের সুযোগে বাংলার তদানীন্তন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। বাংলার উত্তর সীমান্তে কামতা রাজ্য। তার পূর্বে কামরূপ এবং আরো পূর্বে আসাম। অতএব সীমান্ত রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে বাংলার সুলতান নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারেন না। কিন্তু বাংলার সুলতান কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কামতা ও অহোম রাজার বোধোদয় হয়। তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন এবং একযোগে বাংলার সুলতানকে বাধা দেন। তাই আজম শাহ কামতা-কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন বলে মনে হয় না। তবে গৌহাটি জাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপি দ্বারা মনে হয় যে আজম শাহ কামরূপের কিছু অংশ জয় করতে সক্ষম হন। কোচবিহারে যেই মুদ্রা-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয় তাতে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের মুদ্রা থাকায়ও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থে মিথিলার রাজা শিবসিংহ কর্তৃক কোন এক গৌড়ের রাজার পরাজয়ের কথা আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে গৌড়ের এই রাজা সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ। কিন্তু 'পুরুষ পরীক্ষা' রচনার তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকায় এই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মতামত দেয়া যায় না। তথ্যের অভাবে সুলতান গিয়াস-উদ-আজম শাহের যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেয়া যায় না, প্রাপ্ত সূত্রে মনে হয় যোদ্ধা হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ উদার, চরিত্রবান, ন্যায় বিচারক, বিদ্যুৎসাহী এবং সুশাসক রূপে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর ন্যায়বিচার এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন সুলতানের একটি তীর এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা এর প্রতিকার চেয়ে কাজীর নিকট আবেদন করে। কাজী সমন জারী করে সুলতানকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন, এবং তাঁর আসনের নীচে একটি বেত রেখে বিচারালয়ে বসেন। সুলতান সমন পেয়ে আদালতে হাজির হন, তিনি বগলের নীচে একখানি তরবারি লুকিয়ে রাখেন। সুলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হলে কাজী তাঁকে কিছুমাত্র খাতির না করে বলেন, আপনি এই বৃদ্ধা বিধবাকে শান্ত করুন। সুলতান বিধবাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং কাজীকে বলেন যে তিনি যদি সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধবার প্রতি ন্যায়বিচার না করতেন তাহলে সুলতান তাঁকে ঐ তরবারির আঘাতে হত্যা করতেন। কাজীও তাঁর আসনের নীচে থেকে বেত বের করে সুলতানকে বলেন, তিনি যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাতেন এবং কাজীর বিচার অমান্য করতেন তাহলে তিনি ঐ বেতের আঘাতে সুলতানকে জর্জরিত করতেন। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে কাজীকে উপহার দেন ও পুরস্কৃত করেন। এই ঘটনা কল্পকাহিনীর মত শুনায়, তবে মধ্য যুগে বাংলাদেশে এইরূপ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং ন্যায় বিচারের উদাহরণ স্থাপন করে বেশ কয়েকজন সুলতান প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের চরিত্রে আরো অনেক গুণের সমাবেশ হয়। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বান ও গুণীদের পোষকতা করতেন। তিনি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী শয়খ নূর কুতব আলমের সহপাঠি ছিলেন এবং উভয়ে শয়খ হামিদ-উদ-দীন নগৌরির নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি ফারসি ও আরবি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং একবার ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজ শিরাজীকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। কথিত আছে যে তিনি একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে গুল, সরও এবং লালা নামে হারেমের তিনজন মেয়েকে তাঁর লাশ ধোওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু সুলতান আরোগ্য লাভ করেন, হারেমের অন্যান্য মেয়েরা তখন ঐ তিন জনকে লাশ ধোওয়ার কথা নিয়ে প্রায়ই বিদ্রুপ করত। মেয়েরা এই বিষয়ে সুলতানের নিকট অভিযোগ করে, সুলতান তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ছত্র কবিতা রচনা করেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কবিতার দ্বিতীয় ছত্রটি রচনা করতে পারলেন না। সুলতানের কোন সভা কবিও এটা রচনা করতে পারলেন না, তাই সুলতান এই ছত্রটি একজন দূত মারফত ইরানের কবি হাফিজের নিকট পাঠান। হাফিজকে বাংলাদেশে আগমনের জন্যও সুলতান আমন্ত্রণ জানান। হাফিজ কবিতার দ্বিতীয় ছত্রটি রচনা করেন এবং একটি গজলও রচনা করে সুলতানের নিকট পাঠান। হাফিজ বৃদ্ধাবস্থায় বাংলাদেশে আসতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। হাফিজের রচিত গজলটি বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের আর একটি মহৎ কাজ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা স্থাপন, সরাইখানা প্রতিষ্ঠা, খাল খনন এবং পবিত্র নগরীদ্বয়ের অধিবাসীদের জন্য বহুমূল্য উপহার সামগ্রী প্রেরণ। বেশ কয়েকজন আরব ও ভারতীয় ঐতিহাসিক এই বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করেন। খান জাহান নামে আজম শাহের একজন উজীর ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ইয়াহয়া, পিতার নাম আরব শাহ। তিনি আজম শাহকে মক্কা মদীনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই সকল মহৎ কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সুলতানের ভৃত্য হাবশী ইয়াকুতের মাধ্যমে এই অর্থ প্রেরণ করা হয় এবং মক্কা ও মদীনার প্রতিষ্ঠান গুলো নির্মিত হয়। খান জাহানও তাঁর ভৃত্য হাজী ইকবালের মারফৎ মক্কা ও মদীনায় অর্থ ও উপহার সামগ্রী পাঠান, কিন্তু পথে জেদ্দার নিকটে নৌকাডুবির ফলে বেশ কিছু অর্থ সম্পদ বিনষ্ট হয়। মক্কাস্থ আজম শাহের মাদ্রাসাখানি বাব-ই-উম্মেহানী নামক হেরেম শরীফের ফটকের নিকটে নির্মিত হয়, এবং মদীনার মাদ্রাসা মসজিদ-ই-নববীর নিকটে 'হোসন্-উল-আতিক' নামক স্থানে নির্মিত হয়। উভয় মাদ্রাসাই বাঙ্গালি মাদ্রাসা বা গিয়াসীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত হয়। মাদ্রাসা নির্মাণ করা ছাড়া-সরাইখানা নির্মাণ এবং পানি সবররাহের জন্য খাল কাটার জন্য বাংলার সুলতান অর্থব্যয় করেন। এতে সুলতানের বিদ্যোৎসাহিতা এবং পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনার প্রতি ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ মহান বিদ্যোৎসাহী নরপতি, যিনি মক্কা ও মদীনায় শিক্ষার প্রসারে ও জনহিতকর কাছে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, তিনি বাংলাদেশে অনুরূপ কিছু করেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। তাঁর আগে বাংলার অন্য কোন সুলতান কর্তৃক দূত বিনিময়ের কথা জানা যায় না। তিনি জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহান মালিক সরওরের নিকট দূত পাঠান। তবে চীন সম্রাটের নিকট আজম শাহের দূত বিনিময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর সমসাময়িক চীন সম্রাট ছিলেন য়ুংলো। আজম শাহ্ চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের যে নীতি প্রবর্তন করেন, তা বাংলার পরবর্তী সুলতানেরাও অনুসরণ করেন। চীন সম্রাটও বাংলার সুলতানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং উভয়ের মধ্যে উপহার বিনিময় হয়। চীনা দূতেরা বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সরবরাহ করেন, তথ্যগুলো নিম্নরূপ।

চীনা বিবরণে বাংলাদেশ ঃ

বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনা বিবরণ সাধারণ ভাবে মাহুয়ানের বিবরণ নামে পরিচিত। আসলে মাহুয়ান সহ বেশ কয়েকজন বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবরণ দেন। তাদের বিবরণের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ।

চীনা লেখকেরা বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, এখানকার লোকেরা হিন্দু এবং মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। হিন্দুরা গরুর মাংস খেত না এবং স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করত না। হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী কেউ আগে মারা গেলে কারো দ্বিতীয় বিয়ে করার নিয়ম ছিল না। গ্রামের কেউ দুঃস্থ্ থাকলে বা দরিদ্র হয়ে পড়লে অন্যরা তাকে সাহায্য করত না। বাঙ্গালিদের মধ্যে সততা ছিল, তারা ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটাত, ক্ষতি হলেও তারা মিথ্যা বলতোনা বা কাকেও ঠকাবার চেষ্টা করতো না। দেশে বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, তবে অফিসে এবং উচ্চ পদস্থ্ মুসলমানেরা ফারসি ব্যবহার করত। অফিসে হিন্দুরাও ফারসী ব্যবহার করত। উচ্চ পদস্থ্ হিন্দু মুসলিম সকলেই পাগড়ি ব্যবহার করত। তারা এই ধরণের লম্বা জামা পড়ত যাতে গোল গ্রীবাবেষ্টনী থাকত, তাতে জরীর পাড় দেয়া হত। পুরুষেরা মাথার চুল ছোট করত এবং পায়ে ছুঁচোলো প্রান্ত বিশিষ্ট জুতো ব্যবহার করত। সুলতান ও উজিরেরা টুপি মাথায় দিত। মহিলারা খাট জামার উপর সিল্ক বা সুতিকাপড় বেড় দিয়ে পরিধান করত, এবং সোনা ও অন্যান্য দামী পাথরের নির্মিত হার, ফুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি গয়না ব্যবহার করত এবং হাত ও পায়ের আঙুলে আংটি এবং পায়ের গোড়ালিতে বালা ও মল ব্যবহার করত। উপরের বর্ণনা শুধু সমাজের উচ্চবিত্তের জন্য প্রযোজ্য, নিম্নবিত্তের লোকেরা সামর্থ্য মত ইজ্জত আব্রু রক্ষার মত স্বল্প দামের বস্ত্র বা অন্যান্য জিনিষপত্র ব্যবহার করত। সাধারণ হিন্দু মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করত বা কাপড় বুনত।

চীনা বিবরণে বাংলার কৃষকদের বেশ প্রশংসা করা হয়, তারা সারা বৎসর চাষ করত, বীজ বপন করত, ক্ষেত নিড়াত, সেচের কাজ করত এবং কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাত। ফলে তাদের ভূমি ছিল শষ্যে ভরপুর, এবং কর্ষণযোগ্য ভূমি পতিত

থাকতনা। ভূমিতে বৎসরে তিন বার ফসল ফলত এবং খাদ্য শষ্যের দাম থাকত সস্তা। বাংলাদেশের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল ধান, তিল, বজরা, বরবটি, আদা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, শশা, বেগুন, নারকেল, তাল, খেজুর, গম এবং সকল রকমের ডাল ও শাক সব্জি। ধানই ছিল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং ধান বৎসরে দুইবার ফলত। চা উৎপন্ন হত না। বাঙ্গালিরা পান খেত এবং পান দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করত। পশুপাখী ছিল অগণিত, এদের মধ্যে উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, মুরগি, শূকর, কুকুর এবং বিড়ালের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, আঁখ ইত্যাদি পাওয়া যেত। গৃহস্থালী সরঞ্জামের মধ্যে গালার পেয়ালা, বাটি, বর্শা, কাচ, মাটির পাত্র ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনাদের মতে বাঙ্গালিরা নিজেদের গুণে এবং চেষ্টায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। কৃষিকাজের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল এবং তারা কঠোর প্ররিশ্রম করে ফসল ফলাত, বিভিন্ন ঋতু দেশে সম্পদ ছড়িয়ে দিত। তারা বাঙ্গালিদের সততারও ভূয়সী প্রশংসা করে।

চীনা বিবরণে বাংলাদেশের সূতিবস্ত্রের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সকল বিদেশী পর্যটকদের লেখায় সূতিবস্ত্রের প্রশংসা করা হয়। একটি বিবরণে ছয় প্রকার সূতিবস্ত্রের উল্লেখ আছে। বাংলার মসলিন শিল্প অবশ্যই বিদেশীদের আকর্ষণ করত, কোন কোন বিবরণে বলা হয় মসলিনের মত সূক্ষ্ম বস্ত্র অন্য কোন দেশে পাওয়া যেত না। তখন কাগজ তৈরী হত। এক প্রকার গাছের বাকলের সাহায্যে তৈরী কাগজ অত্যন্ত মোলায়েম ও মসৃণ ছিল। তখন বাংলাদেশে ধান, নারকেল, তাড়ি এবং কাজঙ্গ দ্বারা মদ তৈরী করা হত। মুসলমানেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল, তারা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ খাটাত। বাংলাদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তৈরী হত, রৌপ্য মুদ্রাকে তঙ্কা বলা হত এবং তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহার করা হত। মণ, সের ইত্যাদি ওজনের প্রচলন ছিল এবং ওজন অনুসারে জিনিষ পত্রের মূল্য বির্ধারণ করা হত। সাধারণ বেচা কেনায় হাটে বাজারে কড়ি ব্যবহার করা হত, এক তঙ্কার সঙ্গে ১০,৫২০ টি কড়ি বিনিময় হত। অপরাধীদের হয় প্রহার করা হত, না হয় অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নির্বাসন দেয়া হত। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। রাজকর্মচারীদের সীল মোহর থাকত, সৈন্যদের নিয়মিত বেতন ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে যথেষ্ট চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও শাস্ত্রবিদ ছিল। বাজিকরেরও অভাব ছিল না। অতএব চীনা বিবরণে তৎকালীন বাংলাদেশের একটি সুন্দর ও প্রাচুর্যে ভরা দেশের চিত্র পাওয়া যায়।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ ১৪১০-১১ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে পরলোক গমন করেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেননি। যতদূর জানা যায় রাজা গণেশ নামক তাঁর একজন হিন্দু অমাত্য তাঁকে হত্যা করেন। এই গণেশ রাজা কানস নামেও কোন কোন সূত্রে উল্লেখিত হয় এবং ইলিয়াস শাহী বংশকে উৎখাত করে গণেশ যখন সিংহাসনে বসেন তখন দনুজমর্দ্দন দেব নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। সেই কাহিনী পরে আলোচনা করা হবে। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানেরা উদার নীতির পরিচয় দেন এবং হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতে থাকেন। মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী নামক বিহারের একজন দরবেশ পত্রের মাধ্যমে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহকে সতর্ক করে বলেন যে হিন্দুদের ছোটখাট পদ দেওয়া যেতে পারে, তবে মুসলমানদের উপর প্রভূত্ব করতে পারে এমন পদে নিযুক্ত করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত মুজাফফর শামস বলখীর কথাই সত্যে পরিণত হয়, রাজা গণেশ সুলতানকে হত্যা করেন এবং পরে দেখা যাবে যে ইলিয়াস শাহী বংশকে উৎখাত করে নিজেই সিংহাসন দখল করেন।

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ একজন অতি উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও কবি ছিলেন এবং বিদ্বানদের সংস্পর্শে থাকতে ভালবাসতেন। শয়খ নূর কুতব আলম শুধু তাঁর সহপাঠিই ছিলেন না, তাঁর পরামর্শকও ছিলেন। পত্রের মাধ্যমে মওলানা মুজাফফর শামস বলখীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মুজাফফর শামস তাঁকে পত্রে উপদেশ দেন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের ভিতর দিয়ে মক্কায় হজ্জ্ব করতে যাওয়ার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতে সুলতানকে অনুরোধ করেন। এতে মক্কা মদীনার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগের যেমন প্রমাণ পাওয়া যায় তেমনি বাংলার সুলতান এবং বাংলার মুসলমানদের ধর্মপরায়ণতারও প্রমাণ রয়েছে। মক্কা ও মদীনা শরীফে মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা, খাল খনন, ঐ দুই নগরীর লোকদের মধ্যে উপহার বন্টন ইত্যাদির দ্বারা আজম শাহের ধর্মপরায়ণতার যেমন প্রমাণ আছে, তেমনি তাঁর জনসেবারও দৃষ্টান্ত আছে। এই কাজের দ্বারা বাংলার সুলতান সারা মুসলিম জগতে পরিচিত হয়ে যান। সমসাময়িক একাধিক আরবি ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। বাঙ্গালি মাদ্রাসা বা গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত মাদ্রাসা দীর্ঘ দিন বাংলাদেশ ও বাংলার সুলতান আজম শাহের নাম বহন করে। তিনি নিজে আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি বাঙ্গালি কবিরও পৃষ্ঠপোষণ করেন, আমাদের মনে হয় তিনি কৃত্তিবাস ওঝাকে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। তিনি কাজীর বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে আইন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আজম শাহ যেমন মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন, তেমনি শাসক হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর রাজ্য বিস্তারের জোরালো প্রমাণ না থাকলেও তিনি যে কামরূপে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ফীরুজাবাদ (পাণ্ডুয়া), মুয়াজ্জমাবাদ, জন্নতাবাদ, এবং সাতগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও বন্দরের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, তিনি পিতা ও পিতামহের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্য জৌনপুরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং

চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন এবং উপহারাদি বিনিময় করেন। আজম শাহের মত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সুলতান বাংলার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ হয় এবং তাঁর মধ্যে চরিত্রবান, রুচিবান এবং বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ ও পরবর্তী সুলতানগণ ঃ

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ নিহত হওয়ার পরে তাঁর পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। পিতৃহন্তা রাজা গণেশই তাঁকে সিংহাসনে বসান। হামজা শাহ মাত্র ২ বৎসর (১৪১১-১২ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। তাঁর কোন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়নি তবে মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, মুদ্রায় তিনি সুলতান-উস-সলাতীন বা রাজাধিরাজ উপাধি নেন। তিনি পিতার অনুসরণে চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত এবং উপহার বিনিময় করেন। রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন হামজা শাহকে হত্যা করেন।

প্রভু হামজা শাহকে হত্যা করে ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৪১২ থেকে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কম-বেশী তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তিনিও চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত ও উপহারাদি-বিনিময় করেন। তিনিও গণেশের চক্রান্তে বা গণেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। অতঃপর বায়েজীদের পুত্র আলা-উদ-দীন ফীরুজ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কোন ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। তবে তাঁর উৎকীর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর রাজত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী, মাত্র কয়েকমাস, পরে গণেশ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। অতএব ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ দুই সুলতান এবং ক্রীতদাস সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ ও তাঁর ছেলে সুলতান আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ, মোট ৪ জন সুলতান অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজা গণেশের হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা গণেশ দনুজমর্দ্দনদেব উপাধি নিয়ে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন।

ইলিয়াস শাহী শাসনের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইলিয়াস শাহী আমল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৩৪২ থেকে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭৩ বৎসরে ৪ জন ইলিয়াস শাহের বংশের এবং ২ জন ক্রীতদাস বায়েজীদ শাহের বংশের সুলতান রাজত্ব করেন। এই আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশের ঐক্য এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট ইত্যাদি। কিন্তু শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ সারা বাংলা জয় করে একক

শাসনাধীনে আনেন এবং সেই থেকে ইতিহাসে বাঙ্গালা নাম ব্যবহৃত হতে থাকে। এই বাঙ্গালা থেকেই ঐতিহাসিক বিবর্তনে বর্তমানে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ত, বাংলার সুলতানেরা বাংলার স্বাধীন সত্ত্বা অক্ষুন্ন রাখেন। এমন কি দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলক দুইবার আক্রমণ করেও বাংলার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করতে পারেননি। দুই বারই দিল্লীর সুলতানকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। এতে বাংলার সামরিক শক্তির মর্যাদা বৃদ্ধিপায়, এবং সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং একডাল্লা দূর্গের কার্যকারিতা ও ফলপ্রসূতাও প্রমাণিত হয়। তৃতীয়ত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা সীমান্তবর্তী এলাকায়ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ত্রিপুরার একজন নির্বাসিত রাজাকে স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দেন। ত্রিপুরারাজের মাণিক্য উপাধিও ইলিয়াস শাহের দেওয়া, ত্রিপুরার রাজারা এই মাণিক্য উপাধি কয়েক শত বৎসর ধরে ব্যবহার করে স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইলিয়াস শাহ কামরূপ জয় করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ার তাঁর ছেলে সিকান্দর শাহ কামরূপ টাকশাল থেকে মুদ্রা জারী করেন। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহও কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন। চতুর্থত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, অমুসলিমরাও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন; দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতানের পক্ষে হিন্দু সৈন্যরা যুদ্ধ করে, সহদেব নামক একজন হিন্দু সেনাপতি বাংলার সেনানায়কের দায়িত্ব পালন করেন। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহও হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। গণেশ উজীরের পদ লাভ করেন। গণেশ অবশ্য পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, কিন্তু সে ভিন্ন কথা। পঞ্চমত ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন; চণ্ডীদাস সিকান্দর শাহের সময়ে তাঁর বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন, গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ কৃত্তিবাসকে বাংলায় রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। আজম শাহ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং পানি সরবরাহের জন্য খাল খনন করেন। মক্কা এবং মদীনার লোকদের জন্য তিনি বহুমূল্য উপহারও পাঠান। মক্কা মদীনায় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপুল সম্পদ ওয়াকফ্ করে দেন। ষষ্ঠত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা স্বধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন, সিকান্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে এক অপূর্ব নিদর্শন। এত বড় মসজিদ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। ইলিয়াস শাহ শয়খ রাজা বিয়াবানী এবং শয়খ আলা-উল-হকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফীরূজ শাহ তুগলকের আক্রমণের বিপদ উপেক্ষা করে ইলিয়াস শাহ শয়খ রাজা বিয়াবানীর জানাজা ও দাফন ক্রিয়ায় উপস্থিত হন এবং তিনি শয়খ আলাউল হকের সম্মানে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। সিকান্দর শাহও শয়খ আলা-উল-হক এবং বিহারের শয়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহয়া মানেরীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সিকান্দর শাহের পত্রালাপ ছিল। সিকান্দর শাহ অবশ্য শেষে শয়খ আলা-উল-হককে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। সেটার হয়ত সঙ্গত

বা অন্য কারণ ছিল। আজম শাহ শয়খ নূর কুতব আলমের সহপাঠি বন্ধু ছিলেন। সুলতান শয়খ নূর কুতব আলমের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন, এবং সময় সময় শয়খ নূর কুতব আলমের নিকট খাবার এবং উপহারাদি পাঠাতেন। সপ্তমত, এই আমলেই বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে পরিচিত হয়। এই পরিচিতি ছিল সম্মানজনক, বিদেশে বাংলাদেশের মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। মক্কা মদীনায় প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করায় শুধু আজম শাহই নন বরং বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে এক গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা ও মদীনার মাদ্রাসা বাঙ্গালী মাদ্রাসা এবং গিয়াসীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করে এবং বেশ কয়েকটি আরব ইতিহাসে এর বিবরণ স্থান পায়। চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, দূত এবং উপহারাদি বিনিময়ের ফলেও সুদূর চীনে বাংলার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। আজম শাহ জৌনপুরের সুলতানের সঙ্গেও দূত বিনিময় করেন। ফলে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য এলাকায়ও বাংলার সুলতান পরিচিতি লাভ করে।

অতএব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সকল ব্যাপারেই ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। সমসাময়িক চীনা বিবরণে বাংলাদেশের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজা গণেশের বংশ ঃ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ হাবশী শাসন

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজা গণেশ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশকে উৎখাত করে নিজে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল অতি স্বল্প। পরে তাঁর ছেলে মুসলমান হিসেবে রাজত্ব করেন, অর্থাৎ একটি মুসলমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব রাজা গণেশের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। তবুও দুইশত বৎসরেরও বেশী প্রাচীন মুসলিম শাসন উৎখাত করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই কারণে রাজা গণেশের উত্থান ও পতন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার।

রাজা গণেশের উত্থানের কাহিনী একমাত্র রিয়াজ-উস-সলাতীন নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি অনেক পরে অর্থাৎ ঘটনার প্রায় ৪ শত বৎসর পরে লিখিত হলেও এতেই যেহেতু পূর্ণ কাহিনীটি পাওয়া যায় তাই বোঝার জন্য এই কাহিনী নীচে সংক্ষেপে লিখিত হল।

রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু জমিদার সারা বঙ্গদেশ পদানত করেন। তিনি সিংহাসনে বসে অত্যচার আরম্ভ করেন এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞানী ও ধর্ম ভক্তদের অনেককে হত্যা করেন। রাজ্য থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কথিত আছে যে, একদিন শয়খ মুইন-উদ-দীন আব্বাসের পিতা শয়খ বদর-উল-ইসলাম অভিবাদন না করেই তাঁর সামনে বসেন এবং বলেন, 'বিধর্মীদের অভিবাদন করা জ্ঞানীদের পক্ষে শোভনীয় নয়, বিশেষ করে তোমার মত নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু বিধর্মীকে যে মুসলমানদের রক্তপাত করেছে।' তা শুনে রাজা গণেশ নীরব থাকেন, কিন্তু পরে সুযোগ বুঝে কোন এক ওছিলায় তাঁকে হত্যা করেন এবং আরো অনেক মুসলমান জ্ঞানী লোককে নৌকায় করে নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারেন। দরবেশ শয়খ নূর কুতব আলম গণেশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীকে বাংলা আক্রমণ করার এবং গণেশকে শাস্তি দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। সুলতান ইবরাহীম শার্কী পত্র পেয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ এতে হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং শয়খ নূর কুতব আলমের নিকট যান। তিনি শয়খের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং জৌনপুরের সুলতানকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করার জন্য প্রার্থনা জানান। দরবেশ উত্তরে বলেন যে তিনি একজন বিধর্মীর পক্ষে একজন মুসলমান রাজাকে ফিরে যেতে বলতে পারেন না, বিশেষ করে এই মুসলমান রাজা তাঁর আমন্ত্রণেই সুদূর জৌনপুর থেকে বাংলায় এসেছেন। দরবেশ গণেশকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন এবং বলেন যে গণেশ মুসলমান হলে তাঁর পক্ষে আর একজন মুসলমান সুলতানকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারবেন। গণেশ মুসলমান হতে রাজী হন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাধা দেন। ফলে গণেশ তাঁর ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলে যদুকে শয়খ নূর কুতবের নিকট নিয়ে যান এবং

বলেন যদুকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসান হোক, তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করবেন। দরবেশ তাঁর মুখের চর্বিত পান যদুর মুখে পুরে দেন এবং কলেমা পাঠ করিয়ে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। যদু সিংহাসনে বসলে দরবেশ সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। সুলতান ইবরাহীম শর্কী ক্ষুন্ন মনে ফিরে যান এবং দরবেশের কথার অবাধ্য হতে সাহস করলেন না।

সুলতান ইবরাহীম শর্কী ফিরে গেলে রাজা গণেশ আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি যদুকে সরিয়ে আবার সিংহাসন দখল করেন এবং পূর্বের মত মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তিনি যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল এই যে, রাজা স্বর্ণ নির্মিত গাভীর সম্মুখদিকে যদুকে প্রবেশ করিয়ে পেছন দিকে বের করে আনে, এবং গাভীর স্বর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। সে যাই হোক রাজা গণেশের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে শয়খ নূর কুতব আলমের মৃত্যু হওয়ায় গণেশ আর কাউকে ভয় পেলেন না। তিনি শয়খ নূর কুতব আলমের পুত্র শয়খ আনোয়ার এবং পৌত্র শয়খ জাহিদের উপরও অত্যাচার করেন এবং উভয়কে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। সোনারগাঁয়ে গণেশের অত্যাচারে শয়খ আনোয়ারের মৃত্যু হয়, কিন্তু ঘটনা চক্রে শয়খ আনোয়ারের মৃত্যুর একই দিনে পাণ্ডুয়ায় রাজা গণেশেরও মৃত্যু হয়। রাজা গণেশের মৃত্যুর পরে যদু সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে স্বধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার কোন ফল হল না।

রিয়াজ-উস-সলাতীন পুস্তকটি অনেক পরে রচিত হওয়ায় এতে পাওয়া উপরোক্ত বিবরণ দীর্ঘ দিন ধরে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহের চোখে দেখত। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে এমন কিছু কিছু সমসাময়িক এবং প্রায় সমসাময়িক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা রিয়াজ-উস-সলাতীনের বক্তব্যকে সমর্থন করে। ফলে খুঁটিনাটি বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও মোটামুটিভাবে রিয়াজ-উস-সলাতীনের বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়। এই সকল সূত্রের সমন্বয় সাধন করে আমরা রাজা গণেশের ইতিহাস নিম্নরূপে পুনর্গঠন করতে পারি।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গণেশের অভ্যুদয় আকস্মিক হলেও এর পেছনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্তমান। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে হিন্দুরা রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা দিল্লীর প্রবল শত্রুদের মুকাবিলা করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলিম সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহের 'শাহ-ই-বাঙ্গালা', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' এবং 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' হওয়ার জন্য বাঙ্গালার হিন্দু মুসলিম সকলের ঐক্য এবং সংহতি ছিল পূর্ব শর্ত। হিন্দু সামন্ত, জমিদার এবং হিন্দু যোদ্ধা ও সমরনায়কদের সমর্থনের ফলেই ইলিয়াস শাহ সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলকের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। বাংলার হিন্দু যোদ্ধারাও সুলতানের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত দান করেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও প্রতিদানে হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্তি দেন, এমন কি উজীরের

পদও দান করেন। পরে সুলতানদের দরবারে অমাত্যদের মধ্যে দলীয় কোন্দল আরম্ভ হলে হিন্দু অফিসারেরাও এই দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সুলতান সিকান্দর শাহের সময়ে একবার দলীয় কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। সুলতানের পুত্র গিয়াস-উদ-দীন স্বয়ং পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আমীর আমাত্য, সেনাপতি, সেনানায়কেরাও দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ফলে যেই যুদ্ধ হয় তাতে সুলতান নিজেই নিহত হন। মনে হয় গণেশ এই সময়েই রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং আরো মনে হয় তিনি গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহকে সিংহাসন লাভে সমর্থন দেন। কোন কোন সূত্রে গণেশ ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার ছিলেন এবং ঐ জমিদারী ছিল ৪ শত বৎসরের প্রাচীন। অতএব গণেশ যে একজন ক্ষমতাবান লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজম শাহ সিংহাসনে আরোহনের পরে গণেশ উচ্চ পদ লাভ করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মুসলমান সূফী সাধকেরা মুসলিম রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চ পদ প্রাপ্তি সুনজরে দেখেননি। বিহারের দরবেশ মুজাফফর শামস বলখী আজম শাহকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেন, স্বংয় শয়খ নূর কুতব আলমও সুলতানকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেন। হয়ত সূফীদের পরামর্শে আজম শাহ গণেশের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন, যার ফলে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সুযোগ একবার দিলে তা প্রত্যাহার করে নেয়া বিপজ্জনক। এই ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই হয়। গণেশের চক্রান্তে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ নিজেই নিহত হন। আজম শাহের পরে তাঁর ছেলে সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তিনিও দুই বৎসরের মাথায় নিহত হন। অতঃপর সিংহাসনে বসেন হামজা শাহের ক্রীতদাস বায়েজীদ শাহ। তিনিও নিহত হলে তাঁর পুত্র আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ সিংহাসনে বসেন। মনে হয়, রাজা গণেশই ষড়যন্ত্রের জাল বুনে একের পর অন্যকে সিংহাসনে বসান, যাতে তাঁর আসল উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে না পারে। এইভাবে ইলিয়াস শাহী বংশের সাম্ভব্য প্রতিদ্বন্দিরা সব দৃশ্য থেকে সরে গেলে গণেশ নিজের মুখোশ খুলে ফেলে নিজেই সিংহাসনে বসেন। মুসলমান আমীর ওমারা যারা এতদিন দলাদলিতে লিপ্ত ছিলো, তারা এখন তাদের ভুল বুঝতে পারেন, তাঁরা দলাদলি করেছিলেন রাজপরিবারের লোকের পক্ষে বা বিপক্ষে, যাতে তাঁদের মনোনীত যুবরাজ সিংহাসনে বসলে তাঁদের ক্ষমতা বা প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং বৈষয়িক উপকার হয়। গণেশকে সিংহাসনে বসাবার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই দলাদলি করেননি। কিন্তু গণেশ সিংহাসনে বসলে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন, কিন্তু তখন গণেশকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি তাঁদের ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব আসে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ; রাজনীতিতে যাঁর কোনরূপ আগ্রহই ছিল না, যিনি পার্থিব ভোগবিলাসে বিমুখ, সেই বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ শয়খ নূর কুতব আলম মুসলমানদের এই দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন। তিনি যখন দেখেন যে, গণেশ মুসলমানদের উপর বিশেষ করে সূফী দরবেশদের উপর অত্যাচার করছেন, এবং মুসলিম আমীরেরা হতবল এবং কোন উদ্যোগ নিতে অপারগ, তখন তিনি বাধ্য হয়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলা আক্রমণ করে

দেশকে গণেশের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার আবেদন জানান। ইবরাহীম শর্কীর আক্রমণের মুখে গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সরে দাঁড়ান। অবশ্য ইতোপূর্বে শয়খ নূর কুতব আলম যদুকে মুসলমান করে নেন। দরবেশের অনুরোধে ইবরাহীম শর্কী ফিরে যান। কিন্তু তিনি ফিরে গেলে গণেশ আবার যদুকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেন। সূফী সধক নূর কুতব আলম রাজনীতিক গণেশের চাতুরি বুঝতে পারলেন না। গণেশ সিংহাসনে বসে আবার অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে শয়খ নূর কুতব আলমও পরলোক গমন করেন।

দনুজ মর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। দনুজ মর্দ্দন দেবের মুদ্রা ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দে (১৪১৭ ও ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া), চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) এবং সুবর্নগ্রাম (সোনারগাঁও) টাকশালে থেকে উৎকীর্ণ ; মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা ১৩৪০ ও ১৩৪১ (?) শকাব্দে (১৪১৮ ও ১৪১৯? খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম থেকে উৎকীর্ণ। মহেন্দ্রদেবের ১৩৪১ শকাব্দের মুদ্রা খুব স্পষ্ট নয়। সে যাই হোক আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, রাজা গণেশ দনুজমর্দ্দনদেব উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং মুদ্রা জারী করেন। মহেন্দ্রদেবের পরিচিতি নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মহেন্দ্র দেবকে যদুর (সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ) সঙ্গে, আবার কেউ কেউ যদুর ছোট ভাই এর সঙ্গে পরিচিতি দেন। অবশ্য ছোট ভাই এর কোন নাম জানা যায় না। রাজা গণেশ দনুজমর্দ্দন দেব উপাধি নিয়ে কম-বেশী দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য গণেশ ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলার রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন।

সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ ঃ

গনেশের পুত্র যদু সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, গণেশ নিজেই তাঁকে সিংহাসনে বসান, কিন্তু পরে তাঁকে পদচ্যুত করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। কথিত আছে যে, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় গণেশ যদুকে বন্দী করেন। প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও যদু হিন্দু ধর্মে ফিরে যাননি। আরো কথিত আছে যে, যদু বন্দী থাকা অবস্থায় অনুচরদের সাহায্য গণেশকে হত্যা করেন। তবে এর সত্যতা কতটুকু জোর করে বলা যায় না, সত্য এই যে, যদু মুসলমান হিসেবে মুসলমান নাম ও উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ সুশাসক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় এক যুগ ধরে পাণ্ডুয়া রাজনৈতিক কোন্দল ও হত্যার কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমীর অমাত্যরা ছিলই, সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে সৈন্যরা ও কোন না কোন ভাবে রাজনৈতিক দলাদলিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জালাল-উদ-দীন

দলাদলি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ভাবে নতুন পরিকল্পনায় দেশ শাসনের উদ্যোগ নেন। পাণ্ডুয়ায় তা সম্ভব হবে না মনে করে তিনি রাজধানী গৌড়ে সরিয়ে নেন। পরে তিনি জনগণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর পিতার অত্যাচারে জর্জরিত জনগণ তাঁর বংশের প্রতি বিরূপ। তাই তিনি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক নির্বাসিত শয়েখ নূর কুতব আলমের পৌত্র শয়খ জাহিদকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক ধ্বংস করা মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করেন। তিনি মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করেন। কিছুদিন আগে থেকে মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করা বন্ধ ছিল। তিনি মিশরের খলিফার নিকট থেকে সনদ লাভ করে তাঁর রাজত্ব বৈধ করে নেন। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ তিনি মূলত হিন্দু ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেও রাজধানীর মুসলমানেরা তাঁকে হেয় চোখে দেখতেন বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ মুদ্রায় 'খলিফত-উল্লাহ' বা আল্লার প্রতিনিধি বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আমীর উপাধিও গ্রহণ করেন এবং সুলতান ও খলিফত-উল্লাহ-উপাধির সঙ্গে সঙ্গে 'ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী' রূপেও নিজেকে ঘোষণা করেন। তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহকে অনুসরণ করে মক্কা শরীফে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসায় ব্যয় নির্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং মক্কা শরীফের লোকদের জন্য উপহার সামগ্রী পাঠান। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ শুধু একজন সুশাসক ছিলেন না, একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিলেন।

স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হলেও জালাল-উদ-দীন হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন। তবে যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বর্ণ নির্মিত গাভীর অংশ নেন, তিনি তাদের গোমাংস খেতে বাধ্য করেন। কোন কোন সূত্রে বলা হয় যে, তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেন এবং হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। এই দুইটি বক্তব্য গ্রহণযোগ্য কিনা বলা যায় না, কারণ অন্যান্য সূত্রে দেখা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন, তিনি জগদত্তের পুত্র রায় রাজ্যধরকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে সভা কবি নিযুক্ত করেন। এই বৃহস্পতি মিশ্রই বলেন যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন ব্রাহ্মণদের প্রচুর উপহারাদি দিয়ে এবং পুরষ্কৃত করে যুধিষ্ঠির আখ্যা পান। বৃহস্পতি মিশ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, জালাল-উদ-দীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর করতেন। তাঁর উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপতে মসজিদ নির্মাণ এবং অন্য একখানি শিলালিপিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের কথা আছে। অতএব মক্কায় মাদ্রাসা নির্মাণ স্বদেশে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ এবং হিন্দু সভাকবি নিযুক্ত করায় প্রমাণ হয়ে যে, তিনি একজন সংস্কৃতি ভাবাপন্ন উদার লোক ছিলেন। তাঁর কবরের উপর নির্মিত একলাখী ভবন স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

জালাল-উদ-দীনের রাজ্য বিস্তার ও পররাষ্ট্র নীতি ঃ

একাধিক সূত্রে জালাল-উদ-দীনের যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসনের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মুদ্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি পূর্বের টাকশালসহ দুইটি নতুন টাকশাল থেকে মুদ্রা জারী করেন, এই দুইটি টাকশাল হচ্ছে ফতহাবাদ এবং রোতসপুর। এই দুইটি স্থান সুলতান জালাল-উদ-দীন জয় করেন। ফতহাবাদ হল ফরিদপুর, অর্থাৎ জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ ফরিদপুর এলাকা জয় করে এর নাম রাখেন ফতহাবাদ। রোতসপুরকে দক্ষিণ বিহারের শোন নদীর তীরস্থ রোটাস বা রোটাসগড়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। এতে ধারণা করা যায় যে সুলতান জালাল-উদ-দীন দক্ষিণ বিহারও জয় করেন। দক্ষিণ বিহার ছিল জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর অধীনে। অতএব, বাংলার সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে পরাজিত করেই রোতসপুর জয় করেন। এই বিষয়ে দেশীয় সূত্রে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে চীনা সূত্র এবং দক্ষিণ ভারতে নিযুক্ত তুর্কী দূত আবদুর রাজ্জাকের মতলা-ই-সাদাইন নামক গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়। জালাল-উদ-দীনের এক প্রকারের মুদ্রার এক পিঠে আরবীতে সুলতানের নাম এবং অন্য পিঠে লম্ফনোদ্যত সিংহের ছবি অঙ্কিত রয়েছে। সমসাময়িক ত্রিপুরার মুদ্রায় এই রূপ ছবি থাকত। তাই ধারণা করা যায় যে, জালাল-উদ-দীন ত্রিপুরার কিছু অংশ জয় করে তাঁর রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। প্রায় সাত বৎসর ধরে রাজনৈতিক গোলযোগ, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে জালাল-উদ-দীনের রাজ্য বিস্তার তাঁর ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামরিক শক্তির পরিচয় বহন করে।

পররাষ্ট্র নীতিতেও সুলতান জালাল-উদ-দীন অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দেন। তিনি চীন সম্রাট, তুর্কী সুলতান তৈমুর লঙের পুত্র শাহরূখ এবং মিশরের খলিফার নিকট দূত বিনিময় করেন। চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ শুরু করেন। শাহরূখের সঙ্গে দূত বিনিময় তাঁর একটি নতুন কূটনীতিক প্রচেষ্টা, এর সঙ্গে সুলতান ইবরাহীম শর্কীও জালাল-উদ-দীনের সম্পর্কের বিষয় সম্পৃক্ত। যতদূর জানা যাচ্ছে ইবরাহীম শর্কী বাংলা আক্রমণ করায় জালাল-উদ-দীন শাহরূখের নিকট ইবরাহীম শর্কীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। শাহরূখ ইবরাহীম শর্কীকে বাংলায় আগ্রাসন বন্ধের আদেশ দেন। আবার অন্যদিকে জালাল-উদ-দীন দক্ষিণ বিহার জয়ের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ইবরাহীম শর্কী ও সুলতান জালাল-উদ-দীনের সম্পর্ক বা বৈরীতা কোন বিষয়েই খুব সুস্পষ্ট কিছু জানা যাচ্ছে না। রোতসপুর টাকশাল থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ করায় অবশ্য বোঝা যায় যে, জালাল-উদ-দীন কিছুটা সফলতা অর্জন করেন। মুসলমানদের পবিত্র নগরী মক্কায় মাদ্রাসা স্থাপন ও মক্কার জনগণের জন্য উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে অর্থ ব্যয় করে তিনি একদিকে যেমন পুণ্যের কাজ করেন, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের মুসলমানদের সন্তুষ্ট করেন। আরব দেশেও তাঁর ও তাঁর দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মিশরের খলিফার নিকট দূত প্রেরণ করে খলিফার সনদ লাভ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুদ্রায় তিনি খলিফত-উল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। খলিফার সনদ বা

স্বীকৃতি লাভ করে তিনি তাঁর শাসন বৈধ করে নেন। হিন্দু ধর্ম ত্যাগী মুসলমান হওয়ায় সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের জন্য এই বৈধতার প্রয়োজন ছিল। এটাও তাঁর দূরদর্শী কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

পররাষ্ট্র নীতিতে জালাল-উদ-দীনের আর একটি বিরাট সাফল্য আরাকানের এক বিতাড়িত রাজাকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দেওয়া। বিষয়টি নিম্নরূপ। বার্মার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানের রাজা মিন সুয়ামুম স্বরাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। এই ঘটনার তারিখ ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ তখন বাংলার সুলতান। আজম শাহ্ রাজার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও তিনি স্বদেশের সমস্যা নিয়ে ব্যাস্ত থাকায় আরাকানের রাজার সাহায্যে কিছু করতে পারলেন না। অন্যদিকে আরাকানেও বেশ কিছু দিন গোলযোগ চলে এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। বাংলার রাজধানীতে থাকাকালে আরাকানের রাজা কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং রাজবংশের পরিবর্তন দেখেন। তিনি বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার সেনাপতিকে যুদ্ধের কৌশলও শিক্ষা দেন বলে প্রকাশ। ২৪ বৎসর বাংলার রাজধানীতে থাকার পরে তাঁর সুদিন ফিরে আসে। সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে সুলতান আরাকানের রাজাকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দিতে উদ্যোগ নেন। তিনি প্রথমে আরাকানের রাজার সঙ্গে ওয়ালী খান নামক এক সেনাপতির অধীনে বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠান। কিন্তু ওয়ালী খান আরাকানে গিয়ে আরাকানের এক দলনেতার সঙ্গে যোগ দিয়ে আরাকানে এক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা মিন সুয়ামুমকে বন্দী করেন। রাজা কোনক্রমে পালিয়ে বাংলায় চলে আসেন। সুলতান জালাল-উদ-দীন ওয়ালী খানের বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাঁকে শাস্তি দিয়ে মিন সুয়ামমকে আরাকানের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্য দুইজন সেনাপতিকে পাঠান। এইবার বাংলার সৈন্যরা সফল হয়। ওয়ালী খানকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং আরাকানের রাজা তাঁর সিংহাসন ফিরে পান। এর পর আরাকানের সঙ্গে বাংলার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আরাকানের রাজা বাংলার সামন্তে পরিণত হন। সে যাই হোক, এর পর থেকে আরাকানের মুদ্রায় দীর্ঘদিন আরাকানের রাজারা তাদের নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ করে, নামগুলো আরবি অক্ষরে উৎকীর্ণ হত। তবে আরাকানের মুদ্রায় বাংলার সুলতানের নাম উৎকীর্ণ হয়নি। তখন থেকে আরাকানের মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পায়, এবং তা জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফল।

সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক, রাজনীতিজ্ঞ, সুশাসক এবং উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন।

শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ঃ

জালাল-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর সম্পর্কে পরস্পর বিরোধি মন্তব্য পাওয়া যায়। কেউ বলেন তিনি পিতার মত উদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, আবার কারো কারো মতে তিনি অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। অন্য এক সূত্রে বলা হয় যে, শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ১৪ বৎসর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ জালাল-উদ-দীন যদু প্রথম সিংহাসনে বসার সময় তাঁর বয়স ছিল ১২ বৎসর। তাঁর পুত্র সিংহাসনে বসার সময় ১৪ বৎসরের বেশি বয়স্ক হওয়ার কথা নয়। তাহলে এই অল্প বয়স্ক ছেলের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ বা অত্যাচারী কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়।

শামম-উদ-দীন আহমদ শাহ অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। কথিত আছে যে তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর দুই ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন। মনে হয় তাঁর অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে ক্রীতদাসেরা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পরে উভয় ক্রীতদাসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, এই সুযোগে নাসির খান সাদী খানকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে। কিন্তু অমাত্যেরা ক্রীতদাসের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন। তাঁরা ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর নাসির-উদ-দীনকে সিংহাসনে বসান। তিনিই নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন অর্থাৎ তিনি সিংহাসনে বসে রাজা গণেশ কর্তৃক উৎখাতকৃত ইলিয়াশ শাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই এই বংশের সুলতানদের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, এই বংশকে মাহমুদ শাহী বংশ বলা উচিত। মাহমুদ শাহী বংশ বলাও অসঙ্গত নয়, কারণ মাহমুদ শাহই এই বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে ইলিয়াস শাহী বংশ উৎখাত হওয়ার পরে মাহমুদ শাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং কৃষিকাজে লিপ্ত হন। তিনি রাজনীতিতে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষও ছিল না। আমীর আমত্যেরা তাঁকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসান, অর্থাৎ তিনি আমীর আমাত্যদের মনোনীত সুলতান। এর একটি সুফল পাওয়া যায়, মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে কোন দলাদলি বা কোন্দলের সংবাদ পাওয়া যায় না, বরং প্রাপ্ত তথ্যে মাহমুদ শাহের সময়ে নিববচ্ছিন্ন শান্তির আভাষ পাওয়া যায়।

মাহমুদ শাহের শিলালিপি এবং মুদ্রাই তাঁর রাজত্বকালের একমাত্র সমসাময়িক ও প্রামাণ্য সূত্র। এই পর্যন্ত তাঁর আঠারখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিহারের ভাগলপুর থেকে প্রাপ্ত। মাহমুদ শাহের আগে পূর্বে সিলেট ও চট্টগ্রাম, পশ্চিমে বীরভূম এবং উত্তরে দিনাজপুর রংপুর পর্যন্ত মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। ভাগলপুর বোধহয় মাহমুদ শাহের সময়ে অধিকৃত হয়। মিথিলাএবং

উড়িষ্যায় রাজার সঙ্গে মাহমুদ শাহের যুদ্ধ হয় বলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই যুদ্ধের প্রধান কারণ বোধহয় সীমান্ত সংঘর্ষ। কিন্তু তাঁর সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইতিপূর্বে খুলনা-বাগেরহাট এলাকায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় যে, খান জাহান মাহমুদ শাহের সময়ে এই অঞ্চল জয় করেন। তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এক বিরাট দীঘি খনন করেন। তাঁর সমাধিও এখনো বর্তমান।

মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে শান্তি বিরাজ করায় তিনি ইমারতাদি নির্মাণ করে রাজধানী এবং অন্যান্য এলাকায় সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা করেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। গৌড়ে তিনি একটি দূর্গ এবং একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর শিলালিপিতে অনেকগুলো মসজিদ এবং পুল নির্মাণের কথা আছে। তাঁর নির্মিত গৌড় দূর্গের কোতোয়ালী দরজা (প্রধান দরজা বা সিংহদ্বার), দূর্গ প্রাচীরের কিছু অংশ এবং পাঁচ খিলান বিশিষ্ট একটি পুল এখনো দৃষ্ট হয়। বাগেরহাটে খান জাহান কর্তৃক নির্মিত বৃহদাকার মসজিদ খানি ষট গুম্বুজ মসজিদ (প্রকৃতপক্ষে এতে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে) স্থাপত্য শিল্পে একটি অপূর্ব নিদর্শন। এই মসজিদের অনুকরণে সেই অঞ্চলে নির্মিত আরো বেশ কয়েকখানি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলো একটি আলাদা স্টাইল বা রীতিতে তৈরী, এবং এই স্টাইলকে খান জাহানী স্টাইল বলা হয়।

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ মুদ্রায় এবং শিলালিপিতে খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি উপাধি নেন 'খলীফত-উল্লাহ বিল-হুজ্জতে ওয়াল বুরহান'। ইতিপূর্বে সিকান্দর শাহ এবং আজম শাহ খলীফা উপাধি নেন এবং জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ 'খলীফত-উল্লাহ' উপাধি নেন। 'খলীফত-উল্লাহ বিল-হুজ্জতে ওয়াল বুরহান' এর অর্থ প্রমাণ ও সাক্ষ্য মতে খলীফা। এই উপাধি নিয়ে মাহমুদ শাহ যেন বুঝাতে চেয়েছেন যে হিন্দু গণেশের ছেলে জালাল-উদ-দীন যদি 'খলীফত-উল্লাহ' হন, তাহলে তিনি মুসলমানের ছেলে হয়ে প্রমাণ ও সাক্ষ্য মতে খলীফা, তাঁর খলীফত-উল্লাহ উপাধি শুধু কথার কথা নয়। পররাষ্ট্রনীতিতে মাহমুদ শাহ পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি অনুসরণ করে চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত এবং উপহারাদি বিনিময় করেন।

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি উদার ও প্রজারক্ষক নরপতি ছিলেন। যতদূর জানা যায় তাঁর সময়ে দেশে শান্তি বিরাজ করে। প্রায় ২৪ বৎসর রাজত্ব করে মাহমুদ শাহ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ ঃ

মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বারবক শাহ যেমন যুদ্ধে সফল ছিলেন, তেমনি শান্তির কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং এই কারণে তিনি ইতিহাস খ্যাত হয়েছেন।

'রিসালত-উশ-শুহাদা' নামে একখানি ফারসি জীবনীগ্রন্থে রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়। পুস্তকখানি ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পীর মুহাম্মদ শত্তারী লেখেন, বিষয়বস্তু শাহ ইসমাইল গাজী নামক একজন দরবেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা। শাহ ইসমাইল গাজী আরবের কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জেহাদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ তখন বাংলার সুলতান। তিনি রাজধানীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছুটিয়া-পুটিয়া নামক জলায় বাঁধ দেওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হন। দেশের প্রকৌশলীরা ঐ কাজে ব্যর্থ হলে সুলতান শাহ ইসমাইল গাজীর সাহায্যে তা সমাধা করেন। প্রকৌশলীরা বাঁধ দিতে চেয়েছিলেন এবং সুলতান রাজধানীর সকল লোককে বাঁধে মাটি ফেলার আদেশ দেন। সুলতান নিজেও মাটি ফেলার কাজে অংশ নেবেন বলেন। কিন্তু ইসমাইল গাজী বাঁধের পরিবর্তে একটি পুল নির্মাণের পরামর্শ দেন। পুল নির্মাণ করলে পানি নিষ্কাশন হয়ে যায় এবং জলার পানিও সরে যায়, রাজধানীও বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। এতে শাহ ইসমাইলের প্রতি সুলতানের ভক্তি বৃদ্ধি পায়।

ঐ সময়ে হুগলী জিলার মান্দারনের রাজা গজপতি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সুলতানের সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে সুলতান শাহ ইসমাইলের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠান। শাহ ইসমাইল গজপতিকে পরাজিত ও হত্যা করতে সক্ষম হন। পরে সুলতান শাহ ইসমাইলকে কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে পাঠান। সন্তোষের যুদ্ধে শাহ ইসমাইল গাজী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং মাত্র ১২ জন সৈন্য বাদে আর সকলেই প্রাণ হারায়। কিন্তু রিসালত-উশ-শুহাদায় বলা হয় যে, পরাজয় সত্ত্বেও শাহ ইসমাইলের অতিলৌকিক শক্তিতে মুসলমানেরা জয় লাভ করেন। কিন্তু শাহ ইসমাইল গাজীর শোচনীয় মৃত্যু হয়, কথিত আছে যে ঘোড়াঘাটের সামন্ত ভান্দসী রায় বারবক শাহকে জানায় যে, শাহ ইসমাইল গাজী কামরূপের রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। শাহ ইসমাইল গাজীর দেহ মন্দারনে এবং মাথা রংপুরের খোঁটাদুয়ারে সমাধিস্থ করা হয়। তবে শাহ ইসমাইল গাজীর মৃত্যু সম্পর্কে বিতর্ক আছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে, শাহ ইসমাইল গাজী বারবক শাহের আদেশে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড পান, আর একটি সূত্রে দেখা যায় সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর হাবশীর রাজত্বকালে (১৪৯০-১৪৯৩ খ্রিঃ) ইসমাইল গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সে যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে বারবক শাহ মন্দারনে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি কামরূপে বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও মোটামুটিভাবে সীমান্তে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

বারবক শাহ ত্রিহুত জয় করেন এবং কেদার রায় নামক এক ব্যক্তিকে সেখানে সীমান্ত রক্ষী ও রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ বঙ্গে সমুদ্র তীরের বাকেরগঞ্জ এলাকা তখনও মুসলিম অধিকারের বাইরে ছিল। বারবক শাহ ঐ এলাকা জয় করেন।

অতএব বারবক শাহ্ দক্ষিণে উড়িষ্যা, উত্তর-পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ এবং পাশ্চিমে ত্রিহুতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ যে শুধু যুদ্ধে সফলতা দেখান তাই নয়। রাজ্য শাসনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন উদার এবং হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দান করেন। বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকরূপেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নিজেও বিদ্বান ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের পোষকতা ও পুরস্কৃত করতেন এবং তাঁদের মুক্ত হস্তে দান করতেন। তাঁর সময়ে ইবরাহীম কওয়াম ফারুকী ফরহঙ্গ-ই-ইবরাহীমী বা শরফনামা নামে একখানি অভিধান ফারসি ভাষায় রচনা করেন। তিনি বারবক শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বারবক শাহের সভাকবি ছিলেন আমীর জৈন-উদ-দীন হারবী। তাঁর সময়ে আমীর শাহা-উদ-দীন হাকিম কিরমানীও একখানি ফারসি অভিধান রচনা করেন। তাছাড়া মুনসুর শিরাজী, মালিক ইউসুফ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ মুহাম্মদ রুকন, সৈয়দ হাসান এবং শয়খ ওয়াহেদী নামক ফারসী কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সুলতানের সভা অলঙ্কৃত করতেন। শয়খ ওয়াহেদী ইবরাহীম কওয়াম ফারুকীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'হাবল মতীন' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন, বিষয়বস্তু সূফীতত্ত্ব বলে মনে হয়। বারবক শাহ্ বাঙ্গলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষণ করেন। 'শ্রী কৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচয়িতা মালাধর বসুকে তিনি গুণরাজ খান উপাধি দেন এবং কবির পুত্রকে সত্যরাজ খান উপাধি দেন। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। অনন্ত সেন ছিলেন বারবক শাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এতে বোঝা যায় যে, বারবক শাহ্ ধর্ম বিষয়ে উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম সকল যোগ্য ব্যক্তির সমাদর করতেন।

বারবক শাহের আর এক কীর্তি ৮ হাজার হাবশী আমদানী করে তাদের সৈন্য এবং অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ দান। হাবশী আমদানী করার কারণ বোঝা যায় না, তবে অনুমান করা যায়। পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহী আমলে হিন্দুরা উচ্চ পদ পেয়ে শেষে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। সেইজন্য বারবক শাহ্ হয়ত বিদেশী হাবশী আমদানী করে তাঁর ও তাঁর বংশের প্রতি অনুগত রূপে সৈন্যবাহিনী পুর্নগঠনের আশা করেন। তা না হলে বাংলাদেশে মুসলমান এবং হিন্দু উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত হাবশীরা পরে ক্ষমতা লিপ্সু হয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের পরে বাংলাদেশে কয়েক বৎসর হাবশীরা রাজত্ব করে। সেই কাহিনী পরে বলা হচ্ছে। সে যাই হোক, বিদ্বান, বিদ্যাৎসাহী, উদার এবং প্রজা হিতৈষী সুলতান বারবক শাহ ১৫ বৎসর যশ ও খ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ :

বারবক শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ইউসুফ শাহের অনেক মুদ্রা এবং ১০ খানির মত শিলালিপি

আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায় তিনি একজন জ্ঞানী গুণী লোক ছিলেন এবং পিতা পিতামহের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি পিতা ও পিতামহের মত 'খলীফত-উল্লাহ বিল হুজ্জতে ওয়াল-বুরহান' উপাধি গ্রহণ করেন এবং "সুলতান-উস-সলাতীন" উপাধিও নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমসাময়িক কোন ইতিহাস না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী ইতিহাসেও তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি বিদ্বান, ধার্মিক এবং প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন এবং ভালকাজের আদেশ দিতেন ও মন্দ কাজ নিষেধ করতেন। মদ্যপান এবং অসৌজন্যমূলক কাজও তিনি নিষেধ করেন। তিনি আলেম ও বিচারকদের মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁদের আদেশ দিতেন যেন বিচার কাজে পক্ষপাতিত্ব না করেন। তিনি বিদ্বান ছিলেন এবং নিজে বিচার কাজ সমাধা করতেন, বিশেষ করে যেই সকল বিচার কাজ বিচারকেরা করতে পারতেন না, ইউসুফ শাহ সেগুলোই বিচার করতেন। কেউ কেউ বলেন যে তাঁর সময়ে জৈনুদ্দীন 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা করেন এবং সুলতান তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তিনি ৭ বৎসর রাজত্ব করে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ :

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পরে অমাত্যেরা সিকান্দর নামক একজন রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসায়, কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে গদিচ্যুত করে ফতেহ শাহ নামক আর একজন রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়। আগে সিকান্দর, ফতেহ শাহর পরিচিতি এবং ইউসুফ শাহের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু মুদ্রা এবং শিলালিপির সাহায্যে এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সিকান্দর এবং ফতেহ শাহ উভয়েই সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহের ছেলে ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের ভাই এবং শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহের চাচা ছিলেন। সিংহাসনে বসিয়ে যুবরাজ সিকান্দরকে পদচ্যুত করার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, সিকান্দর বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ ছিলেন। সিংহাসনে বসাবার পরে অমাত্যরা বুঝতে পারেন যে, রাজা হওয়ার মত গুণ সিকান্দরের ছিল না। কিন্তু এগুলো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আমীর অমাত্যরা সিংহাসনে বসাবার আগে সিকান্দরের পাগল হওয়া বা গুণ না থাকার কথা জানত না, সিংহাসনে বসাবার পরে জানতে পারেন তা কেমন কথা। তাই আমাদের মনে হয় রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের ফলেই এইরূপ ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ ফতেহ শাহের চক্রান্তের ফলেই, এমন কি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলে আমীর অমাত্যেরা মত পরিবর্তন করে সিকান্দরকে উন্মাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। সিকান্দরের রাজত্ব কাল নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি যেদিন সিংহাসনে বসেন সেই দিনই পদচ্যুত হন, আবার কেউ কেউ বলেন অমাত্যরা খোঁজ খবর নিয়ে যখন দেখেন যে তিনি সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নন, তখন তাঁরা তাঁকে

পদচ্যুত করেন। সিকান্দর শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাঁর রাজকীয় নাম নূর-উদ-দীন সিকান্দর শাহ। মুদ্রা জারী করায় মনে হয় তিনি অন্তত কয়েকদিন রাজত্ব করার সুযোগ পান।

ফতেহ শাহ সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর বেশ কিছু মুদ্রা এবং ১০ খানি শিলালিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে মনে হয় তিনি পিতা ও ভাই ভাইপোর নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমগ্র রাজ্য অক্ষুন্ন রাখেন এবং এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বিশাল। তাঁর একখানি শিলালিপিতে মীর বহর বা এ্যাডমিরাল খেতাবধারী একজন অফিসারের নাম পাওয়া যায়। শিলালিপিখানি ঢাকার ধামরাই থেকে প্রাপ্ত। এতে মনে হয় তিনি নৌবাহিনী গঠন করেন এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর ঢাকায় ছিল। তিনি তাঁর বংশের পূর্ববর্তী সুলতানদের মত "খলীফত-উল্লাহ বিল হুজ্জাতে ওয়াল বুরহান" উপাধি গ্রহণ করেন। শিলালিপিতে তাঁর অন্যান্য উপাধি ছিল 'সুলতান-উস-সলাতীন' (রাজাধিরাজ বা সম্রাট), 'জলে ও স্থলে সাহসী যোদ্ধা', 'পবিত্র কোরানের রহস্য উদঘাটনকারী' এবং 'ধর্মীয় ও শারিরিক বিদ্যায় (চিকিৎসা বিদ্যা) পারদর্শী'। এই উপাধিগুলি দেখে মনে হয় রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা ছাড়াও ফতেহ শাহ ধর্মীয় শাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও জ্ঞানী ছিলেন। মোগল আমলের ইতিহাসে ফতেহ শাহের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে শাসন পরিচালনা করতেন।

ফতেহ শাহ একজন গুণী লোক হলেও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। তিনি প্রাসাদরক্ষীদের হাতে নিহত হন। তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের ভাইকে সরিয়ে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বারবক শাহের আশ্রয় পুষ্ট হাবশীরা বোধহয় তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। সিংহাসন লাভের পরে ফতেহ শাহ নিশ্চয়ই হাবশীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বারবক শাহ এবং ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় হাবশীরা দাম্ভিক ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের হঠকারিতায় নাগরিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ফতেহ শাহ উচ্ছৃঙ্খল হাবশীদের কঠোর হস্তে দমনের চেষ্টা করেন। তখন এইরূপ এক প্রথা চালু ছিল যে, প্রত্যেক রাতে পাঁচ হাজার পাইক প্রাসাদ পাহারায় নিযুক্ত থাকত, সকালে সুলতান তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলে তারা বিদায় নিত এবং অন্য একদল আসত। ফতেহ শাহ উচ্ছৃঙ্খল হাবশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এই প্রাসাদ রক্ষীরা ক্ষেপে যায়। বারবক শাহজাদা নামক একজনের নেতৃত্বে তারা ফতেহ শাহকে হত্যা করে। বারবক শাহজাদা নিজেই সিংহাসনে বসেন। ফতেহ শাহ ৭ বৎসর রাজত্ব করেন এবং ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। তাঁর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়।

ইলিয়াস শাহী বংশ রাজা গণেশের চক্রান্তে উৎখাত হলেও গণেশের বংশের পতনের পরে ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর (পৌত্র, প্রপৌত্র, আত্মীয় বা বংশের কেউ) আবার সিংহাসন লাভ করেন। এতেই বাংলায় ইলিয়াস শাহী সুলতানদের

জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন এবং পূর্ববর্তীদের মত উদারতা, শাসন দক্ষতা ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য শিল্পে তাঁরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ কাজে, বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ বাংলার যে কোন শ্রেষ্ঠ শাসকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহীদের মত পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হাবশী সুলতানদের শাসন ঃ

বারবক শাহজাদা সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বারবক শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাবশী অমাত্যদের মধ্যেই রেষারেষি শুরু হয়ে যায়। মালিক আন্দিল নামক একজন হাবশী তখন সেনাপতি ছিলেন এবং সীমান্তে অবস্থান করছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে রাজধানীতে ছুটে আসেন এবং এক রাতে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বারবককে হত্যা করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি পরলোকগত সুলতানকে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই বারবককে হত্যা করেন। তিনি ফতহ-শাহের অল্প বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করেন কিন্তু ফতেহ শাহের রানী এতে রাজী হলেন না বরং ফতেহ শাহের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানান। অতএব মালিক আন্দিল সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফীরূজ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বারবক শাহের মাত্র ৮৯৩ হিজরী বা ১৪৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। তিনি মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করার সুযোগ পান বলে মনে হয়।

সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফীরূজ শাহ হাবশীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য লোক ছিলেন। তিনি উদার এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি এত বেশি দান করতেন যে, লোকে অবাক হয়ে যেত এবং তাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও বলাবলি করত যে এই হাবশী বিনা পরিশ্রমে যে অর্থের মালিক হয়েছেন, তার মূল্য তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি একদিনেই গরীবদের মধ্যে এক লাখ টাকা দান করেন। তিনি মসজিদ, মিনার এবং গৌড়ে জলাশয় তৈরী করেন। তাঁর নির্মিত মিনারটি ফিরূজা মিনার নামে পরিচিত। মাত্র ৩ বৎসর রাজত্ব করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, আবার কারো কারো মতে পাইকরা তাঁকে হত্যা করে। শেষোক্ত মত গ্রহণযোগ্য বলে বর্তমানে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

সাইফ-উদ-দীন ফীরূজ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহের প্রকৃত নাম এবং পরিচিতি নিয়ে বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি ছিল। বলা হত যে,

তাঁর নাম নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ, এবং পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশে একজন নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ থাকায় এই সুলতানকে দ্বিতীয় নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ বলা হত। তিনি কি সাইফ-উদ-দীন ফীরূজ শাহের পুত্র ছিলেন নাকি জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহের পুত্র ছিলেন সেই বিষয়েও মতভেদ ছিল। বর্তমানে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় বিতর্কের অবসান হয়েছে। এখন নিশ্চিত ভাবে জানা যাচ্ছে যে, তাঁর নাম কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহ এবং তিনি সাইফ-উদ-দীন ফীরূজ শাহের পুত্র ছিলেন।

কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহের সময় হাবাশ খান নামক একজন হাবশী গোলাম প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। তাঁর প্রভাব এত ব্যাপক হয় যে, সুলতানের কোন ক্ষমতাই ছিল না, অর্থাৎ সুলতান হাবশ খানের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এতে অন্যান্য হাবশীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। সিদি-বদর দিওয়ানা নামে একজন হাবশী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং উভয়েই সুলতানকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসার জন্য চেষ্টিত হন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিদি বদর দিওয়ানা জয়লাভ করেন। তিনি প্রথমে হাবাশ খানকে হত্যা করেন এবং পরে সুলতান কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহকেও হত্যা করে নিজে সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ সম্পর্কে পরষ্পর বিরোধি তথ্য পাওয়া যায়, এই মন্তব্যগুলোর সারমর্ম নিম্নরূপ :

মুজাফফর শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং অনেক ধার্মিক, পণ্ডিত এবং অভিজাত লোকের প্রাণনাশ করেন। সৈয়দ হোসেন নামক এক ব্যক্তিকে তিনি উজীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে রাজ্য শাসনের ভার দেন্। উজীরের পরামর্শে মুজাফফর শাহ প্রজাদের শোষণ ও নির্যাতন করেন, সৈন্যদের বেতন কমান এবং ধনরত্ন জমা করেন। ফলে প্রজারা, এমনকি অমাত্যরাও বিক্ষুদ্ধ হয়। উজীর সৈয়দ হোসেনও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। কারো কারো মতে মুজাফফর শাহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন, আবার কারো কারো মতে উজীর সৈয়দ হোসেন প্রাসাদ রক্ষীদের বশে এনে প্রাসাদে ঢুকে সুলতানকে হত্যা করেন।

মুজাফফর শাহ সম্পর্কে উপরে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তা সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে। তাঁর সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁকে একজন বিদ্বান লোক হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে। এই শিলালিপির কোন কোনটি সূফীদের দরগায় উৎকীর্ণ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত তাঁর মুদ্রায় তাঁকে 'কামতা মর্দ্দন' বা কামতা বিজয়ী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয় তাঁর সময়ে কিছু রাজ্যও বিজিত হয়। উজীর সৈয়দ হোসেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করায় মনে হয় যে তিনি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং তাঁর চরিত্রেও কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সে যাই হোক, সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ ৩ বৎসর রাজত্ব করে ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন, হাবশীদের শাসনকালও শেষ হয়।

হাবশীদের মধ্যে ৪ জন সুলতান রাজত্ব করেন। ৪ জনেই অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন অর্থাৎ ঘাতকদের হাতে নিহত হন। এই ৪ জন সুলতান মিলে মাত্র ৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তার মধ্যে গিয়াস-উদ-দীন বারবক এবং কুতব-উদ-দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল কয়েকমাসের বেশি হবে না। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, হাবশী আমল মোটামুটিভাবে বলতে গোলে অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাবশীদের উৎখাত করে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আমরা দেখব যে, তিনি হাবশীদের দেশ থেকে বের করে দিয়ে দেশকে হাবশী মুক্ত করেন।

সপ্তম অধ্যায়

হোসেন শাহী বংশ

হাবশী সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহের উজীর সৈয়দ হোসেন মক্কী হাবশীদের পতনের পরে সিংহাসনে বসেন। তিনি স্বীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই বংশকে তাঁর নাম অনুসারে হোসেন শাহী বংশ বলা হয়। আবার এই বংশকে সৈয়দ বংশও বলা যেতে পারে, কারণ তিনি সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন এবং তিনি যে সৈয়দ ছিলেন তা সগৌরবে প্রকাশ করেন। সিংহাসনে বসে তিনি উপাধি নেন সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরাফ আল-হোসেনী। এই বংশের ৪ জন সুলতান রাজত্ব করেন, সকলেই যোগ্য ছিলেন, সকলেই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং উদার শাসন প্রবর্তন করেন। তাই হোসেন শাহী আমলকে বাংলার মুসলমান শাসনকালের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ ঃ

হোসেন শাহ সিংহাসনে বসে প্রথমে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের দিকে মনযোগ দেন। রাজনৈতিক দলাদলি, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির ফলে দেশে একটা অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, শান্তি ব্যাহত হলে দেশের উন্নতি অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য হোসেন শাহ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসার আগে তিনি অমাত্যদের কথা দেন যে গৌড়ের মাটির উপরে যা আছে তা তিনি তাদের ভোগ করতে দেবেন এবং মাটির নীচের সম্পদ নিজে রাখবেন। কথা মত তিনি অমাত্যদের শহর লুট করার অনুমতি দেন। কয়েকদিন পরে সুলতান তাদের লুট বন্ধ করার আদেশ দেন কিন্তু সুলতানের আদেশে কর্ণপাত না করায় তিনি ১২ হাজার লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করেন। এইভাবে সুলতান এক কঠোর শাসনের সূচনা করেন। তিনি নিজে মাটির নীচে অনুসন্ধান করে ১৩০০ সোনার থালা হস্তগত করেন। এতে তাঁর রাজকোষের অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি হাবশীদের আমলের অরাজকতা সৃষ্টিকারী পাইকদের নিরস্ত্র করে বরখাস্ত করেন এবং ভবিষ্যতে গোলযোগ বন্ধ করার লক্ষ্যে হাবশীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। হোসেন শাহ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং হিতৈষীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন, বিশেষ করে অভিজাত লোকদের রাষ্ট্রীয় পদে প্রাধান্য দেন। তিনি নতুন একটি পাইক দল নিযুক্ত করেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকে। তিনি বিশেষ করে সৈয়দ, আফগান এবং মোগলদের রাজপদে নিযুক্তি দেন এবং তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। এই ভাবে তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধ বিগ্রহ ও পররাষ্ট্রনীতি ঃ

দেশে শান্তি স্থাপন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হোসেন শাহ দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এর কারণ হোসেন শাহের এক মানবিক কাজ। জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর নিকট পরাজিত হয়ে স্বদেশ থেকে পালিয়ে এসে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের আশ্রয় নেন। সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ শর্কী বাংলার সুলতানের অধীনস্থ বিহারের খলগাঁও নামক স্থানে সপারিষদ অবস্থান করেন। লোদী সুলতান এতে বিরক্ত হয়ে সসৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। বাংলার সুলতান ইহা আগে ভাগে আঁচ করতে পেরে তাঁর পুত্র দানিয়ালের অধীনে সৈন্য পাঠান। দিল্লী এবং বাংলার সৈন্যরা কিছুদিন বাঢ় নামক স্থানে মুখোমুখি থাকে, কিন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির দ্বারা এক পক্ষ অন্য পক্ষের শত্রুদের আশ্রয় না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সিকান্দর লোদী বিহার, তুগলকপুর এবং সারণ জিলায় গবর্নর নিযুক্ত করে দিল্লী ফিরে যান। চুক্তির শর্ত যাই হোক না কেন, প্রকৃত অবস্থা দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। হোসেন শাহ শর্কী বাংলার সুলতানের এলাকায় দীর্ঘ দিন থেকে যান এবং আমৃত্যু অবস্থান করেন। হোসেন শাহ শর্কী ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে থেকেই স্বনামে মুদ্রা জারী করেন। আবার আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ বেশ কয়েক বৎসর পাটনা, ভাগলপুর, সারন, বাঢ়, মুঙ্গের, বিহার শরীফ ইত্যাদি স্থানে শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। এতে বোঝা যায় যে বাংলার সুলতান শুধু হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেননি, বরং বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা নিজ দখলে রাখেন। তাতে মনে হয় সিকান্দর লোদীর সঙ্গে আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের চুক্তির কথা হয় সঠিক নয়, নতুবা চুক্তি সম্পাদিত হলেও পরে বাংলার সুলতান সুযোগ বুঝে পশ্চিম সীমান্তে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। এমনও হতে পারে যে, দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য এবং রাজ্যের সংহতি রক্ষার খাতিরে বাংলার সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা চিন্তা করেননি। সিকান্দর লোদীর মনোভাব যাই হোক না কেন, এতে বাংলার সুলতানের শৌর্য ও শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অর্থাৎ কামতা-কামরূপ এবং আসামেও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বে বনাস (মনসা) নদী পর্যন্ত ভূভাগ কামতা নামে পরিচিত ছিল, কামতার পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত কামরূপ এবং তারো পূর্বে আসাম রাজ্য অবিস্থত ছিল। সুলতান রুকন-উদ-দীন বাবরক শাহের সময়ের কামরূপ অভিযান অমিমাংসিত থেকে যায়, কিন্তু সীমান্ত রাজ্য কামতা-কামরূপের সঙ্গে বাংলার সুলতানদের সংঘর্ষ বোধহয় থেমে যায়নি। কারণ

সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহের 'কামতা-মর্দন' উৎকীর্ণ মুদ্রায় প্রমাণিত হয় যে তিনি কামতা বা তার কিছু অংশ জয় করেন। তাছাড়া হোসেন শাহ তাঁর অনেক মুদ্রায় কামতা, কামরূপ, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ের ঘোষণা দেন। এমনও হতে পারে যে হোসেন শাহ মুজাফফর শাহের উজীর হিসেবে কামতা অভিযান পরিচালনা করেন। যাই হোক, দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর অভিযান প্রতিহত করে বা সিকান্দর লোদীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পরে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন।

ফারসি ইতিহাসে হোসেন শাহের কামতা, কামরূপ ও আসাম অভিযান সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ। যুদ্ধের পরিকল্পনা করে হোসেন শাহ অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে ঐ এলাকা রূপ নারায়ণ, মাল কুনওয়ার, লছমী নারায়ণ এবং অন্যান্য রাজাদের অধীনে ছিল। প্রকৃতপক্ষে মোগল আমলের আগে পর্যন্ত সেখানে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিলনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বহিঃশক্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্রুদের বাধা দিত, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে একে একে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হত। হোসেন শাহ এই রাজাদের সহজে পরাজিত করেন, পরাজিত রাজারা পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নেয় এবং হোসেন শাহ ধন সম্পদসহ ফিরে আসেন। সুলতান তাঁর ছেলেকে বিজিত রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রেখে আসেন। কিন্তু বর্ষাকাল আসলে সকল রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়ে যায়, শক্রুরা পাহাড় পর্বত থেকে নেমে আসে এবং মুসলমান সৈন্যদের রসদ বন্ধ করে দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে সকলকে হত্যা করে। আসামের সূত্র অহোম বুরঞ্জীতে আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের অভিযানের কথা আছে, এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্যের বিভিন্নতা থাকলেও বাংলার সৈন্যদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসার কথা আছে। অতএব সকল সূত্রের সমন্বয় সাধন করে হোসেন শাহর কামতা-কামরূপ ও আসাম অভিযানের নিম্নরূপ চিত্র তুলে ধরা যায়। খুব সম্ভব হোসেন শাহ নিজে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রায় ২৪ হাজার (বা ২০ হাজার) পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং প্রথম চোটে কামতা ও কামরূপ অধিকার করে আসাম আক্রমণ করেন। আসামের রাজাও পালিয়ে যান। তাই হোসেন শাহ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে তাঁর ছেলেকে রেখে নিজে বিজয় গৌরবে দেশে ফিরে আসেন। হোসেন শাহ যেই ছেলেকে আসামে রেখে আসেন তাঁর নাম দুলাল গাজী। কেউ কেউ মনে করেন যে তা দানিয়ালের বিকৃত রূপ। কিন্তু হোসেন শাহ ফিরে আসার পরে বর্ষার প্লাবনের সুযোগ নিয়ে আসামের রাজা বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। অতএব বোঝা যায় যে, হোসেন শাহ কামতা- কামরূপ জয় করতে সক্ষম হলেও তাঁর আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে উড়িষ্যা, উড়িষ্যার রাজা তখন পরাক্রমশালী ছিল। জনান্নাথ মন্দির উড়িষ্যায় অবস্থিত হওয়ায় তীর্থ যাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে আসত এবং মন্দিরে ধনরত্ন জমা রাখত। ফলে উড়িষ্যা সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল, হোসেন শাহের সমসাময়িক রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চলে, কোন কোন সময় যুদ্ধ বন্ধ হলেও পরে আবার যুদ্ধ বাধত। শ্রী চৈতন্যদেব প্রায়ই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন, চৈতন্য চরিত গ্রন্থসমূহে চৈতন্য দেবের আলোচনায়, বিশেষ করে তাঁর গমনাগমনের পথের আলোচনায় বাংলাদেশ এবং উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধের কথা স্থান পায়। তাছাড়া পর্তুগীজ পরিব্রাজক ডুয়ার্টে বারবোসাও বলেন যে, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে কোন কোন সময় যুদ্ধ বাধত। হোসেন শাহের অনেক মুদ্রা এবং একখানি শিলালিপিতে হোসেন শাহকে কামতা-কামরূপ, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ীরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলো ১৪৯৩ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে উৎকীর্ণ। উড়িষ্যার রাজাও শিলালিপিতে দাবী করেন যে, তিনি বাংলার রাজাকে পরাজিত করেন, অর্থাৎ সূত্রগুলো পরস্পর বিরোধী দাবী করে। তাই মনে হয় উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ ছিল বেশির ভাগ সীমান্ত সংঘর্ষ। তবে উড়িষ্যার সূত্র মাদলা পঞ্জী এবং কটক রাজবংশাবলীতে একস্থানে বলা হয়েছে যে, বাংলার সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করেন, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র পরে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে এসে হোসেন শাহকে তাড়িয়ে দেন। এই সময় হোসেন শাহ জগন্নাথ মন্দিরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন বলে মনে হয়। চৈতন্য ভাগবতে আছে, 'যে হোসেন শাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।" অতএব হোসেন শাহ যে অন্তত একবার পুরী পর্যন্ত জয় করে জগন্নাথ মন্দির থেকে ধনরত্ন নিয়ে আসেন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের কোন শিলালিপি বা অন্য কোন নিদর্শন বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়নি, অন্য পক্ষে হোসেন শাহের কোন কীর্তিও উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বোঝা যায় যে, হোসেন শাহ বা প্রতাপরুদ্র কেউ প্রতিপক্ষের দেশ জয় করতে পারেননি। তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন কোন সময় একে অপরের বিরুদ্ধে হয়ত সাময়িকভাবে জয় লাভ করতে পারে, কিন্তু কারো পক্ষে অন্যের রাজ্য জয় সম্ভব ছিল না। চৈতন্য চরিত গ্রন্থের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ছত্রভোগ থেকে মন্ত্রেশ্বর নদ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪০ মাইল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ ত্রিপুরায়ও অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতানের নিজের শিলালিপি ও ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'ত্রিপুরা-রাজমালায়' এই সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়। সোনারগাঁয়ে প্রাপ্ত হোসেন শাহের এক শিলালিপিতে খওয়াস খান নামক একজন অফিসারকে ত্রিপুরা ভূমির (জমীন ক্রিপুরা) সেনাপতি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহাতে বোঝা যায় যে হোসেন শাহ ত্রিপুরার কিছু অংশ জয়

করেন। রাজমালায় হোসেন শাহ এবং ত্রিপুরা রাজ ধন্য মাণিক্যের সংঘর্ষের কাহিনী পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা ধন্য মাণিক্য প্রথমে সীমান্তবর্তী সুলতানের এলাকা দখল করেন এবং পরে চট্টগ্রাম জয় করেন। চট্টগ্রাম তখন হোসেন শাহের অধীনে ছিল। তিনি ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। গৌড়ের সৈন্যরা প্রথমে জয়লাভ করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। পরের বৎসর হোসেন শাহ আর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, সেনাপতি হৈতান খান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন এবং বেশ সাফল্য অর্জন করেন। ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধের কথা বিভ্রান্তিকর, কারণ রাজমালায় ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক বাংলার সুলতানের এলাকা আক্রমণের কথা আছে, আবার চট্টগ্রাম আক্রমণের কথা আছে। কিন্তু হোসেন শাহের শিলালিপিতে ত্রিপুরার কিছু অংশ জয়ের কথাও আছে এবং পর্তুগীজদের বিবরণে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বাংলার সুলতান হোসেন শাহের আধীনে ছিল।

চট্টগ্রাম বাংলার সর্বদক্ষিণ এলাকায়। এর একদিকে বাংলার সুলতান, অন্যদিকে ত্রিপুরার রাজা এবং দক্ষিণ দিকে আরাকানের রাজা। এই তিন রাজারই লোলুপ দৃষ্টি ছিল চট্টগ্রামের দিকে, এবং চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রায়ই ত্রিদলীয় যুদ্ধ হত। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে মনে হয় সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর থেকে চট্টগ্রাম মোটামুটিভাবে বাংলার সুলতানদের অধীনে ছিল। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ, রাজা গণেশ, জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ, নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ, রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ, শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ, সকল সুলতানের সময় চট্টগ্রাম তাঁদের অধিকারে থাকার অকাট্য প্রমাণ আছে। হোসেন শাহের সময় হামীদ খান, পরাগল খান প্রমুখ সেনাপতিরা চট্টগ্রাম শাসন করেন।

এখন হোসেন শাহের রাজ্যের সীমানা আলোচনা করা যায়। তাঁর অনেক মুদ্রা ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, মুদ্রাগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ কিন্তু তাঁর শিলালিপিগুলো বাংলার বাইরে বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, সারণ, ইত্যাদি এলাকায় পাওয়া যায়। অতএব মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, হোসেন শাহ সারা বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমগ্র এলাকার অধীশ্বর ছিলেন, তাছাড়াও তিনি বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেন। চট্টগ্রামে হোসেন শাহের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে, কিন্তু উড়িষ্যা, কামতা-কামরূপ এবং ত্রিপুরায় তিনি তাঁর রাজ্য সীমা কিছু কিছু বৃদ্ধি করেন।

আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন অসামান্য প্রতিভাবান লোক ছিলেন। তাঁর বংশ ও পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিংবদন্তী মতে, তিনি

আরবদেশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আশরাফ, দুই ছেলে, অর্থাৎ সৈয়দ হোসেন এবং সৈয়দ ইউসুফকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশে আসেন এবং চাঁদ পাড়ায় অবস্থান করেন। বড় ভাই সৈয়দ হোসেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে এবং তাঁরা সৈয়দ পরিবারের লোক হওয়ায় স্থানীয় কাজী সৈয়দ হোসেনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। এর পর থেকে সৈয়দ হোসেন উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকেন এবং গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি সুলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে উজীরের পদে উন্নীত হন। সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহের উজীর থাকা কালে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং সুলতানের মৃত্যু হলে বা সুলতান নিহত হলে উজীর সৈয়দ হোসেন সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসন দখল করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করার অপবাদ আছে, অপবাদ সত্য হতে পারে, এবং সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলেও তাঁর পরিচয় তাঁর নিজের শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরাফ আল-হোসেনী, তিনি যে সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন তা তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি কোন রাজবংশের লোক ছিলেন না। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব গুণে এবং স্বীয় প্রতিভায় সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন, এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। হাবশী আমলে পরিস্থিতি যেরূপ খারাপের দিকে যায়, তাতে তিনি না হলেও অন্য কেউ হাবশীদের সরিয়ে সিংহাসনে বসতেন। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে নিজেই সিংহাসনে বসেন। এতে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিংহাসনে বসেও হোসেন শাহ সার্বিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন। তিনি দেশের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার কারণ বুঝতে পারেন। তিনি দেখেন যে হাবশী আমলের ছয় বৎসর কাল সময়ে জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ- সহ ৫ জন সুলতান ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করেন এবং দেখেন যে হাবশীরাই এর জন্য দায়ী। তিনি তাদের শাস্তি দেন, এমনকি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং অরাজকতা বন্ধ করেন। সুলতান হিসেবে তা তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। তিনি জানতেন যে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা চলতে থাকলে তাঁর রাজত্ব বেশিদিন টিকবেনা, যেমন হাবশিদের রাজত্ব টিকেনি। বিশৃঙ্খলা দমন করে হোসেন শাহ নতুনভাবে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি নিজ আত্মীয়স্বজন এবং অভিজাত লোকদের রাজপদে নিযুক্তি দেন। তিনি সৈয়দ, আফগান, মোগল ইত্যাদি বহিরাগতদের নিযুক্ত করে প্রশাসনকে শক্তিশালী করেন এবং সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। ফলে দেশে যেমন শান্তি ফিরে আসে প্রশাসনেও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ সুশাসনের ব্যবস্থা করে এবং জন হিতকর কাজ করে প্রজাদের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি দুঃস্থ-দরিদ্রদের উপকারের জন্য দেশে অনেক লঙ্গর- খানা স্থাপন করেন এবং অনেক রাস্তা নির্মাণ করেন। রাস্তাগুলো সৈন্য চলাচলের জন্য যেমন উপযুক্ত ছিল, সাধারণ লোকের চলাচল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও সুযোগ বৃদ্ধি করত। তিনি স্থানে স্থানে জলাশয় এবং পুল নির্মাণ করেন। পশ্চিম বাংলার উচ্চ ভূমিতে জলাশয় খননের প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে, যেখানে পানির অভাব বেশি সেখানেই বিশেষে করে জলাশয় নির্মাণ করা হয়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি অনেক মসজিদ এবং বেশ কয়েকখানি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং সূফী দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। শয়খ নূর কুতব আলমের স্মৃতির প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি ছিল। হোসেন শাহের রাজধানী ছিল একডালায়। কথিত আছে যে সুলতান প্রত্যেক বৎসর পায়ে হেঁটে একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় এসে শয়খ নূর কতুব আলমের কবর জেয়ারত করতেন। তিনি শয়খ নূর কুতবের দরগায় লঙ্গর খানার জন্য এবং দরগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২২ খানি গ্রাম নিষ্কর এবং লাখেরাজ রূপে দান করেন। তিনি মুসলমান আলেমদের সম্মান করতেন এবং তাঁদের ধর্মীয় কাজের জন্য পুরস্কৃত করতেন। তিনি মুহাম্মদ বিন ইয়াজদান বখশ নামক একজন মুসলিম পণ্ডিতকে সম্মানিত করেন। এই মুসলিম পণ্ডিত সুলতানের কোষাগারের জন্য সহীহ বোখারী (বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ) নকল করেন।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন। হিন্দু কর্মচারীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন এবং হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের পোষকতা করতেন। তাঁর সময়ে অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু অফিসারের নাম পাওয়া যায়। রূপ এবং সনাতন নামক দুই ভাই তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। রূপ ছিলেন দবীর খাস বা প্রধান সচিব এবং সনাতন ছিলেন সাকের মালিক। তাঁদের বড় ভাই রঘুনন্দন এবং ছোট ভাই বল্লভও ছিলেন উচ্চ পদের অধিকারী। তাঁদের ভগ্নিপতি শ্রীকান্তও ছিলেন সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। তিনি হাজিপুর থেকে ঘোড়া কিনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। কেশব ছত্রী ছিলেন সুলতানের দেহরক্ষীদের নেতা। সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের অধিকারী, বোধহয় কোতোয়াল। মুকুন্দ দাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা রাজবৈদ্য। তা ছাড়াও রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরন্য দাস, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী ইত্যাদি আরো অনেক হিন্দু কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে, হোসেন শাহের সময়ে রাজ সরকারে হিন্দু অফিসারদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। তাঁর সময়ে 'সহীহ বোখারী' অনুলিখন করার কথা আগে বলা

হয়েছে। মীর আলাভী নামক আর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ফারসি ভাষায় ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে একখানি বই লিখেন এবং হোসেন শাহের নামে উৎসর্গ করেন। হোসেন শাহের রাজসভার অনেক অমাত্য কবি ছিলেন। যেমন রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন ইত্যাদি। তাঁদের হোসেন শাহ উচ্চ পদ বা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন, কেশব ছত্রী এগুলো হোসেন শাহের দেয়া উপাধি। শুধু হোসেন শাহ যে হিন্দু কবিদের উপাধি দেন বা পৃষ্ঠপোষণ করেন তাই নয়, তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও কবিদের উৎসাহিত করতেন। চট্টগ্রামের পরাগল খান ও ছুটি খান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন এবং ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব অনুবাদ করেন। হোসেন শাহের আমলে আরো দুইটি বই রচিত হয়, বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসা বিজয় এবং বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল বা পদ্ম পুরাণ কাব্য। বিপ্রদাস পিপলাই লেখেন পশ্চিম বঙ্গে এবং বিজয়গুপ্ত লেখেন বরিশালে বসে। উভয়েই রাজধানীর বাইরে কাব্য রচনা করেন। উভয়ে হোসেন শাহের উল্লেখ করেছেন, বিজয় গুপ্ত হোসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' এবং ইত্যাকার উপাধিতে ভূষিত করেন। অতএব সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন বিদ্বান লোক ছিলেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, মুসলিম বিদ্বান ও আলিমদের পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করেন এবং হিন্দু কবিদেরও পৃষ্ঠপোষণ করেন।

শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তিনি নদীয়ায় ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাংলার ধর্মীর ইতিহাসে এক বিপ্লব আনয়ন করেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। বৈষ্ণবেরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে মেনে নেয়। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণদের বর্ণ বৈষম্য তুলে দিয়ে উচ্চ-নীচ সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন এবং ভেদাভেদ তুলে দেন। ফলে শত শত লোক তাঁর ভক্ত হয়ে উঠে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা ছিল প্রেম, এবং কৃষ্ণের নাম জপ করা। সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের সময়ে তিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করতেন। তিনি বিনা বাধায় ধর্ম প্রচারের সুযোগ পান। সুলতান হোসেন শাহ ঘোষণা করনে যে চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারে বা বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনে যেন কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা না হয়। হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মকর্তাদের অনেকেই চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। এতে অন্য ধর্মের প্রতি হোসেন শাহের উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য চরিত গ্রন্থে আভাষ পাওয়া যায় যে, হোসেন শাহ চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

হোসেন শাহ একজন মহৎ ও দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি জৌনপুরের সিংহাসনচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে স্বীয় রাজ্যে আশ্রয় দেন। এর ফলে দিল্লীর

সুলতান সিকান্দর লোদী বাংলার সুলতানকে আক্রমণ করেন, কিন্তু বাংলার সুলতান যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও শর্কী সুলতানকে আশ্রয় দেন। কিন্তু বাংলার সুলতানের কৃতিত্ব এই যে, তিনি সফলভাবে দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং দিল্লীর সুলতানকে চুক্তি-সম্পাদন করে ফিরে যেতে হয়। হোসেন শাহ একজন সফল যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাজ্যের চতুর্দিকে উড়িষ্যা, কামতা-কামরূপ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম অর্থাৎ সকল সীমান্তে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এই যে, তাঁর সকল যুদ্ধ বাংলার সীমান্তের বাইরে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ অনেক যুদ্ধ করতে হলেও তাঁর নিজের রাজ্য অক্ষুন্ন থাকে এবং তিনি বিভিন্ন দিকে কিছু কিছু রাজ্য দখল করে নিজ রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। পশ্চিম দিকে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী ক্ষমতাবান হলেও সেই দিকেও হোসেন শাহের রাজ্য সীমানা বৃদ্ধি পায়।

হোসেন শাহ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। পূর্ববর্তী সময়ের সকল অশান্তি ও অরাজকতা দূরীভূত হয়। এটাও তাঁর একটা বড় কৃতিত্ব। দেশে তিনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন, স্থাপত্য শিল্পেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের যেমন উৎসাহিত করেন, হিন্দু কবিদেরও সেইরূপ পৃষ্ঠপোষণ করেন। উচ্চপদে নিযুক্ত তাঁর অনেক কর্মকর্তাও সাহিত্য ও কাব্য চর্চা করেন। তাঁর ধর্মমত ছিল উদার, হিন্দু মুসলিম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করে, সকলের সম অধিকার নিশ্চিত করে তিনি দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি এখনো কিংবদন্তীর নায়ক। হোসেন শাহ বলতে একজন উদার, মহৎ, জ্ঞানীগুণী এবং ন্যায় পরায়ণ সুলতানকে বুঝায়। এই মহান নরপতি ২৬ বৎসর রাজত্ব করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ ঃ

আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্র ছিল, নসরত শাহ সিংহাসনে বসে ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাদের বৃত্তি বাড়িয়ে দেন। সিংহাসনে বসেই তিনি চতুর্দিকে সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং সীমান্ত চৌকিসমূহ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে হোসেন শাহ সারা উত্তর বিহার দখল করে সারন পর্যন্ত জয় করেছিলেন। হোসেন শাহের শিলালিপি এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। দিল্লীতে সিকান্দর লোদীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ইবরাহীম লোদী সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার মত যোগ্য শাসক ছিলেননা। আফগান অমাত্যদের বশে রাখতে না পারায় দিল্লীতে শান্তি বিঘ্নিত হত। দিল্লীর অশান্ত পরিস্থিতি নসরত শাহের জন্য সুখকর ছিল না। তিনি পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেন।

তিনি ত্রিহুতে হোসেন শাহের জামাতা ও তাঁর অমাত্য আলা-উদ-দীন ও মখদুম আলম বা শাহ আলমকে ত্রিহুত ও হাজীপুরে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এইভাবে প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা করলেও বিপদ আসে অন্যদিক থেকে।

ভারতের ইতিহাসে এক নতুন শক্তির উদয় হয়, এই নতুন শক্তি হল মোগল সম্রাট বাবর। তিনি ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী সুলতান ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেন এবং দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নিতে থাকেন। পরাজিত আফগান সেনাপতি সেনানায়কেরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে তারা বিহারে চলে আসে এবং দক্ষিণ বিহারকে কেন্দ্র করে লোহানী ফর্মুলী বংশীয় আফগানেরা স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। মোগল আফগান দ্বন্দে বাংলার সুলতান নসরত শাহের তাৎক্ষণিক কোন ক্ষতি না হলেও নসরত শাহেরও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, নসরত শাহ আফগানদের সহযোগিতায় মোগলদের বিরুদ্ধে আঁতাত বা বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পান। কিন্তু কথাটা সত্য নয়, নসরত শাহ একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিকের মত গায়ে পড়ে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে রাজী ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অবস্থার পর্যালোচনা করেন। কিন্তু বাবরও একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, নসরত শাহ না চাইলেও আফগানেরা তাঁর রাজ্যে আশ্রয় নেবেন। নসরত শাহ গোপনে মানবতার খাতিরে আশ্রিত আফগানদের সাহায্যও করেন। বাবর নসরত শাহের নিকট দূত পাঠিয়ে মোগল-আফগান দ্বন্দে নসরত শাহের মনোভাব জানতে চান। আফগানদের সম্পূর্ণ দমন করতে হলে বাবরকে নসরত শাহের রাজ্যের কিছু অংশের উপর দিয়ে গমনাগমনের প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই বিশেষ করে বাবরকে নসরত শাহের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছার প্রয়োজন ছিল। নসরত শাহ দীর্ঘ দিন উত্তর না দিয়ে বাবরের দূতকে গৌড়ে রেখে দেন। নসরত শাহের সরাসরি হাঁ বা না বলার বিপদ ছিল, নসরত শাহ বাবরকে তাঁর রাজ্য সীমায় বিচরণ করতে দিলে তাঁর স্বার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর, আবার না দিলে বাবর অবশ্যই তাঁকে আক্রমণ করবে। দীর্ঘ দিন চুপ করে থেকে বাবরের ধৈর্য্যচুতির সময় আসলে নসরত শাহ হাঁ সূচক জবাব দেন, অর্থাৎ তিনি আফগানদের সাহায্য করবেন না এবং বাবরকে তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে সৈন্য পরিচালনার আপত্তি না থাকার কথা জানান। কিন্তু উত্তর পাওয়ায় আগেই বাবর নসরত শাহের এলাকা আক্রমণ করেন এবং বাংলার সৈন্যদের পরাজিত করেন। বাবর এতেই সন্তুষ্ট হয়ে আফগানদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে যান। নসরত শাহও বেঁচে যান। কিন্তু ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পরে নসরত শাহ সংবাদ পান যে, হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। নসরত শাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের নিকট দূত পাঠান। বাহাদুর শাহও নসরত শাহের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের আগে নসরত শাহের মৃত্যু হয়।

নসরত শাহের সময়ে ত্রিপুরার রাজা দেব মাণিক্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। নসরত শাহ্ আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং চট্টগ্রাম টাকশাল থেকে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন। চট্টগ্রামে নসরত শাহের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। নসরত শাহ্ তাঁর রাজত্বের শেষ বর্ষে আসাম আক্রমণ করেন। আক্রমণের কারণ জানা যায় না, কিন্তু আসামের সূত্র অহোম বুরঞ্জীতেই তা জানা যায়। এই সূত্র মতে মুসলিম সেনাপতি তুবরক এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসাম আক্রমণ করেন। আসামের সৈন্যরা বীরবিক্রমে বাধা দিলেও তারা পরাজিত হয়। আসামের রাজপুত্রসহ বেশ কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ নিহত হয়। নসরত শাহ্ জয়লাভ করেন কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হয়। আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ বৎসরে পর্তুগীজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসে, নসরত শাহের রাজত্ব কালে বেশ কয়েকজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন আসে, কিন্তু পর্তুগীজরা বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করার আগে নসরত শাহের মৃত্যু হয়।

নসরত শাহ্ একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পূর্ণ রাজ্য অক্ষুন্ন রাখেন, বরং কোন কোন সীমান্তে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের কূটনীতিক-ছিলেন। প্রধানত কূটনীতির দ্বারা তিনি বাবরের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ এড়াতে সক্ষম হন। তিনি আফগানদের গোপনে সমর্থন দেন, এবং বাবরের দূতকে দীর্ঘদিন উত্তর না দিয়ে বাবরের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। অবশেষে খরিদ নামক স্থানের অধিকার নিয়ে বাবরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, বাবরনামাই এই বিষয়ে এক মাত্র সূত্র। এই সূত্রে নসরত শাহ্ পরাজিত হন কিন্তু বর্ষাকাল এসে গেলে বাবর নসরতের সঙ্গে চুক্তি করে ফিরে যান। সে যাই হোক নসরত শাহ্ আফগানদের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে নসরত শাহের ক্ষতি হতে পারত। নসরত শাহের বলিষ্ঠ কূটনীতি-ই তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করে।

নরসত শাহ্ একজন উদার এবং দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে মহানুভবতার পরিচয় দেন। সমসাময়িক কালে এইরূপ মহানুভবতা দেখা যায় না। নসরত শাহ্ একজন নিষ্ঠাবান সুলতান ছিলেন। তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত বড় সোনা মসজিদ, কদম রসূল ভবন ইত্যাদি স্থাপত্য শিল্পে অপূর্ব নিদর্শন। কদম রসূল ভবনে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র পায়ের প্রতিকৃতি সংরক্ষিত আছে। তাঁর আদেশে আহমদ মজল্লদ খান বিন মাহমুদ (মাহমুদের পুত্র) নামক একজন ফারসি ভাষার পণ্ডিত ইসকান্দার নামা নামক একখানি পুস্তক অনুলিখন করেন। লেখক নিশ্চিয়ই তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন। নসরত শাহ্ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কবিদের উৎসাহিত করেন। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে তৎকালীন সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র নসরত শাহেরও প্রশস্তি করেন। যুবরাজের নামের সঙ্গে শাহ্ উপাধি দিয়ে বলেন, "পুত্র সম রক্ষা করে সকল পরজা"। কবি শেখর (বা কবিরঞ্জন বা বিদ্যাপতি) নামক একজন

পদকর্তার ভণিতায়ও নসরত শাহের নাম পাওয়া যায়। অতএব নসরত শাহ্ যেমন সাহসী ও উদার নরপতি ছিলেন তেমনি শিল্প সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল এবং ফারসি ও বাংলা সাহিত্যের পোষকতা করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সুশাসনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন।

নসরত শাহ্ ১৩ বৎসর রাজত্ব করে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। কথিত আছে যে, গৌড়ের একনাকা নামক স্থানে পিতার সমাধি থেকে ফিরবার পথে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

সুলতান আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ ঃ

নসরত শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সুলতান আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। পিতা ও পিতামহের মতো আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে দ্বিজ শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর', বা 'কালিকা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তিনি যুবরাজ থাকাকালে কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দেন। এই সুলতানের মাত্র দু'খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, দু'খানিই একই বৎসর বর্ধমানের কালনায় উজীর ও সেনাপতি উলুঘ মসনদ খান উৎকীর্ণ করেন। তাঁর মুদ্রা এবং শিলালিপি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তিনি মাত্র বৎসর খানিক (নয় দশ মাস) রাজত্ব করেন। তাঁর পিতৃব্য এবং পরবর্তী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ ঃ

আগে বলা হয়েছে যে নসরত শাহ্ তাঁর ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁদের বৃত্তি বৃদ্ধি করেন। গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ বড় ভাই এর সময়ে আমীর এর মর্যাদা লাভ করেন। মাহমুদ শাহ্ নসরত শাহের সময়ে পূর্ণ রাজকীয় উপাধি নিয়ে মুদ্রাও জারী করেন। এতে মনে হয় নসরত শাহ্ মাহমুদ শাহ্কে রাজ্য শাসনে নিজের অংশীদার করে নেন। কিন্তু এতে মাহমুদ শাহের মনে উচ্চ অভিলাষ জাগে এবং তিনি সিংহাসনে বসার জন্য উদগ্রীব হন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে নসরত শাহের পরে তিনি সুলতান হবেন যদিও এরূপ ভাবার কোন কারণ দেখি না। আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহ্ সিংহাসনে বসাতেই দেখা যায় যে নসরত শাহের উপযুক্ত পুত্র ছিল, এবং উপযুক্ত পুত্রের উপস্থিতিতে পিতৃব্য সিংহাসনে বসার আশাও করবে কেন? সে যাই হোক মাহমুদ শাহ্ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে ভাইপো আলা-উদ-দীন ফীরূজকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসেন। এর ফলে সিংহাসন আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ শাহ্ শত্রুর সৃষ্টি করেন এবং নিজ রাজ্যে অন্তর্বিরোধের বীজ বপন করেন। তাঁর নিকট আত্মীয়

হাজিপুরের গবর্নর মখদুম আলম তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মখদুম আলম বিহারের শাসনকর্তা জালাল খানের অভিভাবক শের খানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

এই পরিস্থিতিতে মাহমুদ শাহ মুঙ্গেরের গবর্নর কুতব খানকে বিহার জয়ের জন্য পাঠান, উদ্দেশ্যে শের খানকে দমন। শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে কুতব খান নিহত হন এবং বিস্তর ধন সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র শের খানের হস্তগত হয়। মখদুম আলম শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে কুতব খানকে সাহায্য না করায় মাহমুদ শাহ মখদুম আলমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠান। মখদুম আলম পরাজিত ও নিহত হন কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ শের খানের নিকট পাঠাতে সক্ষম হন। অতএব ভাইপোকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে মাহমুদ শাহ ক্রমে ক্রমে শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শের খান ছিলেন সাসারামের জাগীরদারের পুত্র। ঐ সময়ে মোগলরা আফগানদের পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে। শের খান বিহারের শাসনকর্তা জালাল খানের অভিভাবক হলেও জালাল খানের স্বগোত্রীয় লোহানীরাই শের খানের বিরোধিতা করত। তাই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শের খানকে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে শের খানের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ হয়। পরে শের খান আরো শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ খুঁজতে থাকেন এবং শীঘ্রই সেই সুযোগ এসে যায়।

লোহানীদের ষড়যন্ত্রে শের খানের সঙ্গে জালাল খানের শত্রুতা শুরু হয়। জালাল খান তাঁর অভিভাবক শের খানের অভিভাবকত্বে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে চলে আসেন। একে একটি বড় সুযোগ মনে করে মাহমুদ শাহ তাঁর সেনাপতি কুতব খানের ছেলে ইবরাহীম খানকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিহার জয় করতে পাঠান। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুরুজগড় নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। শের খানের তুলনায় ইবরাহীম খানের অনেক বেশি সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও শের খানের কৌশলের কাছে অনভিজ্ঞ ইবরাহীম খান পরাজিত হন। মাহমুদ শাহের জন্য এর ফল হয় মারাত্মক, সুরুজগড়ের যুদ্ধে পরাজয়ে বাংলার স্বাধীন মুসলিম সলতনতের পতনের সূচনা হয়, এবং অন্যদিকে একে শের খানের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা যায়। এতদিন পর্যন্ত মাহমুদ শাহ শের খানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু এখন থেকে শের খানই মাহমুদ শাহকে আক্রমণ করতে থাকেন। তিনি একে একে সারা বিহার দখল করে ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন এবং গৌড়ের দূর্গ অবরোধ করেন। মাহমুদ শাহ উপায় না দেখে অত্যন্ত নির্বোধের মত কাজ করেন, তিনি সেনাপতিদের নিষেধ স্বত্ত্বেও ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শের খানকে সন্তুষ্ট করেন এবং শের খান বিহারে ফিরে যান। মাহমুদ শাহ ভীরু না হলে শের খানকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বিহারস্থ তাঁর এলাকা হাতছাড়া হলেও সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর অধীনে ছিল, তাঁর রণতরীগুলোও অক্ষত ছিল, পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনরাও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। তিনি ৩/৪ মাস দূর্গে অবরুদ্ধ থাকতে

পারলে বর্ষা আসলে শের খানকে নিজের নিরাপত্তার জন্যই ফিরে যেতে হত। কিন্তু মাহমুদ শাহ শের খানকে অর্থ দিয়ে তাঁর লোভ বাড়িয়ে দেন।

শের খান ফিরে যান বটে, কিন্তু তিনি মাহমুদ শাহ প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধেই চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাহমুদ শাহও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং মোগল সম্রাট হুমায়ুন ও গোয়ার পর্তুগীজ গবর্নরের নিকট থেকে সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন। শের খানও এর খবরাখবর রাখতেন এবং কোন দিকে থেকে সাহায্য আসার আগে মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখলের পরিকল্পনা নেন। শের খান ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে গৌড় আক্রমণ করেন এবং মাহমুদ শাহর নিকট থেকে বার্ষিক কর বাবদ বিরাট অংক দাবী করেন। মাহমুদ শাহ এইরূপ কোন কর দেওয়ার অঙ্গীকার করেননি। তাই তিনি শেরখানের এই অদ্ভুত দাবী মেটাতে অস্বীকৃতি জানান। প্রকৃতই শের খানের সঙ্গে মাহমুদ শাহের এইরূপ কোন চুক্তি ছিল না। তবে যুদ্ধের জন্য কোন ওজর বা কারণের প্রয়োজন হয় না। হুমায়ুন বা পর্তুগীজদের কোন সাহায্য আসার আগে শের খান গৌড় জয়ের সংকল্প করেন। এটাই শের খানের একমাত্র ওজর বা অজুহাত। যুদ্ধে মাহমুদ শাহ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে গৌড় ছেড়ে বিহারের দিকে পলায়ন করেন। তিনি নিজে এবং তাঁর দুই ছেলে আহত হন। মাহমুদ শাহ খলগাঁও-এ তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকে দুঃখে মৃত্যু বরণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে শের খানের হাতে গৌড়ের পতন হয়।

গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলায় পর্তুগীজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন। আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের সময়ে পুর্তুগীজরা প্রথম চট্টগ্রামে আসে, কিন্তু হোসেন শাহ এবং নসরত শাহের সময় তারা বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়। মাহমুদ শাহের সময়েও হয়তো পর্তুগীজদের চেষ্টা ব্যর্থ হত, কিন্তু মাহমুদ শাহ শের খানের বিরুদ্ধে পুর্তুগীজদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করায় তিনি পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন ; শুধু বাণিজ্যকঠি নয়, পর্তগীজরা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দরে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক আদায়ের ক্ষমতাও লাভ করে। পর্তুগীজরা কিছু দিন বাণিজ্য করে কিন্তু পরে তারা বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ভাইপোকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে এবং শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ দিলেও মাহমুদ শাহের মানবিক গুণও কম ছিল না। তাঁর উৎকীর্ণ মুদ্রা বেশ পাওয়া যায় এবং এই পর্যন্ত তাঁর ৮ খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। নওগাঁ জিলার ধোরাইলে প্রাপ্ত শিলালিপিখানির ভাষা সংস্কৃত, লিপি বাংলা। বাংলার অন্য কোন সুলতানের শিলালিপিতে এই ভাষা বা লিপি ব্যবহার করা হয়নি। তাঁর শিলালিপিতে মসজিদ এবং সূফীদের মাযার নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। একখানি শিলালিপি এবং

কিছু মুদ্রায় 'বদর শাহী' উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি বদর শাহ নামক একজন পীরের ভক্ত ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে আব্দুল বদর মাহমুদ শাহের জনপ্রিয় নাম। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদের ভণিতায় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের নাম পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিদ্যাপতি সুলতানের অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর মাহমুদ শাহের সময়ে তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন বলে মনে হয়। কবি সুলতানের অধীনে চাকুরি করতেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা বিহারের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র মুঙ্গের জিলা এবং উত্তরে হাজিপুর পর্যন্ত তাঁর অধিকারে ছিল। এদিকে সারা বাংলাদেশ, দক্ষিণে মাতামুহুরী নদী পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। পর্তুগীজ বিবরণে দেখা যায় যে, উত্তর চট্টগ্রামে হামজা খান এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে খোদাবখশ খান নামে মাহমুদ শাহের দুইজন গবর্নর ছিলেন। এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও মাহমুদ শাহ তা রক্ষা করতে পারেননি, শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিজে সপরিবারে ধ্বংস হন। তাঁর বংশের রাজত্বও লোপ পায়।

হোসেন শাহী শাসন সুলতানী আমলের স্বর্ণযুগ ঃ

হোসেন শাহী আমল বাংলাদেশের সুলতানী আমলের স্বর্ণযুগ রূপে বিবেচিত হয়। এই বংশের ৪ জন সুলতান—আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ, নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ, আলা-উদ-দীন ফীরূজ-শাহ এবং গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ, সকলে মিলে মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। হোসেন শাহ হাবশীদের দমন করে এবং প্রয়োজনে হাবশীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে দেশকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। শেষ দিকে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের লোভের ফলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। অবশ্য এর ফলে বংশের স্বাধীনতাও লোপ পায়। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত শান্তি বজায় থাকে এবং দেশ অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হয়।

হোসেন শাহী আমলে বাংলাদেশের উন্নতি অগ্রগতির প্রধান প্রমাণ বাংলার বাইরে রাজ্য বিস্তার। হোসেন শাহ চতুর্দিকে সীমান্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এইযুদ্ধের কোনটিই বাংলার মাটিতে হয়নি, বরং বাংলার বাইরে হয়। এতে প্রত্যেক সীমান্তেই কিছু কিছু সীমান্ত বৃদ্ধি পায়। হোসেন শাহ কামতা-কামরূপ জয় করেন। আসামে তিনি বাধা প্রাপ্ত হন, উড়িষ্যা সীমান্তে রাজ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁর রাজ্যের সর্বপেক্ষা বেশি বিস্তৃতি লাভ করে পশ্চিম সীমান্তে বিহারের দিকে। দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীও হোসেন শাহের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছতে বাধ্য হন। প্রায় অর্ধেক বিহার গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের রাজত্ব কাল পর্যন্ত বাংলার সুলতানের অধীনে থাকে। সারা

সুলতানী আমলে হোসেন শাহী সুলতানদের অধীনেই বাংলাদেশ সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সময়ে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি সাধন করে। হোসেন শাহী আমলের অনেক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আমলের শিলালিপির সংখ্যা সারা সুলতানী আমলের শিলালিপির তুলনায় অধিক। এতে বোঝা যায় যে, এই আমলে মসজিদ, মাদ্রাসা, পুল, জলাশয় ইত্যাদি অধিক পরিমাণে নির্মিত হয়। আর্থিক উন্নতি না হলে প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণে এত ব্যয় করা সম্ভব হত না। এই সময়ে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসে। পর্তুগীজ পরিব্রাজক ডুয়ার্টে বারবোসার বিবরণে দেখা যায় যে, দেশে প্রচুর কৃষি পণ্য এবং শিল্পপণ্য উৎপাদিত হত, শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প ছিল উন্নত মানের। পর্তুগীজ ছাড়া ইরানী, আরবী, এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় বাণিকেরাও চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল।

হোসেন শাহী সুলতানেরা সকলে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁরা মুসলমান সূফী সাধকদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের সম্মানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন, সূফীদের মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। মসুলিম সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলেন। আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ শয়খ নূর কুতব আমলের মাযারে লঙ্গরখানা চালু রাখা ও মাযারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমিদান করেন। তিনি শয়খ নূর কুতব আলমকে এত ভক্তি করতেন যে প্রতি বৎসর তিনি পায়ে হেঁটে রাজধানী একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় এসে দরগাহ জেয়ারত করতেন। রাসূল (দঃ) এর পদচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য হোসেন শাহ একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন এবং নসরত শাহ কদম রসূল নামে একটি সুদৃশ্য ভবন নির্মাণ করেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ বদর শাহ নামক একজন পীরের ভক্ত ছিলেন, এই পীরের নামানুসারে তিনি বদর শাহী উপাধি নেন।

হোসেন শাহী সুলতানেরা বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হোসেন শাহের সময়ে সৈয়দ মীর আলভী ফারসি ভাষায় 'হেদায়েত-উর-রামী' নামে ধনুর্বিদ্যা সম্পর্কে একখানি বই লিখেন এবং সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। হোসেন শাহের রাজধানী একডালায় বসে মুহাম্মদ বিন ইয়াজদান বখশ সহীহ বুখারী (বুখারী শরিফ) অনুলিখন করেন। তিনি সুলতানের প্রশংসা করেন। নসরত শাহের আদেশে আহমদ মজল্লদ খান ইসকানদার নামা নামক পুস্তক ফারসি ভাষায় লেখেন এবং সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। হোসেন শাহী সুলতানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালি কবিদেরও পোষকতা করেন। হোসেন শাহের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন, রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, যশোরাজ খান কবি ছিলেন। তাঁর সময়ে বিপ্রদাস বিপলাই 'মনসা বিজয়' কাব্য এবং বিজয় গুপ্ত 'মনসা মঙ্গল' বা 'পদ্ম পুরাণ' কাব্য লেখেন। হোসেন শাহের দেখাদেখি

প্রাদেশিক শাসক পরাগল খান এবং তৎপুত্র ছুটি খানও কাব্য প্রেমিক ছিলেন। পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' এবং ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' রচনা করেন। নসরত শাহও কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তার সময়ে সঞ্জয় মহাভারত লেখেন। ছুটি খান হোসেন শাহের সঙ্গে সঙ্গে নসরত শাহের প্রশংসাও করেন। সুলতান আলা-উদ-দীন ফীরুজ শাহ্ যুবরাজ থাকা কালে দ্বিজ শ্রীধরকে বিদ্যাসুন্দর বা কালিকা মঙ্গল কাব্য রচনার আদেশ দেন। বিদ্যাপতি একটি পদে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের প্রশংসা করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের সময়ে লিখেন। সম্ভবত তিনি সুলতানের অধীনে চাকুরি করতেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ আগে থেকে শুরু হলেও হোসেন শাহী আমলে বাংলা সাহিত্য রাজদরবারে প্রবেশ করে এবং রাজার পোষকতায় বাংলা কাব্য রচিত হওয়া শুরু করে।

হোসেন শাহী সুলতানেরা এক উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই বংশের সুলতানেরা হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দান করেন। হোসেন শাহের সময়ের অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উজীরের মর্যাদায় নিযুক্ত ছিলেন। রূপ এবং সনাতন নামক দুই ভাই হোসেন শাহের প্রিয় পাত্র ছিলেন। রূপ ছিলেন দবীর খাস (প্রধান সচিব) এবং সনাতন ছিলেন সাকের মালিক। রূপ সনাতনের অনেক আত্মীয়ও উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া পুরন্দর উজীর, অনুপ টাকশালের কর্তা এবং মুকুন্দ দাস ছিলেন রাজ-চিকিৎসক। হোসেন শাহের দেহরক্ষীদের নেতাও ছিলেন কেশব ছত্রী নামক একজন হিন্দু। এতে বোঝা যায় হোসেন শাহী সুলতানেরা হিন্দু রাজকর্মচারীদের কিরূপ বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া রামচন্দ্র খান, হিরন্য দাস এবং গোবর্ধনের মত লোকেরা সামন্ত বা আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। এই সকল উচ্চপদস্থ উজীর এবং অমাত্য বা সামন্ত শাসনকর্তা ছাড়াও অনেক হিন্দু কর্মচারী হোসেন শাহী আমলে রাজকাজে নিযুক্ত ছিল। বাংলা লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় মুসলমানদের প্রথম শিলালিপিও হোসেন শাহী আমলে উৎকীর্ণ হয়। নওগাঁর ধোরাইল নামক স্থানে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের আমলে তা উৎকীর্ণ হয়। চৈতন্যদেবের প্রতি মনোভাবেও হোসেন শাহের উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। তিনি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন, অর্থাৎ তিনি প্রায় সারা হোসেন শাহী আমলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। হোসেন শাহ্ আদেশ দেন যেন তাঁর প্রচার কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। রূপ সানাতন প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। হোসেন শাহের পরবর্তী সুলতানেরাও চৈতন্যদেবের কাজে বাধার সৃষ্টি করেননি।

স্থাপত্য শিল্পেও হোসেন শাহী সুলতানেরা মূল্যবান অবদান রাখেন। সেই আমলে নির্মিত ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, কদম রসূল ভবন এবং আরো অন্যান্য অনেক মসজিদ সুলতানদের কীর্তি বহন করে। হোসেন শাহী সুলতানেরা অনেক রাস্তা ও পুল নির্মাণ করেন এবং অনেক জলাশয় খনন করেন। জলাশয়গুলো বীরভূম বর্ধমান এলাকায় খনন করা হয় যেখানে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব থাকে। অতএব হোসেন শাহী সুলতানেরা আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং অখণ্ডতা বজায় রেখে সীমান্ত বৃদ্ধি করে দেশে শিল্প সাহিত্যের প্রসার ঘটান। তাঁরা উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং হিন্দু মুসলিম সকলে রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেন। এক কথায় বলতে গেলে হোসেন শাহী সুলতানেরা সর্ব বিষয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেন। হোসেন শাহী আমল বলতে এমন এক শাসনকাল বোঝায়, যখন বাংলাদেশ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সকল কর্মকাণ্ডে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করে। তাই হোসেন শাহী যুগ সুলতানী আমলের স্বর্ণযুগ।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলায় আফগান শাসন

শের খান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে গৌড় জয় করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মোগলদের হাতে পরাজিত হলে বাংলার আফগান শাসনের অবসান হয়। অবতএব আফগানরা ৩৮ বৎসর বাংলায় শাসন করে, মধ্যে মাত্র নয় মাস মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকারে রাখেন। শের খান যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। অতএব শের শাহ্ ও তাঁর ছেলের সময়ে বাংলাদেশ দিল্লীর একটি প্রদেশে পরিণত হয়, কিন্তু শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহের (সলীম শাহ নামেও পরিচিত) মৃত্যুর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং সেই থেকে মোগল বিজয় পর্যন্ত স্বাধীন থাকে।

শের শাহ্ কর্তৃক বাংলা বিজয়ের সংবাদ পেয়ে দিল্লীর মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করেন। বাহ্যত হুমায়ুন পরাজিত বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্যার্থে আসেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শের শাহকে দমন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। পূর্বাঞ্চলে একজন শক্তিশালী সুলতান শের শাহ্ মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মাহমুদ শাহ আঘাতজনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেন। হুমায়নের আক্রমণের মুখে কৌশলগত কারণে শের শাহ্ পশ্চাদপসরণ করেন। হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন, এবং সেখানে আরাম আয়াসে দিন কাটাতে থাকেন। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথে শের শাহ হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে ভারত থেকে বিতাড়িত হন। শের শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং বাংলাদেশকে দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং খিজির খানকে বাংলার গবর্নর নিযুক্ত করে নিজে সাম্রাজ্যের অন্যদিকে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

শের শাহ্ যখন পাঞ্জাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন সংবাদ পান যে বাংলার গবর্নর খিজির খান বাংলার পূর্ববর্তী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের মেয়ে বিয়ে করেন এবং সুলতানদের রীতি মত টোকি বা উচ্চ মঞ্চে বসেন। সংবাদ পেয়ে শের শাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি আশা করেননি যে খিজির খান তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তিনি ক্ষিপ্তগতিতে বাংলায় চলে আসেন এবং খিজির খানকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে কারারুদ্ধ করেন। প্রায় একই সময়ে বারবক শাহ্ নামক একজন লোক স্বাধীন মুদ্রা জারী করেন, তিনি সুলতান উপাধি নেন। তাঁর উৎকীর্ণ দুইটি মুদ্রা কিশোরগঞ্জের যশোদল এবং সিলেটের সোনাখিরা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। শের শাহ্ তাঁকে দমন করার জন্য যুদ্ধ করেন কিনা জানা যায় না, তবে এর পরে বারবক শাহ্

নামধারী কোন সুলতানের মুদ্রা আবিষ্কৃত না হওয়ায় ধারণা করা যেতে পারে যে, শের শাহ তাঁকেও দমন করেন।

খিজির খানের বিদ্রোহ দমন করে শের শাহ বাংলার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। ইতিপূর্বে বাংলার ভৌগোলিক সীমা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। শের শাহ বাংলার সুলতানের বিহারের অংশ, অর্থাৎ ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং হাজিপুরসহ বিশাল এলাকার শাসন ভার বিহারের গবর্নরের অধীনে দেন এবং বাংলার পশ্চিম সীমানা তেলিয়াগড় দূর্গ এবং গিরিপথে নির্ধারণ করেন। শেরশাহ বাংলা প্রদেশের শাসনভার একজন গবর্নরের অধীনে একক ভাবে না রেখে সারা প্রদেশকে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করেন। এইসব এলাকায় নিযুক্ত অফিসার সকলে একই মর্যাদার লোক ছিলেন, কেউ কারও অধীনে ছিলেন না। সুলতান নিজেই তাঁদের নিয়োগ দান করতেন এবং তাঁরা সকলে নিজ নিজ-কাজের জন্য সুলতানের নিকট দায়ী থাকতেন। শের শাহ সারা বাংলাকে ১৯টি ভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেক ভাগের নাম দেওয়া হয় সরকার। শের শাহের সময়ের কোন সূত্রে এই সরকারগুলোর নাম পাওয়া যায় না। তবে আকবরের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এদের নাম পাওয়া যায়।

সারা বাংলাকে ক্ষুদ্র আকৃতির প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করে শের শাহ দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি অতি পুরাতন সমস্যার সমাধান করেন। মুসলিম আমলের প্রথম থেকেই দেখা যায়, বাংলার গবর্নরেরা সুযোগ পেলেই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। রাজধানী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় বাংলার বিদ্রোহের সংবাদ দিল্লীতে পৌছতে অনেক সময় লাগত। সংবাদ পৌছার পরেও বিদ্রোহ দমনের জন্য দিল্লী থেকে সৈন্য পাঠানোও বেশ সময় সাপেক্ষ ছিল। তাই দিল্লীর সুলতানের চোখে ফাঁকি দিয়ে, বাংলার গবর্নরেরা শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পেত, এবং দিল্লীর পক্ষে বাংলার বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজ ছিল না। ছোট ছোট এলাকার শাসন কর্তারা একক ভাবে বিদ্রোহ করার মত শক্তিশালী ছিল না, আবার সকলে মিলে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনাও তেমন ছিল না। বরং কেউ বিদ্রোহ করলে অন্যরা সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশায় বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক এককে ভাগ করে শের শাহ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সকলের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য একজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীর প্রয়োজন অনুধাবন করেন। তাই তিনি কাজী ফজীলত (বা কাজী ফজীহত) নামে এক ব্যাক্তিকে আমিন নিযুক্ত করেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ এবং বিদ্বান লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটের কর্মকর্তার মধ্যে নীতির ক্ষেত্রে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। সুলতানের আদেশ যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তিনি দেখতেন এবং প্রশাসকদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি সেই বিষয়ে মতামত দিতে পারতেন। শের শাহ মূলত দিল্লীর সুলতান হলেও তিনি বাংলাদেশেই প্রথম ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের সোনারগাঁ

থেকে পাঞ্জাবের লাহোর পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেন। এই রাজপথের একটা নিয়মিত দূরত্বে তিনি পরপর সরাইখানা নির্মাণ করেন। সরাইখানাগুলো শের শাহের অপূর্ব কীর্তি, ডাক ব্যবস্থায় এবং পথচারীদের ভ্রমণে এগুলো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলো। শের শাহ একজন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন, মধ্যযুগে তাঁর মত প্রজাহিতৈষী এবং সফল শাসক আর দ্বিতীয়টি ছিলেন কিনা সন্দেহ। দিল্লীর সুলতান হলেও বাংলাদেশ তাঁর অধীনে থাকায় তাঁর সুশাসনের ফলাফল বাংলাদেশও ভোগ করে।

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ সূর (সলীম শাহ) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশে তিনি তাঁর পিতার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। তিনি আবার পূর্বের মত প্রাদেশিক শাসন গঠন করেন এবং তিনি তাঁর আত্মীয় মুহাম্মদ খান সূরকে বাংলার গবর্নর এবং সোলায়মান কররানীকে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত করেন। এই সময়ে বাংলার ভাটি এলাকায় (ঢাকা ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা-সিলেটের নিম্নাঞ্চল) সোলায়মান খান নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করেন। যতদূর জানা যায় সোলায়মান খান ছিলেন মূলত একজন রাজপুত, নাম কালিদাস গজদানী। কালিদাস গজদানীর পূর্ব কোন এক পুরুষ বাংলায় আসেন এবং রাজ সরকারের চাকুরি গ্রহণ করেন। কালিদাস গজদানী উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন এবং সুলতানের মেয়ে বিয়ে করেন। এই সূত্রে তিনি নিজেকে পরালোকগত সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের বৈধ উত্তরাধিকারী মনে করেন। তাই তিনি ইসলাম শাহ সূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইসলাম শাহ তাজ খান ও দরিয়া খান নামক দুই সেনাপতিকে সোলায়মানের বিরুদ্ধে পাঠান, সোলায়মান পরাজিত ও নিহত হন, তাঁর দুই ছেলে ঈসা ও ইসমাইলকে নির্বাসন দেয়া হয়। এই ঈসাই পরবর্তীকালের ঈসা খান মসনদ-ই-আলী, বারভূঁঞার নেতা। সেই কাহিনী পরে আসছে।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে বাংলার গবর্নর মুহাম্মদ খান সূর শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এদিকে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অমাত্যেরা ইসলাম শাহ সূরের ছেলে ফীরূজকে সিংহাসনে বসায়, কিন্তু ইসলাম শাহের শ্যালক মুবারিজ খান ফীরূজকে হত্যা করে মুহাম্মদ শাহ আদিল উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি আফগানদের দমন করতে পারলেন না, রাজদরবারেই খুনাখুনি হয়ে যায়। সে যাই হোক, এই সুযোগে শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন, পথে ছপপরঘাটা নামক স্থানে দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। তিনি পরাজিত হয়ে নিহত হন। শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ গাজী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর একটি মুদ্রায় আরাকান পাঠ করে কেউ কেউ মনে করে যে তিনি আরাকান জয় করেন। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিত।

শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ নিহত হলে অমাত্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটেই তাঁর পুত্রকে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। বাহাদুর শাহ প্রথমে

গৌড়ে তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন এবং তৎপর পিতৃহন্তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। মুহাম্মদ শাহ আদিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনানায়ক তাজ খান কররানী বাহাদুর শাহের সঙ্গে যোগ দেন। সুরুজগড়ের অদূরে ফতেহপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয় এবং মুহাম্মদ শাহ আদিল নিহত হন। বাহাদুর শাহ তাজখান কররানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নিজে গৌড়ে ফিরে আসেন।

এদিকে দিল্লীতে আবার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ মোগলদের বিতাড়ন করার উদ্দেশ্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু জৌনপুরস্থ মোগল সেনাপতি খান জামানের নিকট পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। বাহাদুর শাহের সময়ে আবদুর রহমান নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি মখজন-ই-গনজরাজ নামক ফারসি ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন। এর বিষয়বস্তু তসওওফ বা সূফীতত্ত্ব।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তখন রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শ্রীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর এক পুত্র সিংহাসনে বসেন, কোন সূত্রেই তাঁর নাম পাওয়া যায় না। এক সূত্র মতে তিনি কয়েকমাস রাজত্ব করার পরে গিয়াস-উদ-দীন নামক এক জবর দখলকারী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বৎসর খানিক পরে তাজ খান কররানী তাঁকে হত্যা করে কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কররানী বংশ :

তাজ খান কররানী ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। তাজ খান আফগানদের কররানী গোত্রের লোক, লোদী আমলে কররানীদের বিশেষ নাম শোনা যায়না কিন্তু বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে তাজ খান কররানী ও তাঁর ভাই সোলায়মান কররানী শের শাহের পক্ষে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে শের শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে তাঁরা উভয়ে বাংলায় ও উত্তর বিহারে জায়গীর লাভ করেন। তাজ খান শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন এবং ঐ সময়ে বাংলায় বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হন। ঐ সময়ে সোলায়মান কররানী বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হন। শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে দিল্লীতে গোলযোগ দেখা দিলে তাজ খান কররানী বাংলায় চলে আসেন এবং তাঁর অন্যান্য ভাই সোলায়মান, ইমাদ ও ইলিয়াসের সঙ্গে যোগ দেন। তাজ খান প্রথমে লুঠতরাজ করে বাংলার সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন কিন্তু পরে সুলতানের সঙ্গে সমঝোতা করে সুলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। গিয়াস-উদ-দীন নামক এক জবরদখলকারী সূর বংশের শেষ সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করলে তাজ খান জবরদখলকারীকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে তাজ খানের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই সোলায়মান কররানী গৌড়ের সিংহাসনে বসেন।

ইতিপূর্বেই সোলায়মান কররানী বিহারের গবর্নর ছিলেন। এখন বাংলার সিংহাসনে বসে তিনি বাংলা এবং বিহারের কর্তৃত্ব লাভ করেন। দিল্লীতে আফগানদের পতন এবং মোগলদের উত্থানের সেই গোলযোগপূর্ণ সময়ে তাঁকে বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিলনা তাই বাংলা বিহারে সোলায়মান কররানী আফগানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখন তাঁর প্রয়োজন ছিল ঠাণ্ডা মাথায় আফগানদের সংঘবদ্ধ করা এবং মোগলদের বিরুদ্ধাচারণ না করে স্বীয় ক্ষমতা সুসংহত করা। সৌভাগ্যবশত সোলায়মান কররানী অন্যান্য আফগানদের মত উগ্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ধীরস্থির। উত্তর ভারতে সকল আফগান রাজ্য হারা হয়ে ক্ষমতা হারিয়ে বাংলা বিহারের দিকে ছুটে আসে এবং সোলায়মানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে এবং সোলায়মান কররানীর ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি পররাষ্ট্র নীতিতে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন, তিনি মোগল শাসন প্রতিষ্ঠাকে ইতিহাসের আলোকে বিচার করে বুঝতে পারেন যে উগ্রমস্তিষ্ক আফগানদের পক্ষে মোগলদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মোগলদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যাতে মোগলরা তাঁর বিরুদ্ধে না যায়। হুমায়ুন দিল্লী পুনরুদ্ধার করলে সোলায়মান তাঁর নিকট উপহার সামগ্রী পাঠান। অনুরূপভাবে আকবর সিংহাসনে বসলেও তিনি আকবরের নিকট উপহার পাঠান। যদিও সোলায়মান প্রকৃত পক্ষে বাংলা ও বিহারের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেননি এবং স্বনামে মুদ্রা জারী করেননি। তিনি আফগান আমীরদের মত 'হজরত আলা' উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। কারো কারো মতে তিনি আকবরের নামে খুতবা পাঠ করতেন এবং মুদ্রা জারী করতেন। ফলে সোলায়মান কররানী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আকবর বাংলা বিহার জয়ের চেষ্টা করেননি। ইহাই সোলায়মান কররানীর পররাষ্ট্রনীতির সফলতা প্রমাণ করে।

মুসলিম সুলতানদের মধ্যে সোলায়মান কররানীই সর্বপ্রথম উড়িষ্যা জয় করেন। ইতিপূর্বে অনেকেই উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, লুণ্ঠনও করেন কিন্তু জয় করতে পারেননি। মুসলমান সৈন্যরা জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করে এবং বিস্তর ধনরত্ন লুঠ করে। সোলায়মান লোদী খান ও কতলু খানকে যথাক্রমে কটক ও পুরীতে গবর্নর নিযুক্ত করেন। উড়িষ্যা বিজয়ের পরে সোলায়মান কররানী কোচবিহারের দিকে দৃষ্টি দেন। কোচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহ কামতাপুর জয় করে কামেতশ্বর উপাধি নেন। এতে সোলায়মানের ভাববার কিছু ছিলনা। কিন্তু কোচবিহারের রাজা বাংলার সীমান্ত লঙ্ঘন করলে সোলায়মান কররানীকে বাধ্য হয়ে সৈন্য পাঠাতে হয়। মুসলমান সৈন্যরা কোচরাজাকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও সোলায়মান তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে ফিরে আসেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এটাও সোলায়মানের দূরদর্শিতার প্রমাণ, কারণ তিনি সর্বদা সম্প্রসারণশীল মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সজাগ থাকেন। পেছনে শত্রু রাখা তিনি নিরাপদ মনে করেননি।

সোলায়মান কররানী একজন অত্যন্ত দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী নরপতি ছিলেন। তাঁর উজীর লোদী খানও একজন অত্যন্ত দূরদর্শী লোক ছিলেন। তাঁদের উভয়ের চেষ্টায়

বাংলায় কররানীরা সুনাম অর্জন করে। সোলায়মান কররানী গৌড় ও পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে তাঁড়ায় (তাণ্ডা) রাজধানী স্থানান্তর করেন। গৌড়ের আবহাওয়া দূষিত হওয়ায় এবং সেখানে রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তিনি রাজধানী সরানোর পদক্ষেপ নেন। সোলায়মান কররানী বাস্তবে স্বাধীন হলেও স্বাধীন মুদ্রা জারী করেননি কিন্তু বাংলার বিভিন্ন স্থান এবং বিহার থেকে তাঁর ৫ খানি শিলালিপি এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় ৭ বৎসর দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করে সোলায়মান কররানী ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর তারিখে পরলোক গমন করেন।

সোলায়মান কররানীর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজীদ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তিনি হঠকারি এবং উগ্র হওয়ায় অমাত্যেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সোলায়মানের জামাতা হাঁসুর নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করে। উজীর লোদী খান আবার হাঁসুর হঠকারিতা সহ্য না করে তাঁকে হত্যা করেন এবং সোলায়মান কররানীর কনিষ্ঠ-পুত্র দাউদ খান কররানীকে সিংহাসনে বসান। অল্পবয়স্ক দাউদ সিংহাসনে বসে বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হন। কারণ দুই দুইটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সিংহাসনে বসে তিনি দেখতে পান যে, আফগানদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়েছে। আফগানরা ছিল স্বভাবতই উগ্র স্বভাবের, নিয়মনীতির মধ্যে নেতৃত্ব মেনে চলা তাদের ধাতে ছিল না। তাদের বশে রাখার জন্য শের শাহ বা সোলায়মান কররানীর মত নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। দাউদের এইরূপ কোন নেতৃত্ব গুণ ছিল না, তাই আফগানরা উপদলে বিভক্ত হয়ে, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান নির্বাচিত করে দাউদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। আফগানদের এই বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে মোগল সম্রাট আকবর তাঁর সেনাপতি মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের আদেশ দেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে অল্পবয়স্ক দাউদ খান বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিনি প্রদেশে বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হলে তাঁর মাথা বিগড়ে যায়। তিনি অত্যধিক মদ পান করতেন এবং ইতর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। রাজ্যশাসনে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিরোধিদের সনাক্ত করতে পারতেন না, এমন কি যেই লোদী খান তাঁর পিতার সময়েই বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সোলায়মানকে সাহায্য করতেন তিনি তাঁকেও অবিশ্বাস করে মৃত্যুদণ্ড দেন। সোলায়মানের মৃত্যুর পরে স্বল্প সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বায়েজীদ স্বনামে খুতবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা জারী করেন। দাউদ খানও নিজে নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেন। এতে আকবর চটে গিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। তবে মনে রাখতে হবে যে দাউদ নিজ নামে খুতবা পাঠ বা মুদ্রা জারী না করলেও আকবর বাংলা আক্রমণ করতেন। আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, সারা ভারতের অধীশ্বর হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না। সোলায়মান কররানী সুশাসন এবং স্বীয় কূটনীতির দ্বারা এই এলাকাকে মোগলদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন সত্য, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেও বেশি দিন আকবরের সম্প্রসারণ নীতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আকবরের সেনাপতি মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাসে পাটনা অবরোধ করেন, কারণ অনেক সৈন্য সামন্ত থাকা সত্ত্বেও দাউদ মোগলদের বীর বিক্রমে বাধা না দিয়ে পাটনা দূর্গে আশ্রয় নেন। পাটনা জয় করতে দেরী হওয়ায় আকবর নিজেই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। আকবরের উপস্থিতিতে ও তাঁর পরামর্শে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, মোগলরা পাটনা ও হাজিপুর অধিকার করতে সক্ষম হয়। দাউদ রাজধানী তাঁড়ায় চলে আসেন। তিনি তাঁর ধন সম্পদ নিয়ে শ্রী হরিকে যশোরে পাঠিয়ে দেন। আকবর দিল্লী ফিরে যান। তিনি রাজা তোডর মল্লকে সেনাপতি মুনিম খানের সাহায্যার্থে রেখে যান। মুনিম খান ও তোডরমল্ল দাউদের রাজধানী তাঁড়া অধিকার করলে দাউদ উড়িষ্যায় গিয়ে আশ্রয় নেন। দাউদের সেনাপতিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

মোগলরা দাউদের বিরুদ্ধে শেষ দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলা বিহার উড়িষ্যা দখল করে, একটি ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ তারিখের তুকারায় বা মোগল মারীর যুদ্ধ, এবং দ্বিতীয়টি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখের রাজমহলের যুদ্ধ। তুকারায় বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের মেদিনীপুর জিলার একটি গ্রাম। মোগলমারী তুকারায়ের ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত আর একটি গ্রাম। এই যুদ্ধ ৮ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত হওয়ায় এই যুদ্ধ উভয় গ্রামের নামানুসারে পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধে এত মোগল সৈন্যক্ষয় হয় যে যুদ্ধের স্থানটি মোগলমারি নামে পরিচিত হয়েছে। আফগানরা এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যে, যুদ্ধ শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়, মুনিম খান নিজে আহত হন। অনেক যুদ্ধের পরেও আফগানেরা টিকতে পারল না। দাউদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। দাউদ নিজে কটকে পলায়ন করেন এবং মুনিম খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেন। বৃদ্ধ এবং যুদ্ধে ক্লান্ত মুনিম খানও সন্ধি করতে রাজী হন। সন্ধির শর্ত মত দাউদ খান কররানী সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন, বিনিময়ে মোগল সম্রাট দাউদকে সামন্ত রূপে উড়িষ্যা শাসন করার দায়িত্ব দেন। এটা কটকের চুক্তি নামে খ্যাত।

দাউদ কররানী চুক্তি স্বাক্ষর করলেও আফগান অমাত্য ও সেনানায়কেরা তা মানতে রাজী হল না। তারা চতুর্দিকে ছাড়িয়ে যে যেখানে পারে মোগলদের বাধা দিতে থাকে। বর্ষাকালে আফগানদের আরো সুবিধা হয়, মোগলেরা তখনো বাংলার নদী নালার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তাই বর্ষাকালে আফগানদের অতর্কিত আক্রমণে মোগল সৈন্যরা বেকায়দায় পড়ে যায়। ঘোড়া ঘাটে অনেক আফগান সৈন্য জড়ো হলে তাদের দমনের জন্য সেনাপতি মুনিম খান তাঁড়া থেকে রাজধানী গৌড়ে সরিয়ে নেন। কিন্তু গৌড়ের আবহাওয়া তখন অত্যন্ত দূষিত ছিল, অনেক মোগল সৈন্যের উপাস্থিতিতে আবহাওয়া আরো বেশি দূষিত হয়ে পড়ে এবং গৌড়ে মহামারী দেখা দেয়। অনেক মোগল সৈন্য প্রাণ হারায়। সেনাপতি মুনিম খান অবস্থা বেগতিক দেখে গৌড় থেকে তাঁড়ায় ফিরে আসেন কিন্তু ফিরবার মাত্র ১০ দিন পরে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর তারিখে তিনি মহামারীর কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ শুনে আফগানেরা দ্বিগুণ উৎসাহে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। প্রথমে মুনিম খানের মৃত্যুর পরে সেনাপতি কে হবে এই প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ দেখা দেয়। তাই তারা আফগানদের ঐক্য বদ্ধ হয়ে বাধা দিতে অক্ষম হয়। এতদিন পর্যন্ত আফগানেরা বিচ্ছিন্নভাবে মোগলদের বিরোধিতা করছিল, এখন তাদের মধ্যে ঐক্য ফিরে আসে। মুনিম খানের মৃত্যুতে দাউদ খানও নতুন উৎসাহ নিয়ে মোগলদের বিরোধিতায় তৎপর হন, এবং ভদ্রকের মোগল সেনাপতিকে হত্যা করেন। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মোগল সেনাপতিরা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গৌড়ে আশ্রয় নেয় অর্থাৎ দাউদ কররানী কটক চুক্তি ভঙ্গ করে মোগলদের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। আফগানেরা তেলিয়াগড় গিরিপথ বন্ধ করে দেয় যাতে মোগল বাহিনী এই পথে যাতায়াত করতে না পারে। মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আকবর খান জাহানকে বাংলার সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, রাজা তোডর মল্ল খান জাহানের সঙ্গে আসেন। খান জাহান রাজমহলে পৌছে দেখেন যে দাউদের আফগান সৈন্যরা রাজমহলে সৈন্য সমাবেশ করে তাঁদের যাত্রাপথ বন্ধ করে দিয়েছে। খান জাহানও রাজমহলেই শিবির স্থাপন করেন।

উভয় পক্ষ প্রায় ৫ মাস সামনাসামনি অবস্থান করে, উভয় পক্ষ ছোট খাট সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কিন্তু কোন পক্ষ প্রতিপক্ষকে সম্মুখ আক্রমণ না করে সময় কাটাতে থাকে। মোগল সেনাপতি খান জাহান এই অবসরে দুইজন নেতৃস্থানীয় আফগান কর্মকর্তাকে নিজ দলে ভিড়িয়ে ফেলেন। এঁরা হলেন কতলু খান এবং শ্রীহরি। শেষ পর্যন্ত ১২ জুলাই (১৫৭৬) তারিখে যুদ্ধ হয়, দাউদ কররানী প্রাণপণ যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু তাঁর ঘোড়া কাদায় আটকে পড়ায় তিনি বন্দী হন। তাঁকে খান জাহানের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সন্ধির কথা বলেন। খান জাহান দাউদের অল্প বয়স এবং সুন্দর চেহারা দেখে সন্ধি করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মোগল সেনানায়কেরা দাউদের মৃত্যুদন্ড দাবি করেন। দাউদকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে হত্যা করা হয়, তাঁর ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিশ্বাসঘাতকতার পুরষ্কার স্বরূপ কতলু খান উড়িষ্যা এবং শ্রীহরি যশোরের শাসন ভার লাভ করেন। এই শ্রীহরিই যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা। দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আফগান সলতনত শেষ হয়।

নবম অধ্যায়

সুলতানী আমলে সমাজ ও সভ্যতা

সমাজ :

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন উপাদান যুক্ত হয় এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলার লোকজন ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু; মুসলমানরা নিয়ে আসে একটি নতুন ধর্ম, ইসলাম ; যার সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশি। মিল ছিল না বললেই চলে। মুসলমানেরা আসে বিজয় পতাকা নিয়ে, যারা জয় করে তারাই প্রথমে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিজয়ীরা ছিল তুর্কী, তুর্কীরা প্রায় তিনশত বৎসর ধরে শাসকের মর্যদা লাভ করে, তুর্কীদের মধ্যে আবার প্রথমে খলজীরা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে, খলজীদের পরে আসে ইলবরী তুর্কী, এবং তুগলকেরা। ইলিয়াস শাহীরাও তুর্কীই ছিল, কিন্তু তার পরে হাবশী এবং হাবশীদের পরে সৈয়দ বংশের সুলতানেরা শাসন ক্ষমতা দখল করে। সুলতানী আমলে সকলের শেষে ক্ষমতাশালী হয় আফগানেরা। আফগানদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব সুলতানী আমলে বাংলাদেশে তুর্কী, হাবশী, সৈয়দ এবং আফগানরা শাসন করে। অতএব মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সুলতানী আমলে বাংলাদেশে তুর্কীরা প্রাধান্য বিস্তার করে ; হাবশীরা মাত্র অল্প সময় ক্ষমতাসীন থাকে, তাছাড়া তাদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সংবাদও পাওয়া যায়। সৈয়দরা অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় রাজত্ব করে ; আফগানরা রাজত্ব করে মাত্র ৩৮ বৎসর, কিন্তু তবুও প্রাক-মোগল আমলে আফগানরা প্রাধ্যন্য বিস্তার করে, কারণ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত আফগানরা বাংলাদেশে এসে তাদের বসতি বিস্তার করে।

উপরে মুসলমানদের জাতিগত এবং গোত্রগত বিভেদের কথা বলা হল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকদের সহযোগি লোকেরাও এখানে আসে, কারণ দেশ জয় করে তাতে সুশাসন প্রবর্তনও জরুরী হয়। এইজন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে বিদ্বান, পেশাধারী, স্থপতি, প্রকৌশলী, প্রশাসক এবং কারিগরদেরও এই দেশে আসতে হয়। প্রত্যেক পেশার লোকেরা তাদের জীবিকার তাড়নায় আসে। তাছাড়া সমসাময়িক কালে মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যেও অনেকে দিল্লী সাম্রাজ্যে বা বাংলাদেশে আসে। এইজন্য দেখা যায় বিদ্বান লোকেরা নতুন বিজিত এলাকায় আসে, বাংলায় সমসাময়িক ইতিহাসের অভাবে এঁদের নাম অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না, তবে শিলালিপিতে বেশ কিছু বিদ্বান বিভিন্ন পেশা ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্তদের নাম পাওয়া যায়। মুসলমান বিদ্বান লোকেরা, বিশেষ করে সূফীরা এখানে আসার প্রমাণ বেশি পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক, তাঁদের আলেম, শয়খ এবং সৈয়দ নামে অভিহিত করা যায়, তাঁরা দেশে শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম প্রচার বা অনুরূপ কাজে লিপ্ত থাকত, তাঁরা সুলতানদের নিকট থেকে

বৃত্তি, পুরস্কার, জায়গীর ইত্যাদি লাভ করে তাঁদের পেশা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতেন। যাঁরা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকত তাঁরা খান, উমরা, মালিক, সদর ইত্যাদি রূপে পরিচিত হত। তাঁরা বৃত্তি, পুরস্কার, জায়গীর বা নগদ বেতন লাভ করত। সুলতানী আমলে মুসলমানদের মধ্যে এঁরাই ছিলেন অভিজাত শ্রেণী, তাঁরা ছিলেন মুসলিম শাসনের স্তম্ভ, ধারক ও বাহক। প্রাথমিক যুগে এঁরা ছিলেন প্রায় সবাই বহিরাগত, পরে তাদের পুত্র-পৌত্ররা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতেন। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আরব এবং পারস্য দেশ থেকে আগতদের সংখ্যাও বেশ ছিল, সৈয়দ সুলতানেরা আরব ছিলেন বলে মনে করার পক্ষে যুক্তি আছে। তাছাড়া অনেক আরব ধর্ম প্রচারের জন্যও আসেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পারস্য থেকে আগত মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিল, তাদের ফারসি ভাষাই মুসলমান আমলে অফিসের এবং আদালতের ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। ফারসি শিক্ষা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া সূফীদের মধ্যে অনেকেই পারস্য থেকে আসেন। অতএব প্রশাসনিক কমকর্তা, পেশাজীবিরাও তুর্কি, আরবি এবং ইরানী ছিলেন। সুলতানী আমলে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, দাসরা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থান নিতে পারতেন। তুর্কী দাসেরা দিল্লীতে যেমন সুলতান হতে পারতেন, বাংলাদেশেও দাসেরা সুলতানের মর্যাদার উন্নীত হওয়ায় প্রমাণ পাওয়া যায়। দাসরাও শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হয়ে অভিজাত শ্রেণীতে স্থান পেতেন।

সুলতানী আমলে বহিরাগত মুসলমানেরা সকলে স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে আসতেন না, যাঁরা একা আসতেন তাঁরা এই দেশের রমনীদের পাণি গ্রহণ করতেন। এই বিবাহের ফলে জন্ম গ্রহণ করা ছেলে-মেয়েরা মুসলমানই হত। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া বা বিয়ে শাদীর ফলে মুসলমান হওয়া লোকদের প্রতি কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিলনা। তারা পিতার সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন, এইরূপ একাধিক প্রমাণ রয়েছে যে তারা গবর্নর বা প্রাদেশিক শাসকের পদও লাভ করতেন। যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

এর পরে আসে সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত লোকেরা। সেন আমলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা এবং বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিস্পেষিত হত। হিন্দুদের ছিল বর্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা, সেখানে শূদ্রদের কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু মুসলমানেরা জাতিভেদ প্রথা মানত না, উচ্চ-নীচ সকল মুসলমানের সমান অধিকার ছিল, তাদের ধর্মীয় বা সামাজিক বৈষম্য ছিল না, অর্থনৈতিক প্রভেদ ছিল। ইসলামের বর্ণবৈষম্যহীন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বৌদ্ধরা মুসলমানদের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেন। তারা মনে করে যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানেরা অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। বৌদ্ধরা এই বিষয়ে 'ধর্মপূজা বিধান' নামে বই লিখে ফেলে। এইভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরাও বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই সকল ধর্মান্তরিতরা তাদের পিতা পিতামহের পেশা গ্রহণ করত। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এইরূপ কিছু নিম্নশ্রেণীর পেশা এবং পেশাজীবির কথা পাওয়া যায়, যেমন গোলা, জোলা (মোটা কাপড় প্রস্তুত কারক), মুকেরি (বলদের পিঠে জিনিষ নিয়ে যারা

ফেরী করে), পিঠারি, সানাকার (তাঁত নির্মাতা), হাজাম, তীরকর, কাগজী, দরজি, কাবাড়ি (মৎস্য বিক্রেতা), বেনটা (বয়নকারী), রংরেজ (যে রং লাগায়), কসাই ইত্যাদি। এরা মুসলমান হয়েও তাদের পিতৃ-পেশা ছেড়ে দেয়নি।

মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ বেকায়দায় পড়ে যায়। শক এবং হুনদের মত মুসলমানেরা হিন্দু সমাজে বিলীন হয়ে যায়নি। হিন্দু সমাজ ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক, তাদের শিল্প সাহিত্য সব কিছু ধর্মের প্রভাব বলয়ে গড়ে উঠেছে। তাদের জাতিভেদ প্রথা সমাজকে কলুষিত করত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হত। বৈষম্যহীন ইসলাম ধর্মের প্রতি তাই আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুরা বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ বন্ধ করার জন্য হিন্দু সমাজপতিরা প্রাথমিক ভাবে যে ব্যবস্থা নেন তা হল তাঁদের সামাজিক আইন কানুনে কড়াকড়ি আরোপ করা। এতে ফল হ্ল উল্টো, আইন কানুন বিধি নিষেধের বাঁধন কষণে হিন্দু সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়। উদাহরণ স্বরূপ খাদ্য বা পানির স্পর্শ, রসূন পেঁয়াজের গন্ধ। কোন কারণে মুসলমানরা খাদ্য পানি স্পর্শ করলে অথবা মুসলমানদের রন্ধন শালায় রসুন পেঁয়াজের গন্ধ হিন্দুর নাকে ঢুকলে তাদের জাতি নষ্ট হত। অনেক কিংবদন্তীতে হিন্দুদের এই ভাবে জাতি নষ্ট হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জাতিদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট, সংসর্গদুষ্ট ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। সমাজপতিরা এইভাবে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করলে ধর্মান্তকরণ বাড়ল বই কমল না। কিন্তু ষোল শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা তুলে দেন এবং হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন।

হিন্দু সমাজে ব্রাক্ষণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য এই তিন জাতির প্রাধান্য ছিল, শূদ্ররা ছিল সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে, অস্পৃশ্য এবং নিগৃহীত। ব্রাহ্মণেরা আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণদের একদল ছিলেন খুব সাত্ত্বিক ও বিদ্বান। বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শিক্ষার্থীগণ তাঁদের নিকট থেকে বিদ্যালাভ করত। অবশ্য মূর্খ বিপ্রেরও অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ এবং কৌলিন্য প্রথা ছিল, কুলীনদের বাসস্থানের নাম অনুসারে তাঁদের পরিচয় হত। কায়স্থরা লেখাপড়া জানত, তারা মোটামুটিভাবে লেখক শ্রেণী, ছোট খাট ব্যবসা, অন্যান্য পেশা এবং কৃষিকাজেও তারা তৎপর ছিল। বৈদ্যরা ছিল কবিরাজ, বা চিকিৎসক, তাঁদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। ঔষধ, অর্থাৎ বটিকা, পাচন ইত্যাদি সেবনের ব্যবস্থা করা ছাড়াও বৈদ্যরা প্রয়োজন বোধে ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য নিত। চিকিৎসা বৈদ্যদের প্রধান বৃত্তি হলেও তারা অন্যান্য শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিল। এরা ছাড়া যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হল বণিক, স্বর্ণকার, কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, তাম্বুলী, তিলি, তাঁতি, মালাকার, গোয়ালা, নাপিত, বারুই, কামার, কুমার, ময়রা, যুগী, চাষী, কৈবর্ত, জেলে, সেকরা, ছুতার, ধোপা, চাঁড়াল, বাগ্দী, হাঁড়ী, ডোম, মুচি, শুঁড়ি ইত্যাদি।

মুসলিম বিজয়ের সময়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা শংকিত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারে যে তাদের স্বার্থ মুসলিম বিজয়ের ফলে বিঘ্নিত হবে। এই কারণে লক্ষণ সেনের দরবারের ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে বুঝতে পারে যে বিজয়ের সময় যুদ্ধ বিগ্রহের ধকল কেটে গেলে শাসন প্রতিষ্ঠায় বিজয়ী বিজিত সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে মুসলমান শাসকেরা নৌবাহিনী গঠন করতে স্থানীয় মাঝি মাল্লা পাইক ইত্যাদির সাহায্য নেয়, রাজস্ব প্রশাসনে বরাবরই প্রাচীন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারীর সাহায্য নিতে হয়, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণেও স্থানীয় কারিগর, কুলী মজুরের প্রয়োজন হয়। এই সকল কারণে শাসক শাসিতের মাঝে আস্থার ভাব ফিরে আসে। হিন্দুরা প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে ধীরে ধীরে উচ্চ রাজপদও লাভ করে। দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলকের বাংলা আক্রমণ কালে স্থানীয় পাইকরা ইলিয়াস শাহকে যুদ্ধে সহযোগিতা করে, সহদেব নামক একজন হিন্দু সেনাপতি ইলিয়াস শাহকে সাহায্য করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফীরূজ শাহ বাংলা আক্রমণ করে যেই নিশান বা প্রচার পত্র ঘোষণা করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সাহায্যও কামনা করেন। ফীরূজ শাহ নিশানে জমিদার, মোকদ্দম, সন্ন্যাসী, সাঁই এবং তাদের অনুসারী অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে যারা তাঁকে সমর্থন করবে তিনি তাদের জমি, পারিশ্রমিক, বেতন ইত্যাদি বৃদ্ধি করবেন। অতএব মুসলিম বিজয়ের একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও এমন প্রভাবশালী হয়ে উঠে যে দিল্লীর সুলতান ফরমান জারী করে তাদের সাহায্য কামনা করতে বাধ্য হন। কিছুদিন পরে হিন্দুরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের উৎখাত করে নিজে সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হন। গণেশের ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী হয়, কিন্তু হিন্দুদের উচ্চ রাজপদ লাভ করা অব্যাহত থাকে। হোসেন শাহী আমলে অনেক হিন্দু উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় সমাজে শিক্ষার এবং বিদ্যা লাভের ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান শাসকেরা প্রথম থেকেই মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করার কথা সমসাময়িক ইতিহাস তবকাত-ই-নাসিরীতে পাওয়া যায়। মসজিদ শুধু নামাজের স্থান ছিল না, মসজিদে বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। তবে মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত এবং মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিলালিপিতেও বিভিন্ন সুলতান কর্তৃক মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ আছে। প্রাথমিক শিক্ষায় অক্ষরজ্ঞান দেওয়া, পবিত্র কোরান পাঠ, নামাজ রোজা ইত্যাদি ইসলামের অবশ্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হত। মুসলমানদের জন্ম এবং মৃত্যুর পরে কবরস্থ করার জন্যেও ধর্মীয় বিধি বিধান রয়েছে, এগুলো সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা প্রাথমিক শিক্ষায় দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, হাদিস, কোরান, ফেকাহ, আইন ইত্যাদি সকল বিষয়ে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার জন্যেও কোন কোন মাদ্রাসায় আলেম ও পণ্ডিত

ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হত। যে সকল মাদ্রাসা নির্মাণের কথা উল্লেখ করে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই শিলালিপিতে বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শিলালিপিতে কোন কোন সুলতান ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অমুসলিমদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাদের জন্য ছিল পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী, পাঠশালা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, কিন্তু চতুষ্পাঠীতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অক্ষর জ্ঞান ছাড়াও পাঠশালায় ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান, যেমন ভূমির মাপ, রাজস্বের হিসাব, সাধারণ দৈনান্দিন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবপত্রও শিক্ষা দেওয়া হত। চতুষ্পাঠী বা উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে সাহিত্য, স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। নব্যন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চার জন্য সেকালে নবদ্বীপ অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছাড়াও অনেক কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। এই সকল পণ্ডিতেরা ও কবিরা মুসলমান সুলতানদের নিকট থেকে পুরস্কার, উপাধি এবং পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেতন।

শাসন ব্যবস্থা :

মুসলমান আমলে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন উত্তর বঙ্গ বরেন্দ্র, পশ্চিম বঙ্গ রাঢ় এবং পূর্ব বঙ্গ বঙ্গ নামে পরিচিত হত। মুসলিম আমলের প্রথম দেড়শত বৎসরে এই নামগুলো মোটামুটিভাবে প্রচলিত থাকলেও এই সময়ে লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও প্রাধান্য লাভ করে। এই স্থানগুলো আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সারা বাংলাদেশ জয় করে একক শাসনাধীনে আনেন এবং সেই থেকে সারা দেশের নাম হয় বাঙ্গালা। ইলিয়াস শাহের সময় থেকে মুসলিম সুলতানেরা বাঙ্গালার সুলতানে পরিণত হন।

বাংলার সুলতানেরা সার্বভৌম ছিলেন। বখতিয়ার খলজী লখনৌতি জয় করে সুলতান মুইজ্জ-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন সামের (মুহাম্মদ ঘোরী) নামে মুদ্রা জারী করেন, অর্থাৎ তিনি মুহাম্মদ বিন সামের সার্বভৌমত্ব মেনে নেন। এর পরে মুসলমান সুলতানেরা কিছু দিন 'ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী' বা এইরূপ উপাধি নিতেন, কোন কোন সুলতান আব্বাসী খলিফাদের নাম তাঁদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ করতেন। এমন কি ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খেলাফতের অবসান হলেও তার পরে বাংলার কোন কোন সুলতান শেষ আব্বাসী খলিফা আল-মুস্তাসিমের নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ করতেন। অতএব বাংলার সুলতানেরা বাংলার মুসলিম রাজ্যকে খেলাফতের অংশ রূপে গণ্য করতেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে বাংলার সুলতানেরা সার্বভৌম ছিলেন, তাঁরা কারো অধীনে ছিলেন না। ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দর শাহ সর্বপ্রথম নিজে খলিফা বা ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন। এর পরে অন্যান্য সুলতানেরাও খলিফা উপাধি নিতেন।

সুলতান ছিলেন বাংলার মুসলিম রাজ্যের সর্বময় কর্তা, তিনি আইন প্রণয়ন করতেন, রাজকর্মচারীদের নিয়োগ দান করতেন, রাজ্য জয়, যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি স্থাপন, সকল কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি বিচার বিভাগেরও কর্তা ছিলেন, বিচারকদের নিয়োগ দিতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজে বিচার করতেন। বিভিন্ন শিলালিপিও মুদ্রায় প্রাপ্ত উপাধি দৃষ্টে মনে হয় সুলতানেরা সাধারণতঃ ইসলামের বিধি বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করতেন না। তাছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি বিধান করাও সুলতানদের দায়িত্ব ছিল বলে মনে হয়। সুলতানী আমলে রাজধানী লখনৌতি (গৌড়), ফীরূজাবাদ (পাণ্ডুয়া), একডালা এবং তাঁড়ায় স্থাপিত ছিল। প্রথম প্রায় তিন শত বৎসর রাজধানী লখনৌতি এবং ফীরূজাবাদে প্রায়ই স্থানান্তরিত হত, হোসেন শাহের সময় রাজধানী ছিল একডালা, সোলায়মান কররানী রাজধানী তাঁড়ায় স্থানান্তর করেন। সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। সুলতান রাজপ্রাসাদে দরবারে বসতেন, এখান থেকেই শাসন পরিচালনা করা হত এবং বিদেশী দূত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করা হত।

সমসাময়িক ইতিহাসের অভাবে প্রশাসনিক সম্পূর্ণ রূপটি পাওয়া যায় না। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ও বিভাগের নামও পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্রে যে পদবী পাওয়া যায় তা হল হাজিব, সিলাহদার, শরাবদার, জামাদার, দ্বারবান, দবীর খাস, সাকের মল্লিক (বা মালিক), ছত্রী ইত্যাদি। মাঝে মাঝে উজীরের উল্লেখও পাওয়া যায়। রাজ অমাত্যরা সাধারণ ভাবে আমীর বা মালিক রূপে অভিহিত হতেন। মধ্যযুগে শাসন ব্যবস্থায় সুলতানের পরেই ছিল উজীরের স্থান। তিনি শাসন কাজে এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বেসবা ছিলেন। এই পদবীগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে বলে সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণরূপটি পাওয়া যাচ্ছে না, তবে এতে সন্দেহ নেই যে কেন্দ্রীয় শাসনে বিভিন্ন বিভাগ ছিল এবং বিভাগীয় প্রধান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ উজীর, দবীর খাস (প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত সচিব) সর লস্কর (সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ), কোতওয়াল (নগর অধ্যক্ষ), ছত্রী (সুলতানের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান), দ্বারবান (প্রাসাদ রক্ষী-প্রধান) এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুলতানী আমলে রাজস্বের মধ্যে গণীমা, ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক এবং আবগারী শুল্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। গনীমা হল যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী বা ধন সম্পদ, প্রথম মুসলিম বিজয়ের সময় গনীমা ছিল আয়ের প্রধান উৎস, গনীমার উপর ভিত্তি করেই সুলতানেরা শাসন পরিচালনা করেন। রাজস্বের মধ্যে ভূমি রাজস্ব ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত থাকত, এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে রাজস্বে ঘাটতি দেখা দিলেও মোটামুটি ভাবে ভূমি- রাজস্বই ছিল নির্ভরযোগ্য এবং নির্দিষ্ট আয়। সাধারণভাবে উৎপাদনের এক-পঞ্চামাংশ ভূমি-রাজস্ব রূপে নির্ধারিত হত। বাণিজ্য শুল্কও আয়ের একটা বড় উৎস ছিল, আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হত। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম এবং সাতগাঁও বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা করত। চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের

ব্যবসায়ী, আরব এবং পারস্য দেশের ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল। হোসেন শাহী আমলে পুর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে আসে। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য শুল্কও বৃদ্ধি পায়। বাংলা সাহিত্যে আবগারী শুল্কের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শুল্কের মধ্যে ঘাটি, দানী, হাট কর, পথ কর, ঘাট কর ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশে জিজিয়া কর আদায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুসলমান সুলতানদের শক্তির মূল ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনীই দেশ জয় করে এবং এই বাহিনীই দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করে এবং দেশকে বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সেই কারণে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা আধা-সামরিক এবং আধা-বেসামরিক ছিল। সুলতান নিজেই সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। কোন কোন সময়, বিশেষ করে প্রাথমিক যুগে সুলতানেরা নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। আবার কোন কোন সময় একেকটি যুদ্ধের জন্যে পৃথক পৃথক সেনাপতি নিয়োগ করা হত। যুবরাজেরাও যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হতেন। সামরিক বাহিনী ৪ ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, নৌ বাহিনী ও হস্তী বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থায় অশ্বারোহী বাহিনী শুষ্ক মৌসুমে এবং উঁচু জায়গায় যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখতে পারত। অশ্বারোহী বাহিনী যেরূপ দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতে পারত, অন্য বাহিনীর লোকেরা সেইরূপ পারত না। কিন্তু বাংলাদেশে নৌ বাহিনীর প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশি। নদী মাতৃক বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় নৌকা ছাড়া যুদ্ধ চলত না। মধ্যযুগে যুদ্ধে হাতির প্রয়োজনও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশাল আকৃতির হাতিগুলো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকত এবং যেদিকে যেত গুঁড়িয়ে দিত। পদাতিক বাহিনী সংখ্যায় বেশি ছিল, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করত। প্রথমদিকে সামরিক বাহিনীতে শুধু মুসলমানদের নিয়োগ করা হলেও শেষ দিকে হিন্দুরাও সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিত।

সুলতান নিজে বিচার বিভাগের প্রধান হলেও কাজীরাই বিচার করতেন। এই জন্য রাজধানীতে এবং প্রত্যেক শহরে বা প্রাদেশিক রাজধানীতেও কাজী নিযুক্ত হত। শারীয়তের বিধান অনুসারে বিচার করা হত, তবে হিন্দুদের বিচার তাদের শাস্ত্র অনুসারে করা হত। স্থানীয় বিচার করত গ্রাম্য পঞ্চায়েত। সুলতান শুধু গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমায়, বিশেষ করে রাজদ্রোহ এবং ধর্মদ্রোহ বিষয়ে বিচার করতেন। কাজীরা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ হলে সুলতান নিজেই সেই ব্যাপারে বিচার করতেন। কোন কোন সুলতান ন্যায়বিচারের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, সুলতান নিজেই কাজীর বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে কাজীর বিচার মেনে নেন। মুসলমান আমলে দেশ রক্ষা এবং রাজস্ব আদায় ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সুলতান হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রাম ছিল স্বায়ত্ব শাসিত। গ্রামের পঞ্চায়েত গ্রামের শান্তি রক্ষার এবং সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ভার নিত। সামাজিক ব্যাপারে সামাজিক আইন বলবৎ ছিল, বিশেষ করে হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল।

শাসন কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশ বা আঞ্চলিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল। সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রায় ইকতা, আরছা, ইকলীম, খিত্তা, শহর ও থানা ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। প্রথম মুসলিম বিজয়ের পরে মুসলিম রাজ্য কয়েকটি ইকতায় ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের সুশাসনের জন্য একজন করে মুকতা নিয়োগ করা হত। মুকতা দেশ রক্ষা, প্রশাসন, রাজস্ব আদায় ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত হতেন। আরছাকে বর্তমান কালের জিলা এবং ইকলীমকে বিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। খিত্তা হচ্ছে সুরক্ষিত নগর এবং শহর অর্থ নগর (রক্ষিত বা অরক্ষিত)। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে প্রয়োজন মত থানা স্থাপন করা হত। বর্তমান কালের থানা প্রশাসন তখন থেকে শুরু হয়। দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে তিনটি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন, লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনার গাঁও, এই ইউনিটগুলোকে প্রদেশের সাথে তুলনা করা যায়। লখনৌতিকে মোটামুটিভাবে উত্তর বঙ্গ, সাতগাঁওকে পশ্চিম বঙ্গ এবং সোনারগাঁওকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পরিচিতি দেওয়া যায়। শের শাহ বাংলাদেশকে সরকার রূপে ১৯টি ইউনিটে ভাগ করেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এইরূপ ছোট ছোট ইউনিট তৈরী করা হয়। মোগল সম্রাটেরা বাংলাকে একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত করলেও শের শাহের প্রবর্তিত সরকার রাজস্ব আদায়ের ইউনিট রূপে গণ্য হত। বাংলার কোন কোন এলাকায় সামন্তদেরও অস্তিত ছিল। সামন্তরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার অঙ্গীকারে সামন্ত প্রধানের দায়িত্ব পালন করত। প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে সুলতানী আমলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা সহজ নয়, তবে প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে প্রশাসনের রূপরেখা আলোচিত হল।

স্থাপত্য শিল্প :

বাংলার মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান স্থাপত্য শিল্প। মুসলমানেরা মসজিদ নির্মাণ করেন সবচেয়ে বেশি, তাছাড়া সমাধি ভবন, পুল এবং মাদ্রাসা ভবনও নির্মাণ করেন। মুসলিম ছেলে-মেয়েরা মসজিদেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত, অর্থাৎ মসজিদেই মাদ্রাসার কাজ চলত, তাই প্রাপ্ত ভবনগুলোতে মাদ্রাসার সংখ্যা কম। কিছু কিছু মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কথা শিলালিপিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমত, মুসলিম নির্মিত ভবনগুলো ইটের নির্মিত, বাংলাদেশে পাথর বেশি পাওয়া যায় না। উত্তর ভারত থেকে পাথর আমদানি ব্যয় সাপেক্ষ এবং কষ্টকরও ছিল। তাই এখানে পাথরের ব্যবহার কম। শুধু স্তম্ভ এবং কোন কোন ভবনে প্রাচীরের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পাথর ব্যবহার করা হয়। ইটের গাঁথুনির জন্য চুন সুরকি ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আবহাওয়া উত্তর ভারতের আবহাওয়া থেকে ভিন্ন। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত বেশি, তাই বৃষ্টির পানি আবদ্ধ হয়ে ভবনের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হত। বাংলাদেশে সাধারণ বাড়িঘর বাঁশের খুঁটি, বেড়া এবং ঘরের চাল দিয়ে তৈরী হত। এই ঘরগুলো

দোচালা এবং চারচালা হত। তবে ঝড় বৃষ্টির দিকে লক্ষ করে দোচালা ঘরই সংখ্যায় বেশি ছিল। বাংলার সাধারণ নির্মাণ সামগ্রীও বাঁশ এবং খড় বা শন। কিন্তু পাকা ইটের নির্মিত ভবনও সনাতন পদ্ধতির বাঁশ ঘরের নির্মিত ভবনের অনুকরণে নির্মিত হত। দোচালা ঘরে দুই প্রান্তে একটু নীচু করে উপরে উঁচু করা হত, অর্থাৎ চাল বাঁকিয়ে বৃষ্টির পানি যেন সহসা গাড়িয়ে নীচে পড়ে যায় সেই ব্যবস্থা করা হত। এই দোচালা ভবনের অনুকরণে ইটের নির্মিত ভবনেও সরল রেখার পরিবর্তে খড়ের চালের ন্যায় বাঁকিয়ে দেয়া হত। চৌচালা ঘরে চারিকোণে যেমন শক্ত ও মজবুত বাঁশের খুঁটি লাগানো হত, ইটের ভবনেও চারিকোণে চারটি ইটের স্তম্ভ অট্টালক বা টাওয়ারের আকারে নির্মিত হত। দু'টি বাঁশ অল্প দূরে পুঁতে মাথা নুইয়ে দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইট এবং পাথরের স্তম্ভের উপর গঠিত খিলানগুলোও সেই অনুকরণে নির্মিত হত। তৃতীয়ত, দেয়ালের নির্মাণে বিশেষ অংশ সামনে বাড়িয়ে বা পিছনে হটিয়ে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হত এবং দেয়ালের গায়ে নানা রকম নকশা করা হত। প্রথম প্রথম হিন্দু আমলের অনুকরণে এক খণ্ড পাথরে স্তম্ভ নির্মাণ করা হত কিন্তু পরে পরে এটার পরিবর্তন হয়। হিন্দুরা মন্দিরের গায়ে মনুষ্যমূর্তি খোদাই করত, কিন্তু ইসলামে মূর্তি গঠন নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলমানেরা তাদের নির্মিত ইমারত ও ভবনের গায়ে অর্থাৎ দেয়ালে নানরূপ জ্যামিতিক নকশা বা লতা-পাতা খোদাই করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। চতুর্থত, মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান। মুসলমানদের খিলান হিন্দু আমলের খিলানের চেয়ে ভিন্ন ছিল। খিলান নির্মিত হত ইটের উপর ইট বসিয়ে, কিন্তু ইট বসাবার প্রক্রিয়া ছিল দুই আমলে দুই রকম। সাধারণত হিন্দু যুগে একটি ইট বা এক খণ্ড পাথরের উপর এমনভাবে বসান হত যাতে উপরের ইট বা পাথর খণ্ড একটু বাড়তি থাকে। এইভাবে দুইটি স্তম্ভের উপর দুই দিক থেকে ইট বা পাথরের অংশ বাড়তে বাড়তে যখন দুখানি ইট বা পাথর খণ্ডের ব্যবধান খুব সংকীর্ণ হত তখন একখণ্ড ইট বা পাথরের অংশ ঐ সংকীর্ণ ব্যবধানে বসিয়ে খিলান তৈরী হত। কিন্তু মুসলমানেরা প্রকৃত খিলান বা ট্রু আর্চ পদ্ধতি প্রবর্তন করে, এই প্রথায় ইট-বা পাথর খণ্ড একটির উপর একটি না বসিয়ে কোণাকুনিভাবে পাশাপাশি সাজিয়ে বসান হত। এই প্রণালীতে বড় বড় গম্বুজ বা দরজা নির্মিত হত। এই রূপ খিলান ও গম্বুজ মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের বিশেষত্ব। তা ছাড়াও মুসলিম স্থাপত্য শিল্পে নানা আকৃতির মিনা করা মসৃণ ইট ও টাইলের ব্যবহার ছিল।

মুসলমান আমলে নির্মিত অট্টলিকার মধ্যে বর্তমানে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীনগুলো হল হুগলী জিলার ত্রিবেণীতে প্রাপ্ত জাফর খান গাজীর মসজিদ ও মাযার। মুসলিম সুলতানদের রাজধানী ছিল গৌড় এবং পাণ্ডুয়ায়। এই দুটি শহরে বেশির ভাগ ইমারতগুলো নির্মিত হয়। রাজধানীর বাইরেও বেশ কিছু ইমারত নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট কতকগুলো ইমারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

সুলতান সিকান্দর শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এটা একটি বৃহদাকার মসজিদ, এর পার্শ্বের কক্ষগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশ এখানো বর্তমান। ৩৯৭ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গন বা চেহনের চারিপাশে সারি সারি কক্ষ রয়েছে। চারদিকে চার সারির কক্ষের উপরের

ছাদ ৩৭৬টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে প্রত্যেকটির উপর ছোট ছোট গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদ এবং দরসবাড়ি মসজিদও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভবন। পাণ্ডুয়ার একলাখী ভবনে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ-সমাধিস্থ আছেন। এর কার্নিসটি খড়ের চালের মত সামান্য বাঁকানো এবং দেয়াল থেকে অনেকটা বাড়ানো। গৌড়ের লট্টন মসজিদ, চিকা মসজিদ, তাঁতি পাড়া মসজিদও উল্লেখযোগ্য। ছোট ও বড় সোনা মসজিদও অত্যন্ত সুন্দর ইমারত, প্রথমটি আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ এবং দ্বিতীয়টি নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মান করেন খান জাহান সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহের সময়ে। মাহমুদশাহ গৌড়ের দুর্গও নির্মাণ করেন। এই দূর্গের দাখিল দরওয়াজা বা প্রধান ফটকও স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান। এগুলো ছাড়াও অনেক ইমারত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। গৌড়ের কদম রসূল ভবনের উল্লেখ না করলে নয়, এটা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। এই ভবনে রাসূল (দঃ) এর পদচিহ্ন রক্ষিত আছে, সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ তা নির্মাণ করেন। গৌড়ের ফীরূজা মিনার নির্মাণ করেন সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফীরূজশাহ, এই মিনারের উচ্চতা ৮৪ ফুট এবং তা পাঁচ তলায় বিভক্ত। এর সর্বনিম্ন তলার পরিধি ৬২ ফুট। হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়ায় আরো একটি ফীরূজা মিনার আছে, এর উচ্চতা ১২০ ফুট এবং তাও পাঁচ তলায় বিভক্ত। গৌড়ের ফীরূজা মিনারের তুলনায় ছোট পাণ্ডুয়ার ফীরূজা মিনারের নির্মাণ পদ্ধতি নিম্নমানের। মসজিদের বাইরে এই মিনারগুলো বিজয় স্তম্ভ বলে মনে হয়।

মুসলিম সুলতানেরা কোন ভবন নির্মাণ করলে সেখানে স্মারক রূপে শিলালিপি খোদাই করে রাখত। শিলালিপিতে ভবনের প্রকার, সুলতানের নাম, নির্মাতার নাম এবং তারিখ উৎকীর্ণ হত। এইরূপ অনেক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপির লিখন পদ্ধতি অত্যান্ত উৎকৃষ্ট মানের, এবং মুসলমান আমলের হস্ত লিখন শিল্প তাদের শিল্পী মনের পরিচায়ক। এই হস্ত লিখন পদ্ধতি বা ক্যালিগ্রাফী বিভিন্ন রকমের ছিল, যেমন কুফিক, নসখ্, তুগরা, নস্তালিক ইত্যাদি। বাংলার মুসলিম শিলালিপিতে নসখ্ লিখন পদ্ধতির প্রযোগ বেশি দেখা যায়। তবে তুগরা এবং নস্তালিকের ব্যবহারও ছিল। মনুষ্য বা প্রাণীর মূর্তি ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার মুসলমানেরা স্থাপত্য এবং হস্তলিখন শিল্পে তাদের প্রতিভা বিকাশ করে।

সাহিত্য ঃ

মুসলমানেরা বাংলাদেশে আসার সময় আরবি ও ফারসি ভাষা নিয়ে আসে। এখানে এসে তারা বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বাংলা ভাষা আয়ত্বও করে। প্রকৃত পক্ষে সেইযুগে মুসলমানদের মধ্যে অন্য দেশের ভাষা বা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় অনীহা ছিল না। সুলতানী আমলে আরবি ফারসি ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়। তুর্কীরা তুর্কী ভাষাও নিয়ে আসে, কিন্তু বাংলাদেশে এই ভাষায় কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

আরবি ও ফারসি সাহিত্য ঃ

বাংলাদেশে আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত প্রথম যেই বইখানি পাওয়া যায় তা 'অমৃতকুণ্ড' নামক একটি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ। সুলতান আলা-উদ-দীন আলীমর্দান খলজীর রাজত্বকালে ভোজর ব্রাহ্মণ নামক একজন যোগী কামরূপ থেকে লখনৌতি আসেন এবং লখনৌতির কাজী রুকন-উদ-দীন সমরকন্দীর সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় লিপ্ত হন। ভোজর ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি 'অমৃতকুণ্ড' নামক সংস্কৃত পুস্তকটি কাজীকে উপহার দেন। বইখানি যোগ বিষয়ক, কাজী এই বইখানি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ফারসি ভাষায় এর নাম হয় 'বাহর-উল-হায়াত' এবং আরবি ভাষায় 'হাউজ-উল-হায়াত'। বইখানি মুসলিম সূফী সাধকদের অতিপ্রিয় ছিল।

সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের সময়ে 'নাম-ই-হক' নামে ফারসি কবিতায় একখানি পুস্তক রচিত হয়। এর বিষয় বস্তু ফেকাহ বা নামাজ রোজা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। কেউ কেউ মনে করেন মওলানা শরফ-উদ-দীন আবু তওওয়ামা বইখানি রচনা করেন। হয়ত সোনারগাঁয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় বইখানি ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। তৃতীয় বইখানি লিখিত হয় সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সময়ে। এটা একটি ফারসি ভাষায় লিখিত অভিধান, ইবরাহীম কওয়াম ফারুকী তা রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম 'ফরহঙ্গ-ই- ইবরাহীমী' বা 'শরফ নামা।' এই পুস্তকে জানা যায় যে আমীর জয়েন-উদ-দীন হারবী সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সভা কবি ছিলেন। ঐ সময়ে আরো অনেক ফারসি কবির আবির্ভাব ঘটে। যেমন আমির শাহাব-উদ-দীন হাকিম কিরমানী, মনসুর শিরাজী, মালিক ইউসুফ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ-মুহাম্মদ রুকন, সৈয়দ হাসান এবং শয়খ ওয়াহেদী, কিন্তু তাঁদের রচিত কোন পুস্তক পাওয়া যায়নি। সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের আমলে মুহাম্মদ বিন ইয়জদান বখশ বিখ্যাত হাদীস সংকলন সহী বুখারী অনুলিখন করেন এবং সৈয়দ মীর আলাভী হিদায়েত-উর-রামী নামক ধনুর্বিদ্যা সম্পর্কিত একখানি বই লেখেন। সুলতান নসরত শাহের আদেশে আহমদ মজলদ খান 'ইসকান্দার নামা' অনুলিখন করেন। বাংলার স্বাধীন সূর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের সময়ে আবদুর রহমান নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি মখজন-ই-গঙ্গরাজ নামক একখানি পুস্তক লেখেন। ফারসি কবিতায় লিখিত এই পুস্তকখানি তসত্তওফ বা সূফী তত্ত্ব বিষয়ে লিখিত।

অবধি ভাষায় কাব্য ঃ

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের আমলে জৌনপুরের কবি শয়খ কুতবন অবধি ভাষায় 'মৃগাবতী' কাব্য রচনা করেন। হোসেন শাহ শর্কী যখন আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের আশ্রয়ে খলগাঁও-এ অবস্থান করছিলেন তখন ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। প্রকৃত পক্ষে বইখানি জৌনপুরের কবি লিখলেও এবং বইখানিতে হোসেন শাহ শর্কীর প্রশস্তি থাকলেও বাংলার সুলতানের অধীনস্থ এলাকায় বইখানি রচিত হওয়ায় তা এখানে উল্লেখ করা হল।

বাংলা সাহিত্য ঃ

বাংলার মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হয়। এই বক্তব্য অতিরঞ্জন মনে হলেও সত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ, বৌদ্ধ সিদ্ধা বা গুরুরাই চর্যাপদের নির্মাতা। চর্যাপদের নিম্নতম সময় সীমা দ্বাদশ শতক। এর প্রায় দুইশত বৎসর পরে চণ্ডীদাস 'শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য মুসলমান আমলের রচনা। অতএব বৌদ্ধদের পরে হিন্দু আমলে কোন বাংলা কাব্য রচিত হয়নি। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলেও হয়তো বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠত, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে দীর্ঘ দিন সময় লাগত। বৌদ্ধ বা হিন্দু আমলে সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। সেন রাজদরবারে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল, তাঁরাই ছিলেন পণ্ডিত এবং শিক্ষিত শ্রেণী। দরবারের ভাষাও ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় ধর্মকেন্দ্রিক কাব্য লেখা হত, এই দেব ভাষা বা দেব গ্রন্থে শূদ্র বা সাধারণের কোন অধিকার ছিল না। তাছাড়া দেব-ভাষা সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণদের কড়া নজর ছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে দেশী অ-দেব ভাষা বাংলায় কাব্য রচনার সুযোগ ছিল না। কিন্তু দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত ভাষা উভয়ের প্রতিপত্তি কমে যায়। দেশে আসে আরবি ও ফারসি ভাষা ও ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক কাব্য ইত্যাদি। শূদ্রাও মুসলমানদের নিকট নির্যাতিত হওয়ার কোন কারণ ছিলনা, মুসলমানদের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই সমান, সকলেই বিজাতি। মুসলিম শাসনে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলায় সাহিত্য রচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়। কোন কোন মুসলিম সুলতান বা সুলতানের অমাত্যেরা বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারা হিন্দু কবিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন, আবার মুসলমানেরাও বাংলা শিক্ষা করে বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

সুলতানী আমলে যে সকল হিন্দু কবির কাব্য পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় এবং দ্বিজ শ্রীধর। তাছাড়া কোন কোন কবির রচিত পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাঁদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, তাঁদের মধ্যে যশোরাজ খান, বিদ্যাপতির নাম উল্লেখযোগ্য। সুলতানী আমলে একজন মুসলমান কবির কাব্য পাওয়া যায়। তিনি হলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর।

সর্বপ্রথম কাব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, এর রচনাকাল নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, চণ্ডীদাস ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দর শাহের সময়ে কাব্যটি রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে কবি সুলতানের প্রিয় পাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় কাব্য কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ। কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। তিনি কোন এক গৌড়েশ্বরের আদেশে কাব্য রচনা করেন, কিন্তু তিনি গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি। আধুনিক পণ্ডিতেরা কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরকে

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ বা রাজা গণেশ, বা জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ, বা রুকন-উদ-দীন বাবরক শাহের সঙ্গে পরিচিতি দেন। আমরা মনে করি কৃত্তিবাস সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের আদেশে কাব্য রচনা করেন। সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য (বা গোবিন্দ বিজয় বা গোবিন্দ মঙ্গল) রচনা করেন। এই কবি সুলতানের নিকট থেকে গুণরাজখান উপাধি পান। সুলতান তাঁর প্রতি এতই প্রীত ছিলেন যে, তিনি কবির ছেলেকে সত্যরাজ খান উপাধি দেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের নিকট থেকে উপাধি পেয়েও কবি গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি। তাই মালাধর বসুর সময়কালও বেশ কিছুদিন বিতর্কিত বিষয় ছিল। বর্তমানে মালাধর বসু ও তাঁর পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দের সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে জানতে পারি যে, মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। তাই বর্তমানে এটা সকলে স্বীকার করেন যে, মালাধর বসু সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন এবং সুলতান তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মালাধর বসু সুলতানের দেহরক্ষী বা ছত্রী ছিলেন এবং কবির পুত্রও চাকরি করতেন।

হোসেন শাহী আমলকে বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁ বা নবযুগ বলা হয়। এই আমলে বাংলা সাহিত্যে অভুতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এই বংশের সকল সুলতান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন। এই আমলে বেশ কয়েকজন কবি কাব্য রচনা করেন। তাঁদের কেউ কেউ রাজার প্রশস্তি করেন, আবার কেউ কেউ রাজ অমাত্য বা সেনানায়কদের পোষকতা লাভ করেন। তাঁরা সুলতান বা অমাত্যদের আদেশে কাব্য রচনা করেন। সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের অধীনস্থ অনেক হিন্দু উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী কবি ছিলেন। যেমন রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন ইত্যাদি। এঁদের লিখিত কাব্য পাওয়া না গেলেও পদ পাওয়া যায়। রূপ ও সনাতন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতও ছিলেন। যশোরাজ খানের একটি পদে হোসেন শাহকে 'জগৎ ভূষণ' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সুলতান কাব্য রসিক ছিলেন। হোসেন শাহের রাজত্বকালে দুইটি বাংলা কাব্য রচিত হয়, বিপ্রদাস পিপলাই এর "মনসা বিজয়" এবং বিজয় গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল' বা 'পদ্মপূরাণ'। বিজয়গুপ্ত হোসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলে প্রশস্তি করেন।

হোসেন শাহের দুইজন সেনাপতি পরাগল খান ও তাঁর ছেলে ছুটি খান (বা নসরত খান) চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় মহাভারত কাব্য রচনা করেন এবং ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় লিখেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর হোসেন শাহের এবং শ্রীকর নন্দী হোসেন শাহ ও নসরত শাহ উভয়ের ভুয়যী প্রশংসা করেন, উভয় কবি পরিষ্কার বলেন যে তাঁরা পরাগল খান ও ছুটি খানের আদেশে কাব্য রচনায় হাত দেন। পরাগল খান ও ছুটি খান দরবারে বসে কাব্য শুনতেন এবং কাব্য-রস আস্বাদন করতেন। ছুটি খানের

সময় হোসেন শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও নসরত শাহ যুবরাজ থাকা অবস্থায় কবির প্রশস্তি লাভ করেন। নসরত শাহের সময়ে সঞ্জয় নামক এক কবি সুলতানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন। নসরত শাহের ছেলে আলা-উদ-দীন ফীরূজ শাহও একজন কাব্য প্রেমিক ছিলেন। তিনি যুবরাজ থাকতেই দ্বিজ শ্রীধরকে 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনার আদেশ দেন। বিদ্যাপতির একটি পদের ভণিতায় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয় কবি কোন না কোনভাবে সুলতানের উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেন। হোসেন শাহী আমলের শেষ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন একজন মুসলিম কবি। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম বাঙ্গালি কবি। তিনি শাহ মুহাম্মদ সগীর, 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা। উপরে যে সকল কবি ও কাব্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সব হিন্দু কবির লেখা হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত কাব্য। হিন্দুরা মানব-মানবীর প্রেম বিষয়ে কাব্য লেখেননি। দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী অর্থাৎ মানব মানবীর প্রেমের ছাপ থাকলেও ইহাকে ধর্মীয়কাব্যের রূপ দিয়ে কালিকা মঙ্গল কাব্য করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান কবিরা ফারসি সাহিত্যের অনুকরণে প্রণয় কাব্য রচনা করেন, এবং এই সময় থেকে মানব-মানবীর প্রেমকে কেন্দ্র করে কাব্য রচিত হতে থাকে। হিন্দু কবিরাও মুসলমানদের অনুকরণে প্রণয় কাব্য রচনা করতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে ইহা শ্রেষ্ঠ মুসলিম অবদান। ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানেরা বাংলাদেশ জয় করে মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করে এবং মুসলিম সভ্যতা গড়ে তোলে। সুলতানেরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন। এই সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা যায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুলতানদের দরবারে প্রবেশ করে। প্রথমে সুলতানেরা ও তাঁদের অমাত্যেরা হিন্দু কবিদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণ করেন, অর্থাৎ মুসলিম সুলতানেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশে সহায়তা দান করেন। পরে মুসলিম কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহাম্মদ সগীর একমাত্র মুসলিম কবি যিনি সুলতানী আমলে কাব্য রচনা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতানী আমল সম্পর্কে অতিরিক্ত পাঠের জন্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ঃ হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৪৮।
আবদুল করিম ঃ বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল, ঢাকা ১৯৯৯।
আবদুল করিম ঃ শোশ্যাল হিস্টরি অব দি মুসলিমম ইন বেঙ্গল, ২য় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৮৫।
সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৯৮৮।
সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলিকাতা, ১৯৬২।
মমতাজুর রহমান তরফদার ঃ হোসেন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৬৫।
এম. এ. রহীম ঃ সোশ্যাল এ্যাণ্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, ভল্যুম-১, করাচী ১৯৬৩ ; ভল্যুম-২, করাচী ১৯৬৬।

দশম অধ্যায়

আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় মোগল অভিযান

রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করে আকবরের সেনাপতি খান জাহান রাজধানী তাঁড়া অধিকার করেন। কিন্তু সারা বাংলাদেশ তখনো মোগল অধিকারের বাইরে থাকে। প্রকতপক্ষে, অনেক সেনাপতির অধীনে অনেক যুদ্ধ করেও আকবর বাংলাদেশ জয় করতে পারেননি। সমগ্র বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলেই সারা বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ দাউদ কররানীর হত্যার পরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান এবং হিন্দু সামন্ত প্রধান, জমিদার এবং ভুঁঞা ইত্যাদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। মোগলদের পক্ষে এঁদের সহজে দমন করা সম্ভব হল না। এই সময়ে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ মোগল শক্তি সারা বাংলার কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হয়, সেহেতু এই আমলকে ভুঁঞাদের আমলও বলা যেতে পারে। ভুঁঞাদের মধ্যে আবার বার ভূঞা অত্যধিক প্রাসিদ্ধি লাভ করে ; বার-ভুঁঞা আকবরের সময়ে এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে মোগলদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেও দীর্ঘদিন তারা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় লিপ্ত ছিল। বার-ভূঁঞাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত। কেউ কেউ বলেন বার ভুঁঞা দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভূঁঞাকে বুঝায়, আবার কেউ কেউ বলেন, যে সকল ভুঁঞা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা সকলেই বার ভূঞার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই বিতর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা পরে করব। এখন মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা হচ্ছে।

মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

খান জাহান দাউদ কররানীকে পরাজিত করে রাজধানী তাঁড়ায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁড়া মালদহ শহরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, বর্তমানে ভাগিরথী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তখন মোগল অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল; মালদহ-দিনাজপুর হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট এবং পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা, মোটামুটিভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় তিনটি রাজ্য ছিল—বিষ্ণুপুরের বীর হামীর, পাচেটের শামস খান এবং হিজলীর সলীম খান। বীর হামীর প্রয়োজনে মোগলদের সাহায্য সহযোগিতা করত, কিন্তু পাচেটের শামস খান ও হিজলীর সলীম খান আকবরের সময় স্বাধীন থাকেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী তাঁদের পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। মেদিনীপুর জেলাতেই উড়িষ্যার সীমান্তে আরো দুইজন জমিদার ছিলেন—চন্দ্রকোণার বীরভান বা চন্দ্রভান এবং বরদাঝকরার

দলপত। বাংলা থেকে উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে বিস্তৃত সড়কের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এই দুইজন জমিদার সুযোগ পেলেই লুণ্ঠনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা নষ্ট করত। জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁদেরও দমন করা হয়। দক্ষিণ বাংলার যশোর-খুলনায় তখন একটি বড় জমিদারী ছিল। এই জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দাউদ কররানীর অমাত্য শ্রীহরি। রাজমহলের যুদ্ধের আগে শ্রী হরি এবং কতলুখান দাউদ কররানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মোগলদের সঙ্গে যোগযোগ করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ শ্রীহরি যশোরের এবং কতলু খান উড়িষ্যার কর্তৃত্ব লাভ করেন। শ্রীহরি যশোরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরের সময়ে তিনি যশোর রাজ্যের রাজা ছিলেন। আকবরের সেনাপতিরা তাঁকে কোন সময় আক্রমণ করেনি। শ্রীহরির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য যশোরের রাজা হন। জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে যশোর দখল করেন। যশোরের পাশেই ভুষণা। আকবরের সময় এখানে জামিদার ছিলেন মুকুন্দ রায়, এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে ছিলেন রাজা শত্রুজিত। ইসলাম খান চিশতী শত্রুজিতকে পরাজিত করলে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আজীবন মোগল সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান বরিশাল বাকেরগঞ্জ এলাকা নিয়ে ছিল বাকলা। আকবরের সময় এখানে রাজা ছিলেন কন্দর্প নারায়ণ, জাহাঙ্গীরের সময়ে ছিলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্র ইসলাম খানের সময়ে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবরের সময়ে ফরিদপুরে বা ফতহাবাদে ছিলেন মুরাদ খান, ভুষণার রাজা মুকুন্দ রায় মুরাদ খানের পুত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ফতহাবাদের জমিদার ছিলেন মজলিশ কুতুব। তিনি পরাজিত হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজশাহীর পুটিয়া রাজপরিবারের পূর্ব পুরুষ ছিলেন পিতাম্বর। তিনি চিলাজওয়ারের জমিদার ছিলেন। পুটিয়া লষ্করপুর পরগণায় এবং চিলাজেওয়ার ভাতুরিয়া পরগণায় অবস্থিত ছিল। পিতাম্বর রাজশাহী-পাবনা এলাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। পিতাম্বরের ছোট ভাই নিলাম্বর এবং নিলাম্বরের পুত্র অনন্ত। তাঁরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতী তাঁদের পরাজিত করলে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করেন। পুটিয়ার দক্ষিণে গঙ্গীর তীরে আলাইপুর। লস্কর খান ছিলেন আলাইপুরের জমিদার। জাহাঙ্গীরের সময়ে তিনিও মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

মোগলদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ছিল ভাটি এলাকা। ভাটির পরিচিতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং প্রবীণ ইঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। ভাটি মানে নিম্ন এলাকা। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সম্পূর্ণ নিম্ন এলাকা, এখানে অনেক নদ-নদী রয়েছে,এবং এই এলাকা বৎসরে ছয় মাসেরও বেশি সময় পানির নীচে থাকে। অতএব সাধারণভাবে এই সম্পূর্ণ এলাকাকে ভাটি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের সমসাময়িক ইতিহাস ও যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় ভাটি অবস্থিত ছিল। ভাটির সীমানা আমরা নিম্নরূপে নির্ধারণ করতে

পারি-পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা) নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সহ উত্তর-পূর্বে সিলেটের বাণিয়াচংগ। গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা, এই তিন বৃহৎ নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা বিধৌত এবং বেষ্টিত (বৃহত্তর) ঢাকা, ময়মনসিং, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত। ভাটিতে ভুঁঞারা মোগলদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, নিম্নাঞ্চল হওয়ায় মোগলদের এই অঞ্চল জয় করতে বেশ বেগ পেতে হয়। এই ভাটিতেই বার-ভূঁঞার অভ্যুদয় হয়।

ভাটির ভুঁঞাদের মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের জমিদারী ছিল বিক্রমপুর পরগণায়। পদ্মার নিকটে তার অবস্থিতি। চাঁদ রায়, কেদার রায় দুই ভাই ছিলেন কায়স্থ। তাঁরা উভয়েই আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করেন এবং কেদার রায় যুদ্ধে আহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। চাঁদ রায়ের মৃত্যু বোধহয় আগেই হয়। কথিত আছে যে, চাঁদ রায়ের একমাত্র কন্যা সোনাময়ীকে ঈসা খান জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁদের জমিদারী বা পরিবার সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যায় না। মনে হয় ঈসা খানের ছেলে মুসা খান তাঁদের জমিদারী দখল করেন। আকবরের সময়ে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণার ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। আকবরের সময়ে জোয়ান শাহী ও খালিয়াজুরী পরগণার মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। তাঁরা আকবরের সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করেন। ভাওয়ালের গাজী পরিবারের গাজী উপাধিধারী ভূঞারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। ভাওয়ালের গাজীদের প্রথম পুরুষ ছিলেন ফজল গাজী। আকবরের সময়ে টিলা গাজী, বাহাদুর গাজী, চাঁদ গাজী, সুলতান গাজী, সেলিম গাজী এবং কাসিম গাজীর নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। এঁদের নাম অনুসারে তালিপাবাদ, চাঁদ প্রতাপ, সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ এবং কাসিমাবাদ পরগণার নাম হয়। সরাইলের উত্তরে এবং তরফের দক্ষিণে মাতংগ নামে একটি ক্ষুদ্র পরগণায় পাহলোয়ান নামে একজন ভুঁঞা ছিলেন। তা ছাড়া শয়খ পীরের পুত্র হাজী বাকাউল এবং হাজী শামম-উদ-দীন বাগদাদীর নাম পাওয়া যায়। তাঁদের জমিদারীর পরিচিতি পাওয়া যায় না। ভাটির আর একজন জমিদার ছিলেন বানিয়াচং এর আনোয়ার খান। তিনি একজন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন।

তবে ভাটির জমিদার বা ভূঁঞাদের মধ্যে ঈসা খান ও তৎপুত্র মুসা খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে ভুঁঞাদের নেতৃত্ব দেন এবং দীর্ঘদিন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন। ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী। কিংবদন্তী মতে ঈসা খানের পিতামহ ভগিরথ রাজপুত ছিলেন এবং ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন এবং বাংলার সুলতানের অধীনে দিওয়ানের চাকুরি গ্রহণ করেন। কালিদাস গজদানী পিতার মৃত্যুর পরে পিতার দিওয়ানের চাকুরি লাভ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর নাম হয় সোলায়মান খান, এবং তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-

দীন মাহমুদ শাহের মেয়ের পাণিগ্রহণ করেন। মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে শের শাহ বাংলাদেশ অধিকার করলে সোলায়মান খান এবং আরো অনেকে শের শাহের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন। শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহের সময়ে সোলায়মান খান বিদ্রোহ করলে দিল্লীর সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানকে পরাজিত করেন এবং সোলায়মানের পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বন্দী করে নির্বাসিত করেন। পরে সুযোগ পেয়ে ঈসা খান নির্বাসন থেকে ফিরে এসে পিতার জমিদারীতে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পিতা যেহেতু সুলতানের দিওয়ান ছিলেন, খান উপাধি লাভ করেন এবং সুলতানের জামাতাও ছিলেন, সেহেতু তিনি বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং ঈসা খানও ঐ ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। ঈসা খান সরাইলের জমিদার ছিলেন, প্রথমে তাঁর অধিকার যতটুকুই থাকুক না কেন, জীবনের শেষে তিনি ২২ পরাগণার মালিক হন এবং ভাটির ভূঁঞাদের নেতৃত্ব লাভ করেন। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, এবং ত্রিপুরার রাজার পক্ষ অবলম্বন করে তিনি তরফের জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

ঈসা খান দিওয়ান উপাধি গ্রহণ করেন। দিওয়ান তাঁর পিতার উপাধিও ছিল। অতএব তাঁর দিওয়ান উপাধি পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। তিনি মসনদ-ই-আলী উপাধিও নেন। কেউ কেউ বলেন মোগল সম্রাট আকবর তাঁকে এই উপাধি দেন, আবার কেউ কেউ বলেন ত্রিপুরার রাজা তাঁকে এই উপাধি দেন। ঈসা খান নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে এসে পিতার ভূ-সম্পত্তিকে ভিত্তি করে বিশাল এলাকার অধীশ্বর হন। তিনি বাহুবলেই এই এলাকা জয় করেন এবং ভাটির ভূঁঞারা তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে আমরা দেখব যে ঈসা খান ও তাঁর মিত্র ভূঁঞারা মোগলদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন এবং ঈসা খান জীবনের শেষ পর্যন্তও মোগলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেননি। মসনদ-ই-আলী আফগানদের উপাধি, ঈসা খান আফগান না হলেও তাদের মিত্র ছিলেন। তাই আমরা মনে করি যে ঈসা খান নিজ বাহুবলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেই মসনদ-ই-আলী উপাধি নেন। ঈসা খানের ছেলে মুসা খানও ঐ উপাধি নেন এবং মুসা খানের ছেলে মাসুম খান (শাহাজাহানের আমলে) এবং পৌত্র মুনওত্তর খান (আওরেঙ্গজেবের আমলে) মোগলদের অনুগত থাকলেও দিওয়ান উপাধি নিতেন যদিও শেষ দিকে তাঁরা মসনদ-ই-আলী উপাধি নেননি। ঈসা খানের রাজধানী ছিল কতরাব। এটা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জিলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। ইতিহাসের বিবর্তনে কতরাব নামটি এখন বিস্মৃত, তবে মাসুম খানের নামানুসারে মাসুমাবাদ নামটি এখনো সুপরিচিতি। সোনারগাঁয়েও ঈসা খানের রাজধানী ছিল। কতরাব থেকে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মনে হয়, উভয় স্থানেই তিনি ঘাঁটি এবং রাজধানী স্থাপন করেন। ঈসা খানের উত্তর পুরুষেরা ময়মনসিংহের হয়বত নগর ও জঙ্গলবাড়িতে বসবাস করতেন। ঈসা খান ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন, মোগলদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কিছু বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

বারভূঞা ছাড়াও কয়েকজন আফগান সেনানায়কও মোগলদের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে খাজা উসমান আফগান ও তাঁর ভাইয়েরা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আগে বলা হয়েছে, দাউদ কররানীর পতনের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীহরি এবং কতলু খান দাউদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, ফলে শ্রীহরি যশোরে এবং কতলু খান উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত হন। কতলু খান পরে বিদ্রোহ করলে মোগলরা তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে। কতলু খানের উজীর খাজা ঈসাও নিহত হন, কিন্তু মোগলরা খাজা ঈসার ৫ ছেলেকে বাংলাদেশে নির্বাসন দেন। তাঁরা ৫ ভাই, খাজা সোলায়মান, খাজা উসমান, খাজা ওয়ালী, খাজা মালহী এবং খাজা ইবরাহীম বাংলায় আসেন, এবং লুঠতরাজ করতে করতে অগ্রসর হন। খাজা সোলায়মানের মৃত্যু হলে খাজা উসমান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহের বুকাইনগরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরের রাজত্বকালে তিনি সেখানেই থাকেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে পরাজিত ও নিহত হন। আর একজন আফগান নেতা, বায়েজীদ কররানী সিলেটে অবস্থান নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন। আকবরের সময় মোগলরা তাঁকে আক্রমণ করার সংবাদ পাওয়া যায় না, জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁকে দমন করা হয় :

বাংলার মোগল সেনাপতিরা একবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করা হয়, কিন্তু একজন সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী আকবরের প্রতি বশ্যতা স্বীকার না করে বিদ্রোহীই থেকে যান এবং ঈসা খান মসনদ-ই-আলীর সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি স্বাধীনতাও ঘোষণা করেন এবং সুলতান উপাধি নিয়ে শিলালিপিও উৎকীর্ণ করেন। পাবনার চাটমোহরে তাঁর নির্মিত মসজিদ এখনো বর্তমান। ১৫৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মিরযা মোমিন বার - ভূঁঞার সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পিতার অধিকৃত ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে তিনিও একজন ভূঁঞায় পরিণত হন।

বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল ভুলুয়া রাজ্য। ভুলুয়া বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী, ভুলুয়ার করেকজন রাজার নাম পাওয়া যায়, যেমন দূর্লভ নারায়ণ, লক্ষণ মাণিক্য এবং অনন্ত মাণিক্য ইত্যাদি। আকবরের আমলে রাজা ছিলেন লক্ষণ মাণিক্য, জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা অনন্ত মাণিক্য পরাজিত হয়ে আরাকানে পলায়ন করেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ দক্ষিণ পশ্চিমে বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর, পাচেটের শামস খান এবং হিজলীর সলীম খান, চন্দ্রকোণার চন্দ্রভান, বরদা-ঝকরার দলপত, উত্তর বঙ্গে চিলাজওয়ারের পিতাম্বর ও অনন্ত, আলাইপুরের লক্কর খান ও তাঁর পুত্র আলা বখশ ; দক্ষিণ বঙ্গে যশোরের শ্রীহরি ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায় এবং তৎপুত্র শত্রুজিত, বাকলার কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র, ফতহাবাদের (ফরিদপুরের) মুরাদ খান ও পরে মজলিস কুতব, ভাটি এলাকায় (পূর্ববঙ্গ) বিক্রমপুরে চাঁদ রায়, কেদার রায়, সোনারগাঁয়ে ইবরাহীম নারাল, মহেশ্বরদীতে করিম দাদ মুসাজাই, জোয়ানশাহীতে মজলিস দিলাওয়ার এবং খালিয়াজুরীতে মজলিস প্রতাপ, ভাওয়ালে

গাজী পরিবার, মাতংগ-এ পাহলোয়ান, শয়খ পীরের পুত্র হাজী বাকাউল এবং হাজী শামম-উদ-দীন বাগদাদী, ঈসা খান মসনদ-ই-আলী ও তৎপুত্র মুসা খান, বুকাইনগরের খাজা উসমান, সিলেটের বায়েজীদ করবরানী এবং ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য এবং পরে অনন্ত মাণিক্য।

বার-ভুঁঞা ঃ উৎপত্তি ও পরিচয় ঃ

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে অনেক ভূঞা বা জমিদার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। তাঁদের কেউ রাজা আবার কেউ মসনদ-ই-আলী উপাধি নিতেন। বেকায়দার পড়লে তাঁরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও মোগল সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার পরে তাঁরা পুনরায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, হয় এঁরা সকলেই বার-ভূঞার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বা এঁদের মধ্যে যাঁরা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তাঁরাই বার-ভুঞার মধ্যে ছিলেন। তাঁরা বলেন যে বার সংখ্যাটি বহু অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ভুঁঞাদের সংখ্যা বার জনের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু সমসাময়িক মোগল ইতিহাস আকবরনামা এবং মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা যখনই বারভুঞার কথা বলেন সঙ্গে সঙ্গে ভাটির কথাও বলেন, অর্থাৎ তাঁরা বলেন যে বার-ভুঁঞা মানে ভাটির বার-ভুঁঞা। আমরা উপরে ভাটির পরিচিতি দিয়েছি, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বেষ্টিত ও বিধৌত এলাকাই ভাটি নামে পরিচিত এবং এখানেই বার-ভূঁঞার অভ্যুদয় হয় এবং ভাটির বার-ভুঁঞাই মোগলদের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করে।

বার-ভুঞাঁর উৎপত্তি হয় বাংলার আফগান শাসন আমলে। হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে পরাজিত ও হত্যা করে শের শাহ বাংলাদেশ দখল করলেও বাংলার ভাটি অঞ্চল তাঁর শাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। শের শাহের রাজত্ব কালেই গবর্নর খিজির খান বিদ্রোহ করেন। বারবক নামে একজন স্বাধীন মুদ্রা জারী করেন। শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সোলায়মান খান বিদ্রোহ করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে দিল্লীতে যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বার-ভূঞার উদ্ভব হয়। তারা প্রত্যেকে মোটামুটিভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। আফগান আমলে গৌড় বা তাঁড়ার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তাঁরা অনুগত থাকলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা স্বাধীন ছিল, আফগানদের রাজনৈতিক কাঠামোতে এতে বাধা ছিল না, কারণ আফগান অমাত্য ও সেনাপতিরা স্বাধীনচেতা ছিল এবং এই কারণে সুলতানেরাও তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। এই ভাবেই বার-ভুঁঞার অভ্যুদয় হয়, এই বার-ভুঁঞারাই মোগলদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা ভাটির সঠিক পরিচিতি ধরতে পারেননি, সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা যে বার-ভূঁঞা বলতে ভাটির বার-ভুঁঞা বুঝান এই কথাটিও তাঁদের নিকট পরিষ্কার ছিল না। তাই তাঁরা মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলাদেশে অনেক ভুঁঞার অস্তিত্ব দেখে মনে করেন যে বার-ভুঁঞা মানে অনেক ভূঁঞা, অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাতে বার সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁরা বার-ভূঁঞার পরিচিতি দিতে ভুল করেন। আকবরনামা এবং বাহরিস্তান-ই-গায়বী অনুসরণ করে এখন বার-ভুঁঞার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। তবে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা বার-ভুঁঞা ও তাদের নেতার কথা বলেছেন। অর্থাৎ নেতা সহ বার-ভূঁঞা তের জন। দ্বিতীয়ত, আকবরের সময়ের বার-ভুঁঞা এবং জাহাঙ্গীরের আমলের বার-ভুঁঞা এক নয়, আকবরের আমলের বার-ভূঁঞার কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ ঈসা খান, আকবরের সময়ে তিনি বার-ভূঁঞার নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র মুসা খান জাহাঙ্গীরের সময়ে বার-ভূঁঞার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখন আমরা আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বার-ভূঁঞার তালিকা দিচ্ছি। জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী বার-ভূঁঞাকে পরাজিত করে তাদের মোগল সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এর পরে কিছু দিন নামে মাত্র বার-ভূঁঞা ব্যবহার করা হত, অতঃপর বার-ভূঁঞার নাম শেষ হয়ে যায়।

আকবরের আমলে বার-ভূঞা ঃ

১। ঈসা খান মসনদ-ই-আলী, নেতা।
২। ইবরাহীম নারাল।
৩। করিমদাদ মুসাজাই।
৪। মজলিস দিলাওয়ার।
৫। মজলিস প্রতাপ।
৬। টিলা গাজী।
৭। বাহাদুর গাজী।
৮। চাঁদ গাজী।
৯। সুলতান গাজী।
১০। সেলিম গাজী।
১১। কাসিম গাজী।
১২। কেদার রায়।
১৩। শের খান।

জাহাঙ্গীরের আমলে বার-ভুঞা ঃ

১। মুসা খান মসনদ-ই-আলী, নেতা।
২। আলাওল খান।

৩। আবদুল্লাহ খান।
৪। মাহমুদ খান।
৫। বাহাদুর গাজী।
৬। সোনাগাজী।
৭। আনোয়ার গাজী।
৮। শয়খ পীর।
৯। মিরযা মুমিন।
১০। মাধব রায়।
১১। বিনোদ রায়।
১২। পাহলোয়ান।
১৩। হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী।

আকবরের রাজত্বকালে মোগল অভিযান ঃ

আকবরের সেনাপতি খান জাহান ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ কররানীকে পরাজিত ও হত্যা করে রাজধানী তাঁড়া অধিকার করেন। তিনি কিছু দিন পরে সাতগাঁও গিয়ে দাউদের দুই সেনাপতি মতি ও জামশেদকে পরাজিত করেন, মতি ও জামশেদের সঙ্গে দাউদের মা নওলাখাও ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিস্তর ধন-সম্পদ ছিল। মতি জামশেদকে হত্যা করে, খান জাহান সেদিকে অগ্রসর হলে মতি পালিয়ে যায়। দাউদের মা খান জাহানের নিকট আত্মসমর্পন করেন। অতঃপর খান জাহান নদী-মাতৃক ভাটি আক্রমণ করেন। সেখানে মোগল নৌসেনাপতি শাহ বরদী বিদ্রোহের চক্রান্ত করেন এবং সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণার জমিদার যথাক্রমে ইবরাহীম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই মোগলদের বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খান জাহান অগ্রসর হলে শাহ বরদী মোগল সেনাপতির সঙ্গে যোগ দেন, এবং ইবরাহীম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই মোগলদের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বার-ভূঞা নেতা ঈশা খান খান জাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা খানের দূরবস্থা দেখে মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিস প্রতাপ নামক দুই ভুঞা তাঁদের জমিদারী পানি বেষ্টিত জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী থেকে অর্তকিত আক্রমণ করে মোগল সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। খান জাহান রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। অল্পদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

খান জাহানের মৃত্যুর পরে আকবর মুজফফর খান তুরবতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু বৎসর খানিকের মধ্যে মোগল বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

আকবরের বিরুদ্ধে মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ ঃ

মুজফফর খান তুরবতী দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিহারের মোগল সেনানায়কেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়,

বাংলার ভূঁঞাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। সুবাদারের কিছু আদেশ নিষেধ এবং দোষীদের মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ায় সৈন্যদের মন বিক্ষুদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের বিদ্রোহের কারণ প্রধানতঃ দু'টি-(১) সৈন্যদের ভাতা কর্তন এবং (২) ধর্ম বিষয়ে সম্রাট আকবরের বাড়াবাড়ি।

মোগল সৈন্যরা বাংলা এবং বিহারের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিতি ছিল না। তারা বৃষ্টি এবং কাদামাটির দেশে যোগাযোগে অভ্যস্থ ছিল না, এখানে ঘোড়ার লালন-পালন কষ্টকর এবং এই স্থানের আবহাওয়াও তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। এই সকল কারণে সম্রাট আকবর বাংলা বিহারে যুদ্ধরত সৈনিক ও সেনানায়কদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাদের বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। বিহারের সৈন্যদের জন্য বেতনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করে এবং বাংলার সৈন্যদের জন্য শতকরা একশত ভাগ হারে ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং বাংলা বিহার আক্রমণের সময় থেকে এই ভাতা চালু করা হয়। কিন্তু শাহ মনসুর কেন্দ্রের দীওয়ান নিযুক্ত হলে তিনি ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে ভাতার হার কমিয়ে দেন। তিনি বিহারের জন্য শতকরা বিশ ভাগ এবং বাংলায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করে ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তা ছাড়াও এই সময়ে কেন্দ্রীয় দীওয়ানের আদেশে অনেক সেনানায়কের জায়গীর কমিয়ে দেওয়া হয় এবং পূর্বের অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকা রাজকোষে ফেরৎ দানের আদেশ দেওয়া হয়। আকবর একজন উদার শাসক ছিলেন। তিনি 'সুলহ-ই-কুল' বা সকলের প্রতি শান্তির নীতির প্রবক্তা। তিনি ধর্ম বিষয়ে উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন, হিন্দু রমণী বিয়ে করেন এবং হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। তিনি সতীদাহের মত হিন্দুদের কতকগুলো কুসংস্কার বন্ধ করে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এর নাম দীন-ই-এলাহী। প্রথম কারণটি সৈনিকদের আয় কামিয়ে দেয়, অর্থাৎ এই দুইটি আদেশ সৈন্যদের জীবিকা ও ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ। এই কারণে আকবরের নিজের সৈন্যরাই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা আকবরের ভাই এবং কাবুলের শাসনকর্তা মিরযা হাকিমের সঙ্গে যোগযোগ করে এবং তাঁকে সিংহাসেন বসাবার ষড়যন্ত্র করে। আকবরের নতুন ধর্ম প্রবর্তনের ফলে সকল সুন্নী মুসলমান বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাংলার কাজী মীর মুইদুল মুলক এবং জৌনপুরের কাজী মুহাম্মদ ইয়াজদী আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ বলে ফতোয়া দেন।

বাংলা ও বিহারের মোগল সেনানায়কেরা ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করে। বাংলার বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন বাবা খান কাকশাল ও মাসুম খান কাবুলী এবং বিহারে নেতৃত্ব দেন আরব বাহাদুর ও আরো কয়েকজন সেনানায়ক। সুবাদার মুজফফর খান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন সেনানায়ককের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রথম থেকেই সুবাদারের অনুগত সেনানায়কদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাই সকলে একযোগে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। উভয় পক্ষ রাজমহলের নিকটে গঙ্গা নদীকে মধ্যে রেখে অবস্থান নেয়, এই সময়ে আকবরের আদেশ উভয়ের পক্ষে হস্তগত হয়। আকবর সুবাদার মুজফফর খানকে বলেন যে

বিদ্রোহী কাকশালরা সারা জীবন সাম্রাজ্যের সেবা করেছে, সুতরাং তাদের জায়গীর তাদের ফেরৎ দেওয়া হোক। বিদ্রোহীদের নিকট লিখিত ফরমানে সম্রাট তাদের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাদের সাম্রাটের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দেন। এতে বিদ্রোহীরা খুশী হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কুচক্রী মোগল অফিসার সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে বিদ্রোহী নেতাদের হত্য করার ষড়যন্ত্র করে। এটা ফাঁস হয়ে গেলে বিদ্রোহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সুযোগে আকবরের ভাই মিরযা হাকিম কাবুল থেকে পাঞ্জাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। সম্রাট আকবর মিরযা হাকিমের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তাই মিরযা হাকিম সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ দমন করা সুবাদারের পক্ষে সম্ভব হল না। বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত রাজধানী তাঁড়া আক্রমণ করে মুজফফর খান তুরবতীকে অবরুদ্ধ করে এবং পরে হত্যা করে।

সুবাদার মুজফফর খান তুরবতী নিহত হওয়ার পরে বিদ্রোহীরা রাজধানীতে স্বাধীন সরকার গঠন করে। তারা কাবুলের শাসনকর্তা মিরযা হাকিমকে সম্রাট নির্বাচিত করে এবং তাঁর নামে খোতবা পাঠ শুরু করে। মাসুম খান কাবুলীকে মিরযা হাকিমের অনুপস্থিতিতে তাঁর উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় এবং বাবা খান কাকশালকে বাংলা সরকারের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। নতুন অর্থাৎ বিদ্রোহী সরকার বিদ্রোহী প্রত্যেক নেতাকে উপাধিতে ভূষিত করে এবং জায়গীর প্রদান করে। উপাধি এবং জায়গীর এমন- ভাবে দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পায় এবং কেউ অসন্তুষ্ট না হয়। প্রত্যেকেই এক একজন আমীর হয়ে বসে। আকবর বিদ্রোহীদের দমন করে তাঁর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর বাংলাদেশ বিদ্রোহী সরকারের হাতে থাকে। বিদ্রোহীরা জানত যে তারা সম্রাটের বিরোধিতা করে টিকতে পারবে না, তবে তাদের ভরসা ছিল মিরযা হাকিমের উপর। মিরযা হাকিম পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করে দিল্লী অধিকার করতে পারলে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নিতে পারত এবং বিদ্রোহীরাও সফলতা লাভ করত।

সম্রাট আকবর দুই দিক থেকে বিদ্রোহ মোকাবিলা করেন। মিরযা হাকিম প্রথমে আক্রমণ করলেও আকবর তাঁকে কোন সুযোগ না দিয়ে নিজেই কাবুল আক্রমণ করে তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। এদিকে বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা তোডর মল্ল এবং শাহবাজ খান প্রমুখ বিখ্যাত সেনাপতিদের পাঠান। মিরযা হাকিম পরাজিত হওয়ার সংবাদ বিদ্রোহীদের নিকট পৌছুলে তারা হতবল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। বাবা খান কাকশাল এবং আরো কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। আকবরের সেনাপতিরা প্রথমে বিহার দখল করে এবং বাংলার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আঘাত হানে। বিদ্রোহীরা আত্ম সমর্পন করে এবং বাংলার মোগল এলাকা আবার সম্রাটের অধীনে চলে যায়। মাসুম খান কাবুলী সম্রাটের বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন না করে ভাটির বার-ভূঞা প্রধান ঈসা খানের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা চালাতে থাকেন।

আকবর খান আজম মিরযা আজিজ কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি আকবরের দুধ ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি বাংলার সুবাদারী পছন্দ করতেন না। তিনি বাংলার মোগল শাসন বিস্তৃতি ও বার-ভুঁঞাকে দমনের চেষ্টা না করে তাঁকে অন্যত্র বদলীর জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। সম্রাট তাঁর বদলে শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাহবাজ খান একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন এবং ভাটির ভূঁঞা ও মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। একবার মাসুম খান কাবুলী এবং ঈসা খানের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের কুচক্রীদের কারসাজিতে সমঝোতা ভেস্তে যায়। শেষ পর্যন্ত শাহবাজ খানও বার-ভুঁঞাদের দমন করতে ব্যর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে আকবর সেনাপতির পর সেনাপতি পাঠিয়েও বাংলা সম্পূর্ণ জয় করতে পারেননি। বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি ছিলেন রাজপুত এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি। তিনি রাজমহলে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাটের নাম অনুসারে এর নাম রাখেন আকবরনগর। তিনি রাজধানীও তাঁড়া থেকে রাজমহলে স্থানান্তর করেন। তিনি রাজধানীতে এসেই তাঁর ছেলে হিম্মত সিংহ ও অন্যান্য সেনাপতিদের অধীনে কয়েকটি সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠান এবং ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন ঈসা খানের সঙ্গে কামরূপের রাজা রঘুদেবের মিত্রতা ছিল, আর রঘুদেবের শত্রু কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের সঙ্গে মানসিংহের মিত্রতা ছিল। মানসিংহকে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য রঘুদেব লক্ষ্মী নাররায়ণকে আক্রমণ করত, এবং ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলী মোগল সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করত। এইভাবে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ চলতে থাকে। কোন পক্ষই অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করতে পারেনি। একবার মানসিংহ তাঁর ছেলে দুর্জন সিংহকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভাটি আক্রমণ করতে পাঠান। ব্রহ্মপুত্র তীরে এগারসিন্ধুতে ঈসা খান দুর্জন সিংহকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। মোগল নৌবাহিনী ধ্বংস হয় এবং দুর্জন সিংহ নিজে মৃত্যুবরণ করেন। ঈসা খান এবং মাসুম খান কাবুলী অল্পদিনের ব্যবধানে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে মানসিংহ নিজে ভাটিতে সৈন্য পরিচালনা করেন, তিনি শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় যুদ্ধে আহত হয়ে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জনশ্রুতি মতে ঈসা খানের সঙ্গে মানসিংহের একক যুদ্ধ হয়। কথিত আছে যে একবার ঈসা খানের অনুপস্থিতিতে মানসিংহ ঈসা খানের বিখ্যাত দূর্গ এগারসিন্ধু আক্রমণ করেন। সংবাদ পেয়ে ঈশা খান দূর্গ রক্ষার্থে ছুটে আসেন, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা এতই ক্লান্ত ছিল যে, তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ঈসা খান মানসিংহকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং বলেন যুদ্ধে জয়ী যিনি হবেন তিনিই সারা বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করবেন। মানসিংহ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের মাঠে তিনি নিজে না এসে একজন অজ্ঞাতনামা যুবককে পাঠান। যুবক ছিলেন মানসিংহের

জামাতা। ঈসা খান তাকে চিনতে পারেন এবং যুদ্ধে যুবকটি মৃত্যুবরণ করেন। ঈসা খান মানসিংহকে তাঁর কাপুরুষতার জন্য ধিক্কার দিয়ে ফিরে আসেন। এতে মানসিংহ নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেন এবং ঈসা খানের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেলে ঈসা খান তাঁকে আঘাত না করে নিজের তরবারি মানসিংহকে দেন। কিন্তু মানসিংহ তরবারি না নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। ঈসা খান তখন মানসিংহকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন, কিন্তু মানসিংহ তা গ্রহণ না করে ঈসা খানকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর সাহস ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ঈসা খানকে উপহারদি দিয়ে বিদায় নেন। মানসিংহ শিবিরে ফিরে গেলে তাঁর রাণী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মানসিংহের কাপুরুষতার জন্য সম্রাট মানসিংহকে হত্যা করবেন এবং রাণী বিধবা হয়ে যাবেন। ঈসা খান নিজে এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি মানসিংহের সঙ্গে সম্রাটের দরবারে যেতে রাজী হন। সেখানে সম্রাট ঈসা খানকে বন্দী করেন। কিন্তু মানসিংহের নিকট সকল কথা শুনে তিনি ঈসা খানকে উপাধি ও জায়গীর দিয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান।

এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, রাজা মানসিংহ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত বাংলার মোগল আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ হন। তিনি বাংলায় তাঁর দুই ছেলেকে হারান। হিম্মত সিংহ কলেরায় মৃত্যুবরণ করেন এবং দুর্জন সিংহ ঈসা খানের সঙ্গে যুদ্ধ নিহত হন। আকবরের রাজত্বকালে বাংলার শুধু একাংশে মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল এলাকা পশ্চিমে রাজমহল, পূর্বে বগুড়ার শেরপুর, উত্তরে ঘোড়াঘাট এবং দক্ষিণে সাতগাঁও এবং বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাটিতে মোগলদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য ভূঁঞা-জমিদারেরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিত, অর্থাৎ বেকায়দায় পড়লে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করত। এছাড়া প্রকৃতপক্ষে তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করত।

আকবরের সময়ে বাংলার সেনাপতি/সুবাদারদের তালিকা ঃ

১। মুনিম খান ১৫৭৪-১৫৭৫ (১৫৭৫ এর ২৩ অক্টোবর স্বাভাবিক মৃত্যু)
২।খান জাহান ১৫৭৫-১৫৭৮ (১৫৭৮ এর ১৯ ডিসেম্বর স্বাভাবিক মৃত্যু)
৩। মুজফফর খান ১৫৭৯-১৫৮০ (১৫৮০ এর ১৯ এপ্রিল নিহত)
৪। বিদ্রোহী সরকার ১৫৮০-১৫৮২
৫। মিরযা আজিজ কোকা ১৫৮২-১৫৮৩
৬। শাহবাজ খান ১৫৮৩-১৫৮৬ (নবেম্বর)
৭। উজির খান ১৫৮৬-১৫৮৭ (১৫৮৭ এর আগষ্ট স্বাভাবিক মৃত্যু)
৮। সাইদ খান ১৫৮৭-১৫৯৪
৯। রাজা মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৬ (আকবরের মৃত্যুর পরে পর্যন্ত)।

ইসলাম খানের বয়স বেশি ছিল না, শাসন ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও ছিলনা, তাই তাঁকে বাংলার মত একটি সমস্যা সঙ্কুল প্রদেশে সুবাদার নিযুক্ত করার সময় উচ্চ পদস্থ আমীরেরা তাঁর উপযুক্ততার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র, সাহস এবং আনুগত্যে সম্রাটের আস্থা থাকায় সম্রাট কারো কথায় কান না দিয়ে তাঁকে নিযুক্তি দেন। ইসলাম খান চিশতী সম্রাটের আস্থার মূল্য দেন। আকবরের বাঘা বাঘা সেনাপতিরা যেই কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হন, ইসলাম খান তা সম্রাটের সন্তুষ্টি মত সমাধা করেন; তিনি মাত্র ৫ বৎসরের মধ্যে সকল বিদ্রোহীকে দমন করে সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করেন, বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হয়।

ইসলাম খান চিশতী তখন বিহারের সুবাদার ছিলেন, ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে তিনি বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে আসেন এবং রাজমহলে বসেই উচ্চ পদস্থ সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা নির্মাণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলার মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বাধা বার-ভুঁঞা এবং দ্বিতীয় বাধা খাজা উসমান আফগান। বার-ভূঁঞা এবং উসমান আফগান উভয়ের ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব বাংলা। অতএব বার-ভূঁঞা এবং উসমান আফগানকে পরাজিত করতে হলে তাঁকে পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে জয় করতে হবে। দ্বিতীয়, তিনি বুঝতে পারেন যে পূর্ব বাংলা জয় করতে হলে তাঁকে পূর্ব বাংলায় ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে এবং তিনি নিজেও পূর্ব বাংলায় অবস্থান নিতে হবে। এই লক্ষ্যে রাজধানী পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর করতে হবে, প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজমহল থেকে পূর্ব বাংলা জয় করা সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য তাঁর দরকার একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী। নদী-মাতৃক পূর্ব বাংলায় বৎসরের অর্ধেক সময় ঘোড়া অচল। বার-ভূঁঞার শক্তির উৎস ছিল নৌ-বাহিনী, তারা নৌ-যুদ্ধে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিত।

লক্ষ্য স্থির করে ইসলাম খান প্রথমে নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন করেন। তাঁর অনুরোধে সম্রাট ইহতিমাম খান নামক একজন ইম্পেরিয়াল আফিসারকে নৌ-বাহিনীর এ্যাডমিরাল নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সমগ্র নৌ-বহর এবং উচ্চ পদস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাপতি, দীওয়ান-বখশী ইত্যাদিকে নিয়ে নৌ-পথে পূর্ব বঙ্গের দিকে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি সমগ্র বাহিনী নিয়ে ঘোড়াঘাটে যান, সেখানে বর্ষাকাল কাটিয়ে শীত মৌসুমে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। ঢাকা পৌঁছে তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর। অতএব তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌ-বাহিনী গঠন করেন, এবং পূর্ব বাংলার ঢাকাকে রাজধানীর উপযুক্ত মনে করে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, অর্থাৎ রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ইসলাম খানের ঢাকা পৌঁছার তারিখে অর্থাৎ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়। ঢাকা থেকেই তিনি বার-ভূঁঞা, খাজা উসমান আফগান এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সফলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

বার-ভুঁঞা এবং খাজা উসমান আপগানকে পরাজিত করা ইসলাম খান চিশতীর মূল লক্ষ্য হলেও তিনি অন্যান্যদের পরাজিত করার বিষয়ে অবহেলা করেননি। তিনি শত্রুকে কোন সময় ছোট করে দেখেননি। এই কারণে ঢাকা যাওযার পথে তিনি পেছনে ফেলে যাওয়া ভূঁঞা-জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করে তাদের পরাভূত করে আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করেন। প্রথমেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার শয়খ কামালের অধীনে এক বাহিনী বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির, পাচেটের শামস খান ও হিজলীর সলীম খানের বিরুদ্ধে পাঠান। বীর হাম্বির এবং সলীম খান বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করেন এবং মোগলদের বঁশ্যতা স্বীকার করেন, শামস খানও সামান্য বিরোধিতা করে শেষে বশ্যতা স্বীকার করেন। অতএব ইসলাম খান দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জমিদারদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। তিনি ভুষণার জমিদার শত্রুজিতের বিরুদ্ধেও সৈন্যবাহিনী পাঠান। শত্রুজিত সামান্য বাধা দিয়ে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং মোগল বাহিনীতে যোগ দেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং অন্য দু'একজন জমিদারও এসে ঘোড়াঘাট যাওয়ার পথে ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং আত্মসমর্পন করেন। বর্ষা কালে ঘোড়াঘাটে অবস্থান কালে বরেন্দ্র এলাকায় অবস্থানরত দু'একজন বিদ্রোহী জমিদারকে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় এবং কামতার রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। অতএব বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে ইসলাম খান দূরদর্শিতা এবং কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি তাঁর পেছনে ফেলে আসা মোগল অবস্থানকে সম্পূর্ণ শত্রু মুক্ত করেন।

বার-ভূঁঞারা এবং খাজা উসমান আফগানও ইসলাম খান ও মোগল সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। সুবাদার ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে বর্ষা শেষে ঘোড়াঘাট থেকে ঢাকার দিকে যাত্রা করলে বার-ভূঁঞারা তাঁকে বাধা দেওযার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মোগল বাহিনী করতোয়া নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে শাহজাদপুরে (বৃহত্তর পাবনা) পৌছুলে বার-ভুঁঞার এলাকায় প্রবেশ করে। তাঁদের প্রধান মুসা খান মসনদ-ই-আলীর নেতৃত্বে মোগলদের বাধা দেওয়ার জন্য শাহজাদপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদী বেষ্টিত এলাকায় বার–ভূঁঞারা কয়েকটি দূর্গ নির্মাণ করে প্রত্যেকটি দূর্গে মোগলদের প্রবল ভাবে বাধা দেয়। ডাকচড়া দূর্গে যুদ্ধের সময় ভুঁঞারা মোগল শিবিরে এমন প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে যে, মুসা খানের নিক্ষিপ্ত প্রথম গোলা ইসলাম খানের খাবার টেবিলে আঘাত করে থালা বাসন, পেয়ালা, চামচ ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলে এবং ইসলাম খানের ২০/৩০ জন অনুচর নিহত হয়। দ্বিতীয় গোলা হাতির পিঠে উপবিষ্ট পতাকাবাহীকে আঘাত করে পতাকাসহ পতাকাবাহী খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু তবুও ভুঁঞারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি। মোগলরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তাদের যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ইত্যাদিরও কোন অভাব ছিলনা, তদুপরি তাদের ছিল অনেক হাতী। দূর্গের প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে হাতি ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও বার-ভূঁঞারা দুর্গের পর দূর্গ নির্মাণ করে মোগলদের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাধা দিতে থাকে। ইতোমধ্যে ইসলাম খান কয়েকজন অফিসারকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। তারা ঢাকায় পুরাতন দূর্গ সংস্কার করে

ঢাকাকে রাজধানীর উপযোগী করে তোলে। অপর দিকে ইসলাম খান আর একটি বাহিনী ফতহাবাদে (ফরিদপুর) মজলিস কুতবের বিরুদ্ধে পাঠান। মজলিস কুতব বীর বিক্রমে মোগলদের বাধা দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। মুসা খানের নেতৃত্বে ভুঁঞারাও দূর্গের পর দূর্গে বাধা দিয়ে শেষ রক্ষা করতে না পেরে ঢাকা পর্যন্ত মোগলদের হাতে ছেড়ে দেন এবং সোনারগাঁও, কতরাব ইত্যাদি এলাকায় জমা হয়ে মোগলদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা পৌছেন এবং ঢাকা দূর্গে অবস্থান নেন এবং নিকটে বুড়িগঙ্গার চাঁদনীঘাটে নৌ-বাহিনী মোতায়েন করা হয়; সেই থেকেই ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়। ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে মুসা খান মসনদ-ই-আলী ও তাঁর মিত্র ভূঁঞাদের পরাজিত করতে না পারলে বাংলার মোগল অধিকারও সম্পূর্ণ হবে না। তিনি ভুঁঞাদের চারিদিক থেকে ঘিরে চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা নেন। মুসা খান বন্দর খালের দুইদিকে দুইটি দূর্গ নির্মাণ করে একটিতে নিজে অবস্থান নেন এবং অন্যটিতে আলাওল খানকে নিযুক্ত করেন। মুসা খান কদম রসূল দূর্গে আবদুল্লাহ খান এবং কতরাব দূর্গে দাউদ খানকে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া মাহমুদ খান ডেমরায় এবং বাহাদুর গাজী কালিগঞ্জে প্রহরায় নিযুক্ত হন। অতএব মুসা খানের নেতৃত্বে বার-ভুঁঞা লক্ষ্যা নদীকে কেন্দ্র করে মোগল বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তত হন। ইসলাম খানও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ঢাকা থেকে খিজিরপুরে এসে খিজিরপুর দূর্গে সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর কৌশল নির্ধারণ করেন এবং বার-ভূঁঞার প্রত্যেকটি বাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি ইহতিমাম খানকে খিজিরপুরে নিযুক্ত করে অন্যান্য বাহিনীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নিদের্শ দেন। তিনি মিরযা নাথনকে কতরাবোতে দাউদ খানের বিরুদ্ধে, শয়খ রুকনকে ডেমরায় মাহমুদ খানের বিরুদ্ধে, শয়খ আব্দুল ওয়াহিদকে কালিগঞ্জের চৌরার বাহাদুর গাজীর বিরুদ্ধে, শয়খ কামালকে কমার ছড়ায়, মীরক বাহাদুরকে শ্রীপুরে এবং জাহান খান পন্নী ও বায়েজীদ খানকে বিক্রমপুরে নিযুক্ত করেন। এতে দেখা যায় মুসা খান আত্মরক্ষামূলক এবং ইসলাম খান আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। খিজিরপুর দূর্গ থেকে মোগল বাহিনী ডানে বামে সকল দিকে আক্রমণ করেন এবং ভূঁঞাদের আঘাত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রবল যুদ্ধের পরে ভূঞারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মুসা খান তাঁর মিত্র জমিদারদের নিয়ে আত্মসমর্পন করলে ইসলাম খান তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের জমিদারী তাঁদের ভরণ পোষণের জন্য ফেরৎ দেন এবং কোন কোন জমিদারকে মোগল সৈন্যবাহিনী ভুক্ত করে নেন।

বার-ভূঁঞার পতনের পরে ইসলাম খান খাজা উসমান আফগানের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর ভাই গিয়াস খান। খাজা উসমানের বুকাইনগর রাজ্য খুব বিশাল ছিল না, কিন্তু ছোট বড় বেশ কয়েকটি দূর্গ নির্মাণ করে উসমান তাঁর রাজ্যকে দূর্ভেদ্য করে রাখেন। উসমানের অনেক হাতি ছিল এবং তাঁর ভাই খাজা ওয়ালী, খাজা মালহী এবং খাজা

ইবরাহীম ও ছেলে মুমরিজ সহ অনেক দুর্ধষ যোদ্ধা তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রায় অপরাজেয় করে তোলে। মোগলরা দূর্গ নির্মাণ করে করে অগ্রসর হয়, যাতে প্রয়োজনে রাজধানী এবং সহায়ক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়।

খাজা উসমান কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ করে বুকাইনগর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং রাতের আঁধারে সকল সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে লাউড় পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে উহর নামক স্থানে ঘঁটি স্থাপন করেন। মোগল বাহিনী বুকাইনগর দূর্গ অধিকার করে, কিন্তু খাজা উসমানকে তাড়া করে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার ব্যাপারে মোগল সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় তারা ফিরে আসে। পরের বৎসর ইসলাম খান শুজাত খানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী খাজা উসমানের বিরুদ্ধে পাঠান। বর্তমান মৌলবী বাজার জিলার হাইল হাওরের নিকটে দৌলম্বপুর (বর্তমান নাম লম্বোদরপুর) নামক স্থানে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ তরিখে উভয় পক্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই সেটা মর্যাদার যুদ্ধ, মোগলদের বিরুদ্ধে তা আফগানদের শেষ চেষ্টা, মোগলরাও আফগানদের পরাজিত করতে না পারলে বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ হবে না। অতএব উভয় পক্ষই মরণপণ করে যুদ্ধ করে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা অব্যাহত গতিতে যুদ্ধ চলে। অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী, হাতি সকলেই যুদ্ধে অংশ নেয় ; কামান, তীর, বর্শা, তরবারি সকল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং দ্বন্দ যুদ্ধও চলে। কেউ কারো খোঁজ নেয়ার অবসর ছিল না। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সূর্য বেশি তেঁতে না উঠলেও হাজার হাজার মানুষ, শত শত ঘোড়া, হাতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, মানুষ এবং পশুর হুংকার এবং ঘোড়ায় খুরের আঘাতে ধুলোবালি উড়ে পরিবেশ বেশ তপ্ত হয়ে উঠে। বাতাস এমন গরম হয়ে উঠে যে মানুষ এবং ঘোড়ার দম যেন বন্ধ হয়ে যায়। দুই পক্ষই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ঘোড়া আর চলতে পারে না, অশ্বারোহী জ্বীনে বসে থাকতে পারে না, লাগামে হাত আলগা হয়ে যায়। মোগল পক্ষে সেনানায়ক ও সৈন্যসহ অনেকে হতাহত, কিন্তু এত বিপর্যয়ের মধ্যেও মোগলরা পেছনে হটতে নারাজ। এতে আফগানরা অবাক হয়ে যায়। আফগানরা জয়ের পথে, কিন্তু হঠাৎ তারা লক্ষ্য করে যে হাতির পিঠে তাদের নেতা উসমান নেই। হঠাৎ করে মোগলদের একটি তীর এসে উসমানের বাম চোখের মধ্য দিয়ে মস্তিস্কে প্রবেশ করে। উসমান জোরে টেনে তীর বের করে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কেউ টের পেল না যে তিনি মারাত্মক আহত হয়েছেন। কিন্তু উসমান বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। তিনি ঘোড়ার পিঠেই মারা যান। ফলে আফগানরা পালাতে আরম্ভ করে, এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেও নেতার মৃত্যুর ফলে আফগানেরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর খাজা উসমানের ভাই এবং অমাত্যেরাও মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

খাজা উসমানের পরাজয় ও নিহত হওয়ার পরে ইসলাম খান একে একে সিলেটের বায়েজীদ কররানী, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য এবং বাকলার রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। অনন্ত মাণিক্য আরাকানে পালিয়ে যান। কিন্তু বায়েজীদ কররানী ও রামচন্দ্র মোগলদের নিকট আত্মসমর্পন করেন। এর পরে ইসলাম খান যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের

বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান। ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট যাওয়ার পথে প্রতাপাদিত্য সুবাদারের সঙ্গে দেখা করে উপহারাদি দেন এবং আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইসলাম খান তাঁকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান এবং আদেশ দেন যেন বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি মোগলদের সাহায্যার্থে নৌ-বাহিনী নিয়ে আসেন। প্রতাপাদিত্য এই আদেশ মেনে নিয়ে খুশী মনে স্বদেশে ফিরে যান। প্রতাপাদিত্য ছিলেন ভূঁঞাদের মধ্যে সকলের চেয়ে ক্ষমতাবান, তাঁর অধীনে এক বিশাল রাজ্য ছিল, তাঁর বার্ষিক আয়ও ছিল ভুঁঞাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি। তাঁর অনেক রণপোত ছিল এবং নাবিক ও সৈন্য সংখ্যাও সেই পরিমাণে বেশি ছিল। ইছামতী ও যমুনার সঙ্গম স্থলে প্রতাপাদিত্যের সালকা নামে একটি দূর্গ ছিল। তিনি মনে করেন যে এই দূর্গ দূর্ভেদ্য, তিনি এই দূর্গকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। নদীর তীরে হওয়ায় শত্রুরা এই দূর্গ সহজে জয় করতে পারবে না মনে করে তিনি ইসলাম খানকে প্রদত্ত কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। তিনি আরো মনে করেন যে পূর্ববর্তী মোগল সেনাপতিদের মত ইসলাম খানও ভাটি জয় করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন। তাই তিনি ইসলাম খানের আদেশ অমান্য করেন, তাঁর শক্তি সামর্থ অটুট থাকে। কিন্তু বার-ভূঁঞা এবং খাজা উসমান আফগানের পরাজয়ের পরে প্রতাপাদিত্য তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। তিনি এখন দেখেন যে ইসলাম খান পূর্ববর্তী মোগল সেনাপতিদের চেয়ে ভিন্ন। তিনি ফিরে যাওয়ার লোক নন এবং বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়েই তিনি এসেছেন। তাই প্রতাপাদিত্য ভুল শোধরাবার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর ছেলে সংগ্রামাদিত্যের অধীনে ৮০ খানি যুদ্ধের নৌকা পাঠান এবং পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে ৫০০ যুদ্ধের নৌকা, ২০ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ১ হাজার মণ বারুদ দিয়ে মোগলদের সাহায্য সহযোগিতা করার আদেশ দিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে মাত্র ৮০ খানি নৌকা দেখে ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যের উপর ভীষণ রেগে যান। তিনি নৌকাগুলো ইট পাথর বোঝাই করে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন এবং প্রতাপাদিত্যকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী পাঠান। ইসলাম খান জানতেন যে, প্রতাপাাদিত্যের রণসম্ভার, যুদ্ধের নৌকা এবং সৈন্যসংখ্যা প্রচুর। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। ইসলাম খান সেনাপতি গিয়াস খান ও মিরযা নাথনকে পাঠান। প্রতাপাদিত্য মোগলদের বিশেষ বাধা দিতে পারলেন না, মোগলরা সালকা দূর্গ অবরোধ করলে প্রতাপাদিত্যের ছেলে উদয়াদিত্য বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করেন। উদয়াদিত্যের অধীনে সৈন্য বা যুদ্ধের নৌকা কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কৌশল জ্ঞানের অভাবে তিনি পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। পরে প্রতাপাদিত্য নিজে মোগলদের বাধা দেওয়ার জন্য কাগরঘাটা দূর্গে সৈন্য সমাবেশ করেন, কিন্তু এখানেও তিনি সুবিধা করতে পারলেন না, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করেন। ইসলাম খানের আদেশে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখান থেকে প্রতাপাদিত্যকে সম্রাটের নিকট পাঠানো হয়, কিন্তু পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। সেনাপতি গিয়াস খানকে যশোরের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

যশোর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শত্রুজিতের ভূষণা, বার-ভূঁঞার ভাটি, মজলিস কুতুবের ফতহাবাদ, অনন্ত মাণিক্যের ভুলুয়া, রামচন্দ্রের বাকলা, খাজা উসমানের বুকাইনগর, বায়েজীদ কররানীর সিলেট বিজিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট ও হিজলী, আগেই বশ্যতা স্বীকার করে। উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট, হিজলী, পশ্চিমে রাজমহল থেকে উত্তর-পূর্বে সিলেট এবং দক্ষিণ পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মোগল শাসনাধীনে আসে। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ইসলাম খানের সুবাদার নিযুক্তির মাত্র ৪ বৎসরের মধ্যে এই বিরাট এলাকার বিজয় সমাপ্ত হয়। এর পরে ইসলাম খান উত্তর উত্তর পূর্ব সীমান্তবর্তী কোচবিহার, কামরূপ ও কাছাড়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্রতা স্থাপন করেন, কিন্তু কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ ঔদ্বত্যপূর্ণ ব্যবহার করায় ইসলাম খান কামরূপ জয় করেন। সেনাপতি মুকাররম খানের অধীনে মোগল বাহিনী প্রায় ১ বৎসর প্রবল যুদ্ধ করে কামরূপ জয় করেন। রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ আত্মসমর্পন করেন, তাঁকে ঢাকা নিয়ে আসা হয় এবং পরে দিল্লী পাঠানো হয়। কাছাড়ও বিজিত হয়। অতএব চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলাদেশ, কাছাড় এবং কামরূপ বিজিত হয় এবং কোচবিহার বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইসলাম খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

ইসলাম খান চিশতী একজন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সুবাদার নিযুক্তির সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বৎসর। অন্যান্য সেনাপতিদের তুলনায় বয়স অল্প হলেও তিনি মোগল সাম্রাজ্যের জন্য এক অসাধ্য সাধন করেন। আকবরের সময়ের বিখ্যাত সেনাপতিরা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু ইসলাম খান মাত্র ৪ বৎসরের মধ্যে সারা বাংলা জয় করে মোগল শাসন সুদৃঢ় করেন। তাঁর কোন পূর্ব অজ্ঞিতা ছিলনা, কিন্তু তাঁর উপর সম্রাটের পূর্ণ আস্থা ছিল এবং তিনি সম্রাটের আস্থার মূল্য দেন। এই জন্য তিনি সম্রাটের প্রশংসাও লাভ করেন।

ইসলাম খানের সাধারণ বা সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তাতে মনে হয় তিনি শিক্ষা লাভে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল, তাতে বোঝা যায় যে, তিনি একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন। আরো মনে হয় তিনি প্রচলিত প্রথা অনুসারে সামরিক শিক্ষাও লাভ করেন। তিনি কোন যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটে থাকতেন, কিন্তু যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব না দিলেও তিনিই ছিলেন সকল যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করা, সেনানায়কদের নির্বাচন করা, রসদ, ঘোড়া হাতি ইত্যাদি সংখ্যা নির্ণয় করে প্রত্যেক সেনাবাহিনীকে দেওয়া সবকিছু তিনি নিজেই করতেন। প্রত্যেকটি

যুদ্ধের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করে তাঁর মধ্যে ২টি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১ম, পরিকল্পনা এবং ২য়, সংগঠন শক্তি। তিনি রাজমহলে এসেই বাংলার ভৌলেলিক অবস্থা, নদ-নদীর গতি-প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং বিভিন্ন স্থানের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলার সামরিক ভূগোল সম্পর্কে তিনি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি নৌবাহিনী শক্তিশালী করেন এবং পূর্ব বাংলার ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। বাংলার মোগল আধিপত্য স্থাপনে তাঁর এই দুইটি কাজ বিশেষভাবে ফলপ্রসু হয়।

ইসলাম খান শত্রুদের চিহ্নিত করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে বার-ভূঁঞা এবং আফগানরা মোগলদের প্রধান শত্রু। তাই তিনি তাদের দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ঢাকায় অগ্রসর হওযার সময় পেছনে কোন শত্রু রেখে যাননি, পেছনের শত্রুদের দমন করে তিনি নিশ্চিত মনে সম্মুখের শত্রুদের দমন করার কাজে নিয়োজিত হন। তাছাড়া তিনি শত্রুদের একে একে পরাজিত করেন, শত্রুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেননি। তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলেন, যাকে বর্তমানে ডিভাইড এ্যান্ড রুল বা বিভেদ-নীতি বলা হয়। তিনি পরাজিত জমিদারদের স্বরাজ্যে ফেরৎ যেতে দেননি, কোন কোন জমিদারী ফেরৎ দেয়া হলেও জমিদারদের মোগল সৈন্যদলে রেখে দেয়া হয়। ফলে বাংলার ভূঁঞা- জমিদারেরা মোগল সেনাপতির অধীনে মোগলদের পক্ষ হয়ে অন্যান্য বাঙ্গালি ভূঁঞা-জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ইসলাম খান যেমন যুদ্ধের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেন, তেমনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তিও প্রসংসনীয় ছিল। তাঁর যুদ্ধ পরিচালনায় মনে হয়, তিনি একজন বিচক্ষণ রণকুশলী ছিলেন। তিনি রাজধানীতে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করলেও তিনি যুদ্ধের দৈনন্দিন খবরাখবর রাখতেন এবং সময়মত আদেশ-নির্দেশ পাঠাতেন এবং প্রয়োজন বোধে অতিরিক্ত সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠিয়ে সেনাপতিদের সাহায্য করতেন। কোন যুদ্ধ জয় হলে বা অভিযানে যাওয়ার সময় তিনি সেনাপতি ও সেনানায়কদের খেলাত ও উপহারাদি দিয়ে উৎসাহিত করতেন। বিজয়ী সেনাপতি, সেনানায়ক ও সৈন্যদের কথা সম্রাটকে অবহিত করতেন এবং তাদের পদোন্নতি ও পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতেন। এতে সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করত।

ইসলাম খান অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কীর্তির অংশ হিসেবে তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। এর সুফল এখনো পাওয়া যাচ্ছে, বর্তমানে ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। এই মহান মোগল সুবাদার মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে (নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) আকাস্মিকভাবে ভাওয়ালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃতুদেহ ঢাকায় এনে বাদশাহী বাগে (বর্তমান হাইকোর্ট মাযার প্রাঙ্গণ) সমাহিত করা হয়। পরে তাঁর কফিন ফতেহপুর সিক্রিতে তাঁর পিতামহ শয়খ সলীম চিশতীর মাযার প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

কাসিম খান চিশতী ঃ

ইসলাম খানের মৃত্যু পরে জাহাঙ্গীর পরলোকগত সুবাদারের এক ভাই কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কাসিম খান ছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের বিপরীত, বড় ভাই ইসলাম খান যেরূপ সুনাম অর্জন করেন, কাসিম খান সেই সুনাম ধরে রাখতে পারেননি। ইসলাম খান কর্তৃক বিজিত কাছাড় মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কামরূপে কাসিম খানের ভুল নীতির ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে মোগলদের ভীষণ বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত কামরূপ মোগলদের হাতছাড়া না হলেও সেখানে অনেক লোক ও সম্পদ ক্ষয় হয়। তবে কাসিম খান শেষ পর্যন্ত কামরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। যুদ্ধ পরবর্তী সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলেও চলে। তা ছাড়া কাসিম খান আসামেও অভিযান পাঠান, কিন্তু সেনাপতিসহ অধিকাংশ সৈন্য শত্রুদের আক্রমণে প্রাণ হারায়, বাকী স্বল্প সংখ্যক সৈন্য আহত হয়ে এবং অনেক ক্ষতি স্বীকার করে কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। কাসিম খানের ভুল পরিকল্পনা এবং সেনাপতির হঠকারিতা উভয়ই এই মারাত্মক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। কাসিম খান সম্রাটের আদেশে দুইবার চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন কিন্তু দুইবারই ব্যর্থ হন।

কাসিম খান সুবাদার হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর সকল যুদ্ধই ব্যর্থ হয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সাংগঠনিক শক্তি তাঁর ছিল না বললেই হয়। তাঁর ভাই বা শয়খ সলীম চিশতীর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়না। পরলোকগত সুবাদার ইসলাম খানের ছেলে ও জামাতার সঙ্গে তিনি দূর্ব্যবহার করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগী, বদমেজাজী এবং হঠকারি। বাংলার দীওয়ান এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসারের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পাওয়ার পরে সম্রাট শেষ পর্যন্ত কাসিম খানকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। বৎসর তিনেক সুবাদারী করার পরে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি প্রত্যাহৃত হন।

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ঃ

ইবরাহীম খান ছিলেন সাম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূর জাহান, তাঁর পিতা ইতমাদ-উদ-দৌলা এবং ভাই আসফ খান ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। সম্রাট তাঁদের পরামর্শের মূল্য দিতেন, বিশেষ করে সম্রাটের উপর সাম্রাজ্ঞী নূর জাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু ইবরাহীম খান আত্মীয়তার কারণে বা পিতা, ভাই ও বোনের প্রভাবে সুবাদার নিযুক্ত হননি, তাঁর নিজের গুণেই তিনি সুবাদারের মত উচ্চ পদ লাভ করেন। বিহারের সুবাদার থাকাকালে তিনি বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ফতেহ জঙ্গ উপাধি লাভ করেন।

ইবরাহীম খান যখন বাংলার সুবাদারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখনো কামরূপে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি, তাঁর সময়েও বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। সুতরাং তাঁকে কামরূপে বিদ্রোহ দমনে পদক্ষেপ নিতে হয়। তিনি চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন কিন্তু ব্যর্থ

হয়ে ফিরে আসেন, অতএব ফেনী নদীই তাঁর আমলে বাংলার দক্ষিণ সীমা বহাল থাকে। তিনি হিজলীর বাহাদুর খানের বিদ্রোহ দমন করেন। অতএব তাঁর সময়ে সমগ্র বাংলায় শান্তি বজায় ছিল। ইবরাহীম খানের সুবাদারী আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ত্রিপুরা রাজ্য বিজয় এবং আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের বাংলাদেশে আগমন ও বিজয়।

ইবরাহীম খানের ত্রিপুরা আক্রমণের তেমন কোন বাহ্যিক কারণ দেখা যায় না, তবে ত্রিপুরা রাজ্য বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। তাই ত্রিপুরা আক্রমণকে মোগলদের আগ্রাসী নীতির অংশরূপে গণ্য করা যায়। ইবরাহীম খান সম্রাটের আদেশে ত্রিপুরা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং মিরযা ইসফনদিয়ার ও মিরযা নূর উল্লাহ (বা নূর-উদ-দীন) নামক দুইজন সেনাপতির অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন, এবং এ্যাডমিরাল বাহাদুর খানের নেতৃত্বে নৌবাহিনীও পাঠান। এই যুদ্ধে ভূঁঞা প্রধান মুসা খানও অংশ নেন। মিরযা ইসফনদিয়ার কৈলাগড়ের (বর্তমান কসবা) পথে এবং মিরযা নূর-উদ-দীন মেহেরকুল (বর্তমান কুমিল্লা) পথে অগ্রসর হন এবং নোবাহিনী গৌমতী দিয়ে অগ্রসর হয়। ত্রিপুরার রাজা যশো মাণিক্য মোগল আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তাঁর সৈন্য বাহিনী দুই ভাগে ভাগ করে দুইটি দূর্গে পাঠান কিন্তু ত্রিপুর বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানী উদয়পুরে চলে যায়। সেনাপতি কল্যাণ দেব যুদ্ধে সুবিধা করতে পারলেন না। রাজা সংবাদ পেয়ে উদয়পুর রক্ষার জন্য আবার যুদ্ধের আদেশ দেন। কিন্তু এই যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে রাজা পরিবার পরিজন নিয়ে পর্বতে আশ্রয় নেন। মোগল সেনাপতি রাজধানী উদয়পুর দখল করেন। রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যদের পর্বত থেকে খুঁজে আনা হয় এবং রাজাকে রাণীসহ প্রথমে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইবরাহীম খান রাজধানী উদয়পুর সফর করেন এবং সেনাপতি নূর-উদ-দীনকে ত্রিপুরার সেনাপতি এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ফিরে আসেন।

এদিকে ত্রিপুরার রাজা সম্রাটের দরবারে গমন করলে সম্রাট রাজাকে স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাজ্যের ধন-রত্ন ও হাতি সম্রাটের দরবারে পাঠাবার আদেশ দেন। কিন্তু রাজা দেশে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। তিনি সম্রাটের দয়ায় রাজ্য শাসন করাকে অপমানজনক মনে করলেন। রাজা রাণীকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হন এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন, শেষ পর্যন্ত রাজা ৭৮ বৎসর বয়সে মথুরায় পরলোক গমন করেন। মোগলরা ত্রিপুরা দখল করলেও ত্রিপুরায় মোগল অধিকার দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। মোগলদের ত্রিপুরা আক্রমণের তারিখ ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা ত্রিপুরা ত্যাগ করে। এর পরে রাজা কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। ত্রিপুরা রাজমালায় বলা হয় যে মোগল অধিকারের সময় রাজধানী উদয়পুরে মহামারী আকারে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং মোগল সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করতে থাকে। এটা সত্য হতে পারে তবে ত্রিপুরা থেকে মোগলদের ফিরে আসার প্রধান কারণ রাজনৈতিক। বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহান বাংলায় এসে পৌছলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মোগল বাহিনী ত্রিপুরা ছেড়ে চলে আসে।

ত্রিপুরার উদয়পুরে মোগলদের দুইটি নিদর্শন রয়েছে, একটি ইটের নির্মিত ভগ্নপ্রায় অসমাপ্ত মসজিদ এবং অন্যটিও ভগ্নপ্রায় বদর মোকাম, যা বদর শাহের স্মৃতি বহন করে।

যুবরাজ শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দাক্ষিণাত্য ঘুরে বাংলাদেশে আসেন এবং ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বরে উড়িষ্যা সীমান্তে পৌছেন এবং বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হন। তিনি যতদূর অগ্রসর হন, স্থানীয় সেনাপতি ও অফিসারেরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং তিনি বর্ধমান পর্যন্ত জয় করে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হয়ে ঢাকা থেকে রাজমহলে গিয়ে শাহজাহানকে বাধা দিতে প্রস্তুতি নেন। ইবরাহীম খান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। এর পরে শাহজাহান ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় এক সপ্তাহ থেকে শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু শাহজাহান সম্রাটের সেনাপতি মহাবত খান ও যুবরাজ পারভেজের মিলিত বাহিনীর নিকট টংকের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজমহলে ফিরে আসেন। শাহজাহান এখন বুঝতে পারেন যে বাংলায় থেকে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি যেই পথে আসেন সেই পথেই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট সেনাপতি মহাবত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু শীঘ্রই মহাবত খানকে সম্রাটের দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। এর কারণ রাজধানীতে রাজনৈতিক দলাদলি ও ষড়যন্ত্র। মহাবত খান তাঁর ছেলে খানজাদ খানকে বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে রাজধানীতে চলে যান। খানজাদ খান বাংলার মত একটি সুবা শাসনের উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁর সময়ে আরাকানীরা রাজধানীতে ঢুকে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং অনেক লোক বন্দী করে নিয়ে ফিরে যায়। এদিকে রাজধানীতে মহাবত খান বিদ্রোহ করেন। ফলে খানজাদ খানকে প্রত্যাহার করা হয় এবং মুকররম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান হয়। মুকররম খান ছিলেন পূর্ববর্তী সুবাদার ইসলাম খানের জামাতা, এবং শয়খ সলীম চিশতীর প্রপৌত্র। বাংলার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল, ইসলাম খানের সময় তিনি কামরূপ জয় করেন। তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু নৌকাডুবিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। মুকররম খানের পরে ফিদাই খানকে সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, তিনিই জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার শেষ সুবাদার। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে নতুন সম্রাট ফিদাই খানকে প্রত্যাহার করে কাসিম খান জুয়ুনীকে সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান।

বাংলার ইতিহাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট আকবরের আমলে মোগলদের বাংলা বিজয় শুরু হলেও মাত্র সামান্য অংশ বিজয় সম্ভব হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী সারা বাংলা দেশ জয় করে

মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর মোগল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করলেও সেই সময়ে বাংলাদেশ বিজয় সম্পূর্ণ না হওয়ায় জাহাঙ্গীরের আমলেই শাসন ব্যবস্থা কার্যকর হয়। বাংলাদেশ একটি সুবায় পরিণত হয় এবং সুবা বাঙ্গালার সীমারেখাও নির্ধারিত হয়। আকবর সুবার সীমা নির্ধারণের সময় প্রাকৃতিক সীমা এবং ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখেন। সুবার শাসন পরিচালনা করতেন সুবাদার। তাঁকে সাহায্য করার জন্য রাজস্ববিভাগের কর্তা ছিলেন দীওয়ান, সৈন্য বিভাগের কর্তা ছিলেন বখশী, বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন সদর এবং কাজী (ফৌজদারী বিচারক), পুলিশ বিভাগের কর্তা ছিলেন কোতোয়াল এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত থাকতেন ওয়াকিয়া নবিস। সুবা বাঙ্গালা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। যেমন ১। সরকার লখনৌতি, ২। সরকার পুর্নিয়া, ৩। সরকার তাজপুর, ৪। সরকার পাঞ্জরা, ৫। সরকার ঘোড়াঘাট, ৬। সরকার বারবকাবাদ, ৭। সরকার বাজুহা, ৮। সরকার সোনারগাঁও, ৯। সরকার সিলহট (শ্রীহট্ট বা সিলেট), ১০। সরকার চাটগাঁও, ১১। সরকার সাতগাঁও, ১২। সরকার মাহমুদাবাদ, ১৩। সরকার খলিফতাবাদ, ১৪। সরকার ফতহাবাদ, ১৫। সরকার উদম্বর বা তাঁড়া, ১৬। সরকার শরীফাবাদ, ১৭। সরকার মন্দারন, ১৮। সরকার সোলায়মানাবাদ এবং ১৯। সরকার বাকলা। প্রত্যেক সরকার কতকগুলো পরগনা বা মহাল এ বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারের শাসনকর্তা থাকত একজন ফৌজদার। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে সুবাদারকে নাজিম বলা হত। মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এই শাসন ব্যবস্থা চালু থাকে।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবাদারদের তালিকা ঃ

১। রাজা মান সিংহ	১৬০৫-১৬০৬
২। কুতব-উদ-দীন খান কোকা	১৬০৬-১৬০৭
৩। জাহাঙ্গীর কুলী খান	১৬০৭-১৬০৮
৪। ইসলাম খান চিশতী	১৬০৮-১৬১৩
৫। কাসিম খান চিশতী	১৬১৩-১৬১৭
৬। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ	১৬১৭-১৬২৪
৭। মহাবত খান	১৬২৫-১৬২৬
৮। মুকররম খান	১৬২৬-১৬২৭
৯। ফিদাই খান	১৬২৭

দ্বাদশ অধ্যায়

শাহজাহানের অধীনে বাংলাদেশ

সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনী ঃ

শাহাজাহান সিংহাসনে বসে বাংলার সুবাদার ফিদাই খানের স্থলে কাসিম খান জুয়ুনীকে সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কাসিম খান একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় তিনি বাংলার খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত ছিলেন। অতএব বাংলার সঙ্গে কাসিম খান জুয়ুনীর পূর্ব পরিচয় ছিল। সুবাদার হিসেবে কাসিম খানের প্রধান কীর্তি হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়ন।

ইউরোপের ব্যবসায়িক জাতির মধ্যে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতে আসে এবং বেশ কিছু দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে প্রচুর আয় করে এবং ধন সম্পদের মালিক হয়। তাদের স্বদেশ পূর্তগাল একটি অত্যন্ত ধনী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু কালক্রমে পর্তুগীজরা ইউরোপের অন্যান্য জাতি, যেমন ডাচ্ এবং ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তখন তারা লুঠতরাজে লিপ্ত হয়। তারা বাংলার উপকূল ভাগে লুঠতরাজ করে যে বিভীষিকা ও ত্রাসের সৃষ্টি করে তা বাংলার ইতিহাসে এক লোমহর্ষক অধ্যায়।

পর্তুগীজরা ষোল শতকের প্রথম থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে। গোয়া, দমন ও দিউতে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। গোয়াতে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাও বিস্তার করে। ষোল শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু প্রথম দিকে তারা ব্যবসায়ে সুবিধা করতে না পারলেও শের শাহ্ কর্তৃক বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে পরাজয়ের সুযোগে তারা চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ব্যবসায়ের সুযোগ লাভ করে। এর পরে চট্টগ্রাম আরাকানের রাজার অধীনে গেলে পর্তুগীজরা হুগলী বন্দরের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে।

আকবর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজদের একখানি ফরমান দিয়ে হুগলীতে তাদের বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। ফরমানে পর্তুগীজদের (১) হুগলীতে জমি নিয়ে (খরিদ করে) একটি শহর প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়া হয়। বাংলার সুবাদারকে আদেশ দেয়া হয় যেন ঘরবাড়ি তৈরীর ব্যাপারে পর্তুগীজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয়, (২) পর্তুগীজদের গির্জা বা প্রার্থনাস্থল নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং স্থানীয় অমুসলিম ইচ্ছুক ব্যক্তিদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়। সম্রাটের ফরমান পেয়ে পর্তুগীজরা হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠা করে, এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুগলী বন্দরেরও উন্নতি হয়। ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে ত্রিবেণীর নিকটে বাংলার প্রাচীন বন্দর ছিল সাতগাঁও, কিন্তু নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে সাতগাঁও বন্দর নাব্যতা হারালে এর ব্যবসা-বাণিজ্যও কমে যায়। এমনিতেই সাতগাঁও বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস

পেতে থাকে, এখন হুগলী বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাতগাঁও বন্দর একেবারেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

হুগলীকে কেন্দ্র করে পর্তুগীজরা লাভজনক ব্যবসা শুরু করে, তাদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলো বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে বন্দরে ভিড় করত এবং বন্দর থেকে বাংলাদেশী পণ্য নিয়ে বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। সম্রাটের অনুমতি পেয়ে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ পাদ্রীরাও এই দেশে আসে। হুগলীতে গির্জা এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও তারা বিভিন্ন শহরে গির্জা নির্মাণ করে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়। উদারহণ স্বরূপ তারা ঢাকা, শ্রীপুর, সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রামে গির্জা নির্মাণ করে। চট্টগ্রামের কর্নফুলী নদীর অপর পারে দেয়াৎ এ তাদের একটি প্রধান গির্জা ছিল এবং এই গির্জার অধীনে ছোট ছোট গির্জাও ছিল।

একদিকে পর্তুগীজ বণিকরা যেমন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত, এবং পর্তুগীজ পাদ্রীরা ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তেমনি আর একদল পর্তুগীজ দেশীয় ভুঁঞা-জমিদারদের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে কাজ নিত। তারা সৈনিক, নাবিক এবং বন্দুক চালনায় অত্যন্ত দক্ষ থাকায় দেশীয় রাজন্যবর্গ তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিল। ভূঁঞা-জমিদারেরা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় পর্তুগীজরাও উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়ে এবং কোন কোন এলাকায় বিশেষ করে সন্দ্বীপে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। এইরূপ একজন দুর্ধর্ষ পতুগীজ ছিল সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস। গঞ্জালেস সন্দীপে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে সেখানে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। আরাকানের মগ রাজার সঙ্গেও গঞ্জালেসের যোগাযোগ ছিল এবং আরাকানের রাজা মোগল এলাকায় লুঠতরাজ করার জন্য পর্তুগীজদের উৎসাহ দিত। আরাকানের রাজার সঙ্গে গঞ্জালেসের মত বিরোধ হওয়ায় গঞ্জালেসের পতন হয়, নতুবা গঞ্জালেসের হাতে আরো অসংখ্য নিরীহ বাঙ্গালি ধ্বংস হয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, একদিকে পর্তুগীজ সৈন্যরা যেমন লুঠতরাজে লিপ্ত হয়, তেমনি পর্তুগীজ পাদ্রীরাও স্থানীয় লোকদের উপর অত্যাচার করে এবং জোর করে অনেককে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করত। তদুপরি পর্তুগীজরা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, নিরপরাধ বন্দীদের দাসে পরিণত করে তাদের ভারতের অন্যান্য এলাকা এমনকি গোয়ায় এবং দূরদেশে বিক্রি করে দিত।

সম্রাট শাহজাহান যুবরাজ থাকাকালে যখন বাংলায় আসেন তখন তিনি পর্তুগীজদের অত্যাচার এবং নির্যাতন ও লুণ্ঠনের সংবাদ পান। পর্তুগীজরা শাহজাহানের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাই সিংহাসনে বসেই তিনি সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনীকে পর্তুগীজদের হুগলী থেকে বিতাড়ন করার আদেশ দেন। সুবাদার সম্রাটের আদেশ পালন করে হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে স্থল ও নৌবাহিনী প্রেরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজিত করে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

বিভিন্ন সূত্রে শাহজাহানের আদেশে সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনী কর্তৃক পর্তুগীজদের হুগলী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় বিবরণ পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক সূত্রেই পুর্তুগীজদের বিতাড়নের কারণও দেওয়া হয়।

প্রথমত, পর্তুগীজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। হুগলীর পর্তুগীজরা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচুর লাভবান হয়, ফলে তাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। পর্তুগীজরা যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল এবং বন্দুক যুদ্ধে তারা অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারত। নৌ-যুদ্ধে তাদের সঙ্গে দেশী নৌবাহিনীর কোন তুলনা ছিল না, দেশী নৌবাহিনী ছিল নদীতে যুদ্ধের উপযোগী, পর্তুগীজরা নদী এবং সমুদ্র উভয় যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিত। তারা ধনী হওয়ায় এবং সামরিক শক্তিতেও নিপুণ হওয়ায় অনেকেই সন্দেহ পোষণ করত যে হয়ত পর্তুগীজরা একদিন সারা বাংলা সুবা দখল করে নেবে।

দ্বিতীয়ত, উপরে উল্লেখিত ধারণা অমূলক ছিল না এই কারণে যে, আরাকানের রাজার সঙ্গে পর্তুগীজদের যোগাযোগ ছিল। আরাকানের রাজা মোগল আমলে, এমনকি প্রাক-মোগল আমলে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করত, অর্থাৎ আরাকানের রাজা মোগলদের বন্ধু ছিল না। পর্তুগীজরা আরাকানে যেমন যাতায়ত করত, হুগলীতেও তেমনি আসা-যাওয়া করত। হুগলীর পর্তুগীজরা ছাড়াও আরো অনেক গর্তুগীজ ব্যবসায়ী, সৈনিক, যোদ্ধা এই যোগাযোগে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে অস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় মোগলরা তাদের সন্দেহ করত। আরাকানের রাজার যোগসাজসে একদিন হয়ত পর্তুগীজরা মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এইরূপ সন্দেহ অমূলক ছিল না।

তৃতীয়ত, পর্তুগীজরা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, এবং গর্তুগীজ পাদ্রীরা স্থানীয় লোকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে নিয়ে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিত, এইরূপ প্রমাণের অভাব ছিল না। ক্রীতদাসদের খৃষ্ট দর্মে দীক্ষিত করা সহজ ছিল, এবং পর্তুগীজ পাদ্রীরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করত। পর্তুগীজ জলদস্যুরা লুঠতরাজ করে অনেক নিরীহ লোককে অপহরণ করে নিয়ে যেত এবং তাদের বিক্রি করত। উড়িষ্যা এবং বিভিন্ন স্থানে দাসের বাজার বসত।

চতুর্থত, পর্তুগীজরা ব্যবসা হারিয়ে লুঠতরাজে লিপ্ত হত। হুগলীর পর্তুগীজেরা হয়ত সরাসরি লুঠতরাজে লিপ্ত হত না, কারণ তারা ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করত। কিন্তু বাংলা থেকে আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলে পর্তুগীজ জলস্যুদের উৎপাত ছিল। স্বদেশী হিসেবে তাদের সাথে হুগলীর পর্তুগীজদের যোগাযোগ ছিল, এবং হুগলীর ব্যবসায়ী পর্তুগীজরা জলদস্যুদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করত। সুতরাং হুগলীর পর্তুগীজরা প্রত্যক্ষভাবে মোগলদের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত না হলেও পরোক্ষভাবে মোগলদের ক্ষতি করত।

পঞ্চমত, শাহজাহান যুবরাজ হিসেবে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বাংলায় এসে তিনি পর্তুগীজদের সাহায্য চান। পর্তুগীজরা রণপোত এবং কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শাহজাহানের পক্ষে যোগদান করে এলাহাবাদ পর্যন্ত যায়। কিন্তু টংক নদীর তীরে শাহাজাহান যখন সম্রাটের সেনাপতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন রাঁতের আধারে কাউকে কিছু না বলে পর্তুগীজরা শাহজাহানকে ত্যাগ করে হুগলীতে

ফিরে আসে। টংকের যুদ্ধে শাহজাহান পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে হয়। শাহাজাহন পর্তুগীজদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভোলেননি।

ষষ্ঠত, শাহজাহান সিংহাসনে বসলে পর্তুগীজরা প্রথমত শাহজাহানকে অভিনন্দন জানায়নি, বা তাঁর নিকট উপহারও পাঠায়নি। ইহা পর্তুগীজদের হঠকারিতার প্রমাণ। শাহজাহান এই হঠকারিতা মেনে নিলেন না।

সপ্তমত, কোন কোন সূত্রে দেখা যায়, চট্টগ্রামের পর্তুগীজ জলদস্যুরা শাহজাহানের সিংহাসন আরোহনের প্রক্কালে বা সঙ্গে সঙ্গে মেঘনা অববাহিকায় আক্রমণ করে মোগল এলাকায় ব্যাপক লুঠতরাজ করে এবং মোগল অভিজাত মহিলাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। ইহাই বোধ হয় পর্তুগীজদের হুগলী থেকে বিতাড়নের তাৎক্ষণিক কারণ। এই সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌছুলে তিনি সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনীকে হুগলী আক্রমণ করে পর্তুগীজদের বহিষ্কার করার আদেশ দেন।

সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনী হুগলী আক্রমণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। হুগলীর পর্তুগীজেরা সংখ্যায় যে খুব বেশি ছিল তা নয়, মোগলদের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারে তারা নগণ্য ছিল। তবুও পর্তুগীজদের একেবারে অবহেলা করাও সম্ভব ছিল না। কারণ পর্তুগীজরা সকলেই ছিল যোদ্ধা, এমন কি পাদ্রী এবং গির্জার ধর্মাকাজে লিপ্ত লোকেরাও যুদ্ধ করতে জানত। তাদের সকলেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত। পর্তুগীজ জাহাজগুলো ব্যবসা এবং যুদ্ধ উভয় কাজে ব্যবহৃত হত। তারা একবার জাহাজে উঠতে পারলে মোগলরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারত না। এই সকল দিক বিবেচনা করে কাসিম খান সময় নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। শেষে তিনি তাঁর ছেলে এনায়েত উল্লাহ খান এবং সেনাপতি বাহাদুর খানের নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং এ্যাডমিরাল খাজা শের ও ভূঁঞা-প্রধান মাসুম খানের (ঈসা খানের পৌত্র) নেতৃত্বে নৌবাহিনী পাঠান। বর্ধমানের ফৌজদার আল্লাহ ইয়ার খানকেও হুগলীর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুবাদার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সকল প্রস্তুতি সমাধা করেন যাতে সুবাদারের আসল উদেশ্য কেউ বুঝতে না পারে। সেনা এবং নৌবাহিনী প্রেরণের কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, খেলাফী ভূঞা-জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যবশত, হুগলীর একজন দলত্যাগী পর্তুগীজ ব্যবসায়ী এই সময় ঢাকায় এসে সুবাদারের নিকট তার স্বদেশী অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সুবাদারকে অনুরোধ জানায়। শুধু তাই নয়, সে হুগলীর পর্তুগীজদের সামরিক শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও খোঁজ খবর দেয়।

সকল প্রস্তুতি শেষে মোগল সেনাপতিরা হঠাৎ করে হুগলীর পর্তুগীজদের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে। নৌ-বাহিনী প্রথম ভাগিরথী নদীর ভাটিতে গিয়ে নদীতে লোহার চেইন বেঁধে পর্তুগীজদের নৌপথে পালাবার পথ বন্ধ করে দেয়। মোগল বাহিনী দেখে হুগলীস্থ

পর্তুগীজদের স্থানীয় সৈন্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পালিয়ে নিজ নিজ বাড়িঘরে চলে যায়। উভয় পক্ষ প্রথমে সমঝোতার চেষ্টা করে। কয়েকজন পাদ্রী মোগল সেনাপতির সঙ্গে কয়েকদিন আলাপ আলোচনা চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা ভেঙ্গে যায়। প্রায় ৩ মাস অররুদ্ধ থাকার পর পর্তুগীজরা তাদের জাহাজ, রণপোত, ছোট বড় নৌকা ইত্যাদিতে উঠে নদী পথে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। নদীর তীর থেকে মোগলরা তাদের আক্রমণ করে, কিছু জাহাজ এবং নৌকা আত্মসমর্পন করে, প্রচুর ধনসম্পদ মোগলদের হস্তগত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজরা পালিয়ে সমুদ্রে চলে যায়, এবং সমুদ্র উপকূলে বিভিন্ন চর বা দ্বীপে আশ্রয় নেয়। এই যুদ্ধে পর্তুগীজদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, মোগলদের ক্ষয় ক্ষতিও কম ছিল না। তবে মোগলরা পর্তুগীজদের হুগলী থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ৪ হাজারের বেশি পর্তুগীজ বন্দীকে দিল্লীতে সম্রাটের নিকট পাঠানো হয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মোগল নৌবাহিনী হুগলী পৌছে ভাগিরথি নদীতে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থান দখল করে। ৩ মাস অবরুদ্ধ থাকার পরে পর্তুগীজরা সেপ্টেম্বর মাসে তাদের জাহাজে করে পালাতে আরম্ভ করে এবং ঐ মাসেই যুদ্ধও শেষ হয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কাসিম খান জুয়ুনী তাঁর বিজয় সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠান, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের ৩ দিন পরে কাসিম খানের মৃত্যু হয়।

এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা আবার হুগলীতে ফিরে আসে। সম্রাট শাহজাহান তাদের নতুন একখানি ফরমান দিয়ে তাদের বাণিজ্য করার এবং স্বীয় ধর্ম পালনের অধিকার দেন। কারণ পর্তুগীজদের বিতাড়নের ফলে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় সাম্রাজ্য আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চট্টগ্রাম বন্দর তখনো আরাকানের অধীনে এবং ডাচ ও ইংরেজ বাণিকেরা সবেমাত্র বাংলায় আসা শুরু করেছে। তবে পর্তুগীজদের হুগলীতে ফিরে আসার এবং ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হলেও তারা আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি, তাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। পর্তুগীজরা বুঝতে পারে যে, তারা বেআইনী কাজ করলে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। পর্তুগীজদের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ না থাকলেও তাদের ব্যবসা মন্দা হয়ে আসে, ইংরেজ ও ডাচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যায়। পর্তুগীজরা আরো কিছু সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকলেও সতর শতকের শেষার্ধে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে তাদের নাম বাদ পড়ে যায়। তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। কেউ কেউ মোজা তৈরী, রুটি এবং বিভিন্ন প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য, আচার ইত্যাদি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। কেউ কেউ আবার ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে। সপ্তদশ শতকের শেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বা ভারত মহাসাগরে তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

পর্তুগীজদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে বাংলাদেশর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাদের অবদানের কথা কিছু বলতে হয়। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে

বিভিন্ন জিনিষ এই দেশে আনত, যেমন চীনদেশ থেকে রেশমী কাপড় এবং কাগজ, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, বোর্নিও থেকে কর্পুর, সিংহল (শ্রীলঙ্কা) থেকে চীনা বাদাম, মালাবার থেকে গোলমরিচ এবং মালদ্বীপ থেকে কড়ি আমদানী করত। তখন বাংলাদেশের ছোট খাট লেনদেনে কড়ির প্রচলন ছিল। পর্তুগীজরা বাংলাদেশ থেকে চাল, ডাল, মধু, ঘি, তেল ও মোম বিদেশে রপ্তানী করত। তারা উত্তর আমেরিকা থেকে গোলআলু ও তামাক, ব্রাজিল থেকে বাদাম, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, এবং ইউরোপ থেকে জলপাই আমাদানী করে। এই সকল ফলমূল ও সব্জীর চাষ এইদেশে তারাই প্রবর্তন করে। অনেক পর্তুগীজ স্বদেশে ফিরে না গিয়ে এই দেশে বিয়ে শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বর্তমানেও তারা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। বাংলা ভাষায়ও পর্তুগীজদের অবদান রয়েছে। পর্তুগীজরাই প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে এবং বাংলা গদ্যে বই লেখে। 'কৃপার শাস্ত্রে অর্থ ভেদ' পর্তুগীজদের লেখা একটি বই। বালতি, ছবি, সাবান, তোয়ালে, আলপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা, মেঝে ইত্যাদি পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বাংলাদেশে পর্তুগীজদের অত্যাচার, লুঠতরাজ ইত্যাদির কথা উপরে বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা সংস্কৃতিতেও তাদের কিছু অবদান রয়েছে।

সুবাদার আজম খান ও ইসলাম খান মশহাদী ঃ

কাসিম খান জুয়্যুনীর মৃত্যুর পরে আজম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি ৩ বৎসর সুবাদারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে পর্তুগীজদের হুগলীতে ফিরে আসার ও ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। তা উপরে বলা হয়েছে। সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান মশহাদীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবাদার হয়ে এসেই তাঁকে কামরূপ এবং আসাম সীমান্তের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন মোগলদের মিত্র, তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে তাঁর পুত্র বীর নারায়ণ সিংহাসনে বসেন। কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত একটি রাজ্যে পরিণত হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এখানে প্রায়ই বিদ্রোহ লেগে থাকত। ইসলাম খান মশহাদীর সুবাদারী আমলে রাজা শত্রুজিত ছিলেন কামরূপে মোগল ফৌজদার, কিন্তু তিনি আসামের রাজা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আসামের রাজার বশ্যতা স্বীকারের কথাও চিন্তা করেন। কিন্তু আসামের রাজা প্রতাপ সিংহ একজন অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যের সীমান্ত সুদৃঢ় করেন, দূর্গগুলো সংস্কার করেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন এবং কামরূপ অধিকারের জন্য তিনি প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

তিনি কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের (ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক পরাজিত এবং ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গের সময় পরলোকগত) ভাই বলদেবকে আশ্রয় দিয়ে ধরং এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বলদেব রাজা বলিনারায়ণ উপাধি নিয়ে আসামের রাজা প্রতাপ সিংহের সহায়তায় মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এতদিন ছিল তা কামরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কামরূপের বিদ্রোহী নেতারা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, কিন্তু এখন আসামের রাজার হস্তক্ষেপের ফলে আসাম-মোগল যুদ্ধে পরিণত হয়।

তা ছাড়াও আসাম-মোগল যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণও ছিল। আসামে প্রচুর হাতি পাওয়া যেত। পাবর্ত্য অঞ্চলে একটু চেষ্টা করলে খেদায় হাতি ধরা যেত। মোগল সৈন্যরা হাতি ধরার আশায় মাঝে মাঝেই আসাম অঞ্চলে হানা দিত। দ্বিতীয়ত, মোগলরা আসামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসামের মূল্যবান পণ্য হস্তগত করার প্রয়াস পায়। হাতি ছাড়া আসামে প্রচুর আগর এবং ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় স্বর্ণ পাওয়া যেত। তা ছাড়া আসামে প্রচুর মরিচ (গুলমরিচ) এবং মশলা দ্রব্য পাওয়া যেত। আসামের রাজা কোন বিদেশী ব্যবসায়ীকে তাঁর দেশে প্রবশে করতে দিত না। আসামের লোকেরা মোগলদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুপযুক্ত ছিল। তাই তারা প্রায়ই ভয় পেত যে মোগল ব্যবসায়ীরা তাদের ঠকাবে। অন্যদিকে আসামের সঙ্গে ব্যবসায়ে মোগলদের প্রচুর লাভ হত। সে যাই হোক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মোগলরা আসামের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

আসামের রাজা প্রতাপ সিংহ বিষয়টির গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে মোগলদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি আসামীদের চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং আসামের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এমনও হতে পারে যে, একদিন মোগলরা তাদের দেশ অধিকার করবে, মোগলরা কয়েকবার আসাম আক্রমণ করে তার প্রমাণও দেয়। তিনি ধুরং এর রাজা বলি নারায়ণকে মোগলদের আক্রমণ করার উৎসাহ দেন। বলি নারায়ণ ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের আক্রমণ করেন। রাজা নিজেও তাঁর সেনাপতিদের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান। সুবাদার ইসলাম খান মশহাদীও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি তাঁর ভাই জৈন-উদ-দীন খান, সেনাপতি আল্লাহ ইয়ার খান এবং অন্যান্যদের অধীনে সৈন্যবাহিনী এবং ভূঁঞা প্রধান মাসুম খান ও অন্যান্যদের অধীনে নৌ-বাহিনী পাঠান। উভয় পক্ষে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বলি নারায়ণ এবং রাজা প্রতাপ ক্ষতি স্বীকার করেও যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাজা শত্রুজিতের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মোগল সেনাপতিরাও কয়েকবার পরাজিত হয়। শত্রুজিতের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হওয়ায় সুবাদার তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় এনে প্রাণদণ্ড দেন।

উভয় পক্ষে অনেক যুদ্ধ হয়। ইতোমধ্যে সুবাদার ইসলাম খান মশহাদীকে প্রত্যাহার করা হয় এবং কয়েকজন মোগল সেনাপতিও কামরূপ থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। প্রায় ৩ বৎসরের যুদ্ধে প্রমাণ হয় যে, কোন পক্ষই প্রকৃতপক্ষে

জয়লাভ করেনি, শুধু সম্পদ ও লোক ক্ষয় হয়েছে। কামরূপে মোগল আধিপত্য বজায় থাকে, কিন্তু মোগলরা আসামের রাজার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মোগল সেনাপতি আল্লাহ ইয়ার খান এবং আসামের রাজা প্রতাপ সিংহ উভয়ে বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিই কাম্য, এই উপলব্ধিতে উভয়ে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে রাজী হন। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উভয় পক্ষে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মতে আসামের রাজা কামরূপে মোগল অধিকার স্বীকার করে নেন। মোগল কামরূপ এবং আসামের সীমান্ত নির্ধারিত হয় ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে বরনদী, দক্ষিণকূলে আসুরঁ বাধ এবং এর ফলে গৌহাটি মোগলদের অধিকারে চলে আসে। উভয় পক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনেও রাজী হয়। বাংলাদেশ ও আসামের ইতিহাসে এই চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই চুক্তি ২০ বৎসর স্থায়ী হয়।

ইসলাম খান মশহাদীর সুবাদারী আমলে হিজলির বাহাদুর খান বিদ্রোহ করলে তাঁকে দমন করা হয়। এই সময়ে আরাকানে এক রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়। আরাকানের রাজা থিরিথুধম্ম (শ্রী সুধর্ম) তাঁর রাণীর প্রেমিকের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। রাজার অল্পবয়স্ক পুত্র মিন সানি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফলে রাজার হত্যাকারী নরপতিগ্যি আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অত্যাচার আরম্ভ করলে চট্টগ্রামস্থ আরাকানের গবর্ণর মাঙ্গত রায় বাংলাদেশে পালিয়ে মোগল সুবাদারের আশ্রয় নেন। রাজা নরপাতিগ্যি মাঙ্গত রায়কে ফিরিয়ে নেওযার জন্যে এক বিশাল নৌ-বাহিনী পাঠান, ইসলাম খান মশহাদী সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। প্রায় ৩ বৎসর অত্যন্ত সফলভাবে বাংলাদেশ শাসন করার পরে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে উজীর নিযুক্ত করে রাজধানীতে নিয়ে যান।

শাহ্‌ শুজা ঃ

শাহজাহান এখন যুবরাজ শাহ্‌ শুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র। মোগল সম্রাটেরা তাঁদের সন্তান সন্ততিদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন, ধর্মীয় এবং ভাষা ও সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করতেন। শাহ শুজা প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং অত্যন্ত ধীর স্থির, রুচিবান এবং সংস্কৃতিবান রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন তেমনি যুদ্ধ এবং অস্ত্রশস্ত্র চালনায়ও পারদর্শী ছিলেন। স্বভাবতই তিনি বিনয়ী ছিলেন এবং জ্ঞানী লোকদের সাহচর্য পছন্দ করতেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে অনেক জ্ঞানী লোকের সমাবেশ দেখা যায়, বিশেষ করে ইরান থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী ও কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বাংলায় আসেন এবং তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। প্রকৃতপক্ষে সতর শতক বাংলাদেশে শিক্ষা সাংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ, ফারসি সাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ করে, শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ দেখা যায়।

শাহ্ শুজা একই সঙ্গে বাংলা এবং উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে ঢাকায় অবস্থান নেন, কিন্তু পরে রাজমহলে চলে যান। তিনি রাজমহলে থাকায় ঐ স্থান তখন রাজধানীতে পরিণত হয়। শুজার সুবাদারী আমল শান্তির সময় নামে পরিচিত। এই প্রথম বাংলাদেশে একজন মোগল রাজপুত্র সুবাদারের দায়িত্ব নিয়ে আসেন, ভুঁঞা-জমিদারেরা তাতেই ভয় পেয়ে যান এবং বিদ্রোহ করার কথা চিন্তাই করেনি। শুধু হিজলীর বাহাদুর খান রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব করলে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। তিনি উড়িষ্যায় প্রথমে মুহাম্মদ জামান তেহরানী এবং পরে অন্যান্য উপযুক্ত শাসকদের নিযুক্ত করে উড়িষ্যা শাসন করেন। একজন মোগল যুবরাজ সুবাদার নিযুক্ত হওয়ায় কামরূপও শান্ত থাকে এবং আসামের রাজাও কোন সমস্যা সৃষ্টিতে সাহস করেননি। তাই ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তি বলবৎ থাকে, মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দিলে দুই পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হত। শাহ্ শুজা ২০ বৎসর কাল বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, এই সময়ে দেশে শান্তি বিরাজ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ছাড়াও শাহ শুজার সময় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এর কারণ শুজার রাজস্ব সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি। সম্রাট আকবরের সময়ে রাজা তোডরমল্ল রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, কিন্তু তখনো সারা বাংলা মোগল অধিকারে আসেনি। তাই তোডরমল্ল পুরনো আমলের রেকর্ডপত্র অনুসরণ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খান চিশতী চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলাদেশে জয় করেন, এমন কি কামরূপ এবং কাছাড়ও মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময়ে এবং শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন না করে তোডরমল্লের বন্দোবস্তই অনুসরণ করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন প্রায় ৫০ বৎসরেরও বেশি সময়ে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, নদী-মাতৃক বাংলাদেশে নদী-সিকস্তির ফলে কোন কোন কৃষি ভূমি নদী গর্ভে বিলীন হয়, আবার কোন কোন স্থানে নতুন চর জেগে উঠে, তাই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাও পরিবর্তনের (বা আধুনিকীকরণের) প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া তোডরমল্লের বন্দোবস্তের পরে কামরূপ বিজিত হয় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা মোগল শাসনভুক্ত হয়। শাহ শুজা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করে রাজস্ব ব্যবস্থা পুর্নগঠন করেন। ফলে সুবা বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। শাহ শুজার সময়ে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। ষোল শতক থেকে ইউরোপীয়দের মধ্যে একমাত্র পর্তুগীজরাই বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল, কিন্তু সতর শতকের তৃতীয় দশক থেকে ডাচ এবং ইংরেজ বণিক কোম্পানীও বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। প্রথম প্রথম তারা পর্তুগীজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না, কিন্তু পর্তুগীজদের পতনের সুযোগে ডাচ ও ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তারা দেশীয় মোগল সরকারের নিকট থেকে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধাও লাভ করে। শাহ শুজার

সময় জিব্রাইল বাউটন নামক একজন ইংরেজ সার্জন বা শৈল্য চিকিৎসক রাজধানীতে চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং শুজার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাউটনের অনুরোধে শুজা ইংরেজ কোম্পানীকে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা শুল্কের বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। এতে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

শাহ শুজা স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন, তাঁর স্থাপিত ইমারতগুলো এখনো দর্শকদের মুগ্ধ করে। শুজা সুবাদার নিযুক্ত হয়ে প্রথমে ঢাকা আসেন, তাই ঢাকায় তিনি কয়েকটি ইমারত নির্মাণ করেন। মীর আবুল কাসেম ছিলেন পূর্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, শুজার আদেশে তিনি ঢাকায় বড় কাটরা নির্মাণ করেন। শুজার ইচ্ছা ছিল তিনি এখানে বাস করবেন, কিন্তু নির্মিত হওয়ার পরে তা পছন্দ না হওয়ায় তিনি এখানে অবস্থান না করে ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর সুবাদারী আমলে ঢাকায় চুরিহাট্টা মসজিদ এবং হোসেনী দালান নির্মিত হয়। ঢাকায় শুজার আর একটি কীর্তি ঈদগাহ, বর্তমান পিলখানার উত্তরে এটা অবস্থিত। রাজমহলেও শুজার কীর্তি রয়েছে, সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়, ইহা সঙ্গী দালান বা পাথরের প্রাসাদ নামে পরিচিত। তিনি রাজমহলে একটি দীঘি খনন করেন, এর নাম দেন আনন্দ সরোবর, এই দীঘির পাড়ে দীওয়ান-ই-আম, দীওয়ান-ই-খাস, পানির ফোয়ারা, পানির হাউজ বা আধার, হাম্মামখানা বা স্নানাগার ইত্যাদি নির্মাণ করেন। রাজমহলে শুজার আর এক কীর্তি রাজমহলের জামে সমজিদ।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ঃ শুজার আরাকানে পলায়ন ও মৃত্যু :

শাহ শুজা প্রায় ২০ বৎসর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বাংলা ও উড়িষ্যার শাসন পরিচালনা করেন। দেশে মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজ করত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়, কৃষির উন্নতি হয়, এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের শিল্পেরও প্রসার ঘটে। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে বাংলাদেশসহ সারা মোগল সাম্রাজ্যে যুদ্ধের ঘনঘটা নেমে আসে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে শাহজাহান রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রথম এক সপ্তাহ তাঁর জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। সম্রাট দরবারে উপস্থিত হতে না পারায় চারিদিকে রটে যায় যে সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে।

শাহাজাহানের ৪ পুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ সম্রাটের নিকটে রাজধানীতে ছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র শুজা বাংলা-উড়িষ্যার সুবাদার, তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজের দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। প্রত্যেকেই জানতেন যে, সম্রাটের মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে ভাইদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হবে এবং প্রত্যেকেই সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। শাহজাহান জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃত্যুর পরে দারা সিংহাসনে বসবেন, এই কারণে দারাকে তিনি সঙ্গে রাখতেন। দারা ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও

উদার, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না এবং তিনি মজমুউল বাহরাইন নামক একখানি বই লেখেন। শুজা সুন্নী ছিলেন, তিনিও উদার ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, শক্তি, সাহস এবং রণকৌশলে তাঁর ভাইদের চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী, তিনি অন্য ভাইদের পছন্দ করতেন না, বিশেষ করে দারার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল। ছোট ভাই মুরাদ ছিলেন হঠকারি, ধীরসুস্থে সমাধানে পৌছার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, অহেতুক তিনি নিজেকে সকলের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। অতএব ৪ ভাই এর মধ্যে স্বভাব চরিত্রের পার্থক্য ছিল। তাই যুবরাজেরা যেমন জানত, সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ আমীর ওমরারাও জানত যে সম্রাটের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের মৃত্যু না হলেও রাজদরবারে সম্রাটের অনুপস্থিতির ফলে যুবরাজেরা নিশ্চিতভাবে ধরে নেন যে সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে, দারা নিজের সিংহাসন নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছেন। দারা নিজেও এই সময় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন, তিনি রাজধানী থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে রাজধানীতে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ করে দেন, এতে যুবরাজদের সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। অতএব শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ সকলেই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। মোগল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকারের কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না, যুবরাজেরা সকলেই উত্তরাধিকারের দাবী করতে পারতেন এবং সিংহাসন লাভের জন্য শক্তি প্রয়োগ এমন কি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান উভয়েই স্ব স্ব পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে শান্তিতে নিরাপদে বাস করার সুযোগও ছিল না। যে কোন একজন যুবরাজ সিংহাসনে বসলে তিনি অন্য ভাইদের যে নিরাপদে থাকতে দেবেন এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না, হুমায়ুনকে তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর প্রতিদ্বন্দী আপন ছেলে খসরুকেও পরাজিত ও অন্ধ করে দেন। অতএব যুবরাজদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তাঁদেরকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

চারজন যুবরাজই উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সম্রাটের অসুস্থতার সংবাদ শুনে শুজা রাজমহলে ১৬৫৭ খ্রিস্টাদের নবেম্বর মাসে সিংহাসনে বসেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্যে সসৈন্য দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। আওরঙ্গজেব এবং মুরাদও স্ব স্ব স্থানে সিংহাসনে বসে দিল্লীর দিকে সসৈন্যে যাত্রা করেন। শাহজাহান ছেলেদের সম্ভাব্য রক্তপাতের কথা চিন্তা করে বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং একটু সুস্থ হয়ে প্রত্যেককে জানিয়ে দেন যে, তিনি সুস্থ আছেন, সুতরাং যুবরাজদের স্ব স্ব প্রদেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু যুবরাজদের তখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। শুজা প্রায় ৪০ হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক সৈন্য এবং অনেক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধ

জাহাজ নিয়ে রাজমহল থেকে যাত্রা করেন। তিনি বিহারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে বিহারের সুবাদার তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে (১৬৫৮ খ্রিঃ) বারানসী পৌঁছেন এবং বারানসীর নিকটে বাহাদুরপুর নামক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। অন্যদিকে দারা তাঁর ছেলে সোলায়মান শিকোহ এবং মিরযা রাজা জয়সিংহের অধীনে এক বিশাল বাহিনী শুজার বিরুদ্ধে পাঠান। উভয় পক্ষ বাহাদুরপুর প্রান্তরেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে শুজা পরাজিত হয়ে নিকটস্থ নদীতে অবস্থানরত রণপোতে উঠে পলায়ন করেন। যুদ্ধে শুজার শোচনীয় পরাজয় হয়। তিনি শিবির এবং শিবিরের সমস্ত ধনসম্পদ ফেলে চলে আসেন। শুজা মুঙ্গের এসে আবার তাঁর পলায়নরত সৈন্যদের একত্রিত করেন এবং নতুন সৈন্যও সংগ্রহ করেন। ঐদিকে সোলায়মান শিকোহ শুজার পেছন পেছন অতি দ্রুত বেগে অগ্রসর হন। তিনি শুজাকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন কিন্তু পিতার নিকট থেকে তাড়াতাড়ি রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আদেশ পান। কারণ ইতোমধ্যে দারা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে পড়েন। সোলায়মান শিকোহ শুজার সঙ্গে এক চুক্তি করে মুঙ্গের থেকে পূর্ব দিকে সমগ্র মোগল রাজ্য শুজার অধিকারে দিতে স্বীকৃত হন। চুক্তি করে সোলায়মান শিকোহ তাড়াতাড়ি দিল্লীর দিকে ফিরে যান।

সোলায়মান শিকোহ পিতার নিকট ফিরে যেতে পারেননি। ইতোমধ্যে সামুগড়ের যুদ্ধে দারা আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হন। শুজাকে এখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে দারাকে তাড়া করে পাঞ্জাবে গেলে শুজা আবার রাজমহল থেকে যাত্রা করেন। আওরঙ্গজেব যুবরাজ মুহাম্মদ সুলতানকে শুজার বিরুদ্ধে পাঠান। শুজা এলাহাবাদ পার হয়ে খাজওয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। যুবরাজ মুহাম্মদ সুলতানও সসৈন্যে সেখানে এসে পৌঁছেন। পরে আওরঙ্গজেব নিজে সেখানে আসেন এবং সেনাপতি মীর জুমলাও এসে উপস্থিত হন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারী তারিখে সংঘঠিত এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ প্রাণপণ যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়া মানে দিল্লীর সিংহাসন হারান, তাই উভয় পক্ষ সকল বিপদ, এবং বাধা উপেক্ষা করে, সারাদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। শুজার সৈন্যসংখ্যা কম হলেও তাঁর সেনাপতিরা অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের ব্যূহ কয়েকবার অতিক্রম করে। সকলেই ধরে নেয় যে, শুজা জয়লাভ করবেন, কিন্তু আনন্দেই হোক বা ভুল করেই হোক, শুজা জয়ের মুহূর্তেই হাতির পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়েন। সৈন্যরা শুজাকে হাতির পিঠে না দেখে হতাশ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। শুজা এবং সেনাপতিরা অনেক চেষ্টা করেও সৈন্যদের ফেরাতে পারেনি। শুজা পরাজিত হন, সকলেই বলাবলি করতে থাকে যে শুজা জয়ী হতে হতে পরাজিত হন।

শুজা পরাজিত হয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন, আওরঙ্গজেব সেনাপতি মীর জুমলা এবং যুবরাজ মুহাম্মদ সুলতানকে শুজার পশ্চাদ্বাবন করতে পাঠান এবং নিজে রাজধানী দিল্লীতে ফিরে যান। শুজা প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সম্রাটের বাহিনীকে বাধা দেন, তাঁর নৌ-বাহিনী অটুট ছিল কিন্তু আওরঙ্গজেবের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। শুজা নৌ বাহিনীর সহায়তায় গঙ্গা নদীকে ভিত্তি করে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেক কৌশলগত স্থানে শত্রুদের বাধা দেন। মীর জুমলার বাহিনী স্থলযুদ্ধে এবং শুজা নৌযুদ্ধে সুবিধা করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত মীর জুমলার জয় হয়। শুজা, মুঙ্গের, রাজমহল, ভাগিরথী নদীর তীরে মখসুসাবাদ, দোগাচ্ছি ইত্যাদি স্থানে মীর জুমলাকে বাধা দেন। বিহারের সুবাদার দাউদ খান মীর জুমলার সঙ্গে যোগ দেন এবং সম্রাটের আদেশে নতুন একটি যুদ্ধফ্রন্ট খোলেন। এতে শুজা বেকায়দায় পড়ে যান। তাছাড়া স্থানীয় জমিদারেরাও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি, বরং সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে। শুজার জয়লাভ অনিশ্চিত হওয়ায় উচ্চ পদস্থ প্রাদেশিক কর্মকর্তারাও শুজার পক্ষ ত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত শুজা তাঁড়ায় আশ্রয় নেন, কিন্তু তাঁড়ার পতন আসন্ন দেখে সপরিবারে ঢাকা যাত্রা করেন। তিনি নিজেও বুঝতে পারেন যে সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব হবে না। তাই তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আরাকানের রাজার নিকট থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে শুজা পরিবার পরিজন এবং অল্প সংখ্যক অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি সেনানায়ক নিয়ে আরাকানে চলে যান।

পরাজিত এবং বিষন্ন শুজা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে ঢাকা পৌছেন। সেখান থেকে ৬মে তারিখে ভুলুয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ৬দিন পর ১২ মে তারিখে আরাকানের রাজার পাঠানো জাহাজে করে আরাকানের উদ্দেশে ভুলুয়া ত্যাগ করেন। তিনি ৩ জুন কর্নফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে দেয়াঙ পৌছেন এবং সেখান থেকে সড়ক পথে যাত্রা করে ২৬ আগষ্ট তারিখে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং বা রোসাঙ্গ পৌছেন। শুজা তাঁর বিজয়ী ভাই আওরঙ্গজেবের নিকট আত্মসমর্পন করতে রাজী হলেন না। আওরঙ্গজেব দারা এবং মুরাদকে হত্যা করেন এই খবর তিনি জানতেন। তাই তিনি ভাই এর হাতে প্রাণ হারানোর চেয়ে আরাকানে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয় মনে করেন। অবশ্য আরাকানে থেকে যাওয়া শুজার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মক্কা বা সেখান থেকে তুরস্কে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ না হওয়ায় আরাকানে গিয়ে সেখানে থেকে শীতকালে মক্কা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আরাকনের রাজাও তাঁকে সুবধিাজনক সময়ে মক্কা যেতে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। শুজা আরাকানে পৌছলে রাজা তাঁকে গ্রহণ করেন এবং অনুচরাদিসহ তাঁকে থাকার ব্যবস্থা করেন। কিছু দিন ভাল সম্পর্ক থাকার পর হঠাৎ আরাকানের রাজার সঙ্গে শুজার মতবিরোধ দেখা দেয়। এক সূত্রে বলা হয় শুজার ধন সম্পদের প্রতি আরাকানের

রাজার লোভ হয়, অন্য সূত্রে শুজার সুন্দরী কন্যার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ে এবং রাজা বিয়ের প্রস্তাব দেন, আবার অন্য সূত্রে শুজা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কারণ যাই হোকনা কেন, উভর পক্ষের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে এবং আরাকানের রাজার ষড়যন্ত্রে শুজা সপরিবারে নিহত হন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে শুজা নিহত হন। বাংলার একজন সফল সুবাদার এবং একজন মোগল রাজপুত্র শাহ শুজার এইভাবেই জীবনাবসান হয়।

শাহাজাহানের সময়ে সুবাদারদের তালিকা

১। কাসিম খান জুয়ুনী	১৬২৮-১৬৩২
২। আজম খান	১৬৩২-১৬৩৫
৩। ইসলাম খান মশহাদী	১৬৩৬-১৬৩৯
৪। শাহ শুজা	১৬৪০-১৬৬০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে বাংলাদেশ

মীর জুমলা ঃ

সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী যুবরাজ শাহ্ শুজাকে অনুসরণ করে সেনাপতি মীর জুমলা বাংলায় আসেন। শুজাকে পরাজিত করে আরাকানে তাড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব মীর জুমলার। মীর জুমলা ইরানের একজন হীরক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডায় আসেন, পরে নিজে হীরক ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। তাঁর হীরক বস্তায় করে মাপা হত। তিনি গোলকুণ্ডার সুলতানের উজীর নিযুক্ত হন, এবং সুলতানের সঙ্গে মতবিরোধ হলে তিনি মোগল সম্রাট শাহাজাহানের চাকুরি গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল তাই উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষ গ্রহণ করেন। শুজার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যেরূপ সাহসিকতা ও শৌর্যের পরিচয় দেন তা প্রশংসনীয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং খেলাত ও বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে সম্মানিত করেন।

মীর জুমলা শুজাকে অনুসরণ করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৯মে তারিখে ঢাকায় পৌছেন। সুজা ৩ দিন আগে আরাকানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময় শুজা বাংলাদেশ ছেড়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলে ঢাকা, কামরূপ ইত্যাদি অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। অতএব সুবাদার হয়ে মীর জুমলার সামনে তিনটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন, কামরূপ পুনরধিকার করা এবং শুজাকে প্রত্যর্পনে আরাকানের রাজাকে বাধ্য করা। মীর জুমলা তখন আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমীচিন মনে করলেন না, তবে আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে তিনি কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে মনযোগ দেন, তবে বাংলার সুবাদার হিসেবে তাঁর প্রধান কীর্তি কোচবিহার, কামরূপ ও আসাম বিজয়।

মীরজুমলা রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় পুনরায় স্থানান্তর করেন। ফলে তিনি ভূঞা-জমিদারদের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে সমর্থ হন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কোন কোন জমিদার বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়। হিজলীর বাহাদুর খানকে শুজা ঢাকায় নিয়ে আসেন, কিন্তু শুজা যুদ্ধের জন্য উত্তর ভারতের দিকে গেলে বাহাদুর খান পালিয়ে হিজলী চলে যান। মীর জুমলা তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অন্যান্য জমিদারেরা মীর জুমলার এই পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ করে সৎপথে ফিরে আসে। মীর জুমলা ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁর ন্যায় বিচারের বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর

ন্যায় বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন, পরাজিত শত্রুদের স্বার্থের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখতেন এবং পরাজিত শত্রুদের উপর অত্যাচার না করার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদের কঠোর নির্দেশ দিতেন। ফলে তাঁর সময়ে সুবার প্রশাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। মীর জুমলা একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন, ইউপরোপীয় কোম্পানী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবসায়িক লেনদেন দিল। তাই ব্যবসায়ীদের অনিয়ম, অবৈধ ব্যবসা এবং কর-ফাঁকি ইত্যাদি তিনি ভাল বুঝতেন এবং সেই হিসেবে ব্যবস্থা নিতেন।

মীর জুমলা প্রায় ৩ বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ১৭ মাস তিনি কোচবিহার, কামরূপ ও আসামের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বাকী প্রায় ১৭ মাস সময় তিনি রাজধানী ঢাকায় থেকে প্রশাসনিক পুর্নগঠন করেন এবং শান্তি শৃংঙ্খলা স্থাপনে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি স্থাপত্য শিল্পেও মনযোগ দেন। তিনি দুইটি রাস্তা নির্মাণ করেন এবং রাস্তায় প্রয়োজন মত পুল তৈরী করেন। মীর জুমলার নির্মিত প্রথম রাস্তাটি ঢাকা থেকে ধাপা (বর্তমান ফতুল্লা) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই রাস্তা আরো বিস্তৃত হয়ে নারায়ণগঞ্জের অদূরে খিজিরপুর (বর্তমানে হাজিগঞ্জ নামে পরিচিত) পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্রাট আকবরের সময় থেকে খিজিরপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দুইটি দুর্গ ছিল এবং সারা মোগল আমলে খিজিরপুরের সামরিক গুরুত্ব ছিল। কোচবিহার কামরূপ এবং আসাম এবং অন্যদিকে আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে খিজিরপুর ছিল সামরিক এবং নৌ-ঘাঁটি। ফতুল্লার অদূরে পাগলা পুলও মীর জুমলার কীর্তি। মীর জুমলার নির্মিত দ্বিতীয় রাস্তাটি ঢাকা থেকে উত্তর দিকে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে এই রাস্তা ময়মনসিংহ রোড নামে পরিচিত। টঙ্গীতে তিনি দুর্গ এবং তুরাগ নদীর উপর একটি পুল নির্মাণ করেন এবং ঢাকার কার্জন হলের সম্মুখে নির্মিত ঢাকা গেইট বা প্রধান ফটকটিও মীর জুমলার নাম বহন করে। এই দুইটি রাস্তাই সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তাদ্বয় ব্যবসায়িক এবং সাধারণ যোগাযোগের ভিত্তিও স্থাপন করে।

মীর জুমলার কোচবিহার, কামরূপ ও আসাম বিজয় ঃ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে কোচবিহারের রাজা ছিলেন রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কামরূপের রাজা ছিলেন পরীক্ষিত নারায়ণ। পরীক্ষিত নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ বীর যোদ্ধা, কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণ সেই তুলনায় ছিলেন ভীরু। তাই লক্ষ্মী নারায়ণ পরীক্ষিতের ভয়ে তটস্থ্ থাকতেন এবং সেই জন্য মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন এবং সামন্ত রাজ্যে পরিণত হন। কিন্তু পরীক্ষিত নারায়ণ মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অস্বীকৃতি জানান, ইসলাম খান চিশতী তাঁকে পরাজিত করে কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিশৃঙ্খলা

দেখা দেয়। শুজা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কোচবিহার কামরূপের উপর মোগল কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে কোচবিহারের রাজা ছিলেন লক্ষ্মী নারায়ণের পৌত্র প্রাণ নারায়ণ এবং আসামের রাজা হন জয়ধ্বজ সিংহ। শুজার অনুপস্থিতিতে রাজা প্রাণ নারায়ণের মনে স্বাধীন হওয়ায় সাধ জাগে। তিনি মোগলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন যে, মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত কামরূপের উপরও তাঁর অধিকার রয়েছে, কারণ তাঁর প্রপিতামহ কামরূপসহ সারা কোচবিহারের অধিপতি ছিলেন। রাজা প্রাণ নারায়ণ তাঁর সেনাপতি ভবনাথকে কামরূপ জয়ের জন্য পাঠান এবং কামরূপের স্থানীয় সামন্তদের আদেশ দেন যেন তারা তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। গৌহাটিতে মোগল ফৌজদার ছিলেন মীর লুৎফুল্লাহ শিরাজী, ভবনাথ গৌহাটি আক্রমণ করেন।

কোচবিহার ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং প্রাণ নারায়ণ ছিলেন ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা। অন্যদিকে আসাম ছিল একটি বিস্তৃত রাজ্য, পার্বত্য এলাকা হলেও জনসংখ্যা এবং ধন সম্পদে ভরপুর। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি মতে বাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিত হয়। অতএব চুক্তি বলবৎ থাকাকালে আসামের সঙ্গে মীর জুমলার বিরোধের কোন কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সুযোগে রাজা জয়ধ্বজ সিংহও আসামের সীমান্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন। কামরূপ থেকে মোগলদের বিতাড়নে তাঁর অমত ছিলনা, কিন্তু কোচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ কামরূপ জয় করে শক্তিশালী হোক এটাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। কারণ মোগলরা যেমন আসামের জন্য বিপদজনক, শক্তিশালী কোচবিহার-কামরূপও তাঁর জন্য অশান্তির কারণ হতে পারে। তাই তিনি প্রাণ নারায়ণকে বাধা দিতে প্রস্তুত হন এবং তাঁর সৈন্যবাহনীকে গৌহাটির দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন।

মোগল ফৌজদার লুৎফুল্লাহ শিরাজীর এখন দুই দিকেই বিপদ। এতদিন তিনি প্রাণ নারায়ণের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলেন, এখন আসামের বাহিনী অগ্রার হওয়ায়, তিনি দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মহাবিপদের সম্মুখীন হন। তাঁর পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য বা নৌ-বাহিনী ছিল না। সুবাদার শুজার অনুপস্থিতিতে ঢাকা বা রাজমহল থেকে সাহায্য পাওয়ার উপায়ও ছিল না। তাই তিনি পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন, এবং সৈন্য বা নৌকা যা যোগাড় করতে পারেন তারই সাহায্যে পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গৌহাটি ত্যাগ করে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। আসামের বাহিনী গৌহাটি পৌঁছে দেখে যে, গৌহাটি খালি, কোন মোগল সৈন্য সেখানে নেই। মোগলরা ঘোড়া বা ছোট বড় কামান যা ফেলে যায় তা তাদের হস্তগত হয়। তারা গৌহাটিতে লুঠতরাজ করে এবং সারা কামরূপে লুণ্ঠন চালায় এবং মূল্যবান যা কিছু পায় তাদের স্বদেশ আসামে পাঠিয়ে দেয়। এতে বিপদ হয় প্রাণ নারায়ণের, মোগলদের বিতাড়িত করা তাঁর জন্য সহজ ছিল, কারণ মোগলরা সংখ্যায় ছিল কম, এবং ঢাকা থেকে সাহায্য পাওয়ার উপায়ও তাদের ছিল না, কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকার

রাজা জয়ধবজ সিংহকে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা প্রাণ নারায়ণ এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আসামের রাজার নিকট সমঝোতার প্রস্তাব দেন এবং কামরূপকে বিভক্ত করে একভাগ তাঁর অধীনে রাখার এবং অন্যভাগ আসামের রাজাকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাজা জয়ধ্বজ সিংহ এতে রাজী হলেন না, বরং তিনি প্রাণ নারায়ণকে কামরূপ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব মীর জুমলা বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করার সময়ে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

কোচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ মোগলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হয়ে যান এবং কামরূপ আসামের রাজার অধীনে চলে যায়। ১৬৩৯ সালে মোগলদের সঙ্গে আসামের রাজার যে চুক্তি হয় সেটা বাতিল হয়ে যায়। আসামের রাজাই মোগলদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ আগ্রাসী তৎপরতায় একতরফা ভাবে এই চুক্তি বাতিল করেন। এই চুক্তি বাতিলে মোগলদের কোন দোষ ছিল না।

অতএব মীর জুমলা কোচবিহার এবং আসাম দুই শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি কোচবিহার ও আসামের বিরুদ্ধে দুইটি বাহিনী পাঠান এবং নিজেও অগ্রসর হন। রাজা প্রাণ নারায়ণ এবং আসামের রাজা উভয়ে খবরাখবর রাখতেন। তাঁরা উভয়ে বুঝতে পারেন যে, উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শেষ হওয়ায় নতুন সুবাদার মীর জুমলা তাঁদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবেন। প্রাণ নারায়ণের পক্ষে মোগল বাহিনীকে বাধা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তিনি সুবাদারের নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁর অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু মীর জুমলা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে মিরযা বেগ ও সুজন সিংহ নামক সেনাপতিকে কোচবিহার অধিকারের আদেশ দিয়ে পাঠান। আসামের রাজাও অনুতপ্ত হয়ে দূত পাঠান এবং বলেন যে, কামরূপ তাঁর অধিকারে রাখার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। প্রাণ নারায়ণের আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্যই তিনি কামরূপ জয় করেছেন। এখন তিনি কামরূপ মোগলদের নিকট ফেরৎ দেবেন। মীর জুমলা আসামের রাজার নিকট থেকে কামরূপের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য রশীদ খানকে পাঠান।

মীর জুমলা নিজে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ লা নবেম্বর তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবে দিলির খানকে সঙ্গে নেন। তাঁদের সঙ্গে ১২ হাজার অশ্বরোহী, ৩০ হাজার পদাতিক বাহিনী এবং ৩ শতেরও বেশি রণপোত ছিল। দেড় মাসের মধ্যে কোচবিহার অধিকৃত হয়। রাজা প্রাণ নারায়ণ ও উজীর ভবনাথ পালিয়ে পর্বতে আশ্রয় নেন এবং মীর জুমলা রাজধানী কামতাপুরে গিয়ে শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। মীর জুমলা ১৬দিন কামতাপুরে অবস্থান করে সেখান থেকে ফিরে এসে আসামের দিকে অগ্রসর হন। ফিরে আসার আগে তিনি কোচবিহারের শাসন পুনর্গঠন করেন। আগে এটা ছিল মিত্র রাজ্য, কিন্তু রাজা প্রাণ নারায়ণের পলায়নের পরে তা মোগল

সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। আসকর খানকে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি তখনো না পৌছায় তাঁর অনুপস্থিতিতে ইসফনদিয়ার বেগ অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। কামতাপুরের নাম পরিবর্তন করে আলমগিরনগর রাখা হয়।

মীর জুমলা কোচবিহার থেকে কামরূপের দিকে যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে রশীদ খান কামরূপের অধিকার বুঝে নিতে গিয়ে দেখেন যে, আসামের রাজা প্রকৃত অবস্থা গোপন করে মীর জুমলাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রশীদ খান বুঝতে পারেন যে, রাজা বাইরে শান্তির কথা বলে ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আসামের বাহিনী অসংখ্য পরিখা খনন করে দূর্গের প্রতিরক্ষায় চেষ্টিত হয় এবং রাজা সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে থাকেন। অতএব মীর জুমলা কোচবিহার বিজয় সম্পন্ন করে কামরূপের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু কামরূপে মোগলরা কোন বাধাই পেল না, অহোমরা কামরূপের যোগী- ঘোপা দূর্গে মোগলদের বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করে, কিন্তু হঠাৎ সেখানে মহামারী দেখা দেওয়ায় তারা ঐ দূর্গ ত্যাগ করে। প্রায় বিনা বাধায় মীর জুমলা সারা কামরূপ পুনর্দখল করে নেন। ঢাকা থেকে যাত্রার ৩ মাস এবং কোচবিহার থেকে যাত্রার ১ মাসের মধ্যে কামরূপ বিজিত হয় এবং মীর জুমলা সম্পূর্ণ মোগল এলাকা পুনর্দখল করেন। মোগল সামরিক শক্তির প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন মীর জুমলা এই বিজয়ের পরে কি ফিরে আসবেন, নাকি আসামের রাজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসাম আক্রমণ করবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মীর জুমলা আসাম আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

মীর জুমলা তাঁর সৈন্যবাহনীকে দুইভাগ করে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ তীর দিয়ে অগ্রসর হন, নদীতে নৌ-বাহিনী থাকায় সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ থাকে। আসামের আবহাওয়া এবং আসামে যুদ্ধের রীতি বাংলাদেশ বা অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। আসাম পার্বত্য দেশ, ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ, জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা তৈরী করে মোগল সৈন্যদের পথ করে নিতে হয়। আসামের সৈন্যরা ঘোড়া দেখেই ভয় পেত, তারা কোনদিন অশ্বারোহীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করেনি। তদুপরি আসামের সৈন্যরা দিনে যুদ্ধ করত না, রাতে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধে তারা অভ্যস্ত ছিল। মীর জুমলাকে এই সব বিষয় চিন্তা করতে হয় এবং সেনা শিবির অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রহরার ব্যবস্থা করতে হয়। একটা নিয়মিত দূরত্বের মধ্যে মোগলদের প্রহরা চৌকি, সেনা-শিবির এবং থানা স্থাপন করে প্রতিপক্ষের চোরাগুপ্তা হামলার প্রতিরোধ করতে হয়। আসামের সৈন্য দু'একটি দূর্গে মোগলদের বাধা দিয়ে পরাজিত হয়, রাজা বুঝতে পারেন যে মোগলদের বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সুবাদারের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠালে মীর জুমলা তা প্রত্যাখ্যান করেন। অল্প সময়ের মধ্যে মীর জুমলা আসামের রাজধানী ঝাড়গাঁও দখল করেন, রাজা দূর্গম পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নেন। রাজধানী ঝাড়গাঁও দিখু নদীর তীরে অবস্থিত, আসলে এটা একটি নালা, বর্ষা কালে নদীর রূপ নেয়। তাই মীর জুমলা সেখানে রণপোত নিতে পারেননি,

রণপোতগুলো লখৌ বা লখুগরে অবস্থান নেয়। এই পর্যন্ত মীর জুমলার অভিযান ঠিক ভাবেই চলছিল, শত্রুপক্ষের বিশেষ বাধা না থাকায় তিনি মনের আনন্দে ১৭ মার্চ (১৬৬২) তারিখে ঝাড়গাঁও প্রবেশ করেন। তিন চারদিন পরে বর্ষা শুরু হয়ে যায় এবং ঘোরবর্ষায় মীর জুমলা বুঝতে পারেন তিনি ঝড়গাঁও গিয়ে কি ভুল করেছেন। যেই দিখু ছিল একটি ছোট নালা সেটা বিরাট খরস্রোতা নদীতে পরিণত হয়। ঝাড়গাঁও এবং নিকটস্থ মথুরাপুরে কিছু শুষ্ক উঁচু জায়গা ছিল কিন্তু পাহাড়-পর্বতের নীচে উপত্যকা সমুদ্রের রূপ নেয়। মোগল সেনাপতিরা যে যেখানে ছিল সেখানে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আটকা পড়ে যায়। তদুপরি আসামের সৈন্যরা সুযোগ পেলেই নৈশ আক্রমণ চালাতে থাকে। মীর জুমলা ঝাড়গাঁও সেনাপতিদের হাতে দিয়ে নিজে মথুরাপুরে আশ্রয় নেন। মোগল সৈন্যরা বীর বিক্রমে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে, কিন্তু মোগল শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। লখৌতে অবস্থান রত নৌ সেনাদের অসুবিধা ছিলনা, তারা ঢাকা থেকে নিয়মিত সরবরাহ পেতে থাকে, কিন্তু সেই খাদ্য শষ্য ঝাড়গাঁও বা মথুরাপুরে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মথুরাপুরে থাকার সময়ে মীর জুমলা অসুস্থ হয়ে পড়েন, মথুরাপুর থাকার জন্য উপযুক্ত হলেও বর্ষাকালে মথুরাপুরের আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে আসামের রাজা এবং সেনাপতিরা বর্ষাকালের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা জানতেন যে বর্ষাকালে মোগলদের অবস্থা খারাপ হবে, তাদের খাদ্যাভাব দেখা দেবে, ঘোড়া এবং অন্যান্য পশু খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরবে। প্রকৃত পক্ষে খাদ্যাভাবে মোগল সৈন্য এবং ঘোড়াসহ পশু মৃত্যুবরণ করতে থাকে। আসামের রাজা আশ্রয়স্থান থেকে বাইরে এসে সৈন্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং সেনাপতিরাও তৎপর হন। মোগলরা যখন এইভাবে চরম প্রতিকূল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল, মোগল সৈন্য ও সেনাপতিদের দৃঢ় মনোবল তাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। অনেক চেষ্টা করেও শত্রুরা মোগলদের পরাজিত করতে পারেনি, মোগলদের অসুবিধা ছিল শুধু খাদ্যাভাব এবং যোগাযোগের অভাব। এই ভাবে ৬ মাস অতিবাহিত হলে মোগলদের দুঃখের দিন শেষ হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে বর্ষার প্রকোপ কমে আসে, অক্টোবরের মধ্যে পথঘাট চলাচলের উপযোগী হয় এবং ঐ মাসের শেষ দিকে মোগল সৈন্যরা খাদ্যশষ্যের প্রথম চালান লাভ করে। কিন্তু মোগল সৈন্য সংখ্যা ঘোড়া এবং অন্যান্য ভারবাহী পশু অনেক কমে যায়, তবুও মোগলরা পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। আসামের রাজা আবার দূর্গম পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নেন, তিনি বুঝতে পারেন যে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ হবে না। তিনি মীর জুমলার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। মীর জুমলা প্রথমে রাজী হতে চাননি, তাঁর ইচ্ছা ছিল সমগ্র আসাম জয় করা এবং তিনি রাজার পেছনে অনুসরণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। মীর জুমলার অসুস্থতাও ইতোমধ্যে বেড়ে যায়। তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়তেন, চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাঁরা সুবাদারকে ঢাকায় ফিরে

গিয়ে সুচিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ দেন। সকল দিক বিবেচনা করে মীর জুমলা আসামের রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হন।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে (১৬৬২) উভয় পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, রাজা প্রচুর অর্থ দেন এবং তাঁর এক মেয়ে সম্রাটের হারেমে পাঠাবার জন্য স্বীকৃত হন। তিনি সম্রাট এবং সুবাদারের জন্য হাতিও পাঠান এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণকুলে বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড মোগলদের অধিকারে ছেড়ে দেন। মীর জুমলা চুক্তি সম্পাদন করে এবং কামরূপ সহ আসামের রাজা কর্তৃক ছেড়ে দেওয়া এলাকায় শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করে ফিরে যান। আসামে থাকতেই তিনি সংবাদ পান যে, অধিকৃত কোচবিহার মোগলদের হাতছাড়া হয়েছে, পলাতক রাজা প্রাণ নারায়ণ সুযোগ বুঝে কোচবিহারে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থানরত মোগল সৈন্যদের তাড়িয়ে দেন। মীর জুমলার ইচ্ছা ছিল আসাম থেকে ফিরে আসার পথে তিনি আবার কোচবিহার যাবেন, কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তিনি ঢাকায় ফিরে যান। তিনি ঢাকায় পৌঁছতে পারেননি, ঢাকার পথে খিজিরপুরের অদূরে মার্চ মাসের (১৬৬৩) ৩০ তারিখে নৌকায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

সুবাদার শায়েস্তা খান ঃ

মীর জুমলার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু শায়েস্তা খানের আসার আগে বিহারের সুবাদার দাউদ খানকে বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব দেন। শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা, মমতাজ মহলের ভাই, সুতরাং তিনি ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি অভিরুচি এবং চলাফেরা মোগল অভিজাতদের মতই-ছিল এবং বাংলার সুবাদার থাকা কালে তিনি সেই সুনাম অক্ষুন্ন রাখেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। নিজে কবি ছিলেন এবং কাব্য-প্রেমিকও ছিলেন। তিনি একজন ভাল কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং বাংলায় আসার আগে বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারীর দায়িত্ব পালন করে ভাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি একজন ভাল যোদ্ধাও ছিলেন এবং অনেক যুদ্ধে সফলভাবে অংশ নেন। তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩, দুই দফায় বাংলার সুবাদারী শেষে তিনি যখন রাজধানীতে ফিরে যান, তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলাদেশে এসে নিজে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, কিন্তু তাঁর অর্ধ ডজন ছেলে তাঁর সঙ্গে আসেন এবং তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং শাসন পরিচালনা করেন। শায়েস্তা খান ঢাকায় থাকলেও তিনি যুদ্ধ এবং শাসন সকল ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। মোগল সুবাদারদের মধ্যে শায়েস্তা খান অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন, অনেক দিন তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে থাকে।

শায়েস্তা খান প্রথম দফায় ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস

পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। মধ্যে প্রথমে আজম খান কোকা এবং তাঁর পরে শাহজাদা মুহাম্মদ আজম বাংলার সুবাদার ছিলেন। আজম খান কোকা মাত্র কয়েকমাস বাংলায় ছিলেন, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পরে শাহজাদা মুহাম্মদ আজম মাত্র এক বৎসর কাল বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছেলে ছিলেন, কিন্তু সুবার শাসনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সম্রাট তাঁকে প্রত্যাহার করে নেন এবং পুনরায় শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব দেন। শাহজাদা মাত্র অল্প সময় ঢাকায় থাকলেও তিনি ঢাকায় একটি দূর্গ নির্মাণ শুরু করেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। যতটুকু নির্মাণ করেন তা বর্তমানে লালবাগ দূর্গ নামে পরিচিত, দূর্গের ভেতরে তিনি একখানি মসজিদও নির্মাণ করেন, মসজিদখানি সম্পূর্ণ নির্মিত হয় এবং বর্তমানে নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় ঃ

শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে এক অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম খান চিশতী চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন, এবং শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে বিজয় সম্পূর্ণ করেন। স্বাধীন সুলতানী আমলের পরে চট্টগ্রাম দীর্ঘ দিন আরাকানের অধীনে থাকে, ইসলাম খান ভুলুয়া জয় করলে মোগল সুবা বাংলার সীমা চট্টগ্রামের উত্তর সীমা, অর্থাৎ ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আরাকানের রাজা তাঁর রাজ্যের সীমান্তেই মোগল শক্তির বিস্তৃতি সুনজরে দেখেনি এবং এই কারণে বারবার সীমান্ত অতিক্রম করে মোগল এলাকায় হানা দিতে থাকেন। আরাকানীদের শক্তিশালী নৌ-বাহিনী থাকায় মেঘনা অববাহিকার ভেতর দিয়ে মাসে মাসে ঢাকা পর্যন্ত হানা দিতে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না, ইসলাম খান চিশতীর সময় থেকে সকল সুবাদারকেই আরাকানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হত। অতএব চট্টগ্রাম জয় করে সুবা বাংলার দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত করা মোগলদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়, পর্তুগীজ এবং আরাকানী মগ জলদস্যু মিলে প্রায়ই মোগল এলাকায় বিশেষ করে বরিশাল-বাকেরগঞ্জ উপকূলে হানা দিত এবং প্রচুর ধন সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যেত, অনেক লোককেও বন্দী করে নিয়ে গিয়ে দাসরূপে বিক্রি করত, বা আরাকানে কৃষি কাজে নিয়োজিত করে ভূমিদাসরূপে তাদের উপর অমানুষিক. অত্যাচার করত। অতএব সুবা বাংলাকে জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করাও মোগলদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, শাহ্ শুজা আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার পরে আরাকানের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, মীর জুমলা শুজাকে হস্তগত করার জন্য, এবং শুজা নিহত হওয়ার পরে শুজার ছেলে মেয়েদের হস্তগত করার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। মীর জুমলারও আরাকান আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তিনি কামরূপ-আসামে অভিযানে যাওয়ার ফলে তাঁর আরাকান অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। এখন শায়েস্তা খানের উপর সেই দায়িত্ব বর্তায়। চতুর্থত, শায়েস্তা খানের বাংলা

দেশে পৌঁছুবার আগে আরাকানের রাজা বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং মেঘনা অববাহিকায় মোগল নৌ-বাহিনীকে পরাজিত করেন। এটাই বোধহয় শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ।

শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাঁর পরিকল্পনার ৪টি দিক, (১) মোগল নৌয়ারা বা নৌ-বাহিনী পুর্নগঠন করা, (২) সন্দ্বীপ জয় করা, (৩) পর্তুগীজদের স্বপক্ষে নিয়ে আসা এবং (৪) আরাকানীদের সঙ্গে যুদ্ধে ডাচদের সাহায্য লাভ করা, বা অন্ততপক্ষে ডাচ্‌রা যাতে আরাকানীদের সাহায্য না করে, সেই জন্য নিরক্ষেপ করে রাখা। মীর জুমলা প্রায় ৪০০ নৌকার এক বহর নিয়ে কোচবিহার ও আসাম অভিযানে যান। অতএব মোগল নৌবাহিনী খুব একটা দুর্বল ছিলনা, কিন্তু মীর জুমলার মৃত্যুর পরে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করায় নৌবাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়ে, কিছু নৌকা সংস্কারের অভাবে এবং অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যায়। শায়েস্তা খান পুরাতন নৌকা মেরামতের এবং নতুন নৌকা তৈরীর আদেশ দেন। বাংলার বিভিন্ন নদী বন্দরে অবস্থিত ডকে নৌকা নির্মিত হয়। শায়েস্তা খান দক্ষ নৌসেনাপতি নিযুক্ত করে নৌবাহিনীর দায়িত্ব দেন এবং বৎসর খানিকের মধ্যে ৩০০ যুদ্ধ জাহাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয়। চট্টগ্রাম এবং ভুলুয়ার মাঝামাঝি স্থানে সমুদ্রে সন্দ্বীপ অবস্থিত। সন্দ্বীপের কর্তৃত্ব নিয়ে আরাকানের রাজা এবং পর্তুগীজদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়, শায়েস্তা খানের সময়ে দিলাওয়ার খান সন্দ্বীপের কর্তৃত্ব লাভ করেন। সন্দ্বীপে তিনি দিলাল রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এককালে মোগল নৌ-সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু মোগলদের পক্ষ ত্যাগ করে সুযোগ বুঝে সন্দ্বীপ অধিকার করে নেন। শায়েস্তা খান মনে করেন যে প্রয়োজনে সন্দ্বীপকে ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করা যাবে, অন্ততপক্ষে শত্রুরা যাতে সন্দ্বীপকে মোগলদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করতে পারে তার জন্য সন্দ্বীপ জয় করে নিতে হবে। পর্তুগীজরা ছিল আরাকানের নৌ-শক্তির প্রাণ স্বরূপ। পর্তুগীজদের সাহায্য ছাড়া আরাকানের মগ নৌ-সেনারা মোগলদের জন্য তেমন ভয়ের কারণ ছিল না। শায়েস্তা খান ঠিকই বুঝতে পারেন যে পর্তুগীজদের স্বপক্ষে নিয়ে আসতে পারলে চট্টগ্রাম বিজয় সহজ হবে। ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীদের মধ্যে ইংরেজ এবং ডাচ্‌ কোম্পানী দ্বয় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ডাচ্‌দের নৌ-শক্তি ইংরেজদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, ডাচ্‌দের সদর দফতর ছিল জাকার্তায়, এবং আরাকানে এবং বাংলাদেশেও তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল। ডাচ্‌রা যেহেতু তখন শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি ছিল, সেহেতু তাদের সাহায্য, অন্তত পক্ষে নিরপেক্ষতা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম অভিযানে সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়।

শায়েস্তা খান একে একে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। উপরে বলা হয়েছে যে তিনি তিন শত যুদ্ধের জাহাজ নির্মাণ করে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য সেনাপতি নিযুক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। পর্তুগীজরা আরাকানে যেমন ছিল, তেমন বাংলার হুগলী, তমলুক, ঢাকার অদূরে ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থানে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। শায়েস্তা খান

এই সকল স্থানের পর্তুগীজ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আরাকানের পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের লোভনীয় শর্তে মোগল নৌ-বাহিনীতে নিয়োগ দানের প্রতিশ্রুতি দেন। আরাকানের রাজা পর্তুগীজদের লুঠতরাজে লিপ্ত রাখত, লুঠতরাজে আয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, প্রাণ হারাবার ভয়ও যে ছিলনা তা নয়। তাই পর্তুগীজরা নিশ্চিত আয়ের এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবিকা অর্জনের আশায় শায়েস্তা খানের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সকল পর্তুগীজ এক সঙ্গে ৫০টি জলবা বা সমুদ্রগামী যুদ্ধ জাহাজে করে তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র কামান ইত্যাদি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে মোগল এলাকায় চলে আসে, ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে তারা ভুলুয়ায় পৌছে। অতঃপর শায়েস্তা খান সন্দ্বীপ জয় করার দিকে মনযোগ দেন, এবং ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে নৌ-সেনাপতি আবুল হাসানকে সন্দ্বীপ আক্রমণের আদেশ দেন। দিলাওয়ার খান বীরত্বের সঙ্গে বাধা দেন, কিন্তু ক্ষুদ্র দ্বীপের শাসনকর্তার পক্ষে মোগলদের বাধা দেওয়া সম্ভব হলনা। দিলাওয়ার খান যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং বন্দী অবস্থায় ঢাকায় গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ডাচ্‌দের সাহায্য লাভের আশায় শায়েস্তা খান জাকার্তায় ডাচ গবর্নর জেনারেলের নিকট একজন দূত পাঠান। এই দূতের নাম খাজা আহমদ। ডাচ্‌রা আরাকানে বাণিজ্য করলেও বাংলার সঙ্গে তাদের ব্যবসা ছিল অনেক বেশী লাভজনক কারণ আরাকান ছিল একটি ছোট দেশ, সেই তুলনায় বাংলাদেশের মাধ্যমে তারা সারা মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারত। ডাচরা আরাকানে তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় এবং শায়েস্তা খানকে আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা প্রদান করতে সম্মত হয়। (তারা মোগলদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ২টি জাহাজ পাঠায়, কিন্তু তাদের সাহায্য পৌছার আগেই মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয় সমাপ্ত হয়।)

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শায়েস্তা খান জলে-স্থলে যুগপৎভাবে চট্টগ্রামে অভিযান প্রেরণ করেন, স্থল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন সুবাদারের ছেলে বুজর্গ উমেদ খান এবং নৌ-বাহিনী পরিচালনা করেন এ্যাডমিরাল ইবনে হাসান। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে বুজর্গ উমেদ খান যাত্রা করেন। সেনাবাহিনীকে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরী করে অগ্রসর হতে হয়, নৌ-বাহিনীর এরূপ কোন অসুবিধা ছিল না, পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনরা তাদের জাহাজ নিয়ে ইবনে হাসানের নেতৃত্বে অগ্রসর হন। সতর্কতা হিসেবে শায়েস্তা খান স্থল ও নৌবাহনীকে যোগাযোগ রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন এবং সুবাদার নিজে উভয় বাহিনীর রসদ সরবরাহের দায়িত্ব নেন। এই যুদ্ধে স্থল বাহিনীকে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়নি, জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরীতে তাদের সময় ব্যয় হয়, অপর দিকে নৌ-বাহিনীকে ২৩ ও ২৪ শে জানুয়ারী তারিখে শত্রুর নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ২৪ তারিখে কর্ণফুলী নদীর যুদ্ধে আরাকানীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। চট্টগ্রাম দূর্গ জয় হয় ২৬ জানুয়ারী তারিখে এবং সেনাপতি বুজর্গ উমেদ খান ২৭ জানুযারী তারিখে চট্টগ্রাম দূর্গে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রাম দূর্গে

অনেক বাঙ্গালী বন্দী ছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, এবং তাঁরা স্বস্বস্থানে গিয়ে পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়। চট্টগ্রাম দূর্গে রক্ষিত আরাকানীদের অনেক সম্পদ মোগলদের হস্তগত হয়। আরাকানীরা পালিয়ে সারা চট্টগ্রম জেলা ছেড়ে চলে যায়। বুজর্গ উমেদ খান চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা পুর্নগঠন করেন, চট্টগ্রামে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন, এই মসজিদই বর্তমানের জামে মসজিদ। সম্রাটের ইচ্ছা অনুসারে চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ।

কোচবিহার ও অন্যান্য সীমান্ত ঃ

মীরজুমলা কোচবিহার জয় করলেও তা মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মীর জুমলা কোচবিহার জয় করে আসাম অভিযানে যাওয়ার সময় আসকর খানকে কোচবিহারের ফৌজদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু আসকর খান তখনো ঢাকায় থাকায় ইসফনদিয়ার বেগকে অস্থায়ী ভাবে সেখানে নিযুক্ত করেন। রাজা প্রাণ নারায়ণ পার্বত্য এলাকা মোরং এ স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। কোচবিহারে মোগল বিজয়ীরা মোগল নিয়মে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, স্থানীয় জনগণ তা প্রতিরোধ করে। নির্বাসনে থেকে রাজা প্রাণ নারায়ণ এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এই সংবাদ পেয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং বিদ্রোহ ভাবাপন্ন জনগণের নেতৃত্ব দেন। ইসফনদিয়ারের অধীনে মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য থাকায় তিনি প্রাণ নারায়ণকে বাধা দিয়ে সুবিধা করতে পারলেন না, এবং কোচবিহার মোগলদের হাতাছাড়া হয়ে যায়। কোচবিহার পুনর্দখল করার ইচ্ছা থাকলেও মীর জুমলার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি। পরবর্তী অস্থায়ী সরকারও এই ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। শায়েস্তা খান রাজমহলে এসেই ঘোষণা করেন যে তিনি নিজে কোচবিহার জয় করে বিদ্রোহী রাজা প্রাণ নারায়ণকে শাস্তি দেবেন। তা শুনে রাজা প্রাণ নারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কয়েক কিস্তিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খেসারত দেয়ার অঙ্গীকার করেন। রাজা তাঁর কথা রাখেন এবং সময়মত পরিশোধ করেন। প্রাণ নারায়ণ বৎসর খানিকের মধ্যে (১৬৬৬) মারা গেলে তাঁর ছেলে মুধ নারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে বসে ১৫ বৎসর (১৬৬৬-১৬৮০) রাজত্ব করেন। মুধ নারায়ণের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে বাসুদেব নারায়ণ ২ বৎসর, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রাণ নারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্র নারায়ণ ১১ বৎসর (১৬৮২-১৬৯৩) এবং পরবর্তী রাজা রূপনারায়ণ ২১ বৎসর (১৬৯৩-১৭১৪) রাজত্ব করেন। অতএব রূপনারায়ণ আওরঙ্গজেরের সময়ের শেষ রাজা। প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর পরে কোচবিহারে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। শায়েস্তা খান মাঝে মাঝে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে কোচবিহারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। শেষে তিনি ইবাদত খানকে পাঠান, তিনি ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারে গিয়ে শান্তি স্থাপন করেন, পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পুকুর খনন করেন এবং নওয়াবগঞ্জ,মাহিগঞ্জ এবং মোগলঘাট নামে কয়েকটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। শায়েস্তা খানের সময়ে বর্তমান রংপুরের বৃহদাংশ এবং পশ্চিম কামরূপের কিয়দংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পার্শ্ববর্তী পার্বত্য রাজ্য থেকে লোকজন এসে প্রায়ই বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। এর একটি ছিল মোরং, এটা কোচবিহারের পশ্চিমে বিহারের পুর্নিয়া জিলা সংলগ্ন একটি পার্বত্যদেশ। মোগলরা কোচবিহার আক্রমণ করলে সেখানকার পলাতক সেনাপতি এবং সৈন্যরা মোরং এ আশ্রয় নিত। শায়েস্তা খান তা বুঝতে পেরে মোরং আক্রমণ করেন। মোরং এর রাজা পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিয়মিত কর দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। মীর জুমলা আসাম অভিযানে গেলে শ্রীহট্টের সংলগ্ন এলাকার জয়ন্তিয়া রাজা মোগলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং সিলেটের উপর উৎপাত শুরু করেন। ক্ষুদ্র রাজ্য জয়ন্তিয়ার ক্ষুদ্র রাজা সর্বদা সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজারা মীর জুমলার মৃত্যুর পরে বাংলার অস্থায়ী শাসকদের সময়ে উদ্ভুত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিত। কিন্তু শায়েস্তা খান দায়িত্ব গ্রহণ করলে তারা সতর্ক হয়ে যায়। জয়ন্তিয়ার রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন, পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শায়েস্তা খানের নিকট উপহার হিসেবে হাতি প্রেরণ করেন।

ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সতর শতকের প্রথম দিক থেকে ভারতে বাণিজ্য শুরু করলেও বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন উড়িষ্যায় বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু করতে তাদের কিছু সময় লাগে। তারা প্রথমে উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং হরিহরপুরে কুঠি স্থাপন করে সেখান থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে এবং পরে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ঐ একই সালে কোম্পানী সম্রাট শাহাজাহানের নিকট থেকে বাণিজ্যের অনুমতি দিয়ে একখানি ফরমান লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তারা বাংলার সুবাদার যুবরাজ শুজার নিকট থেকে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করেন। এতে তাদের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় এবং ব্যবসা লাভজনক হয় কারণ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক আদায়ের নিয়মানুসারে রপ্তানীর শতকরা হারে শুল্ক দিতে হলে তাদের আরো অনেক বেশি টাকা দিতে হত। ইংরেজেরা এই সুবিধা লাভ করে সুবাদার এবং যুবরাজের নিকট থেকে, সম্রাটের নিকট থেকে নয়। সম্রাটের নিকট থেকেও তারা একখানি ফরমান পায় কিন্তু তা ছিল শুধু অনুমতি পত্র, শুল্ক সম্পর্কে কোন কথা ছিল না। কিন্তু শাহজাহান এবং শাহ শুজার পরে আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসলে শুজার অনুমতি বা শাহজাহানের ফরমান অচল হয়ে পড়ে, মোগল আমলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাটের ফরমানই বৈধরূপে গণ্য হত। অতএব শায়েস্তা খান যখন সুবাদার হয়ে আসেন তখন ইংরেজদের নিকট বাণিজ্যের কোন বৈধ অনুমতি পত্র ছিল না।

হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার পরে ইংরেজদের বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাদের লাভ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেলেও তারা শুজার অনুমতি অনুসারে বার্ষিক ৩

হাজার টাকাই দিত। এতে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হত। দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা ছাড়া ডাচ্ কোম্পানী এবং আরব পারস্য ইত্যাদি এলাকা থেকে আগত মুসলিম ব্যবসায়ী এবং আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা করত। তাদের ইংরেজ কোম্পানীর মত সুবিধা না থাকায় তাদের শতকরা হারে শুল্ক দিতে হত। এতে ইংরেজদের তুলনায় অন্য ব্যবসায়ীকে ক্ষতি স্বীকার করতে হত। তৃতীয়ত, বার্ষিক ৩ হাজার টাকা কর দেওয়ার বিনিময়ে যে সুবিধা দেওয়া হয়, তা ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া হয়, কিন্তু কোম্পানীর এই সুযোগের আড়ালে ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হত এবং তারা নিজেদের পণ্য কোম্পানীর পণ্যরূপে ঘোষণা দিয়ে শুল্ক আদায় করা থেকে রেহাই পাওয়ায় চেষ্টা করত। সুতরাং শুল্কের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত জটিল, ইংরেজ কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ায় এর জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ইংরেজরা ব্যবসায়ে এতই লাভ করতে থাকে যে, তারা হুগলী ছাড়া ঢাকা, কাশিমবাজার, পাটনা ইত্যাদি বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে কুঠি স্থাপন করে তাদের মূলধন বৃদ্ধি করে তাদের বাণিজ্যকুঠিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের ব্যবসার মোট মূলধন ছিল ১০ হাজার পাউন্ড। ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে পেতে তাদের মূলধন মাত্র ২০ বছরে প্রায় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সকল ব্যবসায়ীদের উপর একই হারে শুল্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে শুল্কের বিভিন্নতা হেতু বাণিজ্যের অসম প্রতিযোগিতা হবে এবং এতে অন্যান্য কোম্পানী এবং স্থানীয় ও আরব পারস্য বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আওরঙ্গজেব সকল ব্যবসায়ীর জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক ধার্য করেন কিন্তু তা ইংরেজদের নিকট গ্রহণযোগ্য হল না। তারা শুল্ক ফাঁকি দিতে শুরু করে, প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যবসায়ীই, এমনকি ডাচ্ কোম্পানীও শুল্ক ফাঁকি দিত। শুল্ক ফাঁকি দেওয়াতে স্থানীয় শুল্ক কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। এতে অবৈধ আদান প্রদানও শুরু হয়। কোন কোন সময় উৎকোচের বিনিময়ে কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা চলতে থাকে। আবার না দিলে বা উৎকোচের পরিমাণ কম হলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শুল্ক কর্মকর্তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেত। কোম্পানী যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান, তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও অনেক, তারা নিরাপত্তার জন্য সৈন্যও মোতায়েন রাখত। তাই তারা মাঝে মাঝে স্থানীয় শুল্ক কর্মকর্তাদের প্রতিরোধ করত এবং এই জন্য সংঘর্ষ বেধে যেত। এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে শায়েস্তা খানের সময়ে। সপ্তদশ শতকের ষাটের দশকের পর থেকে ইংরেজদের বাণিজ্য এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে এবং এত লাভজনক হয় যে, তারা যে কোন মূল্যে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়। তারা বিলেত থেকে কয়েক জাহাজ অতিরিক্ত সৈন্য এনে প্রয়োজনে দেশীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। স্যার উইলিয়াম হেজেস নামক বাংলার ইংরেজ এজেন্ট এবং জবচার্নক নামক হুগলীর ইংরেজ কোম্পানীর গবর্নর

এই 'শক্তি প্রদর্শন' নীতির প্রবর্তক। ক্যাপ্টেন হীথ নামক একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি কয়েকটি জাহাজ নিয়ে সত্যি সত্যি চট্টগ্রাম অধিকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধের এমন কোন বিশেষ কারণ ঘটেনি। তবে উভয় পক্ষে উত্তেজনা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সমঝোতার চেয়ে প্রতিশোধের স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠে। একদিন তিনজন সৈন্য হুগলীর বাজারে আসলে তারা মোগলদের হাতে আক্রান্ত হয়ে আহত হয়। ইংরেজ ক্যাপ্টেন তাদের উদ্ধারের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। মোগল ফৌজদার আবদুল গণিও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ইংরেজদের হটিয়ে দেন, ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি সংলগ্ন কুটিরে আগুণ লাগিয়ে দেন এবং ইংরেজ জাহাজের উপরও গোলাবর্ষণ করা হয়। ইংরেজরাও সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তারা সারা হুগলী শহরে ছড়িয়ে পড়ে মোগল স্থাপনার ক্ষতি করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মোগলদের সৈন্য সংখ্যা বা গোলা বারুদ খুব বেশি ছিল না। তারা বুঝতেই পারেনি যে তাদের অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য করতে এসে বিদেশী বণিকরা তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করবে। যাই হোক সুবাদার শায়েস্তা খান ফৌজদারের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান। তিনি ইংরেজদের বন্দী করার জন্য ফৌজদারকে নির্দেশ দেন। কিন্তু সৈন্য আসার আগে ইংরেজরা হুগলী ত্যাগ করে সুতানুটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মোগলদের সঙ্গে জব চার্নকের আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইংরেজরা সুতানুটি ত্যাগ করে হিজলীর দিকে চলে যায়। পথে তারা মোগলদের থানা দুর্গ (বর্তমান মাটিয়াবুরুজ) অধিকার করে। তারা হিজলী দুর্গও অধিকার করে। এদিকে শায়েস্তা খান সেনাপতি আবদুস সামাদের অধীনে ১২ হাজার সৈন্য পাঠান। ইংরেজদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ হয়, এবং তাদের হিজলী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হিজলীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিলে প্রায় দুই শত ইংরেজ মারা যায়। এইভাবে শায়েস্তা খান ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন। কিন্তু মোগল শাসকরা দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন, বিশেষ করে তাঁরা বুঝতেন যে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীরা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ (সোনা-রূপা) এই দেশে আনয়ন করত এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। তাই শায়েস্তা খান ইংরেজদের আবার হুগলীতে ফিরে আসার অনুমতি দেন। কিন্তু এই সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। ফলে শায়েস্তা খান তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করেন। জবচার্নকও আবার সুতানুটি ত্যাগ করেন।

ইতোমধ্যে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান বদলী হয়ে বাংলা ছেড়ে আগ্রায় চলে যান। তাঁর পরে খান জাহান বাহাদুর স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর পরে ইবরাহিম খান ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। মোগল সরকার এবং ইংরেজ কোম্পানী সবাই বুঝতে পারে যে, বাণিজ্য বন্ধ

হওয়া উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করতে স্বীকৃত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের আবার বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। সুবাদার ইবরাহীম খান ইংরেজদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন।

শায়েস্তা খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

নবাব শায়েস্তা খান একজন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের যেমন প্রশংসা করেন, তেমনি সামরিক কৃতিত্ব এবং বেসামরিক শাসনের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সদাশয়, ন্যায় পরায়ণ এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি প্রজাদের সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখতেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেন। তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সৈয়দ, আলেম, সুফী, কবি ইত্যাদির জন্য লাখেরাজ জমি দান করতেন এবং বিধবা ও দুঃস্থদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতেন। অন্যদিকে তিনি দুষ্ট ও সমাজ বিরোধিদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু জনগণের জানমাল রক্ষার কাজে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার এবং লুঠতরাজ থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষা করা। চট্টগ্রাম জয় করার আগে তিনি পর্তুগীজদের স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ জয় করার পরে মগ জলদস্যুদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ার পরে চট্টগ্রাম দূর্গে আরাকানীদের অপহৃত ১০ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরা সকলে বাংলাদেশে তাদের নিজ নিজ ঘরবাড়িতে চলে যায়। চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে ইহার লাভ ক্ষতির বিবরণ দিয়ে শায়েস্তা খান সম্রাটকে জানান যে, অপহৃত এবং বন্দীদের সম্রাটের মঙ্গল কামনাই চট্টগ্রাম বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ।

চট্টগ্রাম বিজয় ছাড়াও শায়েস্তা খান মোরং এবং জয়ন্তিয়া রাজ্য জয় করেন এবং মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি কোচবিহার জয় করেন এবং কামরূপে শান্তি স্থাপন করেন। এই দুই এলাকায় শায়েস্তা খান উপযুক্ত ফৌজদার নিযুক্ত করেন। রাজ্য বিজয়ে এবং রাজ্য শাসনে তাঁর সুযোগ্য ছেলেরা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। চট্টগ্রাম বিজয় করেন তাঁর ছেলে বুজর্গ উমেদ খান। তাঁর অন্য তিন ছেলে জাফর খান, আবু নসর খান এবং ইবাদত খানও রাজ্য বিজয়ে এবং শাসনে তাঁকে সাহায্য করেন। জাফর খান বুজর্গ উমেদ খানের পরে চট্টগ্রামের ফৌজদার নিযুক্ত হন। আবু নসর খান উড়িষ্যায় পিতার প্রতিনিধি ছিলেন এবং ইবাদত খান কোচবিহার জয় করেন।

শায়েস্তা খান বিদ্বান ছিলেন এবং তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। শায়েস্তা খান অনেক ইমারত নির্মাণ করে যশস্বী হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত এইগুলো তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ঢাকায় তিনি চকবাজারের নিকটে শুজার সময়ে নির্মিত বড় কাটরার মত একটি দালান নির্মাণ করেন, এটা ছোট কাটরা নামে পরিচিত, নিকটে তিনি একখানি ছোট মসজিদও নির্মাণ করেন। নিকটে একটি সমাধি ভবনও আছে, কথিত আছে যে শায়েস্তা খানের কন্যা চম্পা বিবি এখানে সমাহিত আছে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বর্তমান

মিটফোর্ড হাসপাতাল ও সলিম-উল্লাহ মেডিকেল কলেজের পেছনে শায়েস্তা খান আরো একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই এলাকাতেই শায়েস্তা খান একটি কাঠের তৈরী প্রাসাদে বাস করতেন। লালবাগ দুর্গের ভেতরে শায়েস্তা খান তাঁর কন্যা বিবি পরীর বা ইরানদুখতের কবরের উপর একটি অত্যন্ত সুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন। এটা বিবি পরীর মাজার নামে পরিচিত একটি অনিন্দসুন্দর দালান। এতে সাদা মর্মর পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। ঢাকার চকবাজার মসজিদও শায়েস্তা খানের নির্মিত। তাছাড়া শায়েস্তা খান রায়ের বাজারের নিকটে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন এবং খিজিরপুর দুর্গে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। চট্টগ্রামের জামে মসজিদও শায়েস্তা খানের আদেশে তাঁর ছেলে বুজর্গ উমেদ খান কর্তৃক নির্মিত হয়। শায়েস্তা খান যে শুধু অনেক ইমারত নির্মাণ করেন তাই নয়, তিনি স্থাপত্য শিল্পে নতুন রীতি প্রবর্তন করেন এবং তা শায়েস্তা খানী ষ্টাইল নামে পরিচিত।

শায়েস্তা খান কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের দ্বৈতকর আরোপ থেকে রক্ষা করেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি পণ্য বাজারজাত করার জন্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেন। তিনি আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং ইউরোপীয় ও বিদেশী বণিকদের উৎসাহ দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বণিকদের কর ফাঁকির জন্য শাস্তি দিতেন। এই কারণে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ, এমনকি যুদ্ধও শুরু হয়ে যায়। অতএব শায়েস্তা খানের সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসায় বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাস পায়। তাঁর সময়ে খাদ্য শষ্যের মূল্য এত সস্তা হয় যে টাকার আট মণ চাল পাওয়া যেত। এর আগে এত সস্তা আর কোন সময় ছিল না। ফলে শায়েস্তা খান ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় লালবাগ দূর্গের পশ্চিম গেট বন্ধ করে দেন এবং সেখানে একটি শিলা স্থাপন করে লিখে যান যে যতদিন পর্যন্ত চালের মূল্য তাঁর সময়ের মত সস্তা না হবে ততদিন এই গেট খোলা যাবে না। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘদিন এই গেইট বন্ধ ছিল, ১৭৪০ সালে নবাব সরফরাজ খানের সময়ে চালের মূল্য আবার কমে টাকায় আট মণ হলে ঐ গেইট খোলা হয়।

শায়েস্তা খান ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের সুবাদারীর দায়িত্ব শেষ করে ঢাকা ছেড়ে যান। তাঁর পরে সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন খান জাহান বাহাদুর। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুধ-ভাই ছিলেন। তিনি মেজাজী এবং হঠকারি লোক ছিলেন বিধায় সম্রাট তাঁকে একস্থানে বেশি দিন থাকতে দিতেন না। বাংলায়ও তিনি বেশি দিন সুবাদারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। সম্রাট তাঁকে প্রত্যাহার করে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইবরাহিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

ইবরাহিম খান ঃ

সুবাদার ইবরাহিম খান ছিলেন এক অভিজাত পরিবারের ছেলে। তাঁর পিতা প্রথমে পারস্যের ও পরে মোগল সম্রাটের অধীনে সেনাপতি ও উজিরের দায়িত্ব পালন করেন।

ইবরাহিম খান একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, ফারসি সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন পড়ুয়া লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ও শাসক থাকলেও তিনি শেষ বয়সে যখন বাংলায় আসেন তখন অধিকাংশ সময় বই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। শাসন ভার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দিতেন। বাংলাদেশে এসে তাঁর প্রথম দায়িত্ব হয় ইংরেজদের হুগলীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সম্রাটের আদেশে তিনি শায়েস্তা খান কর্তৃক আটক করা ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দেন এবং ইংরেজ কোম্পানীকে পুনরায় বাংলাদেশে এসে বাণিজ্য শুরু করার আমন্ত্রণ জানান। জবচার্নক এসে পুনরায় ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ইবরাহিম খানের সুবাদারী আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুভ সিংহের বিদ্রোহ। শুভ সিংহ ছিলেন মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল-চন্দ্রকোনা পরগণার চিতওয়াবরদার একজন জমিদার। এই স্থানটি বাংলা এবং উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত, এলাকার পূর্ববর্তী জমিদারেরা প্রায়ই লুঠতরাজে লিপ্ত থাকত। শুভ সিংহও হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ শুরু করে এবং যখন সে বুঝতে পারে যে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই তখন সে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং নিকটবর্তী জমিদারদেরও আক্রমণ করতে থাকে। তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রহিম খান নামক উড়িষ্যার একজন আফগান সরদার তার সঙ্গে যোগ দেয় এবং উভয়ে মিলিত ভাবে লুঠতরাজে লিপ্ত হয়। তারা বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হলে বর্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম তাদের বাধা দিয়ে ব্যর্থ ও নিহত হয়। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা ঘটে। শুভ সিংহ রাজা কৃষ্ণরামের স্ত্রী ও কন্যাদের হস্তগত করে। এইভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শুভ সিংহ রাজা উপাধি নেয় এবং রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করতে থাকে। রাজা কৃষ্ণ রামের ছেলে জগৎ রায় ঢাকায় গিয়ে সুবাদারকে তা জানালে সুবাদার ইবরাহিম খান কোন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি মনে করেন যে বিদ্রোহীরা লুণ্ঠন করে ধনসম্পদ লাভ করলে নিজে নিজেই স্বদেশে ফিরে যাবে।

ফৌজদার নূর উল্লাহ খান যশোর থেকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি যশোর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং হিজলীর ফৌজদারের দায়িত্বে ছিলেন। অতএব বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করতে পারেননি। বিদ্রোহীরা হুগলী দূর্গ দখল করলে চুঁচড়ার ডাচ রা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এদিকে শুভ সিংহ রাজা কৃষ্ণরামের মেয়ের শ্রীলতা হানির চেষ্টা করলে সেই বিদূষী ও সাহসী মহিলা বেশ চালাকি করে দূবৃত্তকে হত্যা করতে সমর্থ হন। শুভ সিংহের মৃত্যুর পরে তার ভাই হিম্মত হিংস বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেয়, আফগান সরদার রহীম খানও রহীম শাহ উপাধি নিয়ে স্বাধীন আফগান রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখে। বিদ্রোহীরা একদিকে হুগলী এবং অন্যদিকে রাজমহল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা লুণ্ঠন করে বিস্তর ধন-সম্পদ হস্তগত করে। মখসুসাবাদের (পরে মুর্শিদাবাদ) ফৌজদার নিয়ামত খান অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিদ্রোহীদের বাধা দিযে মৃত্যু বরণ করেন। ভাগিরাথীর পশ্চিম তীর

বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্রোহীদের লুঠতরাজ ছড়িয়ে পড়লে জমিদারেরা প্রাণ ভয়ে ঢাকায় গিয়ে সুবাদারের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সুবাদার আগের মতই উত্তর দেন যে যুদ্ধ করে রক্তপাত করে কি লাভ? ইউরোপীয় কোম্পানীরা তাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন উত্থাপন করলে সুবাদার সাধারণভাবে বলেন যে কোম্পানীগুলো যেন নিজ নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তখন ডাচ্ কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি চুঁচড়ায়, ফরাসীর কোম্পীর কুঠি চন্দননগরে এবং ইংরেজেরা জব চার্নকের নেতৃত্বে সুতানুটিতে তাদের স্ব স্ব কুঠিতে কামান বসিয়ে নিজ নিজ নিরাপত্তা সুদৃঢ় করে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তিনি সুবাদার ইবরাহিম খানের নির্লিপ্ততার সংবাদ শুনে সুবাদারের পুত্র জবরদস্ত খানকে বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং বিদ্রোহ দমন করার আদেশ দেন। সম্রাট ইবরাহিম খানকে সুবাদারী থেকে প্রত্যাহার করে স্বীয় পৌত্র যুবরাজ আজিম-উদ-দীনকে (পরে আজিম-উস-শান উপাধিতে ভূষিত) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহীরা তেমন কোন শক্তির অধিকারী ছিল না। মোগল সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন বাধা না পাওয়ায় তারা লুঠতরাজ করে প্রচুর সম্পদ লাভ করে, এবং এর ফলে ভাগ্যান্বেষী চতুর লোকেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জবরদস্ত খান সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সাহস করে এগিয়ে গেলে বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেনি। রাজমহল, মখসুসাবাদ, হুগলী ইত্যাদি সকল এলাকায় তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ তাদের পূর্ব স্থানে ফিরে যায়, কিছু সংখ্যক সৈন্য মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। জবরদস্ত খান তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন, কিন্তু ইতোমধ্যে সুবাদার আজিম-উদ-দীন বর্ধমানে এসে পৌছেন। তিনি জবরদস্ত খানকে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রশংসা করা দূরে থাকুক, তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। জবরদস্ত খান মনের দুঃখে রাজধানীতে চলে যান এবং পিতার সঙ্গে মিলিত হন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইবরাহিম খানকে এলাহাবাদের এবং জবরদস্ত খানকে অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

সুবাদার আজিম-উদ-দীন ঃ

আজিম-উদ-দীন ছিলেন সম্রাটের পৌত্র এবং শাহজাদা মুয়াজ্জমের (পরবর্তী সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ) পুত্র। আজিম-উদ-দীন জানতেন যে তাঁর পিতামহের মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা ও পিতৃব্যদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এবং তাই তাঁর পিতার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এসেই তিনি তাঁর সমর্থক গোষ্ঠি যোগাড় করা এবং অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মনে করেন যে, পরাজিত ও আত্মগোপনে থাকা রহিম খান একজন করিৎকর্মা লোক। তাই তিনি রহিম খানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমঝোতা করার প্রতিজ্ঞা করে রহিম খান সুবাদারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

এতে সুবাদার ক্রুদ্ধ হয়ে রহিম খানকে হত্যা করেন, তার বিদ্রোহী বাহিনীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর পরে সুবাদার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় লিপ্ত হন।

শুভ সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কোম্পানী তাদের বিভিন্ন বাণিজ্য কুঠিতে ক্ষতির শিকার হয়, বিদ্রোহীরা এই সকল কুঠিতে লুঠতরাজ করে। কোম্পানী বিদ্রোহীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত তাদের জিনিষ ফেরৎ চাইলে জবরদস্ত খান তা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু সুবাদার আজিম-উদ-দীন অর্থের বিনিময়ে তাদের মালপত্র ফেরৎ দেন। ইংরেজরা বহুদিন থেকে তাদের হুগলীস্থ বাণিজ্য কুঠির নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু মোগল সরকার তাদের এই অনুরোধ বারবার প্রত্যাখ্যান করে। শায়েস্তা খানের সময় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে তারা দূর্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে উপলব্ধি করে। ইবরাহিম খানের সময়ে ইংরেজরা ফিরে এসে ভাগিরথীর পূর্ব তীরে সুতানুটি গ্রামে অবস্থান নেয়। এই সময় সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামেই তাদের ব্যবসা কেন্দ্রীভূত হয়, এবং দেশীয় তাদের এজেন্ট, দালাল, পাইকার বা দেশীয় ব্যবসায়ীরাও সেখানে জামায়ত হতে থাকে এবং সেখানে একটি বর্ধিষ্ণু বাজার গড়ে উঠে। আজিম-উদ-দীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল হওয়ায় তারা এখন তাদের নিজস্ব একখণ্ড জমির মালিক হওয়ার কথা চিন্তা করে। সুবাদারকে ১৬ হাজার টাকা দিয়ে তারা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রাম তাদের প্রকৃত মালিকদের নিকট থেকে ক্রয় করার জন্য সুবাদারের অনুমতি (নিশান) লাভ করে। এই তিনটি গ্রামে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইভাবেই কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। এই কলিকাতাতেই তারা ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দূর্গ নির্মাণ করে।

অতঃপর শাহজাদা অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে সওদা-ই-খাস নামে নতুনরূপে এক ব্যবসা শুরু করেন। সুবাদারের নামে আমদানীকৃত সকল পণ্য কিনে জমাকরে রাখার নাম সওদা-ই-খাস, এটা সুবাদারের একচেটিয়া ব্যবসা, পরে এই পণ্য অন্যের নিকট চড়া দামে বিক্রি করা হলে তা হয় সওদা-ই-আম বা সাধারণের ব্যবসা। সম্রাট সুবাদারের সওদা-ই-খাসের কথা জানতে পারলে তিনি যুবরাজকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন এবং সওদা-ই-খাস বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এর পরে সুবাদার ইম্পেরিয়াল রেভেনিউ বা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব থেকে অর্থ লাভের চেষ্টা করেন। সম্রাট তাঁর পৌত্রের স্বভাব জানতেন, তাই তিনি নতুন সুবাদারের সঙ্গে সঙ্গে একজন নতুন দীওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। এই দীওয়ানের নাম মুহাম্মদ হাদী। সম্রাট তাঁকে কারতলব খান উপাধি দিয়ে বাংলায় পাঠান। সাধারণত জমিদারেরা নযরানা দেওয়ার নিয়ম ছিল, যুবরাজ নযরানা আদায় করেও তাঁর আয়ের পথ সুগম করেন। দীওয়ান সুবাদারকে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়ে বাধা দেওয়ায় সুবাদার ষড়যন্ত্র করে দীওয়ানকে হত্যা করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। দীওয়ান তা টের পেয়ে সম্রাটকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর দিওয়ানী দফতর ভাগিরথীর তীরে মখসুসাবাদে

স্থানান্তর করে। এদিকে সম্রাট তাঁর পৌত্রকে সাবধান করে দেন, বিশেষভাবে দীওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেন। সম্রাট আরো আদেশ দেন যেন সুবাদার ঢাকা থেকে পাটনায় চলে যান এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সুবাদার আজিম-উদ-দীন তাঁর ছেলে ফররুখ সিয়রকে ঢাকায় রেখে পাটনায় চলে যান। যদিও ঢাকা তখনো প্রাদেশিক রাজধানী, সুবাদার এবং দীওয়ান উভয়ে ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ায় ঢাকার মর্যাদা হ্রাস পায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও কয়েক বৎসর আজিম-উদ-দীন ছিলেন বাংলার সুবাদার এবং কারতলব খান ছিলেন দীওয়ান। সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে শাহজাদা মুয়াজ্জম জয় লাভ করে শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। অতএব ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পুত্র আজিম-উদ-দীন ছিলেন বাংলার সুবাদার। তবে তিনি আর ঢাকায় ফিরেননি, অনুপস্থিতিতেই প্রতিনিধি মারফৎ তিনি সুবা বাংলা শাসন করেন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে সুবাদারদের তালিকা ঃ

১। মীর জুমলা	১৬৬০-১৬৬৩
২। দাউদ খান (অস্থায়ী)	১৬৬৩-১৬৬৪
৩। শায়েস্তা খান	১৬৬৪-১৬৭৭,১৬৭৯-১৬৮৮
৪। আজম খান কোকা	১৬৭৭-১৬৭৮
৫। শাহাজাদা আজম	১৬৭৮
৬। খান জাহান বাহাদুর	১৬৮৮-১৬৮৯
৭। ইবরাহিম খান	১৬৯০-১৬৯৭
৮। আজিম-উদ-দীন	১৬৯৭-১৭১২

চতুর্দশ অধ্যায়

নবাবী আমল

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে, কিন্তু এটাও সত্য যে তাঁর সময় থেকেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। মারাঠাদের দমন করতে তিনি জীবনের শেষ বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে কাটান। ফলে সাম্রাজ্যের অন্য অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। বিশাল মোগল সম্রাজ্যের পতনের একটি বিশেষ কারণ উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, বাবর ছাড়া অন্য কোন মোগল সম্রাট ভাই বা পুত্রের শত্রুতা থেকে রেহাই পাননি। হুমায়ুনের ভাইরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহজাহানও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শাজাহানের ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেও উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়, আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরেও তাঁর ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এতই দূর্বল হয়ে পড়ে যে প্রাদেশিক সুবাদারেরা ক্ষমতাবান হয়ে শেষ পর্যন্ত কোন কোন সুবা স্বাধীন হয়। সুবা বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না এবং এই প্রক্রিয়ায় আইনত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হলেও সুবাদারেরা মোটামুটিভাবে স্বাধীন ভাবে শাসন পরিচালনা করে। এই জন্য মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস নবাবী আমল নামে পরিচিত।

মুর্শিদকুলী খান ঃ

মুর্শিদকুলী খান থেকে নবাবী আমল শুরু হয়। তিনি একজন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন এবং সুদক্ষ অফিসার ছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং স্বীয় চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা বাংলার সুবাদার পদে উন্নীত হুন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান, হাজী শফী ইসপাহানী নামক একজন উচ্চপদস্থ মোগল অফিসার তাঁকে ছোটবেলায় কিনে নেন এবং নিজ সন্তানের মত লালন পালন করে শিক্ষা দেন। তাঁর নাম দেওয়া হয় মুহাম্মদ হাদী। হাজী শফীর নিকট তিনি রাজস্ব প্রশাসনে প্রশিক্ষণ নেন এবং হাজী শফীর মত দক্ষ হয়ে উঠেন। হাজীর শফীর সঙ্গে তিনি ইরানে চলে যান, কিন্তু সেখনে হাজী শফীর মৃত্যু হলে মুহাম্মদ হাদী দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দরাবাদের দীওয়ান নিযুক্ত করেন এবং পরে তাঁকে ইয়ালকুণ্ডলের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। সম্রাট মুহাম্মদ হাদীর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কারতলব খান উপাধি দেন এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সুবা বাংলার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের দীওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান।

মোগল শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক দীওয়ান প্রাদেশিক রাজস্ব শাসনে সর্বেসর্বা ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক সুবাদারের অধীনে ছিলেন না, বরং তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের দীওয়ানের নিকট জবাবদিহি করতে হত। সুবা বাংলার রাজস্ব প্রশাসনে দীওয়ানের অনেক বেশি সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, কারণ অন্যান্য প্রদেশের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, কিন্তু বাংলায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় দীওয়ানকে এশীয় এবং ইউরোপীয় সকল ব্যবসায়ীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হত। তাই ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য শুল্কও আয়ের উৎস ছিল, যদিও সারা মুসলিম আমলে ভূমি রাজস্ব প্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারতলব খান যখন বাংলার দীওয়ান হয়ে আসেন, তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন রাজপরিবারের লোক, সম্রাটের পৌত্র শাহজাদা আজিম-উদ-দীন। শাহজাদা আসন্ন উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলাদেশে আসেন। তিনি সওদা-ই-খাস নামে ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে থাকেন এবং জমিদারদের নিকট থেকেও অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত হন। দীওয়ার কারতলব খান তাঁর অবৈধ কার্যক্রমে বাধা দিলে এবং সম্রাটের নিকট তাঁর অপকর্মের সংবাদ পাঠালে সুবাদার দীওয়ানের প্রাণনাশের চেষ্টায় লিপ্ত হন।

ঐ সময়ে বাংলায় নগদ বেতনে একদল সৈন্য নিযুক্ত ছিল। তাদের বেতন বাকী পড়ায় ঐ সৈন্যদলের নেতা আবদুল ওয়াহেদকে সুবাদার দীওয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেন। একদিন দীওয়ান দীওয়ান খানায় যাওয়ার পথে নগদী সৈন্যরা ভীষণ হৈ চৈ শুরু করে দেয়। দীওয়ান সুকৌশলে সেখানে চলে আসেন এবং সুবাদারের নিকট গিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করার জন্য সুবাদারকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। সুবাদার অস্বীকার করলেও কারতলব খানের বুঝতে বাকী রইল না নগদী সৈন্যদের প্ররোচিত করেন কে? কারতলব খান এর পরে নিজ দফতরে গিয়ে নগদী সৈন্যদের সকল পাওনা মিটিয়ে দেন এবং তাদের বরখাস্ত করে দেন। তিনি এই বিষয়ে সম্রাটের নিকট প্রকৃত ঘটনা জানান এবং দিওয়ানী দফতর ঢাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাট সংবাদ পেয়ে সুবাদারকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখান এবং বলেন যে দীওয়ানের একটি চুল স্পর্শ করলেও সুবাদারকে জবাবদিহি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবাদার আজিম-উদ-দীনকে ঢাকা ছেড়ে পাটনায় এসে অবস্থান করার আদেশ দেন এবং দীওয়ানকে তাঁর দফতর মখসুসাবাদে (মুর্শিদাবাদে) স্থানান্তর করার অনুমতি দেন। সুবাদার ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ছেড়ে পাটনায় চলে যান, পাটনার নাম হয় আজিমাবাদ, তিনি সেখান থেকে প্রতিনিধি মারফত সুবার শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। দীওয়ানও দিওয়ানী দফতর নিয়ে মখসুসাবাদে চলে যান। ঢাকা রাজধানী থাকলেও সুবাদার এবং দীওয়ানের উপস্থিতির মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

মখসুসাবাদকে দিওয়ানী সদর দফতর হিসেবে বেছে নেওয়ার কিছু কৌশলগত কারণও ছিল। প্রথমত, মখসুসাবাদ ছিল সুবা বাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যে কারণে

ঢাকাকে রাজধানী নির্বাচিত করা হয়, অর্থাৎ বার-ভূঁঞার দমন করা, সে কারণ এখন দূর হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, মখসুসাবাদ ছিল ভাগিরাথীর তীরে অবস্থিত, এই নদীর ধারেই ছিল সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কর্মকাণ্ড। ইউরোপীয় কোম্পানীরা এবং অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ইত্যাদি ব্যবসাকেন্দ্রে কুঠি স্থাপন করে। এগুলি ছিল ভাগিরাথীর তীরে। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে ইংরেজরা হুগলী থেকে সরে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতায় তাদের বাণিজ্য কুঠি সরিয়ে নেয় এবং সুবাদারের অনুমতি নিয়ে এই তিনটি গ্রাম খরিদ করে সেখানে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। দালাল, পাইকার, হুণ্ডী ব্যবসায়ী সকলে ইউরোপীয় কোম্পানীদের কুঠির চতুর্দিকে ভীড় করতে থাকে, ইরানী, আরবি আরমেনীয় ব্যবসায়ীরাও ইউরোপীয়দের সঙ্গে লেন-দেন বৃদ্ধি করে। হুগলী বা কলিকাতা বন্দর ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়রা আরো কয়েকটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। যেমন কাসিম বাজার, রাজমহল, রাজশাহীর মখদুমপুর ইত্যাদি। পাটনার নিকটস্থ স্থান থেকে আহরণ করা শোরা তখন ইউরোপীয়দের রপ্তানীর প্রধান বস্তু ছিল। অতএব ইউরোপীয় এবং অন্যান্য বণিকদের কার্যকলাপ ভাগিরথীর তীরেই বৃদ্ধি পায়। সেই তুলনায় পূর্ববঙ্গে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল মাত্র ঢাকায়। অতএব দীওয়ান কারতলব খান বেশ চিন্তা-ভাবনা করে দিওয়ানী অফিস ঢাকা থেকে মখসুসাবাদে স্থানান্তর করেন।

এর এক বৎসর পরে দীওয়ান কারতলব খান এক বৎসরের রাজস্ব সংগ্রহ করে হিসাব নিকাশ ঠিক করে সমুদয় রাজস্ব নিয়ে দক্ষিণাত্যে সম্রাটের দরবারে যান। দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে তখন সম্রাটের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সুবা বাংলার রাজস্ব ছিল বাৎসরিক এক কোটি টাকার উপরে। এই বিরাট অংকের রাজস্ব একসঙ্গে পেয়ে সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় দীওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। সম্রাট তাঁর প্রাদেশিক দীওয়ানকে মুর্শিদকুলী খান উপাধি দেন এবং দীওয়ানের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিভাগের ফৌজদার নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন এবং দীওয়ানের নাম অনুসারে মখসুসাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখারও অনুমতি দেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর মুর্শিদকুলী খানের পাঠানো বাৎসরিক কোটি টাকার রাজস্ব দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। অতএব মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের একজন অতিবিশ্বস্ত ও অনুগ্রহভাজন অফিসারে পরিণত হন। তাঁর মর্যদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং সম্রাট তাঁর দায়িত্বও বৃদ্ধি করে দেন। তিনি উড়িষ্যার সুবাদারীর দায়িত্ব লাভ করেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশের দিওয়ানী, এবং ৫টি জিলার ফৌজদার নিযুক্ত হন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শাহজাদা মুয়াজ্জম জয়লাভ করে শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। পিতার সিংহাসন আরোহণে শাহজাদা আজিম-উদ-দীনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রভাবে মুর্শিদকুলী খান বাঙলা বিহার ও

উড়িষ্যার সকল পদ থেকে অপসারিত হন এবং দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হয়ে যান। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান শাসনকাজে এতই দক্ষ ছিলেন যে, সুবাদার আজিম-উদ-দীন প্রায় ৩ বৎসরের মাথায় তাঁকে আবার বাংলার দীওয়ানের পদে দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে আবার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আজিম-উদ-দীন প্রাণ হারান এবং জাহানদার শাহ সিংহাসনে বসেন। আজিম-উদ-দীনের পুত্র ফররুখ সিয়র কয়েকজন সেনাপতির সাহায্যে জাহানদার শাহকে পরাজিত করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বারবার গৃহযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। অনেক উচ্চ পদস্থ অফিসার, সেনাপতি, সেনানায়ক গৃহযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে এবং সাম্রাজ্যের শাসন সুষ্টভাবে চালাবার মত নেতৃত্বগুণের অফিসারের অভাব দেখা দেয়। কিন্তু রাজধানী এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও দীওয়ান মুর্শিদকুলী খানের অধীনে সুবা বাংলায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি, বরং সুবার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে থাকে। এতে মুর্শিদকুলী খানের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকজন কেন্দ্রীয় অফিসারকে পরপর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন অনুপস্থিত সুবাদার, প্রতিনিধি মারফৎ সুবা বাংলা শাসন করতেন। অবশেষে সুবা বাংলা শাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার মুর্শিদকুলী খানকে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে প্রথমে জাফর খান ও অল্প পরে মুতামিন-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জং উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে সাত হাজার মনসবে উন্নীত করা হয়। ইতোপূর্বে তিনি সুবাদারদের প্রতিনিধি হিসেবে সুবার সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করতেন, কিন্ত এখন থেকে তিনি নামে ও কাজে, অর্থাৎ সার্বিকভাবে সুবা বাংলার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন। শুধু তাই নয়, তিনি একই সঙ্গে উড়িষ্যার সুবাদার, বিহারের দীওয়ান এবং মুর্শিদাবাদ, সিলেট, চট্টগ্রাম, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং কটক ইত্যাদি কয়েকটি জিলার ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খান দীওয়ান রূপে সুবা বাংলার শাসন ক্ষমতায় প্রবেশ করেন। কিন্তু স্বীয় দক্ষতার গুণে তিনি সুবা বাংলার এবং সুবা উড়িষ্যার সুবাদারী এবং সুবা বিহারের দিওয়ানী লাভ করেন। জীবনের শেষ দিকে (প্রায় শেষ এক যুগ) তিনি বাংলা ও উড়িষ্যায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং বিহারেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় ক্ষমতাবান হন। তিনি উচ্চ মর্যাদার উপাধিও লাভ করেন. ঐতিহাসিকেরা তাঁকে জাফর খান রূপে পরিচিতি দেন। তবে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমরা তাঁকে মুর্শিদকুলী খান রূপেই অভিহিত করছি। মুর্শিদকুলী খান যখন সুবাদারী পদে উন্নীত হন, তখন দিল্লীর শক্তি অত্যন্ত দূর্বল; মোগল সম্রাট ও সম্রাটের মন্ত্রীপরিষদ সুবা বা প্রদেশের রাজস্ব পেলেই খুশী থাকতেন এবং প্রাদেশিক সুবাদারদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। প্রাদেশিক সুবাদারদের কাজে সম্রাট হস্তক্ষেপ করতেন না, বা হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। সম্রাট সুবাদারদের

প্রস্তাব বা সুপারিশ বিনা দ্বিধায় অনুমোদন করতেন। মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব সংগ্রহ করার কাজে এবং সংগৃহীত রাজস্ব আইন অনুযায়ী সম্রাটের নিকট পাঠাবার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং ফলে সম্রাট ও ইম্পেরিয়াল দীওয়ান মুর্শিদকুলী খানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং সম্রাটের নিকট মুর্শিদকুলী খানের মর্যাদাও ছিল অত্যধিক। তাই মুর্শিদকুলী খান শাসনযন্ত্রে স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং অনুগৃহীতদের নিযুক্ত করে সকল গুরুত্বপূন স্থানে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন। মুর্শিদকুলী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা ছিল—নাম জিন্নাতুন্নেসা বেগম। তিনি তাঁর জামাতা শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যায় ডেপুটি সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং শুজা-উদ-দীনের ছেলে (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) মুহাম্মদ তকীকে বালেশ্বরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর আত্মীয় মুহাম্মদ আলী খান, ইতিসাম খান ও তাঁর পুত্রকে পর্যায়ক্রমে ঢাকায় তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত করেন। তিনি সৈয়দ আকরাম খান, পরে সৈয়দ রাজী খান এবং তাঁর পরে সরফরাজ খানকে বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করেন। এঁরা সকলেই মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয় ছিলেন, সরফরাজ খান ছিলেন তাঁর দৌহিত্র। অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যেমন ফৌজদারও হয় তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বা তাঁর অনুগ্রহভাজন থাকায় তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। অতএব সমগ্র প্রশাসন ছিল মুর্শিদকুলী খান কেন্দ্রিক। কেউ রক্তের বন্ধনে, কেউ বৈবাহিক সম্পর্কে বা কেউ কেউ নবাবের কারণে উন্নতি লাভ করায় কর্মকর্তাদের সকলেই ছিলেন মুর্মিদকুলী খানের প্রতি অনুগত। দুইজন সদর কানুনগো দর্প নারায়ণ এবং জয় নারায়ণ কেন্দ্রীয় দীওয়ান কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তাঁরা ও মুর্শিদকুলী খানের প্রতি অনুগত ছিলেন। কারণ মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব প্রশাসনে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। নিম্ন পদে, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে হিন্দু কর্মচারীরাই সংখ্যায় অধিক ছিল। জমিদারেরা ও ছিল অংকাংশ হিন্দু। টাকশালের দারোগা ছিল রঘুনন্দন। তিনি প্রভাব খাটিয়ে তাঁর ভাই রামজীবনকে বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক করে দেন। জগৎ শেঠ পরিবারের উত্থানও হয় এই সময়ে, এবং ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীদের কুঠিকে কেন্দ্র করে অনেক উকীল, দালাল, পাইকার ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে রাজনৈতিকভাবে যেমন বাংলার নবাবী আমল শুরু হয়, অর্থনৈতিকভাবে তেমনি নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অতএব এই সময়ে হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়। মুসলমানেরা শাসক গুষ্ঠি হিসেবে শাসন বিভাগ এবং সামরিক বিভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের আগ্রহ ছিল না।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার ঃ

মুর্শিদকুলী খানের এক বিরাট এবং অনন্য সাধারণ কীর্তি হল রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা সম্রাট আকবরের সময়ে থেকেই পূর্ণতা লাভ করে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা তোডরমল্ল বাংলার রাজস্ব সুবিন্যাস্ত করেন। এটা তোডরমল্লের

বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। যদিও বাংলার অধিকাংশ এলাকা মোগল অধিকারের বাইরে ছিল, তোডরমল্ল সারা সুবা বাংলার জন্য ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাই মনে হয় পূর্বের শাসকদের সময়ে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করে তোডর মল্ল তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সারা বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী কামরূপ মোগলদের অধিকারে আসে। এই সময়ে কোন কোন এলাকায় রাজস্ব ব্যবস্থা পুনঃনির্ধারণের প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং শাহ্ শুজার সময়ে সম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশ নদী মাতৃক, নদীর এক কূল ভাঙ্গে অন্যকূল গড়ে, এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে আবাদ নষ্ট হয়, আবার অন্যদিকে নতুন আবাদ গড়ে উঠে। তাই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাও নতুন করে নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভূমি রাজস্ব উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, তাই মুসলিম আমলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমি কর পরিবর্তন করা হত। মুর্শিদকুলী খানও ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার করেন, মধ্যের ২/৩ বৎসর বাদে ১৭০০ সাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭২৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই তিনি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং রাজস্ব সংস্কারে তাঁর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

ঐ সময়ে রাজস্বকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা হত-মাল ও সায়ের। মাল হল ভূমি রাজস্ব এবং সায়ের হল ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্য সকল আয়। ভূমি আবার খালিসা এবং জায়গীর নামে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ কিছু ভূমি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন। এখানে সরকারি কর্মকর্তারা সরাসরি রায়ত বা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করত। এইরূপ ভূমিকে খালিসা বলা হত। আবার কিছু ভূমি বেতনের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দেওয়া হত, এগুলি জায়গীর ভূমি। খালিসা বা জায়গীর সকল ভূমিতেই রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা জমিদারদের উপর ন্যাস্ত ছিল। এইভাবে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা খুব একটা সহজ কাজ ছিলনা, বরং ইহা একটি জটিল বিষয় বলে গণ্য হত। সায়ের রাজস্ব হল ভূমি ছাড়া যেমন জলমহাল, বন, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর আরোপিত কর। জলমহাল, বনমহাল ইত্যাদি আবার ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বানিজ্যের শুল্ক সায়েরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সতের শতকের শেষ অংশ থেকে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য শুল্কও বৃদ্ধি পায় এবং সায়ের রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে খালসা, জায়গীর ভূমি, সরকারি দিওয়ানী বিভাগের কর্মচারীদের রাজস্ব সংগ্রহ, জমিদারী প্রথা, সায়ের রাজস্ব ইত্যাদি সব মিলিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থা খুব একটা সহজ ছিল না। মুর্শিদকুলী খান সম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যবস্থা ভালভাবে পরীক্ষা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করেন। তাঁর সংস্কার নীতি সমূহ ১৭২২ সালে পূর্ণতা লাভ করে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মুর্শিদকুলী খান সমগ্র বাংলার কর্ষিত ভূমি জরিপ করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করেন এবং রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এটা একটি ঢালাও মন্তব্য। মুর্শিদকুলী খানের পক্ষে সারা বাংলার ভূমি জরিপ করা সম্ভব

ছিল কিনা সন্দেহ। তবে এটা সত্য যে মুর্শিদকুলী দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে রাজস্ব সংগ্রাহক, কানুনগো ইত্যাদির মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। উড়িষ্যায় ভূমি বাংলার ভূমির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ছিল। তাই তিনি জায়গীরদারদের জায়গীর ভূমি বাংলা থেকে উড়িষ্যায় স্থানান্তর করেন। ভূমির উৎপাদন শক্তি নির্ধারণে জমিদারেরা অশুভ প্রভাব খাটাতে পারে মনে করে তিনি জমিদারদের আটক করে রাখেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতেই ভূমির উৎপাদন শক্তি নির্ধারণ করেন। তিনি শিকদার, আমিন, কারকুন ও জরিপকারীদের সাহায্যে আবাদী ও পতিত জমি পৃথক পৃথকভাবে পরিমাপ করেন এবং রাজস্ব নির্ধারণ করেন। তিনি জমিদারদের স্বত্ব পরীক্ষা করেন এবং সরকারের সঙ্গে জমিদারদের স্বাক্ষরিত পূর্ববর্তী চুক্তিগুলো দেখে জমিদারদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন চুক্তি করে জমিদারদের রাজস্ব খেলাফী হওয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খান সময়মত রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের উৎসাহিত করতেন কিন্তু খেলাফী জমিদারদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, এমন কি তাদের কারারুদ্ধ করে শাস্তি দিতেন। খেলাফী জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি নতুন জমিদারদের নিকট জমিদারী দিতেন এবং এইভাবে নতুন নতুন জমিদারী সৃষ্টি করেন। নতুন জমিদারেরা রাজস্ব আদায়ে বেশি তৎপর হতেন। অতএব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের মূল নীতি হল, ভূমি থেকে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা এবং একই সাথে রায়ত বা কৃষকদের সুখে শান্তিতে রেখে সন্তুষ্টি বিধান করা। এই লক্ষ্যে অকর্ষিত ও অনাবাদী ভূমি কৃষির উপযোগী করে তোলা হয় এবং দিওয়ানী বিভাগের খতিয়ান ভুক্ত করা হয়। ফলে তোডরমল্লের বন্দোবস্ত থেকে মুশিদকুলী খানের বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তোডরমল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার মত, শাহ শুজার বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষের মত এবং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষের মত। তোডরমল্লের বন্দোবস্ত থেকে শাহ শুজার বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় মোটামুটি ভাবে ১৫% এবং মুর্শিদকুলী খানের সময়ে মোটামুটিভাবে আরো ১৩% বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলী খান বার্ষিক পুন্যাহ প্রথা প্রবর্তন করেন, অর্থাৎ বৎসরের একদিনে বৈশাখ মাসে পুন্যাহর দিনে জমিদারেরা তাদের নিজ নিজ রাজস্ব আদায় করতে বাধ্য থাকত। এতে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয় কমে যায় এবং রাজস্ব সংগ্রহও নিশ্চিত হয়।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারকে 'মাল-জামিনী' ব্যবস্থা রূপে অভিহিত করেন। মাল অর্থ ভূমি রাজস্ব, জামিন অর্থ জামিন দেওয়া বা জামিন রাখা, অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খান নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করেন তাদের নিকট ভূমি রাজস্ব জামিন রাখেন। এর অর্থ এই যে, ইজারাদারগণ রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকার নির্ধারিত অঙ্কের রাজস্ব সরকারের নিকট প্রদান করতে জামিন থাকবেন। পূর্ববর্তী জমিদারেরা অমিতব্যয়ী হয়ে বিলাসিতায় জীবনযাপন করত বলে তারা নিয়ম মত রাজস্ব আদায় করতে পারত না। তাই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুর্শিদকুলী খান নতুন জমিদার

নিযুক্ত করেন। নতুন জমিদারকে ইজারাদার বলা হয়, ইজারাদাররা রাজস্ব ঠিকাদার রূপে ও বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু 'মাল-জামিনী' কথাটা ঠিক নয়, রাজস্ব সংগ্রহ ঠিকাদারদের হাতে ন্যাস্ত করলে তারা জোর জুলুম করে কৃষকদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করত, কৃষকদের এইরূপ জোর জুলুম করা মুর্শিদকুলী খানের শাসন নীতির পরিপন্থী ছিল। তবে এটা ঠিক যে, মুর্শিদকুলী খান খেলাফী কিছু কিছু জমিদারকে শাস্তি দেন, বলতে গেলে কঠোর শাস্তি দেন। কয়েকজন খেলাফী জমিদারকে বাদ দিয়ে তিনি নতুন কয়েকজন জমিদারকে জমিদারী দেন। তিনি জমিদারদের নিকট থেকে ঋণ- পত্র নিয়ে মুচলেকা নেন যাতে জমিদারেরা খাজনা আদায়ে বাধ্য থাকে। এটাকেই ভুল করে ইজারাদারদের নিকট মাল-জামিনের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের সকলেই স্বীকার করেন যে, মুর্শিদকুলী খান শুধু খেলাফী জমিদারদের শাস্তি দিতেন। তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, ফলে রায়তরা বিনা বাধায় ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয় এবং তাদের করদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতএব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব বৃদ্ধির অর্থ এই নয় যে তিনি অবৈধ ভাবে কর আদায় করেন।

ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের প্রসার ঃ

মুর্শিদকুলী খানের সময়ে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার হয়। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানীগুলো বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে থাকে। তারা এখানে থেকে সিল্ক, সিল্ক ও সূতী বস্ত্র, লাক্ষা, চিনি, চাউল এবং শোরা (গন্ধক) প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে এবং অন্যান্য স্থানে রপ্তানী করত। এই সময়ে ইউরোপীয়দের রপ্তানী তালিকায় শোরা, সিল্ক, সিল্ক এবং সুতী বস্ত্র অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করে। তাদের আমদানী ছিল সাধারণত গরম কাপড়। এই দেশ নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় এখানে গরম কাপড়ের বিশেষ চাহিদা ছিল না। তাই ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীগুলো তাদের আমদানী দিয়ে রপ্তানীর মূল্য শোধ করতে পারত না। এই কারণে তারা পিণ্ড আকারে প্রচুর সোনা ও রূপা স্বদেশ থেকে নিয়ে আসত। এদিকে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়।

মুর্শিদকুলী খানের সময়ের আগে থেকেই ইংরেজ, ডাচ্ এবং ফরাসী বণিক কোম্পানীগুলো ভাগিরথী নদীর তীরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করায় বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেশ প্রসার লাভ করে। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কালিকাতা এই তিনটি গ্রাম কিনে কলিকাতা নগরীর পত্তন করে এবং সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দূর্গও নির্মাণ করে। তারা বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি করে এবং তাদের কুঠিকে ঘিরে অনেক দেশী এবং ইরানী, আর্মেনীয় বণিকও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। ডাচ্রা চুঁচুড়ায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং তারাও ফোর্ট গাস্টাভাস নামে দূর্গ নির্মাণ করে এবং ফরাসীরা চন্দননগরে ফোর্ট অর্লিয়েনস নির্মাণ করে। ইংরেজ ও ডাচরা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে, ফরাসীরা নতুন

আসায় তাদের বাণিজ্যে প্রসার লাভ ঘটলেও তারা অন্য দুই কোম্পানীর তুলনায় পিছিয়ে ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে দিনেমার ও অস্টেণ্ড কোম্পানীও বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। দিনেমাররা ডেনমার্কের এবং অস্টেণ্ডরা অস্ট্রীয় কোম্পানী, দিনেমার কোম্পানী ভাগিরথির তীরে গুপ্তিপাড়ায় এবং অস্টেণ্ডরা বাঁকিবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। মুর্শিদকুলী খান আয়-ব্যয়, লেন-দেন, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থাৎ সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভাল বুঝতেন, দেশের সমৃদ্ধিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তিনি ইউরোপীয় কোম্পানীর সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়, পণ্য আনা-নেওয়ার প্রতিবন্ধকতা দুর হয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও নির্বিঘ্ন হয়। তবে মুর্শিদকুলী খান ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি এবং কর ফাঁকি বরদাশত করতেন না। ইউরোপীয়রাও এরূপ দূর্নীতিতে লিপ্ত থাকত। মুর্শিদকুলী খান দূর্নীতিবাজদের শাস্তি দিতেন। এইকারণে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাও মুর্শিদকুলী খানের দুর্নাম করতেন। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজ ও ডাচ্ ও ফরাসীরাও তাদের নিজ নিজ বাণিজ্য কেন্দ্রে দুর্গ নির্মাণ করে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খান তাদের দুর্গ সমাপ্ত করতে দেননি। তিনি এইদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেন ইউরোপীয়রা তাদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের ক্ষতি করতে না পারে। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা সম্রাট ফররুখ সিয়রের নিকট থেকে আরো ৩৮টি গ্রাম খরিদ করার অনুমতি লাভ করে। এই গ্রামগুলো ছিল তাদের পূর্বের খরিদ করা তিনটি গ্রাম সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার নিকটবর্তী এবং লাগোয়া। সম্রাটের ফরমান লাভ করলেও মুর্শিদকুলী খান ইংরেজদের এই ৩৮টি গ্রাম খরিদ করার অনুমতি না দিয়ে বরং বাধা দেন। শেষ পর্যন্তও ইংরেজরা এই গ্রামগুলো খরিদ করতে পারেনি।

মোগল আমলে ব্যাংক ছিল না, কিন্তু অর্থ লগ্নিকারী ব্যবসায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল, তারা সুদে টাকা খাটাত। তখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজনও ছিল। অর্থ স্থানান্তরও করত অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হুন্ডির মারফত, বিনিময়ে সুদ বা লাভ দিতে হত। অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাহু বা সাহাদের অধীনে ছিল। কোন কোন সাহার ব্যবসা সারা মোগল সাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত ছিল। ব্যবসায়ীরা এবং ইউরোপীয় কোম্পানীরাও সাহাদের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করত। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে অনেক সাহা পরিবার রাজপুতানা থেকে এসে বাংলায় হুণ্ডী ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে হিরানন্দ সাহা পরিবার অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তারাই পরে জগৎ শেঠ উপাধি পেলে জগৎশেঠ পরিবারের উত্থান হয়। হিরানন্দের এক ছেলে মানিক চান্দ বাংলায় আসেন এবং নগর শেঠ উপাধি লাভ করেন। মানিকচান্দের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাগিনা এবং দত্তকপুত্র ফতেহচান্দ তাঁর মহাজনী ব্যবসায়ের মালিক হন। এই ফতেহতান্দ ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের সুপারিশে সম্রাটের নিকট থেকে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন।

শাসক হিসেবে মুর্শিদকুলী খান অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর অভিভাবক হাজী শফী ছিলেন একজন দীওয়ান, রাজস্ব প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও পটু। মুর্শিদকুলী খানও তাই ছোটবেলা থেকে রাজস্ব প্রশাসনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। দীওয়ান হিসেবে তিনি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থেকে শাহজাদা এবং সুবাদার আজিম-উদ-দীনের সঙ্গেও বিবাদে লিপ্ত হন। কারণ সুবাদারের অবৈধ কাজকর্ম তিনি সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তিনি সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং সম্রাটের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। এই কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। পরবর্তী সম্রাটেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন, কারণ তিনি উত্তরাধিকারের যুদ্ধে কোন পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকেন এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের উপযুক্ত কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটেরা তাঁর প্রতি সাময়িকভাবে বিরূপ হলেও তাঁরা কেউ তাঁর ক্ষতি করেননি, কারণ তাঁরা সকলেই জানতেন যে, তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ও দক্ষ অফিসার। এই কারণে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি করে শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক সুবাদারের পদে উন্নীত হন।

মুর্শিদকুলী খানের সময়টা ছিল অত্যন্ত নাজুক। মোগল সাম্রাজ্য তখন ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সম্রাটের ক্ষমতা দিন দিন ক্ষীন হয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্রাদেশিক সুবাদারেরা সুযোগ নিতে থাকে। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান এইরূপ কোন অবৈধ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেননি। এই সময়েও তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রদেশিক রাজস্ব সম্রাটের দরবারে পাঠাতেন। উচ্চভিলাষী ইউরোপীয় বণিকদের তিনি যেভাবে সীমা অতিক্রম করতে বাধা দেন তাতেও তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সময়ে সুবা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, রপ্তানীর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আগমন করে এবং সুবা বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হয়। মুর্শিদকুলী খান শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। প্রবল চাপের মুখেও তিনি উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে তাঁর অধীনস্থ এলাকায় শান্তি বজায় রাখেন। তিনি রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করে একটি নতুন জরিপকাজ সমাধা করে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করেন, সুবার রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং সুবা বাংলার সার্বিক উন্নতি অগ্রগতির পথ সুগম করেন। তাই বাংলার সফল মোগল সুবাদারদের তালিকায় মুর্শিদকুলী খানের নামও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই মহান সুবাদার ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জুন মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর ওসিয়ত মত তাঁকে তাঁর নির্মিত মসজিদের সিঁড়ির নীচে দাফন করা হয়।

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান ১৭২৭-১৭৩৯

মুর্শিদকুলী খানের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর দৌহিত্র মিরযা আসাদ উল্লাহ, উপাধি সরফরাজ খান। মুর্শিদকুলী খান সরফরাজ খানকে তাঁর স্থলে সুবাদার নিযুক্ত করার জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর জামাতা এবং সরফরাজ খানের পিতা

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান আগেভাগে চেষ্টা করে নিজেই সুবাদার নিযুক্ত হয়ে যান এবং মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদে এসে ক্ষমতা দখল করেন। সরফরাজ খান আগে থেকেই বাংলার দীওয়ান ছিলেন, পিতার আমলেও তিনি দিওয়ানী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন।

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তকীকে (সরফরাজ খানের বৈমাত্রেয় ভাই) উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন এবং তাঁর জামাতা মিরযা লুৎফুল্লাহকে ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। মিরজা লুৎফুল্লাহকে মুর্শিদকুলী খান উপাধি দেওয়া হয়, তাই তিনি মুর্শিদকুলী খান দ্বিতীয় নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং কবি হিসেবে তাঁর ছদ্মনাম নাম ছিল মখমুর। নবাবের ছেলে সরফরাজ খানকে দীওয়ান পদে বহাল রাখা হয়। তবে তাঁর ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়, কারণ আলমচাঁদকে খালসা রাজস্বের দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। আলমচাঁদ উড়িষ্যায় শুজা-উদ-দীনের দীওয়ান ছিলেন। তাই তাঁকে পুরস্কৃত করা হয় এবং রায়রায়ান উপাধি দেওয়া হয়। পরে অবশ্য আলমচাঁদ দীওয়ান রূপে সার্বিক দায়িত্ব লাভ করেন। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে শুজা-উদ-দীন বিহারের সুবাদার বা নাজিমের দায়িত্বও লাভ করেন।

শুজা-উদ-দীনের শাসনের একটি বৈশিষ্ট হল, তিনি একটি শাসন পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন হাজী আহমদ ও তাঁর ভাই আলীবর্দী খান, দীওয়ান রায়রায়ান আলমচাঁদ এবং ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী দুই ভাই শুজা-উদ-দীন উড়িষ্যায় থাকাকালে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং উড়িষ্যা শাসনে সাহায্য করে শুজা-উদ-উদ-দীনের অনুগ্রহ লাভ করেন। হাজী আহমদ ছিলেন একজন বাকপটু, কথাবার্তায় যে কাউকে তিনি মুগ্ধ করতে পারতেন, কিন্তু আলীবর্দী ছিলেন একজন সুদক্ষ সৈনিক। অতএব শুজা-উদ-দীন এই দুই ভাইকে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। রায়রায়ান আলমচাঁদ দীওয়ান রূপে এমনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন যে, তাঁকে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। জগৎ শেঠ তাঁর অর্থ সম্পদ দিয়ে সুবাদারকে এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট রাখতেন। এমনকি সুবাদারেরাও প্রয়োজনে জগৎ শেঠের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, এবং কথিত আছে যে জগৎ শেঠ স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে এবং নজরানা দিয়ে কেন্দ্রীয় উজীরদের হাত করে সম্রাটের নিকট থেকে সুবাদারের নিযুক্তি নিয়ে আসেন। সে যাই হোক, শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান এই চারজন মন্ত্রকের পরামর্শ মতেই শাসন পরিচালনা করতেন।

শুজা-উদ-দীন বিহারের সুবাদারী লাভ করে আলীবর্দী খানকে বিহারে তাঁর প্রতিনিধি বা নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন, এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাকে চারটি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করেন। বিহার এবং উড়িষ্যা পূর্ব থেকেই দুটি স্বতন্ত্র সুবা বা প্রদেশ থাকায় ঐ দুটি স্বতন্ত্র নায়েব নাজিমের অধীনে দেয়া হয়। মুহাম্মদ তকীকে উড়িষ্যায় বহাল রাখা হয় এবং বিহারে আলীবর্দী খানকে নায়েব নাজিম নিযুক্ত করা হয়। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বিভাগ গঠন করা হয়।

শুজা-উদ-দীন নিজেই এই অঞ্চলের দায়িত্ব নেন। ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলে মুর্শিদকুলী খান ২য় কে বহাল রাখা হয়।

ঢাকার নায়েব নাজিম মুর্শিদকুলী খান ২য় ত্রিপুরা জয় করেন। তিনি তাঁর সেনাপতি মীর হাবিবকে ত্রিপুরা অভিযানে পাঠান এবং পটপসরের জমিদার আগা সাদেক মীর হাবিবের সঙ্গে অগ্রসর হন। ত্রিপুরার একজন দল ত্যাগী রাজপুত্র মীর হাবিবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। ত্রিপুরার রাজা মোগল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে রাজধানী ছেড়ে পর্বতে আশ্রয় নেন। চণ্ডীগড় দূর্গ অধিকৃত হয়, মীর হাবিব ত্রিপুরার রাজার এক ভাইপোকে ত্রিপুরার সিংহাসন ফেরত দেন, কিন্তু আগা সাদিককে সেখানে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। মীর হাবিব বিস্তর ধন সম্পদ নিয়ে ঢাকা ফিরে আসেন এবং ধন সম্পদ সুবাদারের নিকট মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। শুজা-উদ-দীন সন্তুষ্ট হয়ে বিজিত এলাকার নাম রাখেন রৌশনাবাদ। তাঁর সুপারিশে সম্রাট মুর্শিদকুলী খান ২য়কে বাহাদুর উপাধি দেন এবং মীর হাবিবকে আমীর পদে উন্নীত করেন।

১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মুহাম্মদ তকীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে উড়িষ্যার নারেব নাজিম নিযুক্ত করা হয় এবং সরফরাজ খান ঢাকায় নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খান নিজে ঢাকায় না গিয়ে প্রথমে গালিব আলী খান এবং পরে তাঁর (সরফরাজ খানের) ভাগিনা ও জামাতা মুরাদ আলী খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই সময়ে আলীবর্দী খানের উত্থানও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন, পরে এই আলীবর্দী খানই তাঁর মনিব শুজা-উদ-দীন খানের ছেলে সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ দখল করেন। হাজী আহমদের ছেলে সৈয়দ আহমদ সরফরাজ খানের প্রতিনিধি রূপে ঘোড়াঘাট ও রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন।

শুজা-উদ-দীন খান একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। উড়িষ্যার নায়েব নাজিম থাকা কালে তিনি শাসন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং বাংলা বিহার, ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। দিনাজপুরের জমিদার ও কোচ-বিহারের রাজা অবাধ্য আচরণ করলে তিনি তাদের দমন করেন এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায় করতে বাধ্য করেন। বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জামান রাজস্ব আদায়ে গড়িমসি করে বিদ্রোহী হন। তাঁকে দমন করা হয়, তবে নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে নবাব তাঁকে ক্ষমা করেন। শুজা-উদ-দীন মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা বহাল রাখেন এবং প্রয়োজনীয় রদবদল করে রাজস্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তাছাড়া তিনি কিছু আবওয়াব বা উপকর বৃদ্ধি করেন। তাতে রাজস্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে তিনি সীমান্ত জিলাগুলোতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, অর্থাৎ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই অতিরিক্ত কর আদায় করা হত। তিনি মুর্শিদকুলী খানের ন্যায় সম্রাটের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় বাৎসরিক রাজস্ব নিয়মিত দিল্লীতে পাঠাতেন। এই কারণে সম্রাটও তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

মুর্শিদকুলী খানের মত শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির উপরই দেশের উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে। চাষী তাঁতি ইত্যাদি সকলেই তাদের উৎপন্ন কৃষি ও শিল্প দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য পেয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এইজন্য তিনি নদী বা সড়ক পথে নিরাপত্তা বিধান করতেন। ইউরোপীয় বণিকদের সুযোগ-সুবিধার প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু ইউরোপীয় বণিকদের অবাধ্যতাও তিনি সহ্য করতেন না। ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত, কারণ ব্যক্তিগত বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত লাভজনক। তারা কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্য সম্রাট বা সুবাদারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করত, কিন্তু কোম্পানীর জন্য প্রাপ্ত সুযোগ তারা ব্যক্তিগত ব্যাবসায়েও প্রয়োগ করত। এতে সরকারি শুল্ক কর্মচারী এবং ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রায় মতবিরোধ দেখা দিত। কোন কোন সময় উভয়পক্ষে সংঘর্ষের উপক্রম হত। বণিক কোম্পানীরা শুল্কও ফাঁকি দিত। শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান তাদের অপকর্ম কঠোর ভাবে দমন করতেন। কোন কোন সময় বণিক কোম্পানীরা মোটা অর্থ নযরানা দিয়ে সুবাদারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতেন।

নবাব শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান অমায়িক এবং প্রজাদের কল্যাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বন্ধুবান্ধব ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি সদয় ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রজারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাত। তাঁর সময় পণ্যদ্রব্য সস্তা ছিল। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে শাসন পরিষদ, অর্থাৎ হাজী আহমদ, আলমচাঁদ এবং জগৎ শেঠ (আলীবর্দী খানও এই পরিষদে ছিলেন, কিন্তু ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত হয়ে পাটনায় চলে যান) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ তারিখে পরলোক গমন করেন।

সরফরাজ খান ১৭৩৯-১৭৪০ ঃ

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহন করেন। মৃত্যুর আগে পিতা তাঁকে বলেন যে তিনি যেন শাসন পরিষদ অর্থাৎ হাজী আহমদ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের পরামর্শ ও উপদেশক্রমে শাসন পরিচালনা করেন। সরফরাজ খানও পিতার উপদেশ মত কাজ করেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে, এই তিনজন ছিলেন কুচক্রী। তারা তাঁর ধ্বংস কামনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সহায়তায় বিহারের নায়েব নাজিম আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। সরফরাজ খান যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হন।

সরফরাজ খান একজন ধর্মানুরাগী লোক ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর মাতামহের অনুসরণ করতেন। তাঁর সময়ে জিনিষপত্রের দাম এত সস্তা হয় যে, টাকায় আট মন চাউল বিক্রি হত। স্মরণ থাকতে পারে যে শায়েস্তা খানের সময় টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত। এই কারণে শায়েস্তা খান ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় দূর্গের পশ্চিম

গেট বন্ধ করে দিয়ে শিলালিপিতে লিখে যান যে, যতদিন পর্যন্ত চালের দাম ঐরূপ সস্তা না হবে ততদিন ঐ গেট খোলা হবে না, ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, সরফরাজ খানের সময় ঐ গেট খোলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, সরফরাজ খান বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর হারেমে অনেক স্ত্রী লোক ছিল। তবে সরফরাজ খান যে ভাবে পিতার হাতে মসনদ ছেড়ে দিয়ে পিতার আনুগত্য স্বীকার করেন তাতে মনে হয় তিনি উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। আলীবর্দী খানকে দমন করতে গিয়ে তিনি গিরিয়ার যুদ্ধে (এপ্রিল ১৭৪০) প্রাণ দেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি। তাতে মনে হয় তিনি ভীতু কাপুরুষ ছিলেন না। পিতার উপদেশ মত তিনি শাসন পরিষদের পরামর্শ মত কাজ করতেন, কিন্তু শাসন পরিষদ যে ভেতরে ভেতরে তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনছে, এটা বোধহয় তিনি বুঝতে পারেননি। এটা তাঁর চরিত্রের দূর্বলতা প্রমাণ করে।

নবাব আলীবর্দী খান ১৭৪০-১৭৫৬ ঃ

নবাব আলীবর্দী খান একজন প্রতিভাবান লোক ছিলেন এবং সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন তুর্কী এবং শিয়া, তাঁর পিতা আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম শাহের অধীনে সামান্য চাকুরি করতেন। আলীবর্দী খানের নাম ছিল মিরযা মুহাম্মদ-আলী, তিনি এবং তাঁর বড় ভাই মিরযা আহমদও আজম শাহের অধীনে চাকুরি করতেন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজম শাহের মৃত্যু হলে উভয়ে চাকুরি হারান এবং দিল্লীতে কোন কর্ম সংস্থানের সুযোগ করতে না পেরে তিনি বাংলায় মুর্শিদকুলী খানের অধীনে চাকুরি প্রার্থী হন। তাঁদের পরিবার ছিল উড়িষ্যার নায়েব নাজিম শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাঁদের পিতা মিরজা মুহাম্মদ ইতোপূর্বেই ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় এসে শুজা-উদ-দীনের অধীনে চাকুরি নেন। এদিকে মিরজা মুহাম্মদ আলী মুর্শিদাবাদে চাকুরি লাভে ব্যর্থ হয়ে উড়িষ্যায় চলে আসেন। সেখানে ১৭২০ সালে শুজা-উদ-দীন তাঁকে ১০০,টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগে চাকুরিতে নিয়োগ করেন। উড়িষ্যায় মিরযা মুহাম্মদ আলী অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি সবন্তপুরের থানাদার পদে উন্নীত হন এবং ৬০০ অশ্বরোহীর মনসব লাভ করেন। তখন থেকেই তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকেন। এই সংবাদ পেয়ে তাঁর বড় ভাই মিরযা হাজী আহমদ তাঁর তিন ছেলে নওয়াজীশ মুহাম্মদ, সৈয়দ আহমদ ও জৈনুদ্দীনকে নিয়ে উড়িষ্যায় আসেন। উভয় ভ্রাতা শাসন ব্যাপারে শুজা-উদ-দীনকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে এবং রাজস্ব সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভে তাঁরা শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। শুজা-উঁদ-দীনও তাঁদের কাজে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি বড় ভাই হাজী আহমদকে তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা এবং বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করেন এবং ছোট ভাই মিরযা মুহাম্মদ আলীকে রাজমহলের

(আকবর নগরের) ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তাছাড়া ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে মিরযা মুহাম্মদ আলী আলীবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত হন। হাজী আহমদের ছেলে নওয়াজীশ মুহাম্মদকে বখশী এবং সৈয়দ আহমদকে রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি বিহার শাসনের জন্য আলীবর্দী খানকে একজন উপযুক্ত লোক বলে বিবেচনা করেন এবং তাঁকে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। শুজা-উদ-দীনের সুপারিশে সম্রাট আলীবর্দী খানকে পাঁচ হাজারের মনসব প্রদান করেন। এই সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে আলীবর্দী খানের পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই প্রভাবের প্রধান নির্মাতা হাজী আহমদ, তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন এবং কথাবার্তায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখার শক্তি ছিল তাঁর। তিনি শুজা-উদ-দীনকে এরূপ সন্তুষ্ট করেন যে, নবাব তাঁকে শাসন পরিষদের (বা উপদেষ্টা পরিষদের) সদস্য নিযুক্ত করেন। দীওয়ান আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠও এই পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু হাজী আহমদের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। শুজা-উদ-দীন শেষ বয়সে বিলাসী হয়ে পড়েন এবং বেশির ভাগ সময় হারেমে নারী বেষ্টিত হয়ে থাকতেন। এই সুযোগে শাসন পরিষদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং এমনভাবে শাসন পরিচালনা করে যাতে হাজী আহমদ ও তাঁর ভাই আলীবর্দী খানের পরিবারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

যাই হোক বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত হয়ে আলীবর্দী খান অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। বিহারে শান্তি ছিল না, এবং ইতোপূর্বে দুর্বল শাসনের সুযোগে জমিদারেরা অবাধ্য হয়, রাজস্ব আদায়ে গড়িমসি করে, এমন কি কেউ কেউ লুটতরাজেও লিপ্ত হয়। আলীবর্দী খান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের নিয়মিত কর দিতে বাধ্য করেন। টিকারির জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ নবাবের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিয়মতি রাজস্ব আদায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলীবর্দী খানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মুস্তফা খান নামক একজন আফগান রাজা সুন্দর সিংহের অধীনে ছিল। সুন্দর সিংহ তাকে আলীবর্দীর অধীনে চাকুরির জন্য পাঠান। মুস্তফা খান পরে আলীবর্দী খানের সেনাপতি রূপে কৃতিত্ব অর্জন করেন। মুঙ্গের জিলার বিদ্রোহপরায়ণ উপজাতিরাও আলীবর্দী খানের বশ্যতা স্বীকার করে। এক কথায় বলতে গেলে বিহারে শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর জন্য আলীবর্দী খান কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

বাংলার মসনদ অধিকার ঃ

সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদে মসনদে বসে আলীবর্দী খানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে বিহারে নায়েব নাজিম পদে বহাল রাখেন। উভয়ের মধ্যে কয়েকমাস ভাল সম্পর্ক ছিল, কিন্ত ক্রমে ক্রমে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে

আলীবর্দী খান সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ দখল করেন। ঐতিহাসিকেরা এর জন্য সরফরাজ খানের দূর্বল চরিত্রকে দায়ী করেন। সরফরাজ খানের দূর্বলতা এই ছিল যে, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বুঝে উঠতে না পেরে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যান। তবে আমাদের মনে হয় সরফরাজ খান ও আলীবর্দীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ আলীবর্দী খান ও তাঁর পরিবারের উচ্চাভিলাষ এবং শুজা-উদ-দীনের সময়ের শাসন পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। সরফরাজ খানের মৃত্যু এবং আলীবর্দী খানের মসনদ লাভের ঘটনাবলী নিম্নরূপ।

শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান মৃত্যুর পূর্বে সরফরাজ খানকে উপদেশ দেন যেন তিনি শাসন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু এই পরিষদের হাজী আহমদ ছিলেন একজন কুচক্রী। তিনি শুজা-উদ-দীনের সময়েই শাসন পরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে স্বীয় পরিবারের উন্নতির পথ সুগম করেন। তিনি নিজে বাংলার দীওয়ান ছিলেন, তাঁর ছোট ভাই আলীবর্দী খান বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন। আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন কন্যার সঙ্গে হাজী আহমদের তিন পুত্রের বিয়ে দিয়ে হাজী আহমদ ও আলীবর্দীর মৃত্যুর পরে উভয় পরিবার এক হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হয়। শুজা-উদ-দীনের জীবদ্দশায় হাজী আহমদ ও আলীবর্দী এবং হাজী আহমদের ছেলেরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। দেশ শাসনে তাঁদের প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে-অনেকেই তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। নবাব সরফরাজ খানের কয়েকজন পরামর্শদাতা জুটে যান। তাঁরা হলেন মীর মুরতজা, হাজী লুৎফে আলী এবং মর্দন আলী খান। তাঁরা সরফরাজ খানের সভাসদ ছিলেন এবং নবাবকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিকই উপলব্ধি করেন এবং বুঝতে পারেন যে হাজী আহমদ ও আলীবর্দী নবাবের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাঁদের পরামর্শে নবাব সরফরাজ খান হাজী আহমদকে দীওয়ানের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তাঁর স্থানে মুরতজা খানকে নিয়োগ করেন। তাঁরা হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খানকে আকবর নগরের (রাজমহল) ফৌজদারী থেকে অপসারণের এবং সৈয়দ আহমদ ও জৈনুদ্দীনকে আটক করার পরামর্শও দেন। নবাবের নতুন পরামর্শকরা হাজী আহমদের প্রতি অপমানজনক মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়ত, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ হাজী আহমদকে নবাবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং কথা দেন যে, প্রয়োজনে তাঁরা হাজী আহমদকে সাহায্য করবেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রের কারণ হল নবাব সরফরাজ খানের নতুন উপদেষ্টাদের আবির্ভাবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে থাকে। তৃতীয়ত, হাজী আহমদ নবাবের নতুন উপদেষ্টাদের দ্বারা তাঁর অপমানের কথা অতিরঞ্জিত করে আলীবর্দী খানকে জানান এবং তাঁকে উত্তেজিত করেন। আলীবর্দী খান তাঁর ভাই এর অপমানের কথা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না, তিনিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

আলীবর্দী খান ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে পাটনা থেকে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। রাজমহলে পৌঁছে আলীবর্দী নবাবের নিকট লিখে জানান যে তাঁর ভাই ও তাঁর পরিবারকে অপমান ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অগ্রসর হয়েছেন, নতুবা নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব নেই। হাজী আহমদ ও তাঁর পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর নিকটে এসে মিলিত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্যও তিনি নবাবকে অনুরোধ জানান। নবাব সরফরাজ খান আলীবর্দীর চিঠি পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তাঁর নতুন উপদেষ্টাদের পরামর্শে হাজী আহমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বে সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য তাঁর প্রস্তুতি নেয়া উচিত ছিল। আলীবর্দী যে চুপচাপ বসে থাকবেন না এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি কোন প্রস্তুতিই নেননি। এখন তিনি আবার ভুল করলেন, তিনি হাজী আহমদ ও তাঁর পরিবারকে আটকে রাখলে আলীবর্দীকে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে হাজী আহমদ ও তাঁর পরিবারকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গিয়ে আলীবর্দরি সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুমতি দেন। হাজী আহমদ রাজমহলে পৌঁছুলে আলীবর্দী মুর্শিদাবাদের মসনদের সিঁড়িতে উঠে গেলেন। হাজী আহমদ আলীবর্দীকে প্ররোচনা দেন যেন তিনি সরফরাজ খানকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করেন। এদিকে সরফরাজ খান তাঁর নতুন উপদেষ্টাদের পরামর্শে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে আলীবর্দীর বিরুদ্ধে গমন করেন। কথিত আছে যে আলীবর্দী খান সরফরাজ খানের সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা করেন এবং শর্ত দেন যে, অশান্তির জন্য দায়ী সরফরাজ খানের নতুন উপদেষ্টাদের পদচ্যুত করা হোক। সরফরাজ খান এই দাবী মানতে না পারায় আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়া নামক স্থানে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল তারিখে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে প্রায় ১০ হাজার করে অশ্বারোহী এবং ২০ হাজার করে পদাতিক সৈন্য ছিল। সরফরাজ খানের ২০টি কামান ছিল, আলীবর্দী খানের নিকটও কয়েকটি কামান ছিল। অতএব সৈন্য এবং সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়ে উভয় পক্ষে সমান সমান ছিল, কিন্তু আলীবর্দী খানের অধীনে ২ হাজার আফগান সৈন্য থাকায় এবং আলীবর্দীর পদাতিক সৈন্যরা বিহারের লোক হওয়ায় যুদ্ধে আলীবর্দী খানের পাল্লা ভারি ছিল। তাছাড়া আলীবর্দী খান ছিলেন একজন ষাট বৎসর বয়স্ক দূধর্ষ যোদ্ধা। সেই তুলনায় সরফরাজ খান ছিলেন মাতামহের অপত্যস্নেহে লালিত একজন যুবক। কিন্তু তবুও সরফরাজ খান বীরত্বের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু ভাগ্য ছিল তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন। হঠাৎ একটি গোলা এসে তাঁর কপালে আঘাত হানলে তিনি আঘাত পেয়ে পড়ে যান এবং মৃত্যু বরণ করেন। এতেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। যুদ্ধের ৩ দিন পরে আলীবর্দী খান বিজয় গৌরবে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে মসনদে আরোহন করেন। তিনি সরফরাজ খানের ভগ্নী নফিসা বেগমের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তিনি সরফরাজ খানের শিশু পুত্র আকা বাকা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁদের

নিজস্ব সম্পদ ফেরৎ দেন। আলীবর্দী খান পরলোকগত নবাবের নিজস্ব এবং সরকারি সম্পদ মিলে প্রায় ৫ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ লাভ করেন। সরফরাজ খানের উপদেষ্টা হাজী লুৎফে আলী, মীর মুরতজা এবং অন্যান্যদের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মসনদে বসে আলীবর্দী খান শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। তাঁর তিন জামাতা অর্থাৎ হাজী আহমদের তিনি পুত্রকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমা কন্যা মেহেরুন্নিসা বা ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে বাংলার দীওয়ান এবং ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করা হয়। নওয়াজিশ খান ঢাকায় না গিয়ে হোসেন কুলী খানের মারফৎ ঢাকার শাসন পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় কন্যা পুর্নিয়ার বেগমের স্বামী সৈয়দ আহমদকে রংপুরের ফৌজদার এবং কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের স্বামী জৈনুদ্দীন (সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা)কে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করা হয়। আলীবর্দী তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের স্বামী মীর মুহাম্মদ জাফর আলী খানকে (মীর জাফর) পুরাতন সৈন্যদলের বখশী, এবং নসরুল্লাহ বেগ খানকে নতুন সৈন্যদলের বখশী নিযুক্ত করেন। রায়রায়ান আলমচান্দের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সহকারি চিনরায়কে রায়রায়ান উপাধি দিয়ে খালসা বিভাগের দীওয়ান এবং জানকি রামকে পারিবারিক দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। নবাব তাঁর ভগ্নিপতি কাসিম আলী খানকে রংপুরের ফৌজদার, তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তবতবাইর চাচা আবদুল আলী খানকে ত্রিহুতের ফৌজদার এবং বিসওয়াক সহ বিহারের কয়েকটি পরগণার রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তিনি হোসেন কুলী খানের জ্ঞাতিভাই হায়দর আলী খানকে আর্টিলারীর দারোগা এবং হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খানকে রাজমহল ও ভাগলপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ঐ একই বৎসর অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আলীবর্দী খান সম্রাটের ফরমান লাভ করায় মসনদে তাঁর অধিকার বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুজা-উদ-দীনের সময় থেকে মুর্শিদকুলী খান ২য় (রুস্তম জঙ্গ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত) উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শুজা-উদ-দীনের মেয়ে দুর্দানা বেগমের স্বামী। তিনি আলীবর্দী খানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর স্ত্রী দুর্দানা বেগম এবং তাঁর জামাতা মিরজা বাকের খান সরফরাজ খানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। আলীবর্দী খান তাঁর বিরুদ্ধে গমন করেন, মুর্শিদকুলী খান ২য় পরাজিত হয়ে হায়দরাবাদে গিয়ে নিজাম-উল-মুলকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলীবর্দী তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহমদকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে কটকে রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। সৈয়দ আহমদ ছিলেন অনভিজ্ঞ যুবক, তাঁর কুশাসনে সৈন্যরা বিগড়ে যায়। এই সুযোগে মিরযা বাকের খান এসে উড়িষ্যা দখল করেন এবং সৈয়দ আহমদকে আটক করেন। আলীবর্দী খান সংবাদ পেয়ে উড়িষ্যায় ছুটে যান এবং মিরযা বাকেরকে পরাজিত করে কটক পুনর্দখল করেন, মীর

জাফর আলী খান সৈয়দ আহমদকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। অতঃপর আলীবর্দী খান উড়িষ্যায় ৩ মাস থেকে সেখানে শান্তি স্থাপন করে ফিরে আসেন। তিনি শয়খ মাসুম পানিপথিকে উড়িষ্যায় নায়েব নাজিম এবং দূর্লভরামকে তাঁর পেশকার নিযুক্ত করেন। কিন্তু আলীবর্দীর কপালে শান্তি ছিল না। তিনি উড়িষ্যা থেকে ফিরতি পথে মেদিনীপুর পৌছে শুনতে পান যে, মারাঠা হানাদারেরা বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে উপদ্রব আরম্ভ করেছে।

মারাঠা আক্রমণ ও মারাঠা বর্গীদের লুঠতরাজ ঃ

নাবাব আলীবর্দী খানকে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০ বৎসর কাল মারাঠা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তিনি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুদের ধ্বংসের কবলে পড়ে। রাজধানী মুর্শিদাবাদও লুণ্ঠিত হয়। তিনি নিজেও কয়েকবার পরাজয়ের সম্মুখীন হন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কালে আবার তাঁর আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খান ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করেন। বিহারের রাজধানী পাটনাও শত্রুদের আঘাতের সম্মুখীন হয়। উড়িষ্যা প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও বৃদ্ধ আলীবর্দী খান হতাশ হননি। তিনি হানাদার এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের মসনদের সম্মান রক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন।

আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রে মারাঠাদের উত্থান হয়। শিবাজীই তাদের একটি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করেন। আওরঙ্গজেব মারাঠাদের দমনের জন্য জীবনের শেষ ২০ বৎসর দাক্ষিণাত্যে কাটান। মারাঠারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী, সামান্য শুকনা খাবার খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকত। মোগল বা মুসলমান সৈন্যদের মত তারা আরাম প্রিয় ছিল না। তারা সুযোগ সুবিধারও ধার ধারত না। সাহস এবং ক্ষিপ্রতায় তারা অতুলনীয় ছিল এবং যুদ্ধে তারা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করত। কর্কশ ভূমি, অসমান রাস্তা এবং ঝাড় জঙ্গলেও তারা অনায়াসে চলাফেরা করতে পারত। মারাঠা নায়করা শিবাজীর পৌত্র শাহুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মারাঠা রাজ্য স্থাপন করে। তারা বিভিন্ন দিকে হানা দিয়ে চৌথ আদায় করার জন্য লুঠতরাজে লিপ্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়াতেই তারা বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌছে যায়।

মারাঠা নায়ক ও সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলা তাঁর প্রধান মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্যসহ বাংলা আক্রমণ করতে পাঠান। এর আগে বাংলার লোকেরা কোনদিন মারাঠা বা তাদের বর্গী বাহিনীর নামও শোনেনি। ভাস্কর পণ্ডিত উড়িষ্যা ও ঝাড় খন্ডের জঙ্গলাকীর্ণ পথে বাংলায় প্রবেশ করে হঠাৎ করেই বর্ধমানে লুঠ- তরাজ আরম্ভ করেন। উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে নবাব আলীবর্দী খান মারাঠা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে বর্ধমানের দিকে আগ্রসর হন, কিন্তু সেখানে পৌছার

সঙ্গে সঙ্গে মারাঠারা তাঁকে ঘিরে ফেলে। আলীবর্দী ইতোপূর্বেই তাঁর অধিকাংশ সৈন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদে পাঠিয়েছিলেন। তাই তার সঙ্গে মাত্র ৩ হাজার অশ্বারোহী এবং ১ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবার, মালপত্র, সেবক, খেদমতকারী ইত্যাদি বেসামরিক লোকজনও অনেক ছিল। তাই তাঁকে প্রায় ১ সপ্তাহ বর্ধমানে অপেক্ষা করতে হয়। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁকে ঘিরে রাখেন এবং তাঁর শিবিরে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেন, মারাঠাদের অন্য এক দল চারদিকে লুঠতরাজ চালাতে থাকে। এই অবস্থায় আলীবর্দী খান তাঁর সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে জোরপূর্বক ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মারাঠারাও বাধা দিতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাব কাটোয়ায় পৌছতে সক্ষম হন। কাটোয়া পর্যন্ত পৌছুতে নবাব যেখানেই থামেন, মারাঠারা সেখানেই তাঁকে ঘিরে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করে। কাটোয়ায় পৌছে নবাব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, সেখানে তাঁর নিকট অতিরিক্ত সৈন্য ও রসদ পৌছে যায়।

নবাব নিরাপদে এবং তাদের বাধা দান সত্ত্বেও কাটোয়ায় পৌছে গেলে ভাস্কর পণ্ডিত নিরাশ হয়ে নাগপুরে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু মীর হাবিব তাঁকে বাধা দিয়ে প্রচুর ধন সম্পদ লুঠ করার প্রলোভন দেখায়। এই মীর হাবিব ছিল ২য় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ্গের বিশ্বস্ত অনুচর। আলীবর্দী রুস্তম জঙ্গকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করেন, তাই মীর হাবিব আলীবর্দীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে মিতালী করে। তার পরামর্শে ভাস্কর পণ্ডিত ৭০০ সৈন্যকে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করতে পাঠায়। এই সৈন্যরা এক রাতের মধ্যেই প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদের শহরতলীতে পৌছে সেখানে লুঠতরাজ করে সকালে রাজধানী শহরে লুঠপাট করে। তারা ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের নিকট থেকেই ৩ লক্ষ টাকা লুঠ করে নেয়। নবাব সংবাদ পেয়ে পরের দিন মুর্শিদাবাদে পৌছেন, কিন্তু তার আগেই মারাঠারা কাটোয়ায় পালিয়ে যায়, যাওয়ার পথে তারা সর্বত্র অগ্নিসংযোগ করে। মারাঠারা কাটোয়ায় তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করে, মীর হাবিবের প্ররোচনায় তারা হুগলী বন্দর অধিকার করে এবং মারাঠা শেস রাও হুগলীর গবর্নর এবং মীর হাবিব দীওয়ান নিযুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাগিরথীর পশ্চিম তীরের জেলাগুলি মারাঠাদের হস্তগত হয়, নবাবের কর্তৃত্ব সেখানে লোপ পায়, এমন কি মারাঠারা ভাগিরথীর পূর্ব তীরেও মাঝে মাঝে লুঠপাট করতে থাকে। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে মারাঠারা বিস্তীর্ণ এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

মারাঠারা তাদের অধিকৃত এলাকায় এমন অত্যাচার করে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেখানেই তারা অর্থ সম্পদের গন্ধ পায় সেখানেই লুঠতরাজ করে, মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, ব্যবসায়ীদের পণ্য সামগ্রী নষ্ট করে, ফলে ভাগিরাথীর পশ্চিম এলাকা সত্যিকার অর্থেই সাধারণ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। যাদের সামর্থ ছিল তারা নদী পার হয়ে ভাগিরথীর পূর্ব দিকে চলে আসে। বর্ষা কালে উভয়পক্ষ ভবিষ্যত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। নবাব আলীবর্দী

খান পাটনা ঢাকা ইত্যাদি এলাকা থেকে সৈন্য এনে রাজাধানীতে জড়ো করে এবং বিশাল প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি বর্ষা শেষের আগে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট শুষ্ক হওয়ার আগেই মারাঠাদের আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ায় অতি ধুমধামের সঙ্গে দূর্গা পূজার আয়োজন করেন। নবাবের অতর্কিত আক্রমণে মারাঠারা অপ্রস্তুত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। ভাস্কর চেষ্টা করেও মারাঠাদের একত্র করতে পারলেন না, নবাব মারাঠাদের চিল্কা হ্রদের অপর দিকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দেন এবং বিজয় উল্লাসে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। এইভাবে নবাব আলীবর্দী মারাঠাদের প্রথম অভিযান মুকাবিলা করেন।

মারাঠাদের দ্বিতীয় অভিযান আরো ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। এই অভিযান ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে শুরু হয় এবং এতে মারাঠাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল বাংলায় আসে। মার্চ মাসে (১৭৪৩) নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলা স্বয়ং ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে কাটোয়ায় এসে পৌছেন। ইতোপূর্বে মোগল সম্রাট বাধ্য হয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চৌথ (মারাঠাদের করের নাম চৌথ, সরদেশমুখী ইত্যাদি) মারাঠাদের রাজা শাহুকে প্রদান করেন এবং রাজা শাহু চৌথ আদায়ের দায়িত্ব দেন রঘুজী ভোঁসলাকে। তাই চৌথ আদায়ের উদ্দেশ্যে রঘুজী নিজে বাংলায় আসেন। অন্যদিকে পেশোয়া বালাজী রাও ছিলেন রঘুজী ভোঁসলার শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই সম্রাট তাঁকে রঘুজী ভোঁসলার অত্যাচার থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা রক্ষার জন্য আবেদন জানান। অতএব পেশোয়া বালাজীরাও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বাংলায় আসেন এবং নবাব আলীবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে, নবাব শাহুরাজাকে চৌথ প্রদান করবেন এবং পেশোয়া বালাজী রাওকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। অন্যপক্ষে পেশোয়া বালাজীরাও কথা দেন যে, তিনি রঘুজীর সঙ্গে সমঝোতায় পৌছবেন এবং রঘুজী আর উৎপাত করবেন না। প্রকৃতপক্ষে নবাব এবং পেশোয়া বালাজীরাও এর মিলিত আক্রমণের মুখে রঘুজী ভোঁসলা বাংলা বিহার উড়িষ্যা ছেড়ে সম্বলপুরে চলে যান এবং পেশোয়া বলাজীরাও পূণায় চলে যান। এর পরে ১৭৪৩ জুন থেকে ১৭৪৪-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শান্তি বজায় থাকে।

মারাঠাদের তৃতীয় অভিযান শুরু হয় ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। আলীবর্দী খান মনে করেন পেশোয়া বালাজীরাও এর হস্তক্ষেপে মারাঠা আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে যাদের অর্থের নেশা আছে তারা কথা ঠিক রাখতে পারে না। ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ সালের মার্চ মাসে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের পথে বাংলা আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত পূর্ববর্তী বৎসরগুলোতে অনেক কষ্ট করেও লুঠপাট ছাড়া নবাবের নিকট থেকে কিছুই পাননি। তাই তিনি পুনরায় অনেক সৈন্য নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। রঘুজীর বর্গীবাহিনী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আলীবর্দী সংবাদ পেয়ে ভীষণ বিমর্ষ হয়ে পড়েন। আগের বৎসর বিপুল অর্থ দিয়ে তিনি পেশোয়া বালাজীরাও এর সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হন। মারাঠাদের অত্যাচার ও লুঠতরাজের ফলে রায়তদের কর দেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়। নবাবের কোষাগারের অবস্থাও

খারাপ। তা ছাড়াও মারাঠাদের প্রকৃত দূরভিসন্ধি বাংলা বিহার উড়িষ্যায় জন্য আরো মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আগের বৎসর পেশোয়া বালাজীরাও এবং রঘুজী ভোঁসলা ফিরে গেলে রাজা শাহু তাদের মধ্যে একটা সমঝোতার ব্যবস্থা করে। এতে বিহারের কিংদংশের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা পেশোয়া বালাজীরাওকে দেয়া হয় এবং বিহারের বাকী অংশ এবং বাংলা ও উড়িষ্যার চৌথ দেয়া হল রঘুজী ভোঁসলাকে। অতএব নবাব আলীবর্দী খানকে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে শঠের সঙ্গে শঠতার সঙ্গে মুকাবিলা করতে হবে। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে সমঝোতার বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ জানান। আগে এইরূপ সমঝোতা সভায় পেশোয়া বালাজী রাও ২২ লক্ষ টাকা পান, তাই ভাস্কর পাণ্ডিত কিছু সন্দেহ না করে তাঁর ২২ জন সঙ্গীসহ নবাবের শিবিরে যান। ঐ শিবিরে নবাবের আদেশে সঙ্গীদেরসহ ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়। শুধু ১ জন নায়ক ভাগ্যক্রমে কাটোয়ায় মারাঠা শিবিরে পৌছে প্রাণে বেঁচে যায়। এই সংবাদ পেয়ে মারাঠারা সকলে স্বদেশে পলায়ন করে। ১৭৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে মারাঠাদের তৃতীয় অভিযান শেষ হয়।

এর পরে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে আফগান বিদ্রোহের সুযোগে মারাঠারা আবার আক্রমণ করে। বাংলার সৈন্যদলে কয়েক হাজার আফগান ছিল। আফগান সৈন্যদের নেতা ছিলেন গোলাম মুস্তফা খান। আলীবর্দী তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি আলীবর্দীর ডান হাত রূপে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভও করেন। আলীবর্দী তাঁকে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করার পরে নবাব তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। এতে গোলাম মুস্তফা খান বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হলে নবাব কয়েকজন আফগান সেনানায়ককে হাত করেন। ফলে মুস্তফা খান তাঁর অনুগত বাহিনী নিয়ে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। কিন্তু বিহারে পৌছে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং মুঙ্গের দূর্গ অধিকার করে রাজধানী পাটনার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পাটনার নায়েব নাজিম জৈনুদ্দীন খান তাঁকে বাধা দেন, মুস্তফা পাটনা অধিকারে ব্যর্থ হয়ে শাহাবাদের দিকে পলায়ন করেন। ইতোমধ্যে আলীবর্দী খান পাটনায় পৌছলে মুস্তফা খান চুনারের দিকে পলায়ন করেন। মুস্তফা খানের আমন্ত্রণে মারাঠা রঘুজী ভোঁসলা বাংলা আক্রমণ করলে আলীবর্দী ফিরে আসতে বাধ্য হন। তিনি বাংলায় ফিরে এলে মুস্তফা খান আবার পাটনার দিকে অগ্রসর হন। জৈনুদ্দীন তাকে বাধা দেন এবং পাটনার অদূরে শোন নদীর তীরে কারহানি নামক স্থানে যুদ্ধে মুস্তফা খান নিহত হন। মুস্তফার সৈন্যরা তাঁর ছেলে মরতুজার অধীনে পশ্চাদপসরণ করে। এদিকে রঘুজী ভোঁসলা উড়িষ্যা আক্রমণ করে কটক জয় করেন। সেখানকার গবর্নর দূর্লভরাম (দীওয়ান জানকী রামের পুত্র) মারাঠাদের হাতে বন্দী হন। কয়েকদিন ব্যর্থ আলাপ আলোচনার পরে রঘুজী বর্ধমানে প্রবেশ করে সাত লক্ষ টাকা লুঠ করে এবং বর্ষা যাপন করার উদ্দেশ্যে বীরভূমে শিবির স্থাপন করেন। এদিকে আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ সুরক্ষিত করে সেখানেই অবস্থান করেন।

বর্ষা শেষে সেপ্টেম্বর মাসে রঘুজী ভোঁসলা বিহারের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে আফগান সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি পথে লুঠতরাজ করে অগ্রসর হন। আলীবর্দী খান সেদিকে অগ্রসর হলে মুহিব-আলীপুরে উভয় বাহিনীর দেখা হয়, আলীবর্দীর অগ্রবর্তী দল মীর জাফরের নেতৃত্বে রঘুজীর শিবির আক্রমণ করে কিন্তু রঘুজী ভোঁসলা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কয়েকদিন উভয় পক্ষে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলার পরে আলীবর্দী খান সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ করলে মীর হাবিবের অধীনে মারাঠা সৈন্যরা চতুদিকে লুঠতরাজ আরম্ভ করে। রঘুজীও বসে থাকেননি, তিনি গোপনে জঙ্গলাকীর্ণ পথে ডিসেম্বরের (১৭৪৫) শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে পৌছেন। আলীবর্দী খানও পেছনে পেছনে এসে পড়েন, ফলে রঘুজী আবার কাটোয়ার দিকে ফিরে যান। নবাবও পেছনে পেছনে যান এবং কাটোয়ার নিকটে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়, তাদের অনেক লোক ক্ষয় হয়। ফলে রঘুজী নাগপুরে ফিরে যান, কিন্তু মীর হাবিব কিছু মারাঠা ও কিছু আফগান সৈন্য নিয়ে মেদিনীপুরে থেকে যান। নবাবও কিছুদিন মুর্শিদাবাদে বিশ্রাম নেন। তাঁর আফগান সেনাপতি শামসের খান ও সরদার খানের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হয়ে তিনি তাদের পদচ্যুত করেন। পরের বছর (১৭৪৬) এপ্রিল মাসে নবাব আবার অস্ত্র ধারণ করেন এবং মীর হাবিবকে সৈন্যসহ উড়িষ্যা পর্যন্ত হটিয়ে দেন। উড়িষ্যা শত্রু কবলিত হলেও বাংলা এবং বিহার কিছুদিন শান্তিতে থাকে।

১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোগল সম্রাট মারাঠাদের রাজা শাহুর দূতের সঙ্গে একটি সমঝোতায় বাংলা ও বিহারের চৌথ হিসেবে বার্ষিক যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা শাহুকে দিতে সম্মত হন। বিনিময়ে রাজা শাহু বাংলা ও বিহার প্রদেশ দুটি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু নবাব আলীবর্দী খান এতে সম্মত হলেন না। তিনি সম্রাটকে জানান যে, মারাঠাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। তিনি পেশোয়া বালাজীরাও এর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। আসলে সেনাপতিদের উপর রাজা শাহুর তেমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাই নবাব নিজ বাহুবলে প্রদেশগুলো রক্ষার জন্য কৃত সংকল্প হন। তিনি মীরজাফরকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে পাঠান। মীর জাফর প্রথমে কিছুটা সফল হলেও পরে বর্ধমানে পালিয়ে আসেন। নবাব তখন আতাউল্লাহ খানকে তাঁর সাহায্যর্থে পাঠান। কিন্তু এই দুই সেনাপতি, মীর জাফর ও আতাউল্লাহ খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে গমন না করে স্বয়ং নবাবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নবাব টের পেয়ে উভয়কে পদচ্যুত করেন এবং নিজে মারাঠাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। তিনি বর্ধমানের নিকটে রঘুজীর পুত্র জানুজীকে পরাজিত করেন (মার্চ ১৭৪৭)। মারাঠারা মেদিনীপুরে আশ্রয় নেয়।

নবাব যখন উড়িষ্যা সীমান্তে মারাঠাদের নিয়ে ব্যস্ত তখন বিহারে এক নতুন সঙ্কট দেখা দেয়। নবাবের তৃতীয় জামাতা বিহারের নায়েব-নাজিম জৈনুদ্দীন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বে নবাব আলীবর্দী খান কর্তৃক পদচ্যুত

দুই আফগান সেনানায়ক শমশের খান ও সরদার খানকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্তি করেন। তারা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে জৈনুদ্দীন ও তাঁর পিতা হাজী আহমদকে হত্যা করে এবং জৈনুদ্দীনের স্ত্রী ও আলীবর্দীর কন্যা আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদের বন্দী করেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে সংঘটিত এই ঘটনার আকস্মিকতায় নবাব আলীবর্দী মর্মান্তিক দুঃখ পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিহার যাত্রা করেন, অন্যদিকে মীর হাবিবের মারাঠা সৈন্যরাও বিদ্রোহী আফগানদের সঙ্গে যোগ দিতে অগ্রসর হয়। ভাগলপুরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়। পাটনার ২৬ মাইল দূরে কালাদিয়ারা নামক স্থানে মারাঠা ও আফগানদের মিলিত বাহিনীকে নবাব পরাজিত করেন এবং আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদের মুক্ত করেন। ঐ একই সালের (১৭৪৮) এপ্রিল মাসের মধ্যে বিহারে পুনরায় নবাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব জৈনুদ্দীনের পুত্র ও তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের নায়েব নাজিম মনোনীত করেন। সেখানে রাজা জানকীরাম সিরাজের নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে পুর্নিয়ায় ফৌজদার সাইফ খানের মৃত্যু হলে সম্রাটের নিকট হতে আলীবর্দী পুর্নিয়ার শাসন ভার লাভ করেন।

এর পরে আলীবর্দী আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। তিনি রাজধানী কটক ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান পুনরুদ্ধার করেন (মে ১৭৪৯) এবং আবদুস সালামকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু উড়িষ্যা তখনো শত্রুমুক্ত হয়নি, মীর হাবীব আবার মারাঠাদের নিয়ে উড়িষ্যা দখল করে বাংলার দিকে হানা দিতে থাকে। নবাবকে আবার তাদের বিরুদ্ধে ছুটে যেতে হয়, তিনি মেদিনীপুরে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা পাটনায় গিয়ে সেখানে কর্তৃত্ব নিজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তা অধিকার করতে ব্যর্থ হন। নবাব তাঁর প্রিয় দৌহিত্রের এহেন কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে নিজে পাটনা (আজিমাবাদ) যান, উভয়ে সামনা সামনি হলে ভুলবুঝাবুঝির অবসান হয় এবং উভয়ের মধুর মিলন হয়।

দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে নবাব আলীবর্দী খান যেমন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েন, মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলাও সেইরূপ শ্রান্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ১০ বৎসর হানা দিয়ে মারাঠারাও বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেনি, তাদের অনেক লোক ক্ষয় হয়। নবাব আলীবর্দী বৃদ্ধ হলেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারাঠাদের দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেন। তাই উভয় পক্ষ শান্তির অন্বেষায় সমঝোতার পথ বেছে নেন। রঘুজী ভোঁসলা মীর হাবিব ও মীর জাফরের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব করলে নবাবও সম্মতি দেন। আলাপ আলোচনার পর উভয় পক্ষ নিম্নরূপ শর্তে সন্ধি করেন ; (১) মীর হাবিব আলীবর্দীর প্রতিনিধি রূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে রঘুজীর সৈন্যদের বেতন দেবেন, (২) বাংলার জন্য নবাব রঘুজীকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দেবেন এবং (৩) বিনিময়ে রঘুজী নবাবের এলাকা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। জালেশ্বরের নিকটে সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমান্ত

নির্ধারিত হয়। এই চুক্তির ফলে মেদিনীপুর উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর পরে মারাঠারা আর বাংলায় হানা দেয়নি। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৭৫১ সালের মে মাসে, কিন্তু পরের বৎসর ১৭৫২ সালের আগষ্ট মাসের ২৪ তারিখে জানুজীর সৈন্যরা মীর হাবিবকে হত্যা করে মুসলিহ্ উদ্দীন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যার শাসন ভার দেন। মুসলিহ্ উদ্দীন খান ছিলেন রঘুজীর একজন সভাসদ। এর পরে উড়িষ্যার উপর বাংলার নবাবের কর্তৃত্ব লোপ পায়, অর্থাৎ উড়িষ্যা নামেমাত্র বাংলার নবাবের অধীনে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যা মারাঠাদের নাগপুর রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

নবাব আলীবর্দীর সময়ে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই নয়, বরং ডাচ (ওলন্দাজ) এবং ফরাসী কোম্পানীরাও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। উদারহরণ স্বরপ আগে যেখানে ইংরেজ কোম্পানী বৎসরে ৪/৫টি জাহাজে বাণিজ্য করত এবং বাংলার পণ্য ইউরোপে পাঠাত, সেখানে জাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৪০/৫০টিতে দাঁড়ায়। সেই অনুপাতে কোম্পানীগুলোর মূলধন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিদেশী বণিকেরা প্রায়ই দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকত, তারা পণ্যের চালানে হেরফের করে রপ্তানী মূল্য কম দেখাত। ডাচরাই বিশেষ করে এইরূপ কাজে লিপ্ত থাকে। দ্বিতীয়, ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত পণ্য কোম্পানীর পণ্য রূপে চালিয়ে দিত। নবাব আলীবর্দী খান এই সকল বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন এবং বণিকদের দূর্নীতি মুক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। আলীবর্দী খান বিধিমত শুল্ক ছাড়া অধিক অর্থ আদায় করতেন না। তিনি বণিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন, এবং বণিকরা যাতে লাভজনকভাবে ব্যবসা করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি বণিকদের দূর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন এবং তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতেন। নবাব আলীবর্দী খান বণিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন না, শুধু মারাঠা যুদ্ধের সময় যুদ্ধের অতিরিক্তি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দাবী করেন। মারাঠাদের লুণ্ঠনের হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়ায় নবাবের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা বণিকদের নৈতিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা নবাবকে অর্থ দিতে গড়িমাসি করে। ইংরেজরা অর্থ দিতেই চায়নি, শেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হয়। একবার ইংরেজেরা বেআইনী ভাবে আর্মেনীয় ও মোগল বণিকদের জাহাজ আটক করে। তারা নবাবের শরণাপন্ন হলে নবাব তাদের জাহাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য কলিকাতার ইংরেজ গবর্নর বারওয়েলের নিকট আদেশ পাঠান। কিন্তু নবাবের আদেশ অমান্য করায় নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা বন্ধ করে দেন। ফলে ইংরেজরা আর্মেনীয় ও মোগলদের জাহাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং সঙ্গে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। নবাব আলীবর্দী খান দেশের সমৃদ্ধিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করতেন না।

নবাব আলীবর্দী খান তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ নবাবী আমলে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করতে পারেননি। ভাগিরথির পশ্চিম তীর প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা মারাঠাদের লুঠতরাজের শিকার হয়। তবে মারাঠা উৎপাত বন্ধ হওয়ার পরে তিনি কৃষিকাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে থাকে কিন্তু সারা সময় মারাঠা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছুটাছুটি করতে করতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর নিজের পরিবারের কয়েকজন প্রিয় লোকের মৃত্যুতে তিনি শোকে কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর ৩ জামাতা শাহামত জঙ্গ (নওয়াজিস মুহাম্মদ-খান), সওলত জঙ্গ (সৈয়দ আহমদ) এবং জৈনুদ্দীন সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হন ; তাঁর বড় ভাই হাজী আহমদও নিহত হন; তাঁর দৌহিত্র আকরামুদ্দৌলা (সিরাজউদ্দৌলার ভাই) ও মৃত্যুবরণ করেন। শোকে অভিভূত নবাব শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে মৃত্যু বরণ করেন।

আলীবর্দীর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

নবাব আলীবর্দী খান সামান্য অবস্থা থেকে বড় হন এবং স্বীয় সাহস ও প্রতিভার দ্বারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ অধিকার করতে সক্ষম হন। তিনি শিক্ষিত এবং উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন এবং ধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি ধর্মের বিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করেন। তৎকালীন শাসকগুষ্ঠির দোষ তাঁর মধ্যে ছিল না এবং তাঁর বিবাহিত স্ত্রী শরফউন্নেসার প্রতি তিনি সর্বদা বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি ছকবাঁধা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন, পরিমিত আহার করতেন, কিছু সময় পুত্র-পৌত্র এবং কিছু সময় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ব্যয় করতেন। তিনি জ্ঞানীদের সঙ্গ ভালবাসতেন এবং অবসর সময়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতেন। সকালে এবং বিকালে তিনি দরবারে বসতেন। এক কথায় তিনি সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন।

নবাব আলীবর্দী খান পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁর তিন কন্যাই তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং প্রত্যেককেই উচ্চপদে নিয়োগ দান করেন। তাঁর দৌহিত্রদেরও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বিশেষ করে সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বড় ভাই হাজী আহমদকেও ভক্তি করতেন এবং হাজী আহমদের ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে উভয় পরিবারের বন্ধন সুদৃঢ় করেন। কিন্তু তিনি এই পারিবারিক বন্ধনের সুফল দেখে যেতে পারেননি। তাঁর বড় ভাই এবং তিন জামাতাই তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর ভাই হাজী আহমদ এবং কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দীনকে আফগান সর্দারেরা হত্যা করায় তিনি ঐ সরদারদের পরাজিত ও হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁর দৌহিত্র আকরামউদ্দৌলাও তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। নবাব আলীবর্দী বলতে গেলে শোকে কাতর হয়েই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান।

আলীবর্দী খান তাঁর মনিব শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের অনুগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি ও তাঁর বড় ভাই সহায়সম্বলহীন ভাবে উড়িষ্যায় আসেন এবং শুজা-উদ-দীনের অধীনে স্বল্প বেতনের চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় প্রতিভা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করে তিনি ফৌজদার এবং শেষে বিহারের নায়েব নাজিম পদে উন্নীত হন। শুজা-উদ-দীনের সময়েই মনে হয় তিনি উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েন। শুজা-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে সরফরাজ খান মসনদে আসীন হলেই তিনি বাংলার মসনদ লাভের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি মনিবের পুত্রকে হত্যা করে গর্হিত কাজ করেন। অবশ্য তখনকার দিনে রাজনৈতিক হত্যাকে গর্হিত মনে করা হত না, মসনদে আসীনকেই সকলে মেনে নিত। ঐতিহাসিকদের মতে সরফরাজ খানের দূর্বলতা এবং সরফরাজ খানের উপদেষ্টাদের ষড়যন্ত্রের ফলে আলীবর্দী খানকে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করে। আলীবর্দী যখন বিহারে, তখন তাঁর ভাই হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদে, সরফরাজ খানের উপদেষ্টারা হাজী আহমদকে অপমান করে। এই কারণে হাজী আহমদ আলীবর্দীকে ক্ষমতা দখল করতে প্ররোচিত করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এইরূপ ধারণা করা যায়। তবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, প্রথমত, শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের সময়ে হাজী আহমদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্য, যেমন আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠ এমনভাবে ষড়যন্ত্র করে যাতে হাজী আহমদ ও আলীবর্দীর পরিবারের সকলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। হাজী আহমদ নিজে বাংলার দীওয়ান, আলীবর্দী বিহারের নায়েব নাজিম, হাজী আহমদের তিন ছেলে বিভিন্ন এলাকার ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে প্রশাসনে তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা সকলে কোন না কোনভাবে আলীবর্দীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বা আলীবর্দীর সঙ্গে সম্পর্কিত। একমাত্র 'আহওয়াল-ই মহাবতজঙ্গীর' লেখক ইউসুফ আলী ছিলেন সরফরাজ খানের জামাতা, কিন্তু তিনি বই লেখেন সরফরাজ খানের মৃত্যুর পরে। তিনি তাঁর বই আলীবর্দী খানের নামে উৎসর্গ করেন। তাতেই তিনি আলীবর্দীর বিরুদ্ধে কিছুই লিখতে সাহস করেননি বলে মনে হওয়ার কারণ আছে। সে যাই হোক, সরফরাজ খানের দূর্বলতা থাকলেও বা সরফরাজ খানের উপদেষ্টাদের দ্বারা হাজী আহমদ অপমানিত হলেও আলীবর্দী খান কর্তৃক তাঁর মনিবপুত্রের নিমকহারামী করা গর্হিতই বলতে হবে।

মনিব পুত্রকে হত্যা করে মসনদ দখল করলেও আলীবর্দী খান সরফরাজ খানের পরিবারের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। মুর্শিদাবাদে পৌছে মসনদে বসে তিনি সরফরাজের ভগ্নি নফিসা বেগমের নিকট গিয়ে অনুশোচনা করেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি নফিসা বেগম, সরফরাজের শিশুপুত্র আকাবাকা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করেন। তাদের সম্পদের অধিকার তাদের ফেরৎ দেন এবং তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থাও করেন। আলীবর্দী খাঁন তাঁর ঘোর শত্রু মীর হাবিবের পরিবারের প্রতিও সম্মানজনক ব্যবহার করেন। মীর হাবিব মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিলেও তাঁর

পরিবার মুর্শিদাবাদেই ছিল, কিন্তু আলীবর্দী তাদের কোন ক্ষতি না করে কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদে থাকতে দিয়ে পরে বিশ্বস্ত লোকদের তত্ত্বাবধানে সসম্মানে মীর হাবিবের নিকট পাঠিয়ে দেন।

আলীবর্দী খান নিজে বিদ্বান ও শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তিনি কবি ও শিক্ষিত লোকদের পৃষ্ঠ পোষকতা করতেন। তিনি প্রত্যেক দিন এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটাতেন। মুহাম্মদ আলী ফাজিল, হাকিম হাদী আলী খান, নকী কুলী খান, মিরযা হোসেন সেসেবী এবং আরো কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি নবাবের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় অংশ নিতেন। মুহাম্মদ আলী ফাজিল ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিত এবং দার্শনিক এবং হাকিম হাদী আলী আলী খান চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এঁরা ছাড়াও কাজী গোলাম মুজফফর, মুহাম্মদ হাজিন, শাহ মুহাম্মদ হাসান, আবুল কাসিম ও সৈয়দ মুহাম্মদ নবাব আলীবর্দীর আমলে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। 'আহওয়াল-ই-মহাবতজঙ্গীর' লেখক ইউসুফ আলী এবং 'সিয়র-উল-মুতাখখেরীন' এর লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবাই নবাব আলীবর্দীর অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁরা উভয়েই সেই যুগের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন। বিহারের রাজধানী আজিমাবাদ (পাটনা) জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে, মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার খ্যাতিও কম ছিল না।

নবাব আলীবর্দী খান উপযুক্ত এবং যোগ্য হিন্দু অফিসারদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে হিন্দু জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দু অফিসারেরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি পেতে থাকে। শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খান এবং আলীবর্দী খানের সময়েও এই ধারা চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আলীবর্দী প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নাটোর, নদীয়া, বর্ধমান, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ এ বৃহৎ জমিদারী মুর্শিদকুলী খানের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীবর্দীর সময়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায়। তাঁর সময়ে জগৎশেঠের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বেড়ে যায়। নবাব নিজেই জগৎশেঠের খাতকে পরিণত হন। নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার উমিচাঁদও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে। চিন রায়, বীরু দত্ত, রাজা কিরাৎচাঁদ ও উমেদ রায় আলীবর্দী খানের দীওয়ান ছিলেন। জানকিরাম ও রামনারায়ণ যথাক্রমে বিহারের নায়েব নাজিম (সিরাজউদ্দৌলার প্রতিনিধি রূপে) ও দীওয়ান ছিলেন। জানকি রামের পুত্র দূর্লভরাম উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম ছিলেন, গোকুলচাঁদ ঢাকার দীওয়ান এবং তাঁর পরে, রাজা রাজবল্লভ ঢাকার দীওয়ান ছিলেন। পরে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার নায়েব নাজিমের পদেও উন্নীত হন। আরো অনেক হিন্দু বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে কানুনগো, আমিন ইত্যাদি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

আলীবর্দী খান একজন সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং সৈনিক হিসেবেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। সামান্য ১০০ টাকা বেতনধারী রাজস্ব সংগ্রাহক থেকে ফৌজদার,

পরে নায়েব নাজিম এবং শেষে সুবাদার প্রত্যেক স্তরে নিজের সামরিক দক্ষতা এবং প্রশাসনকি যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী লাভ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং প্রসাশনে তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়, কিন্তু কোন যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও তিনি মারাঠাদের সঙ্গে কোনো কোনো যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু একজন দক্ষ সমর নায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মারাঠা বর্গীদের লুঠতরাজ থেকে রায়তদের রক্ষা করতে পারেননি। ইহার কারণ প্রথমত, মারাঠারা দেশ জয় করার পরিবর্তে লুঠতরাজের উদ্দেশ্যেই আসে, লুঠতরাজের জন্য তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ত, একসঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিত না। তাই বাংলার সৈন্যরা একদিকে জয় লাভ করলেও ছড়িয়ে থাকা মারাঠারা লুঠতরাজ করেই যেত। লুঠতরাজ করা এক কথা, দেশ জয় করা ভিন্ন কথা। তাছাড়া মারাঠাদের যুদ্ধের কৌশলই ছিল ভিন্ন, এবং লুটেরাদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, মীর হাবিব উড়িষ্যায় এবং আফগানরা বিহারে মারাঠাদের পক্ষাবলম্বন করে, এমনকি মারাঠাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আনে। মীর হাবিব শুধু যে একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, তিনি উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞান মারাঠাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে আলীবর্দী খানকে কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করতে হয়। এর মধ্যে গোলাম মুস্তফা খানের নেতৃত্বে আফগান বিদ্রোহ নবাবকে দূর্বল করে দেয়, কারণ সাহসী দূর্ধর্ষ আফগান সৈন্যরা আলীবর্দীর সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। শামসের খান ও সরদার খানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আফগান বিদ্রোহ আরো মারাত্মক হয়। আফগানরা নবাবের ভাই হাজী আহমদ এবং জামাতা ও বিহারের নায়েব নাজিম জৈনুদ্দীনকে হত্যা করে এবং নবাবের কন্যা ও তাঁর সন্তান সন্ততিকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এতে নবাব শোকাতুর হয়ে পড়েন এবং নিজে বিহারে গিয়ে যুদ্ধ করে বন্দীদের মুক্ত করেন। নবাবের নিজের সেনাপতি সেনানায়করাও বিদ্রোহের চেষ্টা করে। এই জন্য দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে নবাবকে নেতৃত্ব দিতে হয়। যেখানেই যুদ্ধ, যেখানেই বিদ্রোহ সেখানেই নবাবকে ছুটে যেতে হয়। এর অর্থ এই যে নবাব সেনাপতি সেনানায়কদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেননি। চতুর্থত, মোগল সম্রাটের দূর্বলতা। একবার মোগল সম্রাট মারাঠা রাজা শাহুকে বাংলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা এবং বিহারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। সম্রাট এতই দূর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি মারাঠাদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু আলীবর্দী খান সম্রাটের আদেশও মানেননি। তিনি এই বিরাট অংকের অর্থ দেওয়ার চেয়ে নিজে যুদ্ধ করা শ্রেয় মনে করেন। তিনি যুদ্ধ করেন ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয় এবং বাংলার জন্য বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দেওয়ার জন্য রাজী হতে হয়।

নবাব আলীবর্দী খান ৬৬ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন, অর্থাৎ মসনদে বসার সময়েই তিনি বৃদ্ধ। তিনি ৮২ বৎসর বয়সে মারা যান, অর্থাৎ ৬৬ থেকে ৮২ বৎসরের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁকে প্রায় অনবরত যুদ্ধ করতে হয়। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের উদ্যম ও কর্মশক্তি নিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুষ্ঠু শাসনের প্রচেষ্টা চালান। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে তিনি সুষ্ঠু ভাবে শাসন পরিচালনা করেন, সেটাই সেনাপতি এবং শাসক হিসেবে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬-১৭৫৭

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। সিরাজ ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের গর্ভে এবং আলীবর্দীর কনিষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনুদ্দীনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজের জন্মের বৎসরেই আলীবর্দী বিহারের নায়েব-নাজিম নিযুক্ত হন এবং সেই থেকে তিনি আরো উন্নতি করে শেষ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার সুবাদারী লাভ করেন। তাই আলীবর্দী এবং তাঁর পরিবারের সকলের বিশ্বাস ছিল যে, সিরাজের ভাগ্যেই তাঁর মাতামহের এইরূপ উন্নতি হয়। তাই সিরাজকে সকলেই অত্যন্ত বেশি স্নেহ কবতেন, তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র।

মুর্শিদাবাদের মসনদে বসার সময় সিরাজের বয়স ২৩ বৎসর, একজন পরিপূর্ণ যুবক, সাহসী এবং উদ্যমী। তিনি প্রায়ই মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং রাজনীতি ও সমরনীতিতে দীক্ষালাভ করেন। তিনি মাতামহের সঙ্গে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেন। একবার মাতামহের সঙ্গে গোস্বা করে বিহারের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য আজিমাবাদ বা পাটনায় যান। ইতোপূর্বে নবাব আলীবর্দী সিরাজকে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিরূপে বিহার শাসন করার জন্য জানকি রামকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য আলীবর্দী পাটনায় গেলে মাতামহ দৌহিত্রের মিলন হয় এবং উভয়ের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়।

অভিজ্ঞতা থাকলেও এবং পরিবারের সকলের প্রিয়পাত্র হলেও মসনদে বসে তিনি শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়েন এবং প্রথমে তাঁকে ঘরের শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়। আলীবর্দীর প্রথমা কন্যা মেহেরুন্নিসা ঘসেটি বেগমের স্বামী শাহামত জঙ্গ আলীবর্দীর আগেই মারা যান, কিন্তু ঘসেটি বেগম যেমন পিতার প্রিয় ছিলেন তেমনি তিনি দাম্ভিক ও উদ্ধত ছিলেন। তাঁর আধিপত্যবাদের স্পৃহা ছিল। কারো অধীনে থাকা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় কনিষ্ঠ বোন আমেনা বেগমের ছোট ছেলে আকরাম উদ্দৌলাকে (সিরাজ উদ্দৌলার ছোট ভাই) লালন পালন করেন। ঘসেটি বেগমের ইচ্ছা ছিল আকরাম উদ্দৌলাকে মসনদে বসানো কিন্তু তাঁর দূর্ভাগ্য আকরাম উদ্দৌলা আলীবর্দীর বৎসর খানিক আগে মারা যান। তাঁর স্বামী ঢাকার নায়েব নাজিম

ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পদ জমা করেন। মুর্শিদাবাদ শহরের কয়েক মাইল উত্তরে চতুর্দিকে পরিখা বেষ্টিত মতিঝিল নামক এক প্রাসাদে ঘসেটি বেগম ধনসম্পদ নিয়ে বাস করতেন। আলীবর্দীর দ্বিতীয় জামাতা পুর্নিয়ার নবাব সওলতজঙ্গও আলীবর্দীর আগে মারা যান। তাঁর দুই পুত্র ছিল, শওকতজঙ্গ ও অল্পবয়স্ক মিরযা রমজান। সিরাজ উদ্দৌলার প্রতিদ্বন্দী ছিল শওকতজঙ্গ। ঘসেটি বেগমের পালক পুত্র আকরাম উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তিনি শওকতজঙ্গকে মসনদে বসতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, স্বাধীনচেতা সিরাজ তাঁর আধিপত্য মেনে নেবেন না, অথচ তিনি কারো আধিপত্য মেনে নিতেও রাজী ছিলেন না। তাই তিনি (ঘসেটি বেগম) শওকত জঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেন, প্রকৃতপক্ষে সিরাজকে আক্রমণ করার উৎসাহ দেন। কিন্তু ঘসেটি বেগম ছিলেন একজন মহিলা, তিনি নিজে বাইরে আসতেন না, এজেন্ট মারফৎ কাজ চালাতেন এবং শওকতজঙ্গও খুব একটা সাহসী এবং প্রতিভাবান ছিলেন না। তা না হলে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রে শওকতজঙ্গ সিরাজের মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজকে আক্রমণ করতেন। তবে সিরাজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দী ছিলেন সেনাপতি মীর জাফর আলী খান। জাফর আলী আলীবর্দীর মত কপর্দকহীন অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন, কিন্তু আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শাহা খানমকে বিয়ে করে সেনাপতির পদ লাভ করেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি যে খুব একটা উঁচু দরের ছিলেন তা না, মারাঠাদের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকবার পরাজিত হন, কিন্তু সওলতজঙ্গকে কটকে মারাঠাদের হাত থেকে রক্ষা করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনি একবার আলীবর্দীকে উৎখাত করার জন্য রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ (হাজী আহমদের জামাতা) সহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলীবর্দী শুধু তাঁদের ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেন। আলীবর্দীর মৃত্যুর সময় তিনি সৈন্য বাহিনীর বখশী ছিলেন এবং সেই সুবাদে সেনাপতি ছিলেন। মসনদের প্রতি মীর জাফরেরও লোভ ছিল। তাঁর যুক্তি ছিল, আলীবর্দী খান যদি সরফরাজ খানকে হত্যা করে মসনদ দখল করতে পারেন, তিনি সিরাজকে সরিয়ে মসনদে বসতে পারবেন না কেন! কিন্তু মীর জাফর ছিলেন একজন নিম্ন চরিত্রের লোক, তিনি নারী বেষ্টিত থাকতেন এবং আফিম ও ভাঙ খেয়ে নেশা করতেন। আলীবর্দীর চেয়ে ২০ বৎসর ছোট হয়েও মীর জাফরের আলীবর্দীর মত সাহস বা বীরত্ব কোনটাই ছিল না। মীর জাফর শেষ জীবনে ক্লাইভের গাধা নামে পরিচিতি লাভ করে, তিনি মসনদে বসলেও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। একটি ঘৃণ্য জীবনের ঘৃণ্য পরিসমাপ্তি হয়।

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা অল্প বয়স্ক হলেও তিনি শত্রুদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং বুঝতে পারেন যে, ঘরের শত্রুকে ধ্বংস করতে না পারলে তাঁর মসনদ নিষ্কন্টক হবে না। তিনি প্রথমে প্রশাসনে কিছু রদবদল করেন। তিনি মীর জাফরকে বখশীর পদ থেকে অপসারণ করে বিশ্বস্ত মীর মদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন এবং কাশ্মীরের লোক মোহনলালকে দীওয়ান খানার পেসকার নিযুক্ত করেন। তাঁকে মহারাজা উপাধি দেয়া

হয়, প্রকৃতপক্ষে মোহনলাল প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। মোহনলালের পিতৃব্য জানকি রামকে দীওয়ান নিযুক্ত করে তাঁকে রায় রায়ান উপাধি দেয়া হয়। নবাব এখন শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। প্রথমে তিনি ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদে একদল সৈন্য পাঠান। ঘসেটি বেগম প্রাসাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাঁর প্রেমিক এবং নিরাপত্তা প্রধান নজর মুহাম্মদ পালিয়ে যান। নবাবের সৈন্যরা প্রাসাদ অধিকার করে ধন-সম্পদ হস্তগত করে নবাবের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে নিয়ে যায়। ঘসেটি বেগম অপমানিত হয়ে বন্দী হন। এর পরে নবাব পুর্নিয়ার দিকে মনযোগ দেন, পুর্নিয়ায় তাঁর খালাত ভাই শওকতজঙ্গ নবাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন। ঘসেটি বেগম তাঁকে সিরাজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমের পরাজয়ে ও বন্দী হওয়ায় শওকতজঙ্গ হতাশ হয়ে পড়েন। নবাব সৈন্যবাহিনীসহ রাজমহলে পৌছুলে শওকতজঙ্গ তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং সিরাজের নিকট আনুগত্য পত্র পাঠিয়ে দেন। সিরাজও তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন।

প্রকৃতপক্ষে পুর্নিয়ার শওকত জঙ্গই ছিলেন সিরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দী। ঘসেটি বেগমের উচ্চাভিলাষ থাকলেও তিনি শওকত জঙ্গকেই সিরাজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। শওকতজঙ্গ মীর জাফরের নিকট থেকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার আমন্ত্রণ লাভ করেন, এবং মীর জাফর শওকত জঙ্গকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন। মীর জাফর আরো বলেন যে, অন্যান্য সেনানায়কেরাও সিরাজকে ছেড়ে শওকত জঙ্গের পক্ষ নেবেন। শওকতজঙ্গ গোপনে দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা বিহারের নবাবীর সনদ লাভেরও চেষ্টা করেন। সিরাজ ইহা জানতে পারেন, তাই জুন মাসে (১৭৫৬) ইংরেজদের হাত থেকে কলিকাতা অধিকার করে (পরে আলোচিত) সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৫৬) পুর্নিয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু শওকতজঙ্গ ইতোমধ্যে সম্রাটের উজীরকে বিরাট অংকের অর্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করে সনদ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। সিরাজ রাসবিহারীকে শওকত জঙ্গের নিকট চিঠি দিয়ে পাঠান যেন শওকতজঙ্গ রাসবিহারীকে পুর্নিয়ার শাসন ভার ছেড়ে দেন। শওকত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উত্তরে সিরাজকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে তাঁর (শওকতের) অধীনে নায়েব নাজিম হওয়ার আদেশ দেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, ১৬ অক্টোবর (১৭৫৬) মনিহারি নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে পুর্নিয়ার সৈন্যরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং শওকতজঙ্গ নিজেও নিহত হন।

শওকতজঙ্গের পতনের পরে সিরাজ উদ্দৌলা তাঁর পরিবারের প্রতিদ্বন্দীদের শত্রুতা থেকে মুক্তি পান। ঘসেটি বেগমকে আগেই নিস্তব্ধ করা হয়, তাঁর সম্পদ নবাবের হস্তগত হয়। তা সত্ত্বেও নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শত্রুর অভাব ছিল না। মীরজাফরের কথা উপরে বলা হয়েছে, পরে দেখা যাবে যে মীর জাফর ছাড়াও নবাবের আমীর সভাসদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে এবং তাঁর পতনের জন্য কাজ করে।

নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ, জুন ১৭৫৬ :

কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত সম্পদশালী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নবাবের অবাধ্য হয়ে এবং আদেশ অমান্য করে নবাবকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। ইংরেজরা তাঁকে মসনদে আরোহণ করায় অভিনন্দন না জানানের ফলে নবাবের প্রতি অসম্মান করা হয়। কোন মোগল বাদশাহ বা নবাব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আমীর উমারা বা অন্যান্য অফিসারদের নিকট থেকে অভিনন্দন এবং উপহার উপঢৌকন পেতেন। ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীরা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন এবং অভিনন্দন জানাতেন। তা স্বীকৃত রীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু সিরাজ মসনদে উপবিষ্ট হলে ডাচ ও ফরাসী বণিকেরা নবাবকে অভিনন্দন জানালেও এবং উপহার সমগ্রী পাঠালেও কলিকাতার ইংরেজ গবর্নর ড্রেক এইরূপ সৌজন্য দেখাতে ব্যর্থ হন। অতি সঙ্গত ভাবেই নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এতে মনক্ষুণ্ন হন। দ্বিতীয়ত, কোম্পানী ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা লাভ করলেও কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়েও এই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন, কারণ তারা ব্যক্তিগত ব্যবসা কোম্পানীর নামে চালিয়ে দিতেন। কোম্পানীর গবর্নরের দস্তক পেশ করলে শুল্ক থেকে রেহাই পাওয়া যেত এবং গবর্নরের দস্তক এমন বেপরোয়াভাবে ব্যবহৃত হত যে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরাও এই দস্তকের সুযোগ নিত। এতে নবাবের রাজস্ব কমে যায় এবং রাজকোষের ক্ষতি হয়। নবাব গবর্নরকে দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার আদেশ দিলেও গবর্নর ড্রেক নবাবের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করেন। তৃতীয়ত, মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলার নবাবেরা ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীকে দূর্গ নির্মাণ নিষেধ করেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা নবাব আলীবর্দী খানের সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। আলীবর্দী এই বিষয়ে মুর্শিদ কুলী খানের মত অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে (সেভেন ইয়ারস্ ওয়ার বা সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ) কলিকাতায় ইংরেজরা এবং চন্দরনগরে ফরাসীরা স্ব স্ব দূর্গ সংস্কার ও পূন: নির্মাণ কাজ শুর করে। নবাব উভয় কোম্পানীকে দূর্গ নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসীরা তাঁর আদেশ মেনে নেয়, কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ গবর্নর ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করে দূর্গ নির্মাণ কাজ চালাতে থাকে। চতুর্থত, ইংরেজরা নবাবের অবাধ্য ও অপরাধী কর্মচারীকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কাজে লিপ্ত হয়। নবাব সরফরাজ খানের সময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্য পরিবারের রাজবল্লভ ঢাকায় দিওয়ানী অফিসে নিযুক্ত হন, কিন্তু আলীবর্দীর সময়ে তিনি আরো পদোন্নতি লাভ করেন। ঢাকার নায়েব নাজিম শাহামত জঙ্গ হোসেন কুলী খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, কিন্তু ১৭৫৪ সালে মুর্শিদাবাদে তিনি নিহত হলে রাজবল্লভ হোসেন কুলীর স্থলে ঢাকার নায়েব নাজিমের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। শাহামত জঙ্গের মৃত্যুর পরে রাজবল্লভের সরকারি অর্থ আত্মসাতের ব্যাপার ধরা পড়ে। নবাব রাজবল্লভকে ঢাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান। রাজবল্লভকে

আটক করা হয়, তাঁর হিসাব পরীক্ষা চলাকালে তাঁর পরিবার ও সম্পদ রাজধানীতে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হয়। এদিকে রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ পরিবারের সবাইকে নিয়ে ধনসম্পদ সহ কলিকাতায় পালিয়ে যায় এবং ইংরেজদের আশ্রয় ভিক্ষা করে। ইংরেজরা তাকে আশ্রয় দেয়। এতে নবাব ইংরেজদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি যথার্থই মনে করেন যে, নবাবের অবাধ্য এবং বিচারাধীন কোন প্রজাকে তাঁরই রাজ্যে তাঁরই অনুগ্রহে ব্যবসাকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আশ্রয় দেওয়া নীতি বহির্ভূত এবং গর্হিত কাজ। তিনি কলিকাতায় ইংরেজ গবর্নর ড্রেকের নিকট একখানি চিঠি লেখেন এবং নারায়ণ দাস নামক একজন গোয়েন্দাকে তাঁর নিকট পাঠান। চিঠিতে নবাব কৃষ্ণবল্লভকে নবাবের নিকট সমর্পন করার জন্য ড্রেককে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইংরেজরা নারায়ণ দাসকে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে কলিকাতা থেকে বের করে দেয়। নারায়ণ দাসকে ড্রেকের নিকট চিঠি হস্তান্তর করা ছাড়াও কলিকাতায় ইংরেজদের দূর্গ নির্মাণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার আদেশ দেয়া হয়। অতএব নারায়ণ দাস সত্যি সত্যি গোয়েন্দাগিরিও করেন, তবু তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ করে, কারণ তাঁকে নবাবই পাঠিয়ে ছিলেন।

যাই হোক, নবাব ইংরেজদের ঔদ্ধত্য সহজভাবে নিলেন না, তিনি তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি ২৪ মে (১৭৫৬) তারিখে ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি অধিকার করেন এবং ৫ই জুন কলিকাতার দিকে অগ্রসর হয়ে ১৬ জুন তারিখে কলিকাতা পৌছেন। গবর্নর ড্রেক নবাবকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাউন্সিল সদস্য ও অন্যান্য ইংরেজদের নিয়ে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করেন। তিনি কোন লোককে আটক করার নির্দেশ দেননি, কাউকেও আটক করা হয়নি, পর্তুগীজ এবং আর্মেনীয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা যেখানে ইচ্ছা চলে যায়, এমন কি ইউরোপীয়রাও বিনা বাধায় চলে যায়। অধিকাংশ হুগলীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ড্রেকের নের্তৃত্বে ইংরেজরা জাহাজে করে ফলতায় আশ্রয় নেয়। ড্রেকের প্রস্থানের পরে হলওয়েল বাকী যে ক'জন ইংরেজ ছিল তাদের নেতৃত্ব দেয়, তবে তারা নবাবকে বাধা দিতে পারেনি। কলিকাতা জয় করে হলওয়েলকে কয়েকজন সঙ্গীসহ মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু পরে তারাও মুক্তি পায়। নবাব কলিকাতাস্থ ইংরেজ কোষাগারে মাত্র ৫০ হাজার টাকা পান, যদিও ইংরেজদের হিসেব মতে কলিকাতার পতন হওয়ায় ইংরেজ কোম্পানী ৯৫ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ইংরেজ ব্যবসায়ীর ১৬০ লক্ষ টাকার সম্পদ হারায়।

কোন কোন ইংরেজ লেখক নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার জন্য দায়ী করে। অন্ধকূপ হত্যাকে কেন্দ্র করে যে কথাটি প্রচলিত তা নিম্নরূপ :

কলিকাতা বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় ইউরোপীয় সৈন্যরা মদ্যপ অবস্থায় মাতলামি করে স্থানীয় লোকদের যত্রতত্র আক্রমণ করলে স্থানীয়রা নবাবের নিকট তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। নবাব তাদের জিজ্ঞাসা করে কোম্পানী এরূপ অপরাধীদের কোথায় বন্দী

করে রাখত। তারা উত্তরে বলে যে ইংরেজেরা অপরাধিদের অন্ধকূপে (ব্লাকহোল) বন্দী করত, তা শুনে নবাবও বলেন যে, এই ইউরোপীয় মাতালদের সেখানে বন্দী করে রাখা হোক। ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট ১ ইঞ্চি প্রস্থ এই অন্ধকূপে তাদের বন্দী করে রাখা হয়, পরের দিন সকালে দেখা যায় অধিকাংশ বন্দী দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। প্রথম যখন কাহিনীটি শুরু হয় তখন অন্ধকূপে বন্দীর কোন সংখ্যা ছিল না, পরে বলা হয় ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন মারা যায়, আরো পরে বন্দীর সংখ্যা দেওয়া হয় ২০০ জন। অন্ধকূপ হত্যার স্মরণে কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট তৈরী হয় (ইন্ডিয়া-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার কয়েক বৎসর আগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়)। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার ঐতিহাসিকতা অত্যন্ত দূর্বল। মুর্শিদাবাদ হাইস্কুলের তৎকালীন হেড মাস্টার জে. এইচ. লিটল সর্বপ্রথম এর সত্যতা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন যে, নবাবের আক্রমণের মুখে ইংরেজেরা পালিয়ে যায়, সন্ধ্যার সময় সেখানে ১৪৬ জন ইংরেজ থাকতে পারে না এবং ছিলনা। দ্বিতীয়ত, ২৬৭ বর্গফুটের একখানি কক্ষে ১৪৬ জন ইউরোপীয় বয়স্ক লোকের সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। পরে ভোলানাথ চন্দর নামক একজন হিন্দু ভদ্রলোক ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রস্থ একখানি ঘর তৈরী করে সেখানে বাঙালিদের ঢুকতে দেন, দেখা যায় ১৪৬ জন দূরে থাক, আরো অনেক কম লোকও সেখানে ঢুকতে পারল না। এটা অবশ্যই জানা কথা যে ইংরেজদের তুলনায় বাঙালিদের শারীর ছোট বা ক্ষীণ। কলিকাতায় কতজন ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ছিল তার কোন তালিকা কেউ কোন সময় তৈরী করেনি, আগের মৃত লোকেদেরও অন্ধকূপ হত্যায় মারা যায় বলে চালিয়ে দেয়া হয়। অতএব অন্ধকূপ হত্যার সম্পূর্ণ কাহিনীটি ইংরেজদের কল্পনাপ্রসূত, পলাশীর যুদ্ধের পরে নবাবের পরাজয়ের পরে, নবাবকে হত্যা করা হলে, নবাবের চরিত্রে কালিমা লেপন করার জন্যই এই কাহিনী প্রচলন করা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পটভূমিকা ঃ

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা এবং অক্টোবর মাসে পূর্নিয়া জয় করে সিরাজ উদ্দৌলা মসনদে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তিনি এখন অপ্রতিদ্বন্দী এবং তাঁর ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার জন্য কেউ রইল না। এই সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবীর ফরমান পেয়ে তিনি সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে পৌছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে, এই সফল্য সাময়িক এবং সাফল্যের পেছনে চরম ব্যর্থতা এবং গ্লানি লুকিয়ে আছে। ইংরেজদের ধূর্ততা এবং বাঙালিদের বিশ্বাসঘাতকতা মিলে শুধু সিরাজের পতনই ঘটায়নি, বাংলার স্বাধীনতাও হরণ করে নেয়।

ইংরেজেরা কলিকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফলতায় জাহাজে আশ্রয় নেয়, এবং নবাব সেনাপতি মানিকচাঁদকে কলিকাতার শাসন ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। নবাব আশা করেছিলেন যে, ইংরেজরা তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা

করে বিনীত ভাবে পুনরায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্যবসা করার অনুমতি লাভের জন্য নবাবের নিকট আবেদন করবেন। শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলী খানের সময় ইংরেজরা কয়েকবার এইরূপ পরিস্থিতির শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে নবাবের অনুমতি লাভ করে। কিন্তু নবাব বুঝতে পারেননি যে, এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, শায়েস্তা খান বা মুর্শিদকুলী খানের সময়ের তুলনায় ইংরেজদের ক্ষমতা, সম্পদ বা আর্থিক সঙ্গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পয়েছিল। ইংরেজরা তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা হারাতে যেমন রাজী ছিল না, নবাব বা দেশীয় শক্তির খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করতেও তারা রাজী ছিল না। শায়েস্তা খানের সময় ইংরেজরা প্রথম উপলব্ধি করে যে, শক্তি দিয়েই তাদের ব্যবসার নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং প্রয়োজনে তারা দেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তখন বিলাতের কোম্পানীর ডাইরেকটররা তা অনুমোদন করেনি। কিন্তু এখন কোম্পানী শক্তি প্রয়োগ করার নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, কলিকাতা এখন একটি সুরক্ষিত নগরী, এই নগরকে ঘিরে ইংরেজরা যেমন দাঁড়াবার স্থান পেয়েছে, তেমনি ইংরেজদেরকে ঘিরে দেশি লোকদের একটা আর্থিক স্বার্থের বন্ধন গড়ে ওঠেছে। ইংরেজরা এই দেশীয়দের সাহায্য সহযোগিতার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে। দেশী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যেমন ব্যবসায়ী, উকিল, দালাল, পাইকার ইত্যাদি যারা কোম্পানীর ছত্রছায়ায় ব্যবসা বা অন্যান্য কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করত, তারা ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করবে, এই বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল। দেশীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে ইংরেজরা ফলতায় টিকে থাকতে পারত না। ইংরেজদের নিকট থেকে সুবিধা ভোগ কারী দেশীয়রা ফলতায় তাদের খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে তাদের নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ করে দেয়। তৃতীয় ইংরেজরা দীর্ঘ দিন এই দেশে থেকে এই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেমন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। তারা বুঝতে পারে যে নবাবের সেনাপতি সেনানায়ক, এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই সুযোগ সন্ধানী, সুযোগ পেলেই নবাবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ইতোমধ্যেই তারা এর প্রমাণ পেয়েছে, নবাবের কলিকাতা জয়ের পূর্বে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সমুদয় সম্পদ নিয়ে কলিকাতায় আশ্রয় নেয়। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দূর্লভ, নবকিষেন নামক হিন্দু প্রধান প্রধান নেতারা ফলতায় ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখত। এদের অনেকেরই ইংজেদের সঙ্গে বিরাট অংকের আর্থিক লেন দেন ছিল, ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে তাদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কলিকাতার শাসক মানিকচাঁদের সঙ্গেও ইংরেজদের যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্লাইভের সঙ্গে মানিকচাঁদের পত্রালাপের মাধ্যমে জানা যায় যে, মানিকচাঁদ নিজেকে ইংরেজদের মিত্ররূপে পরিচয় দেন। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এটাই ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতা, দূর্ভাগ্যবশত নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এই বাস্তব চিত্র বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে সামরিক শক্তি দিয়েই তিনি মসনদ নিষ্কন্টক করবেন।

ইংরেজেরা উদ্ভুত পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। প্রথমত, তারা বাণিজ্য সুবিধা ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে নবাবের দরবারে আবেদন করতে থাকে, জগৎশেঠ ও অন্যান্য হিন্দু ব্যবসায়ী এবং সুবিধা ভোগকারীরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করার জন্য নবাবকে পরামর্শ দিতে থাকে। এটা ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবাবের সন্দেহ দূরীভূত করার কৌশল মাত্র। ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে নবাবের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করা। ফলতা থেকে তারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে মাদ্রাজে তাদের কুঠিতে সংবাদ পাঠায়। কোম্পানীর মাদ্রাজ পরিষদ রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ও নৌবহর পাঠায়। ক্লাইভ ইতোমধ্যেই সেনাপতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কর্নাটকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ইংরেজ নৌবহর মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করে ১৪ ডিসেম্বর (১৭৫৬) তারিখে ভাগিরথি নদীতে প্রবেশ করে এবং ফলতার ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ২রা জানুয়ারী (১৭৫৭) তারিখে ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতা আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। মানিকচাঁদের অধীনে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ না করে কলিকাতা থেকে সরে পড়ে এবং বলতে গেলে কলিকাতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। এতে ইংরেজদের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা প্রমাণিত হয়। কলিকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ সুরক্ষিত করে। কয়েকমাস আগে যারা বিতাড়িত হয় সেই ইংরেজরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে।

রবার্ট ক্লাইভ ৩রা জানুয়ারী (১৭৫৭) নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং হুগলীর থানা দূর্গ অধিকার করেন। ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম লুঠ করে জ্বালিয়ে দেয়। নবাব এই সংবাদ পেয়ে কলিকাতার দিকে যাত্রা করেন। তিনি ১৯ জায়ারী হুগলী পৌছেন এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার নিকটে পৌছে শিবির স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ৬০ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ৩০টি কামান ছিল। ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের আলোচনা চালায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবকে অতর্কিতে আক্রমণ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং ৫ ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে হঠাৎ করে নবাবের শিবির আক্রমণ করে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় ক্লাইভের সৈন্যরা পথ হারিয়ে ফেলায় যুদ্ধে সুবিধা করতে পারল না। কুয়াশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবাবের কামানের আক্রমণে ইংরেজদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ক্লাইভ কোনরকমে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে ফিরে যান, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে নবাবের কয়েক শত সৈন্য হতাহত হয়। অতএব উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য সম্মত হয়ে আলীনগরের সন্ধি নামে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির শর্তমত নবাব ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা দিতে সম্মত হন। তাদের বাণিজ্য কুঠি ফেরৎ দেওয়া হয়, নবাব ইংরেজদের ক্ষতি পূরণ করার কথা দেন এবং ইংরেজদিগকে কলিকাতায় দূর্গ নির্মাণ করে স্বীয় নিরাপত্তা বিধানের অনুমতি দেওয়া হয়। এই চুক্তির শর্তমতে ইংরেজরা মুদ্রা উৎকীর্ণ করার অনুমতিও লাভ করে।

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তাদের সেই শত্রুতার প্রভাব বাংলার ইংরেজ ও ফরাসীদের উপর পড়ে। এই কারণে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের ঝগড়া-বিবাদের সময় ফরাসীরা নবাবের সঙ্গে সহযোগিতা করত। ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি রূপেই মনে করেন এবং নবাবের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকেন। তাই ক্লাইভ নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের আগে ফরাসীদের দূর্বল করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ফরাসী কুঠি চন্দর নগর আক্রমণ করেন। সেখানে ফোর্ট অর্লিয়েন নামে ফরাসীদের একটি দূর্গ ছিল, কিন্তু ফরাসী দূর্গ তেমন সুরক্ষিত ছিল না। ইংরেজরা চন্দরনগর আক্রমণ করলে ফরাসীরা অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করে যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। নবাব তাঁর সেনাপতি নন্দকুমার, রায়দূর্লভ ও মানিকচাঁদকে ফরাসীদের সাহায্য করার আদেশ দেন কিন্তু তাঁরা সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার নবাবকে জানান যে, ফরাসীরা এতই দূর্বল ছিল যে তাদের সাহায্যে অগ্রসর হলে অনর্থক নবাবের সৈন্যদের শক্তিক্ষয় হত। নবাব নিজে ফরাসীদের সাহায্য করতে পারেননি কারণ আফগান সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালী তখন দিল্লী আক্রমণ করেন, তিনি বাংলা-বিহারের দিকে অগ্রসর হবেন এমন আশংকাও ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আফগান সেনাপতি আবদালী দিল্লী থেকে ফিরে যান এবং নবাবও এই বিপদের আশংকা মুক্ত হন। কিন্তু ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করলেও যুদ্ধে অনেক ইংরেজ হতাহত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে ক্লাইভ ফরাসীদের বিরুদ্ধে এই বিজয় লাভ করে।

ইংরেজরা ফরাসীদের পরাজিত করে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মত এখন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে মসনদ থেকে অপসারণের কর্মসূচী ত্বরান্বিত করে। নবাব ফরাসী পলাতক সৈন্যদের মানবিক কারণে আশ্রয় দিলে ইংরেজরা ইহাকে উপলক্ষ হিসেবে প্রচার করে। নবাবের দরবারের অনেক সদস্যও নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এদের সমর্থনের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা কাউনসিল ২৩শে এপ্রিল (১৭৫৭) তারিখে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে মসনদ চ্যুত করার প্রস্তাব পাশ করে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য ক্লাইভ উমিচাঁদকে দালাল নিযুক্ত করেন। নবাবের সেনাপতি ও বখশী মীর জাফর আলীবর্দীর সময় থেকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সহজেই তাঁর সম্মতি লাভ করে। তিনি মসনদ পাওয়ার লোভে অধীর হয়ে ওঠেন। ইয়ার লুৎফ খান এবং খাদিম হোসেন নামক সৈন্যাধ্যক্ষও ষড়যন্ত্রে যোগ দেন, জগৎশেঠ, রায়দূর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (নদীয়ার জমিদার) এবং অন্যান্য হিন্দু প্রধান ব্যক্তিরা এবং ইংরেজদের দালাল পাইকার এবং সুবিধাভোগকারীরা স্বেচ্ছায় তাদের পক্ষ নেয়। তবে এদের সকলের যোগাযোগে এবং ষড়যন্ত্র পাকা করার ব্যাপারে জগৎশেঠের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য।

কলিকাতা কাউনসিলের সভায় মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজদের একটি খসড়া চুক্তি অনুমোদিত হয়। ইংরেজরা যথার্থই বুঝতে পারে যে, জগৎশেঠ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেয়ে মীর জাফরের ভূমিকাই হবে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। কারণ তিনি সেনাপতি, চূড়ান্ত পর্বে সেনাপতির ভূমিকাই হবে মুখ্য। সঙ্গে সঙ্গে কাসিমবাজার কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস্ ষড়যন্ত্রে নেমে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও কুটকৌশলী লোক। তিনি জগৎশেঠ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। কথিত আছে যে, ওয়াটস্ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত পালকিতে চড়ে সভায় উপস্থিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করে মীর জাফরকে মসনদে বসান হবে। এমন নিশ্চিদ্র গোপনীয়তায় সভা করা হয় যে নবাবের গোয়েন্দারা, এমনকি মীর জাফরের বিশ্বাস্ত লোকেরাও এই সম্বন্ধে কোন আঁচ করতে পারেনি। ইংরেজ এজেন্টরা চুক্তি মত খসড়া প্রস্তুত করে এবং ১৯শে মে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে। এর পর উইলিয়াম ওয়াটস গোপনে মুর্শিদাবাদ যান। তিনি চুক্তি মীর জাফরের নিকট পেশ করেন এবং ৫ই জুন তারিখে মীর জাফরের সই নেন। অতঃপর ওয়াট্স অতি গোপনে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। ১১ই জুন তারিখে চুক্তি ইংরেজদের গোপন কাউন্সিলে পেশ করা হয়। চুক্তির শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১। সিরাজ উদ্দৌলাকে অপসারণ করে মীর জাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসান হবে ;

২। উভয় পক্ষ পরষ্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হবে ;

৩। ফরাসীদের কুঠি এবং সকল ফরাসী অশ্রিত ব্যক্তিকে ইংরেজদের হাতে প্রত্যর্পন করা হবে ;

৪। সিরাজ-উদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা দখলের ফলে ইংরেজ কোম্পানী ও ব্যক্তিগত ইংরেজদের সকল ক্ষতি পূরণ করা হবে ;

৫। মোগল সম্রাটের ফরমানের দ্বারা ইংরেজ কোম্পানীকে দেওয়া সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে ;

৬। কাসিমবাজার ও ঢাকা কুঠি সুরক্ষিত করার অধিকার ইংরেজদের দেওয়া হবে ;

৭। নবাব (নতুন নবাব মীর জাফর) হুগলীর নীচে (অর্থাৎ হুগলী বন্দরের দক্ষিণে) কোন দূর্গ নির্মাণ করবেন না ;

৮। কলিকাতার সীমানার মধ্যে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া হবে ;

৯। প্রয়োজন মত সামরিক বাহিনী রাখার জন্য ইংরেজদেরকে ভূমি মঞ্জুর করতে হবে ;

১০। নবাবের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইংরেজ সৈন্যদের কোন অভিযান করতে হলে বা সামরিক তৎপরতায় যেতে হলে, তার ব্যয়ভার নবাবই বহন করবে ;

১১। নবাবের দরবারে কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

চুক্তির শর্তগুলো বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। চুক্তির দুটি পার্টি, একদিকে সিরাজ উদ্দৌলার নিজের সেনাপতি, অন্যদিকে ইংরেজরা। সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মীর জাফর কত নীচতার পরিচয় দেন তা এই চুক্তিতেই প্রকাশ পায়। চুক্তিতে মোগল সম্রাটের কোন উল্লেখও নাই, অর্থাৎ উভয় পক্ষই মনে করে যে সম্রাটের অস্তিত্ব মূল্যহীন। চুক্তির ফলে বাংলার নবাব মোগল সম্রাটের অধীনস্থ হওয়ার পরিবর্তে ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভরশীল নবাবে পরিণত হন। এতে নবাবের ক্ষমতা ইংরেজদের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়। নির্বোধ মীর জাফর মসনদের মোহে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেন। বুঝে করুক বা না বুঝে করুক, প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির মাধ্যমেই মীর জাফর বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা কাজে পরিণত হয়।

পলাশীর যুদ্ধ ২৩শে জুন, ১৭৫৭ :

মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পরে ১৩ই জুন তারিখে (১৭৫৭) রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ৮০০ ইউরোপীয় সৈন্যসহ মোট ৩ হাজার সৈন্য ছিল। পথে কাটোয়া এবং হুগলীর ফৌজদারেরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করে। ২২শে জুন তারিখে ইংরেজরা পলাশীতে পৌঁছে লক্ষবাগ নামক আমবাগানে শিবির স্থাপন করে। এই আম বাগানটি ৮০০ গজ দীর্ঘ এবং ৩০০ গজ প্রস্থ, কিন্তু এর চর্তুদিকে মাটির একটি উঁচু বাঁধ থাকায় যুদ্ধের জন্য তা উপযুক্ত বিবেচিত হয়। তাছাড়া আম গাছের ডাল শত্রুর গোলা থেকে তাদের সাময়িকভাবে হলেও রক্ষা করে। ক্লাইভের শিবিরের দক্ষিণে গঙ্গা নদী, এবং অন্যদিকে পলাশী গ্রামও ইংরেজদের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। শিবিরের নিকটেই ইটের নির্মিত নবাবের একটি শিকার-ঘর ছিল। ক্লাইভ তা অধিকার করে সুরক্ষিত করে। এই ছিল ক্লাইভ অর্থাৎ ইংরেজদের শিবির, চতুর্দিক থেকে সুরক্ষিত, ক্লাইভ সৈন্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করে সেটা আরো সুরক্ষিত করে।

নবাবও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সমাবেশ করেন। নবাবের শিবিরের স্থানের নাম মাংগরপাড়া। নবাবের শিকার-ঘর, যা ক্লাইভ অধিকার করেছিলেন, তার ৪০০ গজ উত্তরে নদীর তীরে একটি বড় পুকুর এবং ঐ পুকুরের ১০০ গজ উত্তরে একটি ছোট পুকুর ছিল, উভয় পুকুরের চতুর্দিকে উঁচু পাড় বা বাঁধ ছিল। এখানে নবাব ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রেকে ৪৫ জন ফরাসী সৈন্য এবং ৪টি ছোট কামান-সহ মোতায়েন করেন। এর প্রায় ৫০০ গজ উত্তরে এবং নদীর ৪০০ গজ পূর্বে একটি বড় এবং উঁচু ঝোপজঙ্গলে ঢাকা একটি ঢিপি ছিল। এখানে নবাবের নিজস্ব সৈন্যরা অবস্থান নেয়। এই ঢিপির চতুর্দিকে সুরক্ষিত করে সৈন্যরা অবস্থান নেয় এবং পরিখা খনন করে

বিষয়। জোনস্ কলিকাতা আসলে তাঁর পরিকল্পিত বিষয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে এই বিষয়ে সাড়া পান এবং স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহযোগিতা লাভ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। এশিয়াটিক সোসাইটি এখনো বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে সোসাইটি ভারতবাসীর জ্ঞান ভাণ্ডার কিরূপ সমৃদ্ধ করছে তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে আধুনিক প্রণালীতে চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে তা বাংলাদেশ সহ সারা ভারতে এক নবযুগ আনয়ন করে। প্রথম প্রায় অর্ধ শতাব্দী বিদেশীরাই এর নেতৃত্ব দিত এবং সোসাইটি পরিচালনা করত, এমনকি কোন ভারতবাসী এর সদস্যও ছিল না, ক্রমে ক্রমে ভারতবাসী ও বাঙ্গালিরা তাতে যোগদান করে এবং বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গবেষণায় প্রচুর উন্নতি করে, এবং সোসাইটির উন্নতিতেও অবদান রাখে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ :

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৮৬১ সনে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা পুরাকীর্তি সন্ধান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এর প্রথম পরিচালক ছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং এই দেশের ইতিহাস ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে ভারতীয় ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল বলে এই কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও কোন কোন কর্মচারী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেক পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন, এই পাঠ্যপুস্তকগুলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকেই প্রকাশিত হত। এই কলেজে মুসলিম মুনশী মৌলবী এবং হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, মুসলিমরা ফারসি-উর্দু ভাষার চর্চা করেন এবং হিন্দু পণ্ডিতেরা বাংলা চর্চা করেন। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

উইলিয়াম কেরী ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন, তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেরী তাঁর কয়েকজন বাঙ্গালি সহকর্মীকে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দেন, ফলে রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকই গদ্যে রচিত প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ। এর পর থেকে রামরাম বসু নিজে এবং তাঁর

মীর জাফর নবাবের নিকট থেকে ফিরে এসে গোপনে ক্লাইভকে পরিস্থিতির কথা জানান। তখন ক্লাইভ নবাবের সৈন্যদের আক্রমণ করেন। নবাবের যুদ্ধ বিরতির আদেশ শুনে সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখা গেল যে ফরাসী সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে। আবার নবাবের বাহিনীতে সকলেই মীর জাফরের মত বিশ্বাসঘাতক ছিল না। রাজপুত এবং শিয়া সৈন্যরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হতে রাজী ছিল না। তারা আবার বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মত সেনাপতি ছিল না। মীর জাফর, রায় দূর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খান তাদের নিজ নিজ সৈন্যসহ ধীরে ধীরে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। মোহন লাল একা সকল দিক সামলাতে পারলেন না, শেষে তিনিও আহত হন। ফলে নবাবের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এবং রবার্ট ক্লাইভ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত নবাবের সৈন্যরা পলায়ন করতে থাকে। নবাব বেলা ৪ টার পরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করেন এবং ৫ টার মধ্যে যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়। ক্লাইভ রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়, যাতে নবাব সেখানে গিয়ে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে না পারেন। এদিকে নবাব মধ্যরাতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পৌছেন। সেখানে তখন ভয়ভীতি বিরাজ করছিল এবং নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার মত অবস্থা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে নবাব মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি কাকে বিশ্বাস করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে আর যাই হোক যুদ্ধ জয় করা যায় না। তাঁর পরিবার পরিজনের পরামর্শে তিনি পাটনায় পালিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। ২৪শে জুন রাত্রে তিনি বেগম লুৎফ-উন-নিসা এবং একজন বিশ্বস্ত খোজাকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে রাজধানী ত্যাগ করেন। রাজধানী শাসনের কোন ব্যবস্থাই ছিলনা, নবাবের পরাজয়ে লোকজন এতই বিমূঢ় হয়ে পড়ে যে, তারা কেউ অশান্তি সৃষ্টি করেনি। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে যুদ্ধের পরের দিন, অর্থাৎ ২৪শে জুলাই মুর্শিদাবাদে পৌছেন, কিন্তু তিনি ঘরে অর্গল বন্ধ করে ঘরের ভেতরেই বসে থাকেন এবং মসনদে বসার কোন আগ্রহ দেখালেন না। ক্লাইভ কয়েকদিন পরে ২৯ তারিখে (২৯শে জুন ১৭৫৭) রাজধানীতে পৌছে মুরাদবাগে নবাবের প্রাসাদের নিকটে অবস্থান নেন। তিনি বিকালে প্রাসাদে গিয়ে মীর জাফরকে হাত ধরে সকল কর্মকর্তা, জমিদার, ইত্যাদির উপস্থিতিতে মসনদে বসান এবং তাঁকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তিন সুবার নবাবরূপে অভিবাদন জানান। ক্লাইভের অনুসরণ করে উপস্থিত অন্যান্যরাও নতুন নবাবকে অভিনন্দন জানান।

এদিকে সিরাজ উদ্দৌলা পদ্মার তীরে ভগবানগোলা গিয়ে নৌকায় আরোহণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পাটনায় যাওয়া এবং সেখানে ফরাসী সেনাপতি জীন ল' এর সঙ্গে মিলিত হওয়া। পাটনার নায়েব নাজিম রামনারায়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। রাজমহলের পরে ৩০শে জুন তারিখে আহার যোগাড়ের জন্য তিনি নৌকা

থেকে অবতরণ করেন। যদিও তিনি সাধারণ পুরাতন পোষাকে ছদ্মবেশের যথেষ্ট চেষ্টা করেন, দানা শাহ নামক একজন মুসলমান ফকীর তাঁকে চিনে ফেলেন। এই বিশ্বাসঘাতক সিরাজকে চিনে ফেলেন এবং রাজমহলের ফৌজদারকে সংবাদ দিলে শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁকে ধরে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। সিরাজকে অতি গোপনে ২রা জুলাই রাত্রে মুর্শিদাবাদে নেয়া হয়। মীর জাফর তাঁকে নিয়ে কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না এবং তাঁর ছেলে মিরনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ভার দেন। দুরাত্মা মিরন সেইরাত্রেই কাউকে কিছু না জানিয়ে সিরাজকে হত্যার আদেশ দেন। মোহাম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করেন। এই লোকটিকে সিরাজের পিতা লালন-পালন করেন এবং সিরাজের মাতা বিয়ে দেন। এই লোকটির কাছে সিরাজ তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চান এবং বলেন যে, তাঁর জীবন ভিক্ষা দিলে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে জীবন যাপন করবেন এবং কারো কোন ক্ষতি করবেন না। কিন্তু ঘাতক তাঁর কোন কথাই শুনল না। মিরন সিরাজের ভাই মিরজা মাহদী, এবং সিরাজের অন্য পরলোকগত ভাই অকরাম উদ্দৌলার ছেলে মুরাদ উদ-দৌলাকেও হত্যা করে, অর্থাৎ আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান-সন্ততিকে জীবিত রাখেনি। পুর্নিয়ার শওকতজঙ্গের ছোট ভাই মিরজা রমজানির ভাগ্যে কি ঘটে তা অবশ্য জানা যায় না। অতএব ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই দিবাগত রাত্রে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার মর্মান্তিক জীবনাবসান হয়।

পরের দিন অর্থাৎ ৩ তারিখ সকালে রাজধানীতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সিরাজকে প্রকাশ্যে অপমানিত করার জন্য তাঁর মৃতদেহ একটি হাতির পিঠে করে রাজধানীর রাস্তায় ঘোরান হয়। হাতি সিরাজের বাস গৃহের সামনে বাজারে আসলে চতুর্দিকে হৈচৈ পড়ে যায়। মা আমেনা বেগম বাস গৃহেই ছিলেন। তিনি এই প্রথম সিরাজের ভাগ্য সম্পর্কে জানতে পারলেন। এক নবাবের মেয়ে, অন্য এক ডেপুটি নবাবের স্ত্রী এবং আর এক নবাবের মা এই সম্ভ্রান্ত মহিলা স্থানকাল পাত্র ভুলে পর্দা ফেলে চীৎকার করে পুত্রের মৃতদেহ শেষবারে মত দেখার জন্য ছুটে আসেন, কিন্তু একদিন যারা তাঁর একটু অনুগ্রহ লাভের আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করত, তারাই তাঁকে অশোভনীয় ভাবে হটিয়ে দেয়। সিরাজের প্রিয় বেগম সারা জীবন নবাবের স্মৃতি ধরে রাখেন এবং প্রত্যেক সন্ধ্যায় তাঁর কবরে বাতি জ্বলিয়ে দিতেন।

সিরাজের চরিত্র ঃ

ঐতিহাসিকেরা সিরাজের চরিত্রে কালিমা লেপন করেন। তাঁরা সিরাজকে নির্দয়, উচ্ছৃঙ্খল এবং অত্যাচারী রূপে অভিহিত করেন। এই ঐতিহাসিকেরা হলেন মুসলিম ঐতিহাসিক যাঁরা ফারসি ভাষায় লেখেন এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক। কিন্তু এঁদের কাউকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। মুসলিম ঐতিহাসিকেরাসহ সকলেই পলাশীর যুদ্ধের পরে তাঁদের ইতিহাস লেখেন, অর্থাৎ তাঁরা ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পরে ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের আশায় ইংরেজদের প্রশংসা করতে গিয়ে নবাবের কুৎসা রটনা করেন। নবাব জয়লাভ করলে এঁরাই হয়তঃ নবাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন।

সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি ঢাকায় নিযুক্ত শাহামত জঙ্গের প্রতিনিধি হোসেন কুলী খানকে মুর্শিদাবাদে হত্যা করেন। তিনি ঘসেটি বেগমকে তাঁর জমাকৃত ধন-সম্পদ হস্তান্তর করতে বাধ্য করেন। ঘসেটি বেগম ছিলেন তাঁর বড় খালা। তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে দূর্ব্যবহার করেন। কথিত আছে যে তিনি জগৎশেঠকে খৎনা করে দেয়ার ভয় দেখান। সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র চিত্রণ করার সময় সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন মসনদে বসেন, তখন তাঁর চতুর্দিকে ঘোরতর দূর্যোগ। তাঁর আপন খালা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেন, তাঁর খালাত ভাই শওকত জঙ্গকে তাঁর খালা ঘসেটি বেগমই তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা করতে উৎসাহ দেন। ঘসেটি বেগম আলীবর্দীর প্রিয় জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসাবে নবাবের স্নেহধন্য ছিলেন, বিশেষ করে ঘসেটি বেগমের সন্তান-সন্ততি না থাকায় নবাব আলীবর্দী তাঁকে অতিরিক্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু এই মহিলা নিজে উচ্চাভিলাষী হয়ে প্রথমে তাঁর পালকপুত্র, পরে পালকপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় শওকত জঙ্গকে মসনদে বসাবার চক্রান্ত করেন। সিরাজ ছাড়া অন্য কেউ হলেও ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত মেনে নিতেন না। হোসেন কুলী খানের হত্যার পেছনেও এই একই রাজনৈতিক কারণ ছিল।

সিরাজ নবাব আলীবর্দী খানের সময়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষ, ব্যবসায়ী, মহাজন ইত্যাদিকে চিনতেন। পিতামহের দরবারে পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তিনি এঁদের চরিত্রের ভাল ও খারাপ উভয় দিক দেখার সুযোগ পান। জগৎশেঠ শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে নাক গলাবার সুযোগ পান। সিরাজ আলীবর্দীর সময়েই মীর জাফরের ষড়যন্ত্র দেখেন এবং আলীবর্দী কিভাবে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেন তাও দেখেন। ঢাকার রাজবল্লভ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন, নবাব হিসাব দাবী করলে তিনি পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে তাঁর জমাকৃত সম্পদ কলিকাতায় পাঠিয়ে দেন। সিরাজ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি দেখে দেখে বড় হন। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, গুপ্ত হত্যা কোন সময় কল্যাণ বয়ে আনে না, তা একটি সার্বজনীন সত্য। কিন্ত প্রাক্-পলাশী যুদ্ধকালীন দু'-এক দশকে বাংলার রাজনীতিতে এই সত্যটি ঢাকা পড়ে যায়। ঐতিহাসিকেরা যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালায় তার প্রধান উদাহরণ অন্ধকূপ হত্যা। দীর্ঘদিন ধরে নবাবকে অন্ধকূপ হত্যার জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু এখন ঐতিহাসিকেরা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এটি নিছক একটি মিথ্যা প্রচারণা, সিরাজের চরিত্রে কলংক লেপনের জন্য তা উদ্ভাবন করা হয়।

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা মসনদে বসেই চারদিকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়েন। একদিকে যেমন তাঁর ঘরের শত্রু ঘসেটি বেগম ও শওকতজঙ্গ, অন্যদিকে তেমনি তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ ইত্যাদি। নবাবের ঘরের শত্রুদের সুযোগে ইংরেজ বণিকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেয় তাদের বাণিজ্যের সুবিধা ভোগকারী দেশীয় নেতৃবৃন্দ। নবাব কারো প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁর ধ্বংসের কারণ হয়। তবে বিশ্বাসঘাতকেরা শুধু যে নবাবের সর্বনাশ করে তাই নয় তারা দেশেরও সর্বনাশ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি বিশ্বাসঘাতকদের পদচ্যুত করেননি কেন? এর উত্তর এই যে, বিশ্বাসঘাতকদের দলই ভারী ছিল, বিশ্বাসঘাতকেরা নবাবকে কোন সময় দেয়নি, সময় পেলে হয়ত তিনি একে একে সকলকে দমন করতে পারতেন। সবদিকে বিবেচনা করে আমরা সিরাজ উদ্দৌলাকে খুব উন্নত চরিত্রের লোক না বললেও সমসাময়িক কালের অন্যান্য শাসকের সমতুল্য মনে করতে পারি।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও মীর জাফরের নবাবী, ১৭৫৭-১৭৬০ ঃ

পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন। তাঁকে হত্যা করা হয় এবং মীর জাফর মসনদে বসেন। অতএব আগের মত এবারও নবাবের বদল হয়, সিরাজের স্থলে মীর জাফর। পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেকেই মনে করত যে, মীর জাফরই নবাব এবং ইংরেজেরা শুধু তাদের পূর্বের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা ফিরে পায়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে যে একটা বিরাট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের শুরু হয়, তা ধীরে ধীরে সকলেই বুঝতে পারে। প্রথমত, বানিয়া কোম্পানী তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে। মীর জাফর ছিল অত্যন্ত দুর্বল, সেই তুলনায় ক্লাইভ ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও অনমনীয়। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা ইংরেজদের সঙ্গে মীর জাফরের ৫ই জুন তারিখের চুক্তির এমনভাবে প্রয়োগ শুরু করেন যে তাতে মীর জাফর ক্রীড়নকে পরিণত হন। দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা সামরিক এবং বাণিজ্যিক অনেক সুবিধা লাভ করে। ফলে ইংরেজরা বাংলা বিহার, উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশেই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরে শুধু যে নবাব দুর্বল হয়ে পড়েন তাই নয়, ফরাসীরাও বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। তৃতীয়ত, ইংরেজরা মসনদের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। মীর জাফরকে ক্লাইভই হাত ধরে মসনদে বসান, সকলেই বুঝতে পারে যে তাদের নবাব এখন আর নিজ শক্তিতে চালিত হন না, ইংরেজদের শক্তিতেই চালিত হন। চতুর্থত, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি গলায় কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজরা বিপুল অর্থ পাওনা হয়। ইংরেজ সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য ইংরেজ উচ্চ পদস্থ লোকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎকোচ দিতে হয়। ইংরেজরা যেই অর্থ পায় তা ভারতের সঙ্গে ৩ বৎসর বাণিজ্যের মূলধনের সমপরিমাণ হয়। তাছাড়া ইংরেজ কর্মকর্তা, কর্মচারীরা বিপুল অর্থ স্বদেশে প্রেরণ করে। আগে মূলধন হিসেবে কোম্পানী স্বদেশ থেকে যা স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানী করত তা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিলাতে কোম্পানীর শেয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে যায়, বাংলার সম্পদে বিলেতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে নাকে এবং এর অর্থ বাংলার নবাব মীর জাফর দেওলিয়া হয়ে যায়। পঞ্চমত, ইংরেজরা প্রভাব খাটিয়ে নবাবের নিকট থেকে আরো সুযোগ সুবিধা লাভ করে। কোম্পানী কলিকাতায় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে, কলিকাতার পার্শ্বে ২৪টি পরগনায় জামিদারী লাভ করে এবং উত্তর বিহারে শোরা উত্তোলনের একচেটিয়ে অধিকার লাভ করে। এককথায় বলতে গেলে পলাশীর পরে ইংরেজরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়। নবাব না হলেও তারা নবাবের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মীর জাফর এখন বুঝতে পারেন বিশ্বাসঘাতকতা করে মসনদ লাভ করলেও তা রক্ষা করা সোজা নয়। তিনি ইংরেজদের অর্থ দাবীতে ক্ষুব্ধ হতেন, কিন্তু তাঁর কিছু করার উপায় ছিলনা। সামরিক কারণে তাঁকে ইংরেজদের উপর নির্ভর করতে হয়। রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে দেশে চলে যান, কিন্তু যাওয়ার পূর্বে তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলায় কার্যত শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে মীর জাফর কোম্পানীকে তাঁর চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে ব্যর্থ হন। ফলে ইংরেজরা তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীর কাসিমকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসায়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে মীর কাসিম ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তিতে উপনীত হন এবং মসনদ লাভ করেন।

মীর কাসিম, ১৭৬০-১৭৬৩

মীর জাফর অপসারিত হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে তিনি ইংরেজদের প্রাপ্য অর্থ শোধ করতে পারেননি। পলাশীর পরেও বিভিন্ন কারণে ইংরেজ সৈন্য ব্যবহার করতে হওয়ায় তাদের পাওনা আরো বেড়ে যায়। মীর জাফরের পুত্র মিরনের মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজেরা মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মীর কাসিম ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি মতে এবং মসনদ লাভের বিনিময়ে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলার শাসন কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে সম্মত হন। ফলে মীর কাসিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব রূপে ঘোষিত হন।

মীর কাসিম মীর জাফরের মত অথর্ব ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারেন যে, পলাশীর পরে ইংরেজরা নবাবের প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি আরো বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা পাওয়া তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এইজন্য তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন, কারণ মুশিদাবাদ ইংরেজদের ক্ষমতার কেন্দ্র কলিকাতার নিকটে অবস্থিত ছিল। এর পরে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পান। তিনি আর্মেনিয়ান গুরগিন খানকে তার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের ভার দেন। তিনি ইউরোপীয়দের অনুকরণে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখা পুনর্গঠন করেন। সুমরু, জেন্টিল, মর্কট ও আরাতুন নামক কয়েকজন বিদেশী সেনানায়ককেও নবাবের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। মুহাম্মদ তকী খান নামক একজন সেনানায়কও নবাবকে তাঁর সৈন্যবাহিনী সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করেন। মুঙ্গেরে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে গোলন্দাজ বাহিনী উন্নত করা হয়।

মীর কাসিম মসনদে বসার পরে সম্রাট শাহ্ আলম বিহার আক্রমণ করেন। কোম্পানীর সৈন্যদের নের্তৃত্বে মেজর কর্নাক তাঁকে বাধা দিলে তিনি পরাজিত হন। এর আগেও শাহ্ আলম দু'বার আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এইবারে মীর কাসিম শাহ্ আলমের সঙ্গে পাটনায় মিলিত হন, এবং নবাব হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি লাভ

করেন। কিন্তু মীর কাসিম নবাব হিসেবে বৈধতা লাভ করলেও মসনদে বসে তিনি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি দেখেন যে কোষাগার শূন্য, সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল এবং বিদ্রোহাত্মক এবং জমিদারেরা অবাধ্য। তিনি যেমন প্রশাসন বুঝতেন, তেমনি রাজস্ব প্রশাসনেও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন অর্থের সংস্থান না করতে পারলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। তিনি কর বৃদ্ধি করেন, এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অবাধ্য জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নেন এবং রাজস্ব নিয়মিত আদায়ে বাধ্য করেন। এর ফলে তিনি কোম্পানীর পাওনা আদায় করেন এবং সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাসিমের সম্পর্কের অবনতি হয়। এর প্রথম কারণ কলিকাতায় ইংরেজ কাউনসিল সদস্যদের মধ্যে দলাদলি। তখন গবর্নর ছিলেন হেনরী ভেনসিটার্ট, তিনি মীর কাসিমের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু শুধু এই কারণেই ভেনসিটার্টের বিরোধী কাউনসিল সদস্যরা মীর কাসিমের বিরোধিতা করে। তারা নবাবের সকল কাজের মধ্যে ছিদ্র অন্বেষণ করে। শ্রীঘ্রই একটা সুযোগও এসে যায়। মীর কাসিমের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রশ্নে ইংরেজদের ভীষণ মনোমালিন্য হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হল দেশের অভ্যন্তরে দেশে উৎপন্ন পণ্যের বাণিজ্য, অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা নেওয়া করা এবং বেচাকেনা করা। সম্রাট ফররুখ সিয়র ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের যেই ফরমান দেন, তার বরাতে ইংরেজরা দাবী করে যে, ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা এইরূপ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নিতে পারে। নবাবেরা কখনো কোম্পানীর কর্মচারীদের এই দাবী মেনে নেননি, নবাব মুর্শিদকুলী খান থেকে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা পর্যন্ত কেউ এই দাবী মানেননি। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা নানাভাবে ফাঁকি ঝুঁকি দিয়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নিত। পলাশীর যুদ্ধের পরে তাদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, এবং তারা বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করতে থাকে। ক্ষমতার মোহে তারা মীরজাফরের সরকারের ক্ষমতা বা আইন কানুন অবজ্ঞা করে। মীর জাফর ইংরেজদের উপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। ইংরেজদের ক্ষমতা দেখে আর্মেনিয় এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের সঙ্গে হাত করে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, এমন কি ইংরেজদের দেশীয় হিন্দু গোমস্তারাও এর সুযোগ নিতে থাকে।

মীর কাসিম শীঘ্রই এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের আশ্রয়পুষ্টরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করায় নবাবের আয় কমে যায়। তাদের অত্যাচারে পণ্য উৎপাদকরাও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কারণ ব্যবসায়ীরা জোর করে ন্যায্য মূলের কম দামে পণ্য দ্রব্য নিয়ে নিত। দ্বিতীয়ত, যে সকল দেশী ব্যবসায়ী ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতনা বা তাদের আশ্রয়পুষ্ট ছিলনা তারাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের বিধিমত শুল্ক দিতে হত, ফলে তাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেত এবং ইংরেজ ও তাদের আশ্রিতদেয় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারত না। দেশে উৎপাদন কমে যায়, ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় উৎপাদকরা উৎপাদনে

উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্য ছিল তামাক, লবণ এবং পান-সুপারি। অনেক উৎপাদক তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এর রাজনৈতিক কুফলও ছিল, ইংরেজ ব্যবসায়ীরা জোর করে পণ্য নিতে চাইলে কোন কোন স্থানে স্থানীয় লোকেরা বাধা দিত এবং ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং ইহাতে নবাবের জন্যও সমস্যা হয়।

মীর কাসিম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের নিকট এর প্রতিবাদ করেন। তিনি ইংরেজদের জানিয়ে দেন যে তাদের কর্মচারীদের অবৈধ এবং বিনাশুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নেয়ার ফলে তাঁর এবং দেশের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু ইংরেজ উচ্চ পদস্থরাও এই অবৈধ বাণিজ্যে লিপ্ত থাকায় এবারের প্রতিবাদে কোন ফল হল না। গবর্নর ভ্যানসিটার্ট কাউনসিলে আপোষের প্রস্তাব করলে অধিকাংশ সদস্য তা প্রত্যাখ্যান করে, তারা ন্যায় নীতির জন্য তাদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজী হল না। ফলে ন্যায়ের খাতিরে মীর কাসিম এমন ব্যবস্থা নিলেন যা ইংরেজরা চিন্তাও করেনি। নবাব যথার্থই অনুধাবন করেন যে দেশে দুই আইন চলতে পারে না। একদল বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবে, অন্যদলকে শুল্ক দিতে হবে তা হতে পারে না। তাই নবাব দুই বৎসরের জন্য সকল ব্যবসায়ীকে শুল্ক প্রদান থেকে রেহাই দিলেন। এতে দেশী ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু এই ব্যবস্থায় ইংরেজরা ক্ষেপে যায়। তারা অবৈধ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কলিকাতা কাউনসিলের নবাব-বিরোধী সদস্যরা ঘোষণা করে যে, নবাব কোম্পানীকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানীর কোন প্রিভিলেজ বা সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ইংরেজদের পাটনার কুঠির প্রধান এলিস নবাবের শুল্ক সম্পর্কীয় আদেশের প্রতিবাদে পাটনা আক্রমণ করে। শুধু তাই নয়, কলিকাতা কাউনসিল নবাব মীর কাসিমকে পদচ্যুত করে মীর জাফরকে পুনরায় মসনদে বসায় এবং মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (২৪শে জুলাই ১৭৬৩)।

মীর সমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের প্রধান কারণ পলাশী পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এই ব্যবস্থা কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে না। নবাব শাসন চালাবেন অথচ তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না, নবাবের অর্থের প্রয়োজন, অথচ অর্থনৈতিক ও কর প্রয়োগ বা কর প্রত্যাহার ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকবে না, এইভাবে নবাব কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়েন। অন্যদিকে ইংরেজরা নবাবের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ নেয়ায় নবাবের রাজকোষ শূণ্য হয়ে যায়। ইংরেজরা নবাবের নিকট থেকে এমন সুযোগ সুবিধা দাবী করেন যাতে নবাবের ক্ষমতা ও মর্যাদা উভয়ই ক্ষুন্ন হয়। মীর জাফর নবাবী হারান কারণ তিনি ইংরেজদের পাওনা পরিশোধ করতে পারেননি, ইংরেজদের লোভ এবং দাবীও নিত্য নতুন বৃদ্ধি পায়। মীর কাসিম তা বুঝতে পারেন, তিনি এও বুঝতে পারেন যে, ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাই তিনি তিনটি জিলা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেন। অতঃপর তিনি সৈন্যবাহিনী এবং রাজস্ব সংস্কারে মনযোগ দেন। মীর কাসিম প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুক সেটা ইংরেজদের মনপুত ছিল না। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য তৎপরতার অশুভ ফল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নবাব যখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করে দেন, তখনই ইংরেজরা মীর কাসিমকে পদচ্যুত করেন এবং মীর জাফরকে পুনরায় মসনদে বসায়। মীর কাসিমের পতনের প্রধান কারণ তিনি বাণিজ্যে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন।

যাই হোক মীর কাসিম মীর জাফরের মত অথর্ব ছিলেন না। তিনি বিনা যুদ্ধে তাঁর দাবী ছাড়েননি। কিন্তু তিনি পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। বর্ধমানের কাটোয়ায় (৯ জুলাই ১৭৬৩), মুর্শিদাবাদের গিরিয়ায় (২ আগস্ট ১৭৬৩) এবং রাজমহলের নিকটে উদয়নালায় (৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৭৬৩) এই যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়। তিনি প্রথমে মুঙ্গের যান, সেখানে জগৎশেঠ, রামনারায়ন, রাজা রাজ বল্লভ ও তাঁর পুত্ররা এবং অন্যান্য কয়েকজনকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন। অতঃপর তিনি পাটনায় যান, কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে অযোধ্যার নবাব শুজা উদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয় নেন। সম্রাট শাহ আলমও (দ্বিতীয় শাহ আলম) সেখানে ছিলেন। সম্রাট শুজা উদ্দৌলাকে উজীর নিযুক্ত করেন, তবে এই নিযুক্তি শুজা উদ্দৌলার মর্যাদাই বাড়ায়, কার্যত এর কোন মূল্য ছিল না কারণ সম্রাটের তখন কোন রাজ্য ছিল না। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মীর কাসিম অযোধ্যায় গিয়ে শুজার সাহায্য কামনা করলে শুজা রাজী হন। উভয়ে এই মর্মে চুক্তি করেন যে, শুজা উদ্দৌলার সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলার মসনদ লাভ করলে মীর কাসিম (১) শুজাকে বিহার ছেড়ে দেবেন, (২) প্রত্যেক মাসের যুদ্ধের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দেবেন এবং (৩) যুদ্ধ শেষে ৩ কোটি টাকা দেবেন। কিন্তু যুদ্ধে মীর কাসিম ও শুজার মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। মীর কাসিম শুজার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় যুদ্ধের আগেই পলায় করেন। কয়েক বৎসর অজ্ঞাতবাস করে মীর কাসিম ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর নিকেট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বক্সারের যুদ্ধ ও তার ফলাফল ঃ

মীর কাসিম এবং শুজার মিলিত বাহিনী বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় মিলিত হয়। মীর কাসিম পলায়ন করলে শুজা উদ্দৌলা বর্ষাকাল কাটানোর জন্য বক্সার দূর্গে অবস্থান করেন। ইংরেজেরা প্রথমে মেজর কর্নাককে সেখানে পাঠায়, কিন্তু কর্নাক সুবিধা করতে না পারায় মেজর হেকটর মানরোকে নিযুক্ত করে। মানরো সেপ্টেম্বর (১৭৬৪) সালে রোটাস দূর্গ জয় করে অক্টোবর মাসে বক্সারে পৌছেন, তার অধীনে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য ছিল। ২৩শে অক্টোবর ১৭৬৪ তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে, শুজা উদ্দৌলা সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

মীর কাসিম শুজা উদ্দীনের আশ্রয় নিয়ে শুজা উদ্দীনের সঙ্গে চুক্তি করে বক্সারের যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী করেন। মীর কাসিম যুদ্ধের আগে পলায়ন করলেও যুদ্ধের ফলাফল বাংলাকেও কিছুটা প্রভাবিত করে। তবে বক্সারের যুদ্ধে শুজা উদ্দৌলাই সমূহ

ক্ষতির সম্মুখীন হন। বক্সারের যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতের একমাত্র প্রতাপশালী শাসক অর্থাৎ শুজা উদ্দৌলার পতন হয়। শুজা উদ্দৌলা সাহায্যের জন্য রোহিলা এবং মারাঠাদের স্মরণাপন্ন হন, কোন দিক থেকে কোনরূপ সাহায্য না পেয়ে তিনি ইংরেজদের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করেন। তাঁর অধীনস্থ সুবা অযোধ্যা ও এলাহাবাদ ইংরেজ অধিকারে আসে। সম্রাট শাহ্ আলমও ইতিপূর্বে ইংরেজদের আশ্রিত হয়ে যান।

সামরিক বিচারে বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীতে মীর জাফর এবং নবাবের অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজরা জয়লাভ করে, কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে শুজা উদ্দৌলার কোন সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াই ইংরেজরা জয়লাভ করে। তদুপরি শুজা উদ্দৌলা নিজেও একজন নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, রাজনীতিতেও তিনি সুচতুর ছিলেন। অতএব বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের এবং যুদ্ধ কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বক্সারের যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়, তাদের প্রভাব ও শক্তি বাংলা থেকে অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মীর কাসিমের চরিত্র ঃ

মীর কাসিম একজন দক্ষ ও প্রজাবৎসল লোক ছিলেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার উদ্ভুত পরিস্থিতি অনুধাবন করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মসনদে বসলেও তিনি পলাশীর পূর্বের মর্যাদায় ফিরে যেতে পারবেন না। কারণ ইতোমধ্যে প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেছে। ইংরেজদের প্রাপ্য শোধ করতে গিয়ে কোষাগারও শূণ্য হয়ে পড়েছে। তাই মীর কাসিম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধি করে আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তিনি সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজরা অবৈধভাবে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করলে তিনি ন্যায়ের খাতিরে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। দেশী ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হওয়ায় তারা প্রতিযোগিতায় ইংরেজদের সঙ্গে টিকে থাকতে পারলনা। ইংরেজরা তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করলে নবাব সকলের জন্য শুল্ক রহিত করে দেন। এতেই ইংরেজরা ক্ষেপে যায় এবং মীর কাসিমকে পদচ্যুত করে। অতএব দেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই মীর কাসিমের পতন হয়।

মীর কাসিমের পতনের পরে ইংরেজ গবর্নর ভ্যানসিটার্ট তাঁর সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

"নবাব কোন দিন কোনভাবে আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করেননি, কিন্তু আমরা বরাবর তাঁর ক্ষতি করেছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য ও তুচ্ছ কারণে আমরা নবাবের শাসনে হস্তক্ষেপ করেছি। তাঁর কর্মচারীদের নিগৃহীত করেছি। নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে আমি (গবর্নর হিসেবে) তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারব। নবাব আমাদের নিকট প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেননি। .

এই যুদ্ধের জন্য যে আমরাই দায়ী এবং এলিসই যে পাটনা আক্রমণের জন্য দায়ী ইহাতে সন্দেহ নেই। নিরপেক্ষ ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে, এলিসের পাটনা আক্রমণ বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইহাতে প্রমাণ হয় যে আমাদের সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাসিমকে প্রতারিত করে তাঁর সর্বনাশ করার উপায় মাত্র।

আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে মীর কাসিম ব্যক্তিগতভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেননি, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা যেরূপ সাহস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দেন তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। পাটনায় যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়নের পূর্বে তাঁর কোন প্রজা, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রজারাও বিদ্রোহ করেনি বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। প্রজারা তাঁকে ভালবাসত, ইহাই তার প্রমাণ। মীর কাসিম নিষ্ঠুর ছিলেন না, মুঙ্গেরের হত্যাকাণ্ডের পূর্বে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেননি। তিনি তিন বৎসর অনেক সহ্য করেছেন, তা এবং তাঁর গুরুতর ভাগ্য বিপর্যায়ের কথা স্মরণ করলে মুঙ্গেরের নিষ্ঠুরতা গুরুতর মনে হয় না। একটি ধনী দেশের অধিপতি কপর্দকহীন ভিখারী অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে প্রাণের জন্য পলায়ন—এই আকস্মিক দূর্ঘটনায় মস্তিস্ক বিকৃতি ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের জমা অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রণোদিত হয়েই তিনি মুঙ্গেরের হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন—এই কথা মনে করলে আমরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারি।"

সমসাময়িক ইংরেজ গবর্নর বিনা কারণে মীর কাসিমের প্রশংসা করেননি, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, মীর কাসিম একজন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনও মীর কাসিমের প্রশংসা করেছেন নিম্নরূপে ঃ

"মীর কাসিম বাংলার সেনানায়ক ও সিপাহীদের বিশ্বাস করতেন না, এই কারণে তিনি অনেকের প্রাণদণ্ড দিতেন। কিন্তু দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারে অথবা পণ্ডিতদের মান মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁকে আদর্শ নরপতি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তিনি সপ্তাহে দুই দিন বিচারকের আসনে বসতেন এবং নিম্নপদস্থ বিচারকদের বিচারকার্য পর্যালোচনা করতেন। তিনি নিজে বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীদের বক্তব্য শুনতেন এবং সেই হিসেবে বিচার করতেন। তাঁর সময়ে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করে সত্যকে মিথ্যা করতে পারতেন না। তিনি জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে দূর্বল প্রজাদের রক্ষা করতেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

মোগল আমলে শাসন ব্যবস্থা ঃ সমাজ ও অর্থনীতি

মোগল আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। সম্রাট আকবর সারা মোগল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করেন। সুবা বিভক্তির সময় তিনি ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সীমা ও ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখেন। সেই হিসেবে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা অঞ্চল সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত সুবা বাংলা আকবরের নির্ধারিত অবস্থানেই ছিল। মোগল বিজয়ের সময় বাংলার রাজধানী ছিল তাঁড়ায়, পরে আকবরের রাজত্ব কালেই রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়, রাজমহলের নাম আকবরনগর রাখা হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খান চিশতী ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। শাহ্ শুজা রাজমহলে অবস্থান করতেন কিন্তু পরবর্তী সুবাদারেরা আবার ঢাকায় থাকেন। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়, মীর কাসিম স্বীয় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মুঙ্গেরে অবস্থান করেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে কলিকাতা প্রাধান্য লাভ করে এবং কিছুদিন পরে ইংরেজেরা মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।

সম্রাট আকবর প্রাদেশিক শাসনের রূপরেখাও স্থির করে দেন। পরবর্তী সম্রাটদের সময়ে সামান্য কিছু রদবদল হলেও আকবরের শাসন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত চালু ছিল। সুবার প্রধান ছিলেন সুবাদার (বা গবর্নর), আকবরের সময়ে তিনি সিপাহসালার, পরে সুবাদার ও নাজিম এবং আওরঙ্গজেবের সময় থেকে শুধু নাজিম রূপে পরিচিত হতেন। সুবাদার সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, ফৌজদারী বিচার এবং সুবার সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন। সুবাদারের নীচে ছিলেন দীওয়ান, তিনি রাজস্ব প্রশাসন এবং দিওয়ানী বিচার করতেন। মর্যাদায় সুবাদারের নীচে হলেও দীওয়ান সুবাদারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। দীওয়ান কেন্দ্রীয় সরকারের দীওয়ানের নিকট জবাবদিহি করতেন। প্রকৃতপক্ষে সুবাদার এবং দীওয়ান এই দুই কর্মকর্তাই ছিল প্রাদেশিক শাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। এঁদের নীচে বখশী সৈন্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির ব্যাপারে সুবাদার দায়ী ছিলেন, সেই হিসেবে তিনি ছিলেন সৈন্য বিভাগের কর্তা, কিন্তু সৈন্যদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও বেতন প্রদানের দায়িত্ব ছিল বখশীর। তা ছাড়া একজন সদর ছিলেন ধর্মীয় বিভাগ, বিশেষ করে অনুদান ও পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের বিভাগের প্রধান, কাজী ছিলেন বিচারক, কোতওয়াল ছিলেন পুলিশ প্রধান এবং নগরের শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত। বাংলা সুবা নদী মাতৃক হওয়ায় এখানে নৌ বাহিনী গঠন করা হয় এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মীর বহর (নৌ অধ্যক্ষ)। প্রত্যেক সুবায় ওয়াকিয়ানবিস নিযুক্ত হতেন, তাঁর দায়িত্ব ছিল প্রদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করা। ওয়াকিয়ানবিস বা সংবাদ প্রতিবেদক প্রাদেশিক সুবাদার বা অন্য কোন কর্মকর্তার অধীনে ছিলেন না, তিনি সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ সরবরাহ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।[1]

শাসন কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশকে সরকার এবং প্রত্যেক সরকারকে পরগণা বা মহালে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সরকার-এ সাধারণ প্রশাসনের জন্য ফৌজদার এবং রাজস্ব প্রশাসনের জন্য আমিল বা আমলগুজার নামক কর্মকর্তা নিযুক্ত হত। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পরগণা বা মহালে সাধারণ প্রশাসনে সিকদার এবং রাজস্ব প্রশাসনে আমিন দায়িত্ব পালন করত। রাজস্ব বিভাগে কানুনগো এবং পাটওয়ারী নামে কর্মকর্তাও ছিল। কানুনগোর অর্থ আইনের ব্যাখ্যাকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর দায়িত্ব ছিল ভূমি ও রাজস্বের তালিকা রক্ষা করা এবং পাটোয়ারীরা ছিল লেখক বা বর্তমান কালের কেরানী। অতএব মোগল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক এবং রাজস্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু এক বিভাগের উপর অন্য বিভাগের কর্তৃত্ব যেমন ছিল না, উভয় বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি রক্ষারও বিধান ছিল। সুবাদার এবং দীওয়ানের মধ্যে বিবাদের প্রমাণও পাওয়া যায়, কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত মোগল সম্রাটেরা শক্তিশালী ছিল, ততদিন পর্যন্ত এইরূপ বিবাদ বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত না। সম্রাট দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেন।

সুবা বাংলা ১৯টি সরকার এবং ৬৮২ টি পরগণা বা মহাল-এ বিভক্ত ছিল। ভূমিরাজস্ব ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। রাজা তোডরমল্ল সর্বপ্রথম আকবরের সময়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তখন রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার উপরে। কিন্তু আকবরের সময় সারা বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মনে হয় তিনি পূর্ববর্তী সরকার সমূহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সারা বাংলা জয় হয়। তার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা হয়। শাহ শুজার সময়ে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করে রাজস্ব ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে বাংলার বাইরে কিছু এলাকা বিশেষ করে কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরে মুর্শিদকুলী খান আবার রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করেন, এবং ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মত রাজস্ব নির্ধারিত হয়। এর পরে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সংস্কার করা হয়নি, তবে প্রত্যেক সুবাদার বা নাজিম রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সেচ বা আবওয়াব বা উপকর আরোপ করেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়া আয়ের অন্যান্য উৎসও ছিল। এইগুলোকে একসঙ্গে সায়ের বলা হত, এইরূপ রাজস্বের মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক প্রধান। বাণিজ্য শুল্ক বিভিন্ন বন্দরে আদায় করা হত, ঢাকার বন্দরকে শাহ বন্দর, মুর্শিদাবাদের বন্দরকে পাচোত্রা বন্দর এবং হুগলী বন্দরকে বখশ বন্দর বলা হত।

মুসলমান আমলের প্রথম থেকে বাংলা একটি বিদ্রোহী প্রদেশ রূপে পরিচিত ছিল, কারণ বাংলাদেশ প্রায়ই এবং সুযোগ পেলেই দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। দিল্লীর সুলতানেরা বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে বাংলাদেশকে কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। মোগল সম্রাটেরাও এর সমাধান করেন, কোন সুবাদার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোগলরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবরাজ, নিকট আত্মীয় এবং অতি বিশ্বস্ত উচ্চ পদস্থ

আমীরকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করতেন। তিনজন মোগল যুবরাজ, শুজা, আজম শাহ এবং আজিম উদ্দীন (আজীম-উশ-শান) সুবাদার নিযুক্ত হন। আত্মীয়দের মধ্যে কাসিম খান জুয়ুনী, আজম খান, শায়েস্তা খান, খান জাহান, ইবরাহীম খান ফতেহ জঙ্গের নাম বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য। আকবরের সময়ে আজম খান কোকা ছিলেন সম্রাটের দুধ ভাই, রাজা মান সিংহ ছিলেন সম্রাটের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়, আকবর তাঁকে ফরজন্দ (ছেলে) উপাধি দেন। তবে এখানে ফতেহপুর সিক্রির শয়খ সলীম চিশতীর পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কথিত আছে যে, সলীম চিশতীর আশীর্বাদে আকবরের পুত্র সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) জন্ম হয়। আকবর সলীম চিশতীয় সম্মানার্থে ফতেহপুর সিক্রিতে একটি দূর্গ শহর নির্মাণ করেন। আকবর এবং সলীম চিশতীর পরিবারের মধ্যে অকৃত্রিম সখ্যতা গড়ে ওঠে, জন্মের পরে জাহাঙ্গীর সলীম চিশতীর পরিবারের মহিলাদের দুধ পান করেন। আকবরের সময়েই সলীম চিশতীর পুত্ররা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরিতে নিয়োগ লাভ করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর দুধ ভাই এই পরিবারের কুতব-উদ-দীন কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। পরে ঐ একই পরিবারের ইসলাম খান চিশতী, কাসিম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই পরিবারের আরো অনেকেই সুবা বাংলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক পদে কর্মরত ছিলেন। এই নীতির ফলে বাংলা শাসনে মোগল সম্রাটদের কোন বেগ পেতে হয়নি।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে নবাবী আমলে শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত বিশেষ পরিবর্তন না হলেও গুণগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের একটা প্রধান কারণ উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান উভয়ে তাঁদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শাহজাহান, আওরঙ্গজেব এবং শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু পরে তাঁদের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, ঘরে ঘরে যুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, মোগলদের বিরুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধ। ফলে প্রত্যেক যুদ্ধেই সাম্রাজ্য কম বেশি দূর্বল হয়, অনেক সেনাপতি ও সৈন্য হতাহত হয়। শেষে এমন অবস্থা হয় যে বনেদী, অভিজাত, কর্মঠ, অভিজ্ঞ এবং সাহসী নির্ভীক সেনাপতি, উজীর, দীওয়ানের পদ পূরণ করার মত কর্মকর্তাদের অভাব দেখা দেয়। কেন্দ্রের এই দূর্বলতার প্রভাব প্রদেশেও পড়ে এবং বলতে গেলে প্রশাসনিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মোগল রাজপুত্ররা যাঁরা সিংহাসনে বসেন বা যাঁদের সিংহাসনে বসান হয় তাঁরাও এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের অযোগ্য ছিল। সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু (১৭১২) পর্যন্ত কোন রকমে শাসন ব্যবস্থা টিকে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার যুদ্ধগুলো সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোর ভীত নেড়ে দেয়। বাংলার ভাগ্য ভাল যে মুর্শিদকুলী খানের মত একজন অফিসার এখানে ছিলেন, তিনি তখনো সুবাদার না হলেও কোনমতে বাংলা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান (জাফর খান) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলে বাংলার নবাবী আমল শুরু হয়।

নবাবী আমলে বাংলা মোটামুটিভাবে স্বাধীন ছিল। মুর্শিদকুলী ও তাঁর পরবর্তী নবাবেরা নামে মাত্র মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁরা রাজস্ব আদায় করে সম্রাটের রাজস্ব তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু শাসন ব্যাপারে সম্রাটের কোন হাত ছিল না। নবাবদের সুপারিশ অনুযায়ী সম্রাট উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দিতেন। অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ দিতেন নবাবেরা। সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি ছিল শুধু অর্থপ্রাপ্তির দিকে। প্রত্যেক নতুন নবাব নিযুক্তির সময় সম্রাটেরা নজরানা লাভ করতেন। নবাবী আমলের আর একটি বৈশিষ্ট হল একই লোক বিভিন্ন পদে নিয়োগ লাভ করতেন, অর্থাৎ একই লোক নাজিম, দীওয়ান, ফৌজদার ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হতেন। ফলে নাজিম বা নবাবেরা তাঁদের প্রতিনিধি মারফৎ অন্যান্য পদের কর্তব্য সম্পাদন করতেন। ইহাতে প্রশাসন আরো দূর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে বিহার এবং উড়িষ্যাও বাংলার নবাবের অধীনে ছিল। বাংলার নবাব বিহার ও উড়িষ্যায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন, প্রতিনিধিদের বলা হত নায়েব নাজিম। ঢাকায়ও একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করা হত। প্রকৃতপক্ষে নবাবের নিজের লোক বা আত্মীয়স্বজন এই সকল পদ অধিকার করতেন। মুর্শিদকুলী খানের সময় উড়িষ্যার নায়েব নাজিম, কটকের ফৌজদার, ঢাকার নায়েব নাজিম, বাংলার দীওয়ান সকলেই তাঁর আত্মীয় ছিলেন। মুর্শিদকুলী খান নিজেই বিহারের দীওয়ান ছিলেন এবং প্রতিনিধি মারফৎ দীওয়ানের কার্য নির্বাহ করতেন। তাছাড়া মুর্শিদকুলী নিজেই একই সঙ্গে কয়েকটি জিলার ফৌজদার ছিলেন। আলীবর্দী খান তাঁর তিন জামাতা ও ভাই হাজী আহমদসহ সারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা শাসন করতেন। নবাবী আমলে অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাজধানীতেই বসবাস করতেন এবং প্রতিনিধি মারফৎ তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতেন। অতএব নবাবী আমলে প্রশাসনে দুইটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, নবাব সকল ক্ষমতা নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করেন। ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি শান্ত দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। এইরূপ অবস্থায় প্রতিভার বিকাশ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারীরা রাজধানীতে থেকে অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তারা প্রশাসনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাসঘাতকরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলেই দৃঢ় প্রত্যয়ী আলীবর্দী খান সরফরাজ খানকে হত্যা করে মসনদ দখল করতে পারেন এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও অন্যান্য কুচক্রীদের সহায়তায় ইংরেজরাও সিরাজকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

নবাবী আমলে আর একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের আগে সুবাদার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে দিল্লী থেকে আসত এবং তাঁদের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তাঁরা নিজ নিজ দেশে চলে যেতেন। কিন্তু নবাবী আমলে সুবাদারেরা বাংলাদেশে থেকে যান এবং বাংলাদেশেই মৃত্যু বরণ করেন। অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বেলায়ও তাই। দিল্লীর ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় বাংলার হিন্দু অধিবাসীরাও সরকারি পদে নির্যুক্তি পেতেন, অবশ্য হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিখে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে উচ্চপদের যোগ্য হয়ে উঠতেন। মুর্শিদকুলী খানের অধীনে ১৬ জন খুব বড় জমিদার ছিলেন। তাঁরা ৬১৫টি পরগণার রাজস্ব আদায় করতেন। ছোট ছোট

জমিদার ও তালুকদারেরা আরো ১৬০০ পরগণার রাজস্ব আদায় করতেন। ছোট জমিদারদের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। হিন্দুরা দীওয়ান এবং নায়েব নাজিমের পদও লাভ করেন। বর্তমানে দস্তিদার, সরকার, বখশী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার উপাধিধারী হিন্দুদের পূর্বপুরুষ নবাবী আমলেই ঐ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায়। আলীবর্দী তাঁর মনিবের ছেলেকে হত্যা করে মসনদে বসেন। তাই মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর বংশের আত্মীয়স্বজন হিতাকাঙ্ক্ষীরা আলীবর্দীকে সুনজরে দেখতেন না। আলীবর্দী হিন্দুদের উচ্চপদ দিয়ে তাদের হাত করার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে জানকীরাম, দূর্লভরাম, রামনারায়ণ, দর্প নারায়ণ, কিরীট চাঁদ, উমিদ রায়, বিরুদত্ত, রামরামসিংহ এবং গোকুলচাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়, অবশ্য এঁরাও খুব যোগ্য ছিলেন। সামরিক বিভাগেও অনেক হিন্দু উচ্চপদ লাভ করেন এবং এঁরা মারাঠা ও আফগানদের সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তবুও হিন্দু জমিদার বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মুসলমান নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তারা সর্বাদা নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখতেন। জগৎশেঠ, আলমচাঁদ সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে আলীবর্দী ও হাজী আহমদের সঙ্গে যোগ দেন। আবার আলীবর্দীর সময়ের হিন্দু কর্মকর্তা এবং জমিদারেরা মীর জাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজ উদ্দৌলার পতন ঘটান।

সামাজিক জীবন ঃ

মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী আমলে বাংলার সুলতানেরা প্রায় সকলেই বহিরাগত হলেও তারা এদেশেই বসতি গড়ে তোলে এদেশেই থেকে যায়। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করেনি। দেশের সম্পদও দেশেই থেকে যায়। কিন্তু মোগল আমলে দেশের সংগৃহীত রাজস্ব দিল্লীতে চলে যায়, মোগল সম্রাট ত নয়ই, মোগল সুবাদার এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা কেউ এখানে স্থায়ী কিছু করেনি। সুলতানী আমলে বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পের যত নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই তুলনায় মোগল আমলে অনেক কম ইমারত দেখা যায়। স্বাধীন সুলতানদের সময় দিল্লী বা অন্যান্য মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ছিল সীমিত, কিন্তু মোগল আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। মোগল অফিসার এবং সেনাপতিরা রাজধানীর সঙ্গে এই যোগাযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু উত্তর ভারত নয়, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বিদেশী ভাবধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

মোগল সম্রাটেরা বিদ্বান, উদার এবং উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রজাবৎসলও ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সুবাদার, দীওয়ান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও বিদ্বান এবং উদার ছিলেন এবং তাঁরা সুশাসকও ছিলেন। মোগল

সমাজের আদব-কায়দা, রীতি, রুচি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সুবাদার ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বাংলার সমাজে ও এই আদব কায়দা এবং রীতিনীতি প্রবেশ করে। সুবাদারেরা কেউ কেউ নিজে পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনী এবং শায়েস্তা খানের নাম কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ। সুবাদারেরা গ্রন্থাগারে মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণ করতেন এবং কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠ-পোষণ করতেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে অনেক ফার্সী কবির সমাবেশ হয়। মোগল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই কবিতা লিখতেন। সৈন্য এবং সেনা- ধক্ষ্যের মধ্যে কবিত্ব প্রতিভার লোক থাকতেন, এই জন্য দেখা যায় প্রত্যেক যুদ্ধের পরে সৈন্য সেনাপতিদের বীরত্ব গাঁথা রচনা করতেন, এই বিজয় বা বীরত্ব গাঁথাকে জঙ্গনামা বলা হত।

মোগল আমলের আর একটি বৈশিষ্ট হল এই সময়ে ইরানীরা অধিক সংখ্যায় বাংলায় আসেন এবং এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল শিয়া। শাহ্ শুজার সময়ে শিয়াদের আগমন বৃদ্ধি পায়, এবং এঁরা রাজমহল ও ঢাকার সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রাজ সরকারে চাকুরি করা ছাড়াও তাঁরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত থাকত। শাহ্ শুজার শিক্ষকও ছিলেন একজন শিয়া, তাঁরা অনেক বইপুস্তকও রচনা করেন! নবাবী আমলে শিয়াদের আগমন আরো বৃদ্ধি পায়, কারণ নবাব মুর্শিদকুলী খান, এবং পরবর্তী কালে অন্যান্যরা শিয়া ছিলেন। মোগল আমলে ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। নবাবী আমলে এই শহরগুলোতে অনেক মাদ্রাসা, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সূফী সাধকের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও অধিক সংখ্যায় দিল্লী, ইরান এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে বাংলায় তাঁদের চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। সুলতানী আমলে বাংলাদেশে লিখিত কোন সমসাময়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু মোগল আমলে অনেকেই ইতিহাস লেখেন। মিরজা নাথন বাহরিস্তান-ই-গায়বী নামকে ইতিহাস গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের আমলে মোগলদের বাংলা বিজয়ের কাহিনী লেখেন। শিহাব-উদ-দীন তালিশ তার ফতীয়া-ই-ইবরীয়া গ্রন্থে মীর জুমলার আসাম বিজয় এবং শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় সম্পর্কে লেখেন। তাঁরা উভয়ে শুধু সমসাময়িক নন, প্রত্যক্ষদর্শীও। মুহাম্মদ মাসুম তারিখ-ই-শাহ্ শুজায়ীতে শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের বিবরণ দেন। বিশেষ করে তিনি আওরঙ্গজেবের নিকট শাহ্ শুজার পরাজয়ের বিবরণ দেন। তিনি কোন কোন যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তবে শাহ্ শুজার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হওয়ায় তিনি উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। মুহাম্মদ সাদিক নামক একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি তার সুবহ-ই-সাদিক গ্রন্থে বাংলা এবং মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের অনেক কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যাক্তির বিবরণ দেন, তাতে দেখা যায় বাংলায় তখন অনেক বিদ্বান, পণ্ডিত ও কবি শিক্ষা ও কাব্য চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। নবাবী আমলেও কাব্য চর্চা হত। শুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের জামাতা মিরজা লুতফুল্লাহ (মুর্শিদকুলী খান ২য়, রুস্তমজঙ্গ) একজন উঁচু দরের কবি ছিলেন। কবি হিসেবে তাঁর

ছদ্ম নাম ছিল মখমূর। নবাব সরফরাজ খানের জামাতা ইউসুফ আলী খান একজন ঐতিহাসিক ছিলেন, তিনি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আহওয়াল-ই-মহাবতজঙ্গী নামে ইতিহাস লেখেন। নবাবী আমলের মুনশী বা সেক্রেটারীরা বিদ্বান ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ ইংরেজ আমলে ইতিহাস রচনা করেন। অতএব মোগল আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় খুব উন্নত ছিল।

ফারসি ভাষা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তা সরকারি ভাষা হওয়ায় বাংলার হিন্দুরাও এই ভাষা শিখে রাজপদের যোগ্যতা অর্জন করত। ফারসি ভাষা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। অনেক ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক, হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে বাংলা কাব্য রচিত হত। ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে মানব-মানবীর প্রেমকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্য রচিত হওয়া শুরু করে। অতএব ফারসি সাহিত্যের শব্দ, বিষয়বস্তু এবং ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়। হিন্দু বাঙ্গালি কবিরা তা গ্রহণ করে, মুসলিম কবিরাও ষোল শতক থেকে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা শুরু করে। দৌলত কাজী, এবং আলাওল প্রমুখ কবিরা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। শেষোক্ত দুই জন কবি আরাকানে বসে কাব্য রচনা করেন। ফারসি সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সূফী সাহিত্য ও গজল সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়। মোগল আমলে বাংলায় ফকিরী, দরবেশী, বাউল প্রভৃতি মরমীবাদের উৎপত্তি হয়, মরমীবাদ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রিয় হয়ে ওঠে। বাউল গান বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শিয়াদের আগমনের ফলে মর্সিয়া গানও প্রসার লাভ করে।

মোগল আমলে এবং বিশেষ করে নবাবী আমলে নানাভাবে মুসলমান সমাজের প্রসার ঘটে। সুলতানী আমলে মুসলমান সমাজে আরব, তুর্কী, আফগান ইত্যাদি বহিরাগতদের প্রাধান্য ছিল। ইরানীরাও তখন বাংলাদেশে আসে কিন্তু তখনো তারা অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হয় শাসক হিসাবে, না হয় শিক্ষক হিসেবে তারা সমাজের উচ্চস্তরের লোক ছিল। সমাজের এই উচ্চস্তর সাধারণ ভাবে শয়খ, সৈয়দ, পাঠান, এবং মোগল নামে পরিচিত হত। সুলতানী আমলে স্থানীয় লোকেরা যে ধর্মান্তরিত হয়নি তা নয়, তবে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু মোগল আমলে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনেক নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কেউ কেউ ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করে, কেউ কেউ সরকারি চাকুরি লাভ এবং শাসক গুষ্ঠির অনুগ্রহ লাভের আশায়, আবার কেউ কেউ ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করত। ফকির দরবেশদের প্রাধান্য সুলতানী আমলেও ছিল, কিন্তু মোগল আমলে ফকির দরবেশরা গ্রামে গঞ্জে, এবং প্রত্যন্ত এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের প্রভাবে মুসলমান সমাজের প্রসার হয়। প্রধানত সূফী, পীর দরবেশদের চেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব এবং সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়। ইসলাম প্রচার একটি অতীব পূণ্যকাজ, তাই পুণ্যাত্মা সূফী দরবেশগণ এই কাজে বিশেষ তৎপর ছিলেন। সূফী দরবেশরা প্রায়ই অত্যন্ত সাধু সজ্জন ও মুসলিম শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি হতেন। তাঁদের

জীবন যাত্রাও অত্যন্ত সরল ছিল এবং শরিয়তের বিধানের বাহিরে তারা কোন কাজ করত না। তারা এমন পবিত্র চরিত্রের লোক হত যে তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, উপদেশ, শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে মুগ্ধ অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ইসলামের মূল স্তম্ভগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। মুসলমান বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজ নির্মাণ করা হত এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্থানে স্থানে অনেক মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং সূফী সাধকদের জন্য খানকা নির্মাণ করা হত, অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্ম পালনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শুধু শহরেই নয়, গ্রামে গঞ্জেও মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খানকা প্রতিষ্ঠা করা হয় সূফী সাধকদের আস্তানায়। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে একটি আদর্শ মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপ ঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শিরণী বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালিমাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি॥
আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।

এটা একটি অতি ধর্মপরায়ণ লোকদের চিত্র, এঁরা নিয়মিত নামাজ পড়েন, তসবিহ জপেন (অর্থাৎ দেয়া দরুদ পড়েন) পীরের মাযারে সেবা করেন, সর্বদা কিতাব ও কোরান পাঠ করেন, পীরের শিরনী বাঁটেন, বিচার করেন, তাঁরা অত্যন্ত দানিশবন্দ (দানিশমন্দ) বা পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তি, রোজা রাখেন, মাথা মুড়িয়ে ফেলেন কিন্তু দাড়ি লম্বা রাখেন, তাঁরা ইজার (পায়জামা) এবং টুপি পরেন। মুসলমানদের মধ্যে কেউ খালি মাথায় থাকা তাঁরা পছন্দ করতেন না।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক বারবোসা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের নিম্নরূপ চিত্র তুলে ধরেন :

"মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা জোববা পরে, এর তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ থেকে রৌপ্য খচিত তবরারি ঝোলান থাকে। হাতে মণি মাণিক্য খচিত একাধিক আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি। তারা খুব বিলাসী, মেয়ে-পুরুষ উভয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য পানে অভ্যস্ত। প্রত্যেকের ৩/৪ বা ততোধিক স্ত্রী, তাদের পরণে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার কিন্তু সকলেই পর্দা করে থাকে। নৃত্যগীত তাদের প্রিয় এবং তাদের অনেক দাস-দাসী। সকলেই জুতা ব্যবহার করে এবং জুতায় রেশম সুতার কাজ।" কবি কঙ্কণ চণ্ডীর বর্ণনায় ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিবরণ, কিন্তু বারবোসার বর্ণনায় মুসলমান ধনী ব্যক্তিদের চিত্র পাওয়া যায়।

অনেক স্থানীয় লোক হিন্দু বা বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। তারা সকলেই যে আরবী ভাষা বুঝত এমন ব যায় না। ফারসি কিছু জানলেও তাদের হয়ত ধর্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানও ছিল না। বাঙ্গালি মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতান লিখেছেন যে বাঙ্গালি মুসলমানেরা আরবী বোঝে না, তাই তারা হিন্দুদের পাঁচালি বা রামায়ণ মহাভারত কাব্য শুনে মন জুড়ায়। তাছাড়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের কোন কোন বিশ্বাস বা পুরনো সংস্কার তারা ছাড়তে পারেনি। তাই পাঁচপীর, সত্য পীর, মানিকপীর, ঘোড়া পীর, কুম্ভীর পীর ইত্যাদি ধারণা মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এইরূপ পীরদের কৃপায় বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করতে পারে, বা রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে এইরূপ ধারণাও সাধারণ মুসলমান সমাজে স্থান পায়। ধর্মান্তরিত সকল মুসলমান যে উচ্চপদ লাভ করতে পারত তা নয়, তাই দেখা যায় তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পেশায় নিয়োজিত থাকত। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে পেশাজীবিদের উল্লেখ করা হয়েছে এইরূপে ঃ গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবারি, সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী, দরজি, বেনটা, রংরেজ, হালান ও কসাই ইত্যাদি। গোলা বোধ হয় গোয়ালা, জোলা মোটা বস্ত্র বয়নকারী, মুকেরি অর্থ যে বলদের পিঠে করে জিনিষ বিক্রি করে, পিঠারি যে পিঠা বিক্রি করে, কাবাড়ি অর্থ মাছ বিক্রেতা, সানাকার অর্থ তাঁতি, হাজাম অর্থ যে বালকদের খৎনা করে, তীরকর অর্থ তীর ধনুক প্রস্তুতকারী, কাগজী যে কাগজ তৈরী করে, দরজি বা কাপড় সেলাইকারী, বেনটা অর্থ যে বয়ন করে, রংরেজ যে রং লাগায়, হালান (অর্থ বোঝা যায় না) এবং কসাই যে কসাই এর কাজ করে ইত্যাদি।

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতির প্রাধান্য ছিল। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন সমাজের নিয়ন্ত্রক, এঁরা আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের শ্রেণী বিভাগ, কৌলিন্য প্রথা এবং কুলীনদের বাসস্থানের নামানুসারে গাঁঞীর সৃষ্টি, কবিকঙ্কণ চণ্ডিতে ৪০টি গাঁঞীর নাম পাওয়া যায়। কয়েকটি যেমন, চাটুতি, মুখটি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলি, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালধি মাসচটক। ইহার অনেকগুলো এখনো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণদের উপাধিরূপে ববহৃত হয়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্ত্বিক ও বিদ্বান, বিভিন্ন শাস্ত্রে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে মূর্খও যে ছিলনা তা নয়। গ্রহ-বিপ্র বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শিশুর কোষ্ঠি তৈরী করত এবং গ্রহদোষ কাটাবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করত। বৈদ্য জাতির মধ্যে বর্তমানের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর ইত্যাদি উপাধি ছিল। বৈদ্যরা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, চিকিৎসা তাদের প্রধান বৃত্তি হলেও অন্যান্য শাস্ত্রেও তাদের পারদর্শিতা ছিল। কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বসু এবং মিত্র উপাধিধারীরা ছিল প্রধান। তাছাড়া ছিল পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা বিন্দ ইত্যাদি উপাধিধারী।

হিন্দুরা বরাবর শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর ছিল, এবং এই সময়ে হিন্দুদের সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপে। নবদ্বীপ নব্যন্যায় ও স্মৃতি চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। মহারাজা নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। তাঁর সভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। টোল ছিল প্রাথমিক এবং চতুষ্পঠি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ছিল। মহিলাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, পরিবারে মহিলারাই ছিল কর্ত্রী, তবে ঐ সময়ে হিন্দু সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। সতিদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কোন কোন স্ত্রী লোক স্বেচ্ছায় সতী হতেন, আবার কোন কোন সময় অনিচ্ছুক স্ত্রী লোককে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি প্রচলিত ছিল এবং সমাজপতিরা তা কড়াকড়িভাবে আরোপ করতেন।

মোগল যুগে হিন্দু সমাজে পরিবর্তন দেখা দেয়। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের প্রতিবাদে বৈষ্ণম ধর্ম হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করে। তাছাড়া লৌকিক দেবতার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং মনসা, চণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি ধর্মমতের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। চৈতন্যদেবের জীবনী এবং বৈষ্ণম ধর্ম সম্পর্কে এক বিশাল সাহিত্য গড়ে ওঠে। অনেক কবি এই বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে কাব্য সাহিত্য গড়ে ওঠে, এগুলো মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিতি হয়। যেমন মনসা মঙ্গল, চাণ্ডী মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল কাব্য ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গে গ্রামাঞ্চলে অনেক গীতিকা বা কাহিনী, বর্ণনা, গাথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এইগুলি সংখ্যায় অনেক, কিন্তু কিছু কিছু ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকার ভাষা অমার্জিত এবং পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা, কিন্তু এইগুলোতে বেশ কাব্য সৌন্দর্য ফুঠে ওঠেছে। গীতিকাগুলো ধর্মাশ্রিত নয় বরং মানব-মানবীর প্রেমের আলেখ্য। অধিকাংশ প্রণয় উপাখ্যানে নায়ক নায়িকারা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ভুক্ত। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে এগুলোতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষের নানা অনুভূতি, ভাব, রূপ, মোহ, অন্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জ্বালা এবং বিদায়ের হাহাকার ইত্যাদি

গ্রাম্য কবিদের হাতে এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে তাদের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। গীতিকাসমূহে জীবন সম্বন্ধে কবিদের গভীর ও বিশাল অভিজ্ঞতার প্রমাণও পাওয়া যায়। কিছু কিছু গীতিকা ঐতিহাসিক কাহিনী নির্ভর, যেমন 'দেওয়ান ইছা খাঁর পালা' কিন্তু ইহাতে সত্য ও কল্পনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে সত্য বের করে নেয়া একপ্রকার অসম্ভব। গীতি কবিতা ছাড়াও পুঁথির আকারেও কিছু গ্রাম্য কাহিনী প্রচলিত হয়, যেমন 'ভেলুয়া সুন্দরী' ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের দুইজন বিখ্যাত হিন্দু কবি ভারত চন্দ্র এবং রামপ্রসাদ সেন। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, মহারাজা তাঁকে রায়গুণাকর উপাধি দেন। 'অন্নদামঙ্গল' ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য। রামপ্রসাদ সেন আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কবির দেবী বিষয়ক গানগুলো 'শাক্ত-পদাবলী' নামে পরিচিত। তিনি 'বিদ্যা সুন্দর' কাব্যও রচনা করেন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রথম যখন বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হয়, তখন সাহিত্য সৃষ্টি হয় কবিতায় বা কাব্যে। তখন বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হয়নি। তাই মধ্যযুগের সকল পুস্তক কাব্যে রচিত হয়। কিন্তু মোগল আমলের শেষ দিকে অষ্টাদশ শতক থেকে বিশেষ করে নবাবী আমলে ধীরে ধীরে গদ্যের বিকাশ শুরু হয়। বাংলা গদ্যের পূর্ণতা আসে শ্রীরামপুর কলেজের মিশনারীদের চেষ্টায়, কিন্তু তার আগেও কিছু কিছু গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে পর্তুগীজ মিশনারীগণ স্থানীয় অর্থাৎ বাংলা ভাষা শিখতেন এবং পুস্তিকা লিখিয়া যীশু খৃষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলা ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বাংলা গদ্যে দুইখানি পুস্তক লেখেন, কিন্তু এই পুস্তকদ্বয় এখন পাওয়া যায়না। তবে পর্তুগীজদের লিখিত এবং বর্তমানে পাওয়া যায় এমন বই এর সর্বপ্রাচীনটি হল 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে তা রচিত হয়, ভূষণার একজন খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত বাঙ্গালি হিন্দু এই পুস্তক রচনা করেন। খৃষ্ট ধর্মে তাঁর নাম হয় ডোম এন্টনিও। এই গ্রন্থে একজন ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানের মধ্যে কথাবার্তার মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্মের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এর কিছু নমুনা নিম্নরূপ ঃ

"রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ তাহান ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোন বাসী হইয়াছিলেন তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া নিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন।"

আর একখানি গ্রন্থ 'কৃপায় শাস্ত্রের অর্থভেদ'। ম্যানুয়েল দ্য এসম্পস নামে একজন পর্তুগীজ পাদ্রী ঢাকার অদূরে ভাওয়ালে বসে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে তা লেখেন। নমুনা নিম্নরূপ ঃ

"লুসিয়া এত দুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ চাহিল, কহিল ঃ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল : মুনিষ্যের অলক্ষ্য আছি আমি; তথা আশা রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেউ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাসী ; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা। তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমের যদি উপায় দিলা, আমাকেও উপায় দিবা। তা নিবেদন করিল।"

উক্ত দুইখানি বই রোমান হরফে লেখা, এই দুই বই-এর ভাষা বিচার করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার গদ্য রীতি তখন সাহিত্যের উপযোগী হয়ে ওঠেছে।

মোগল সম্রাটেরা দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি শহরে বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সুলতানী আমলের তুলনায় মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প আকারে, গঠন প্রণালীতে এবং নির্মাণ সামগ্রীতে অনেক উন্নতি লাভ করে। দিল্লী আগ্রার বিখ্যাত ইমারতসমূহ তাজমহল, লালকেল্লা, জামে মসজিদ ইত্যাদি মোগলদের সৃষ্টি। বাংলার মোগল শাসকেরাও দিল্লী আগ্রার অনুকরণে বিরাট ইমারতাদি নির্মাণে উদ্যোগ নেন। উত্তর ভারতে লাল বেলে পাথর, মার্বল পাথর ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী যেমন প্রচুর পাওয়া যেত, বাংলাদেশে পাওয়া যেত না, ঐগুলো বাংলায় আমদানী করাও সহজ ছিল না। তাই বাংলায় নির্মিত ইমারতগুলো উত্তর ভারতের ইমারতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তবে বাংলার শাসকরা উত্তর ভারতের নির্মাণ শৈলী অনুকরণের চেষ্টা করেন।

ঢাকা, রাজমহল এবং মুর্শিদাবাদ তিনটি রাজধানী শহরেই মোগল স্থাপত্য রীতির ইমারতাদি পাওয়া যায়। শাহ শুজা ঢাকায় বড় কাটরা নির্মাণ করেন, এই ইমারত মোগল স্থাপত্য রীতিতে বিশাল আকারে নির্মাণ করা হয়। তা মূলত শুজার বাসভবন রূপে নির্মিত হলেও পরে এটাকে কাটরায় পরিণত করা হয়। কাটরা অর্থ অতিথি ভবন, ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য অতিথিরা এখানে সাময়িকভাবে অবস্থানের সুযোগ পেত। কাটরা দালান মোগল আমলের বৈশিষ্ট্য, সুলতানী আমলে কাটরার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঢাকায় দ্বিতীয় কাটরা দালান নির্মাণ করেন শায়েস্তা খান, শুজার কাটরা বড় কাটরা এবং শায়েস্তা খানের কাটরা ছোট কাটরা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আকারেও প্রথমটি বড় এবং দ্বিতীয়টি ছোট। মুর্শিদাবাদেও কাটরা দালান নির্মিত হয়, তা নির্মাণ করেন মুর্শিদকুলী খান। উত্তর ভারতে ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে সেরাই বা সরাইখানা নির্মাণের প্রমাণ আছে। অনেক সরাইখানার বিবরণও সমসাময়িক লেখায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও সরাইখানা নির্মাণের প্রমাণ আছে কিন্তু এর কোন নিদর্শন এখন দেখা যায় না। শাহ শুজা ঢাকায় ঈদগাহও নির্মাণ করেন। তবে মুসলমান আমলে, সুলতানী আমলেই হোক বা মোগল আমলেই হোক মসজিদ ভবনই বেশি নির্মিত হয়। ঢাকায় শায়েস্তা খান কাটরা ছাড়াও বেশ কয়েকখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। ঢাকায় মীর জুমলা রাস্তা এবং পুল নির্মাণ করেন, তাঁর নির্মিত রাস্তাগুলো ব্যবসা এবং সামরিক কারণে ব্যবহৃত হত। পুল দুইটি টঙ্গীতে এবং নারারণগঞ্জের অদূরে পাগলায় নির্মিত হয়। নারায়ণগঞ্জের অদূরে খিজিরপুরে একটি দূর্গ বোধ হয়

সুলতানী আমলেই নির্মিত হয় কিন্তু ইসলাম খান চিশতী, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খানও এই দুর্গ ব্যবহার করেন এবং প্রয়োজন মত সংস্কার করেন। বর্তমানেও এর নিদর্শন আছে, এখন তা হাজীগঞ্জ দূর্গ নামে খ্যাত। তবে ঢাকায় স্থাপত্য শিল্পে লালবাগ দূর্গ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহজাদা আজম শাহ্ সুবাদার থাকাকালে এর নির্মাণ শুরু করেন কিন্তু তিনি সহসা বদলী হয়ে যাওয়ায় নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারেননি। এখানে নির্মিত ইমারতগুলো এখনো দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। আজম শাহের নির্মিত প্রাসাদের অংশ এবং মসজিদ এখনো বিদ্যমান। তবে লালবাগের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং সুদর্শন ইমারত হল পরীবিবির মাযার। শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা ইরান দুখত বা পরীবানুর কবরের উপর তা নির্মিত। এই মাযার দিল্লীর কোন কোন ইমারতের অনুকরণে নির্মিত এবং এখানে শ্বেত মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়। ঢাকায় শায়েস্তা খান এত বেশি মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারত নির্মাণ করেন যে এগুলোর স্থাপত্য রীতি তাঁর নামেই পরিচিত, অর্থাৎ শায়েস্তা খানী স্টাইল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

রাজমহলে শাহ্ শুজা দীর্ঘদিন অবস্থান করলেও তিনি সেখানে খুব বেশি ইমারত নির্মাণ করেননি, শুধু একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন যা পাথরের দালান (সংগী দালান) নামে পরিচিত। তিনি সেখানে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং একটি সরোবর বা বড় পুস্করিনী খনন করেন, সরোবরটি আনন্দ সরোবর নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদেও অনেকগুলো অট্টালিকা নির্মিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চেহল সতুন বা চল্লিশ স্তম্ভ বিশিষ্ট দরবার ভবন, এটা মুর্শিদকুলী খান নির্মাণ করেন। মুর্শিদকুলী খান কাটরা প্রাসাদ এবং মসজিদও নির্মাণ করেন। তা ছাড়া ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ এবং সিরাজ উদ্দৌলার মনসুরগঞ্জ প্রাসাদও স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মুর্শিদাবাদে শিয়াদের জন্য ইমামবাড়াও নির্মিত হয়। চট্টগ্রামেও মোগল স্থাপত্য শিল্পের অনেক নিদর্শন রয়েছে। এখানে জামে সমজিদ নির্মাণ করেন চট্টগ্রাম বিজয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শায়েস্তা খানের ছেলে বুজর্গ উমেদ খান। তা ছাড়া আওরঙ্গজেবের আমলে বায়েজীদ বোস্তামীর দরগাহস্থ মসজিদ, মিসকিন শাহর দরগাহস্থ মসজিদ এবং নবাবী আমলের ওলী খানের মসজিদ এবং কদম মুবারক মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে উল্লেখযোগ্য নির্দশন।

মোগলেরা বাজারও নির্মাণ করেন। ঢাকার চকবাজার বোধ হয় ইসলাম খানের সময় থেকে শুরু হয়, কিন্তু এই বাজারে দোকান ঘর নির্মাণ করে দেন শুজা উদ্দীনের জামাতা ঢাকার নায়েব নাজিম মুর্শিদ কুলী খান দ্বিতীয়। চট্টগ্রামের চকবাজার বোধ হয় নবাবী আমলে নির্মিত হয়। তাছাড়া আরো কয়েকটি শহরে চকবাজার রয়েছে, সেগুলোও মনে হয় নবাবী আমলে তৈরী হয়। স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখন শিল্পেরও (ক্যালিগ্রাফী) উল্লেখ করতে হয়। মোগল আমলে বিভিন্ন শিলালিপিতে নছখ এবং নস্তালিকের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

মুসলমানদের স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি হিন্দুদের স্থাপত্য শিল্পও উন্নতি লাভ করে। এই সময়ে হিন্দুদের নির্মিত অনেক মন্দিরের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

এগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ১৭০৪-২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত কান্তনগরের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

বাংলাদেশ বরাবরই একটি কৃষি প্রধান দেশ। মোগল আমলেও কৃষিই ছিল বাঙ্গালিদের প্রধান পেশা। মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে দেশের সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। মোগল শাসন ব্যবস্থা ছিল উৎকৃষ্ট, ফলে কৃষকদের ভূমি রাজস্ব প্রদানও একটা নিয়মের মধ্যে এসে পড়ে। সপ্তদশ শতকের শেষে শুভ সিংহের বিদ্রোহ হয় স্বল্পস্থায়ী। তাছাড়া এই বিদ্রোহ সীমিত এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। আলীবর্দীর সময়ের বর্গী হামলায় উড়িষ্যা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বাংলার পশ্চিমে কিছু অংশ সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই বলা যায় মোটামুটিভাবে শান্ত পরিবেশে কৃষকেরা তাদের কৃষি কাজ করতে সক্ষম হয়। একটি প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের জন্য কৃষিই উপযুক্ত পেশা। কারণ ব্যবসায়ে মূলধন লাগে এবং প্রতারণাও করতে হয় বা নিজে প্রতারণার শিকার হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। আবার চাকরিতে আত্মসম্মান থাকে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থলাভ হয় না। সেকালে লোকসংখ্যাও খুব বেশি ছিলনা তাই কৃষি উপযোগী জমির অভাব ছিল না। নদী প্রধান দেশে পলিমাটি পূর্ণ বিস্তর সমতল ভূমি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় বাংলায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। সমসাময়িক সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে বাংলার অতুলনীয় কৃষি সম্পদের বিবরণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা বলেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হত। আবুল ফজল বলেন যে, বাংলায় ধানের চারাগুলো এক রাত্রে ৬০ গজ বৃদ্ধি পায় এবং এখানে বৎসরে ৩টি ফসল উৎপন্ন হয়। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে নানা প্রকারের ধান উৎপন্ন হত, প্রত্যেক প্রকারের একটি করে ধান সংগ্রহ করলে একটি বড় ভাণ্ড ভরে যাবে। ইউরোপীয় পরিব্রাজক সকলেই বাংলাদেশের ভূমির উর্বরতা, এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হওয়ায় কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। বার্নিয়ের বলেন যে বাংলাদেশে প্রচুর চাউল উদ্বৃত্ত থাকত এবং বিদেশে রপ্তানী হত। চাউল বাঙালিদের প্রধান খাদ্য, অতএব বাংলার কৃষকেরা ধানই বেশি উৎপাদন করত, বাংলার ভূমিও চাল উৎপাদনের উপযোগী ছিল। ধানের পরেই আসে গমের, বিদেশীদের অবস্থানের ফলে গমের ব্যবহার উৎপাদন ও ছিল বেশি। তা ছাড়া আঁখ, গুড়, পান, তামাক, সুপারি, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, হলুদ, আদা ইত্যাদি ভোজ্য ও পণ্য দ্রব্যও উৎপন্ন হত। তামাক ও আলু ইউরোপীয় বণিকেরা আমেরিকা থেকে এনে এখানে চাষের ব্যবস্থা করে, দু'টিই বাংলাদেশে প্রচুর উৎপন্ন হত। এখানে পাট এবং চাও উৎপন্ন হত, নীল এবং কার্পাসের চাষও হত। বাংলাদেশে প্রচুর ফলও উৎপন্ন হত। আঁখ থেকে চিনি তৈরী হত, চিনি এবং গুড় বাইরে রপ্তানী হত। বাংলাদেশের কার্পাস ছিল অত্যন্ত উন্নত জাতের, দেশী কার্পাস, তাকে ফুটী কার্পাস বলা হত, তা থেকে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরী হত। গুটি পোকার চাষ করে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হত, রেশম, রেশমী ও সূতী বস্ত্র

প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোহর ইত্যাদি এলাকায় কার্পাস উৎপন্ন হত। পাট ও চা অষ্টাদশ শতকে সর্বপ্রথম বিদেশে পরিচিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে পাট ও নীল বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানী হওয়া শুরু হয়। উত্তর বাংলার কয়েকটি জেলায় আফিমের চাষ হত। সে যাই হোক, বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের কৃষি পণ্য উৎপাদিত হত, কৃষিপণ্য দেশের চাহিদা মেটাত। কোন কোন পণ্য উৎপাদিত আকারে, আবার কোন কোন পণ্য শিল্পদ্রব্যে পরিণত হয়ে বিদেশে রপ্তানী হত।

কৃষির পরেই ছিল শিল্পের স্থান। মোগল আমলে বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প ব্যপক উন্নতি লাভ করে। বাংলার উৎপন্ন মসলিন সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। নানা রকমের সুতীবস্ত্র তৈরী হত, যেমন (১) মলমল, চিকন মসলিন, (২) শবনম বা শিশিরের মত, (৩) তানজেব বা শরীরের সৌন্দর্য বর্ধক, (৪) আবেরওয়ান বা পানির স্রোতের মত স্বচ্ছ, (৫) আলাবলি বা সূক্ষ্ম মসলিন (৬) নয়নসুখ বা মোটা মসলিন, নয়ন সুখ অর্থ যা দেখে সুখ পাওয়া যায়, (৭) বদন খাস বা মিহি মসলিন, (৮) সরবতী বা স্বচ্ছ (৯) তরিন্দাম বা এক প্রকারের মসলিন (১০) জামদানী বা কারুকাজ করা শাড়ি কাপড় (১১) হাম্মাম, অর্থাৎ মোটা সূতী কাপড় (১২) ডোরিয়া বা ডোরা কাটা বস্ত্র (১৩) সিরবন্দ বা পাগড়ির কাপড়, (১৪) জঙ্গল খাস, একে বিকালের শিশির বলা হত, (১৫) ঝুনা, স্বচ্ছ মসলিন, যা সাধারণত নর্তকীরা ব্যবহার করত, (১৬) রঙ্গ বা রংকরা (১৭) বাফতা (১৮) সানু (১৯) গুবারাহ (শেষোক্ত ৩টি মোটা কাপড়) (২০) চিন্‌ট বা চিট কাপড় বা নকশা করা বস্ত্র। এ ছাড়াও মুক্তা, মুগা, মোয়মি, লাহি প্রভৃতি নামের শাড়ী কাপড় তৈরী হত। এই বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কয়েক প্রকার ছিল অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে ৪০ গজের এক খণ্ড একটি কাপড় আংটির মধ্যে ভরে রাখা যেত। শবনম এত সূক্ষ্ম ছিল যে ঘাসে শুকাতে দিলে বোঝাই যেত না যে তা এক খণ্ড কাপড়। কথিত আছে যে আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসা কয়েক ভাঁজ করে কাপড় পড়লেও সম্রাট নাকি মন্তব্য করেন যে, তাঁর মেয়ে কাপড় পরেননি। উপরে মসলিনের যে প্রকার ভেদ দেয়া হয়েছে, তা প্রকৃতি, রঙ, বুনন, ব্যবহার ইত্যাদির বিভিন্নতা বোঝায়, কোন কোন প্রকার বস্ত্রের সঙ্গে খাস শব্দ যোগ করে সেগুলোর বিশিষ্টতা প্রমাণ করে। ঢাকা, সোনারগাঁ এবং ময়মনসিংহ এলাকায় প্রস্তুত বস্ত্র অত্যন্ত উন্নত মানের হত সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অংশে সর্বত্র কম-বেশি বস্ত্র বয়ন করা হত।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প সর্বপেক্ষা সমাদৃত ছিল। প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে বস্ত্র বয়ন হত, সুলতানী আমলেও বাংলার বস্ত্রশিল্প উন্নত ছিল। ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে এর প্রমাণ মিলে। কিন্তু মোগল আমলে বাংলায় বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়। এর প্রথম কারণ মোগল সম্রাট, বাংলার সুবাদার, দীওয়ান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, জগৎশেঠের মত বড় ধনী ও ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ মসলিন ক্রয় করত। মোগল সম্রাটদের জন্য বয়নকৃত মসলিনকে মলবুস খাস এবং সুবাদার দীওয়ানের জন্য ক্রয়কৃত মসলিনকে সরকার-ই-আলী বলা হত। সম্রাট সুবাদার

দীওয়ান ইত্যাদির জন্য এত বেশি বস্ত্র ক্রয় করা হত যে, বাংলাদেশে এর জন্য আলাদা বিভাগ, ক্রয়কেন্দ্র এবং ক্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হত। সম্রাট, সুবাদার বা জগৎশেঠ ইত্যাদিরা নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও পুরস্কার এবং উপহার ইত্যাদি দেওয়ার জন্য এই বস্ত্র সংগ্রহ করা হত। দ্বিতীয়ত, মোগল আমলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়, এবং বিদেশী ব্যবসায়ী এবং ইউরোপীয় কোম্পানীরা প্রচুর মসলিন বা বাংলাদেশী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করত। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

বস্ত্রশিল্পের পরে আসে রেশম বা সিল্ক শিল্প। রাজশাহী এবং উত্তরবঙ্গের মখদুমপুর ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় রেশম তৈরী হত এবং দেশীয় তাঁতিরাই রেশম বস্ত্র তৈরী করত। ইউরোপীয় কোম্পানীরা রেশম ও রেশম বস্ত্র প্রচুর রপ্তানী করত এবং ডাচ এবং ইংরেজ কোম্পানী তাদের বিভিন্ন বাণিজ্য কুঠিতে রেশম বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তোলেন। রেশম শিল্পের মত বাংলাদেশের চিনি শিল্পও উন্নতিলাভ করে। এখানে প্রচুর ইক্ষু উৎপাদিত হত। ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা বাংলার চিনি শিল্পের প্রশংসা করে বলে যে, বাংলার গুড় ও চিনি বিপুল পরিমাণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হত। নৌকা নির্মাণও একটি বড় শিল্প ছিল। যোগাযোগের জন্য যেমন নৌকার প্রয়োজন ছিল, ব্যবসায়ের জন্যও তেমনি নৌকা ব্যবহার করা হত। বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় এবং পূর্ব ও নিম্নবঙ্গ বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় বন্যা প্লাবিত হওয়ায় নৌকাই ছিল যোগাযোগের প্রধান বাহন। ছোট বড় অনেক প্রকার নৌকা ছিল। ব্যবসায়ের নৌকা ছিল অপেক্ষাকৃত বড়, আবার যুদ্ধের নৌকা ছিল স্বতন্ত্র, অবশ্য সকল নৌকাই প্রয়োজনে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা যেত। যুদ্ধের বড় বড় নৌকাগুলোতে কামান বহন করা হত। নৌকার পুল বানিয়ে সৈন্যরা নদী পার হত, আবার কয়েকটি নৌকা এক সারিতে বেঁধে হাতিও নদী পার করা হত। সমসায়িক ইতিহাসে এবং বিদেশী লেখকদের বিবরণে বাংলাদেশে নির্মিত এবং ব্যবহৃত অনেক প্রকার নৌকার নাম পাওয়া যায়। যেমন ডিঙ্গি বা ডিঙ্গা, পাতেলা, পালওয়ার, কোষা ইত্যাদি। যুদ্ধের নৌকার নাম ছিল গুরব, সলব, কোষা, জলবা, বাছারী এবং পারেন্দা ইত্যাদি। গুরব ছিল কামান সজ্জিত নৌকা, সলব অনেক সৈন্য পরিবহন করত এবং একটি সলব অন্যান্য অনেক নৌকা টেনে নিয়ে যেতে পারত। এই সকল রকমের নৌকা বাংলাদেশেই তৈরী হত। মীর জুমলা আসাম অভিযানে প্রায় ৪০০ নৌকা নিয়ে অগ্রসর হন, শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম অভিযানে প্রায় ৩০০ নৌকা ব্যবহার করেন। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম এবং হুগলী এবং ঢাকাসহ প্রত্যেক নদী বন্দরে নৌকা নির্মাণের কারখানা ছিল। ঢাকার নদী তীরে প্রায় দুই ক্রোশ ধরে কেবল বড় বড় নৌকা নির্মাণকারী ছুতার মিস্ত্রি বাস করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লৌহ শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় ; বীরভূম, মুল্লারপুর পরগনা এবং কৃষ্ণনগরে লোহার খনি ছিল। খনি থেকে লোহার পিণ্ড নিষ্কাশন করে কারখানায় লোহা তৈরী হত। বিভিন্ন স্থানে লোহার কারখানা ছিল এবং এখানেই কামান ও বারুদ তৈরী হত। ঢাকার শঙ্খ শিল্প, অলঙ্কার শিল্প বেশ উন্নত ছিল, এবং ব্যবসায়ীরা এখান থেকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত। ঢাকায় পাথরের অলঙ্কারও তৈরী

হত। বাংলায় কাগজ শিল্প ছিল, গাছের বাকলা এবং পেঁয়াজের সাহায্যে কাগজ তৈরী হত। এই কাগজ হত অত্যন্ত মসৃণ ও এর রঙ ছিল সাদা। লাক্ষা শিল্পেরও উল্লেখ আছে। সিলেটের কোন কোন এলাকায় অগুরু কাঠের সাহায্যে আগর তৈরী হত। বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফও তৈরী হত। গরম পানি মাটির নীচে গর্তের মধ্যে সারা রাত রেখে বরফ তৈরীর ব্যবস্থা ছিল।

মোগল আমলে, নবাবী আমলের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজন পণ্যদ্রব্য, বন্দর সুবিধা এবং দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ী। উপরে আমরা বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্প পণ্যের বিবরণ দিয়েছি, কৃষি এবং শিল্প উভয়খাতে বাংলাদেশে প্রচুর পণ্য উৎপাদিত হত। ফলে দেশী এবং বিদেশী ব্যবসায়ী এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানী বাংলাদেশের বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বন্দরেরও অভাব ছিল না, বেশ কিছু নদী বন্দর ছাড়াও বাংলাদেশের দুই সমুদ্র বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করে, চট্টগ্রাম এবং সাতগাঁও। পর্তুগীজেরা যখন আসে প্রথম বাংলাদেশে এই দুইটি বন্দরই সক্রিয় ছিল। তারা চট্টগ্রামকে পোর্টো গ্রাণ্ডে বা বৃহৎবন্দর এবং সাতগাঁওকে পোর্টো পেকেনো বা ক্ষুদ্র বন্দর রূপে অভিহিত করত। ভাগিরথীর তীরে অবস্থিত সাতগাঁও বন্দর নদী ভরাটের ফলে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে হুগলী বন্দরের উত্থান হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর আরাকানীদের অধিকারে চলে যায়। তাই মোগল আমলে হুগলী বন্দর প্রধান্য লাভ করে। নদী বন্দরের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পণ্য চলাচল এবং হুগলী বন্দরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবাবী আমলের শেষ পর্যন্ত হুগলী বন্দরের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ রাজত্বকালে হুগলীর স্থলে কলিকাতা বন্দর প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন কালে বাংলাদেশের গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, এইজন্য গ্রামে পেশাজীবি লোকেরা, যেমন কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, তেলি ইত্যাদি বাস করত, কৃষক ত অবশ্যই ছিল। এইরূপ গ্রামীন কাঠামোর অর্থ হচ্ছে, একজনের উৎপাদিত পণ্য বদল করে অন্যজনের পণ্য নেওয়া। এইজন্য হাট বাজার এবং বন্দর ছিল। তখনো পণ্য উদ্বৃত্ত থাকত এবং বিদেশী, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের বন্দরে আসত। টলেমী, পেরিপ্লাসের লেখায় এইরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। মোগল আমলে কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বংশীদাসের মনসামঙ্গল এবং কবি কঙ্গণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা পাওযা যায়। এতে জানা যায় যে, বাঙালী সওদাগরেরা বড় বড় বাণিজ্য তরী নিয়ে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম কূল ধরে সিংহল, গুজরাট এবং আরব সাগরের তীরের বন্দরসমূহে বাণিজ্য করত। মঙ্গল কাব্যের নায়কেরা যেমন চাঁদ সাওদাগর, ধনপতি ও

শ্রীমন্ত দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন, এই সকল কাব্যে তাঁদের বাণিজ্য তরীর বিবরণ পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের ১৪টি এবং ধনপতির ৭টি ডিঙ্গা ছিল। প্রত্যেক ডিঙ্গার এক একটা নাম ছিল। কবিকঙ্গণ চণ্ডীতে বলা হয় কোন কোন ডিঙ্গা দৈর্ঘে ১০০ গজ এবং প্রস্থে ২০ গজ, আবার বিজয় গুপ্তের বর্ণনায় ১ হাজার গজ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। চট্টগ্রাম বন্দরে সমুদ্রগামী নৌকা নির্মিত হত। বাঙালী বণিকেরা বিদেশের সঙ্গে কি কি পণ্য বিনিময় করত তার একটি বিবরণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপ ঃ

বদলাশে নানাধন আন্যাছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুঁটের বদলে ডঙ্ক (টঙ্ক)?
পিড়ঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা॥
লবন বদলে সৈন্ধত দিবে জোয়ানি বদলে জিরা।
আতঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা॥
চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে গোড়া॥

বাংলা সাহিত্যে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যে অতিমাত্রায় কাল্পনিক তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এটা বোঝা যায় যে, বাংলার ব্যবসায়ীরা স্বল্পমাত্রায় হলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিত।

সমসাময়িক ইউরোপীয় পরিব্রাজকের বিবরণেও বাংলাদেশের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে আগত পতুগীজ পর্যটক ডোয়ার্তে বারবোসা বাংলাদেশের নিম্নরূপ চিত্র দেন ঃ

এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু-বন্দর বা নগরী আছে। অভ্যন্তরীন বন্দরগুলোতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্রবন্দরে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতি লোক বাস করে এরা জাহাজে করে বাণিজ্য পণ্য বহু দেশে পাঠায়। এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম বেঙ্গালা (এই বেঙ্গালা বন্দর চট্টগ্রাম হওয়ার সম্ভাবনা।) আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া ও ভারতীয় অনেক বণিক এই নগরে বাস করে। বাংলার বড় বড় বণিকদের বড় বড় জাহাজ আছে এবং এতে নানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে তারা করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লংকা এবং মালাক্কায় যায়। বাংলাদেশে তুলা, ইক্ষু, আদা ও মরিচ উৎপন্ন হয়। এখানে নানা প্রকারের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্যে তা দ্বারা এত অধিক পরিমাণে টুপী তৈরী করে যে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ বোঝাই করে এই কাপড়ের চালান দেয়। তা ছাড়া আরো অনেক

রেমশ কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের ওড়নার জন্য সববতী কাপড় চড়া দামে বিক্রি হয়। চবকায় সুতা কেটে এই কাপড় তৈরী করা হয়। এই শহরে উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয় এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে পাঠানো হয়। মালাবার ও ক্যাম্বেতে চিনি ও মসলিন বেশ দামে বিক্রি হয়। এখানে আদা, কমলালেবু, বাতাবি লেবু এবং আরো অনেক ফল জন্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগি বেশ আছে।

বারবোসার প্রায় সমসাময়িক ইতালির পর্যটক ভারথেমাও একই রূপ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের মত ধনী বণিক তিনি আর কোথাও দেখেননি। দ্য বরস নামক একজন পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বলেন যে গৌড়, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, হুগলী ও সোনারগাঁও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল, গৌড় শহরের দৈর্ঘ ছিল ৯ মাইল এবং এখানে ২০ লক্ষ লোক বাস করত। ঐ একই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাষ্টার সিজার ফ্রেডারিক সাতগাঁওকে খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর রূপে উল্লেখ করেন, এবং রালফ্ ফিচ চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও উভয় বন্দরের উল্লেখ করেন। ফিচ্ ছিলেন একজন ইংরেজ পরিব্রাজক, তিনি ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা থেকে নৌকাযোগে বাংলায় আসেন। একই সঙ্গে আরো ১৮০ খানি বাণিজ্যিক নৌকা আসে, সকল নৌকায় মূল্যবান পণ্য বোঝাই ছিল। এখানে এসে ফিচ প্রথমে তাঁড়ায় যান, তাঁড়া ছিল তখন রাজধানী। এখানে তুলা ও বস্ত্র ব্যবসা খুব জমজমাট ছিল। তিনি হুগলী এবং হিজলী বন্দরেরও উল্লেখ করেন। হিজলী বন্দরে প্রতি বৎসর নেগাপটম, সুমাত্রা, মালাক্কা এবং আরো অনেক স্থান থেকে অনেক বাণিজ্য জাহাজ আসত।

ষোল শতকের বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেলেও এতে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। এই সকল বিবরণে জানা যায় যে, বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, ভূমি ছিল উর্বর, এখানে প্রচুর কৃষি পণ্য উৎপন্ন হত এবং প্রচুর শিল্পদ্রব্য তৈরী হত। এই সকল জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হত। প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশের অনেক জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এসে এইসব কৃষি ও শিল্প দ্রব্য রপ্তানী করত। তাকে আন্ত-প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই দুইভাবে ভাগ করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল, বাংলাদেশ থেকে যেমন পণ্য দ্রব্য অন্যান্য প্রদেশে যেত, অন্যান্য প্রদেশ থেকেও পণ্য দ্রব্য বাংলাদেশে আসত। এই আন্ত প্রাদেশিক বাণিজ্য নদী পথে, এবং যেখানে নদী পথ নাই সেখানে স্থলপথে চলাচল করত। উপরে বলা হয়েছে যে, রালফ্ ফিচের সঙ্গে ১৮০ খানি পণ্য বোঝাই নৌকা আসে, এতেই আন্ত-প্রাদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই আন্ত-প্রাদেশিক বাণিজ্যে কাশ্মীরী, আফগানী, মুলতানী, পাঠান, শেখ ভুটিয়া, পগোয়া (পাগড়ি ধারী) এবং সন্যাসী ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করত। হিমালয় অঞ্চল থেকে যে সকল ব্যবসায়ী চন্দন কাঠ, ভুর্জ পত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্ম এনে বিক্রয় করত তাদের সন্ন্যাসী ব্যবসায়ী বলা হত। এরা হয়ত সন্ন্যাসীর বেশ নিত। দিল্লী আগ্রার পগোয়া ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর বর্ধমান থেকে সীসা, তামা, টিন, লংকা এবং বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে কিনত এবং বিনিময়ে নগদ টাকা বা আফিম,

শোরা অথবা ঘোড়া বিক্রয় করত। কাশমীরী বণিকেরা অগ্রিম টাকা দিয়ে সুন্দরবন এবং উপকূল অঞ্চলে লবন তৈরী করাত। তারা বাংলাদেশ থেকে চামড়া, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি এবং বস্ত্র নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে রপ্তানী করত।

তা ছাড়া ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে আরব, পারস্য, আর্মেনিয়া, ইউথোপিয়া, সিংহল, মালাবার, জাভা, সুমাত্রা এবং চীনের ব্যবসায়ীরা অংশ নিত। ইউরোপীয়রা ভারতে সমুদ্র পথ আবিষ্কারের পূর্বে (অর্থাৎ ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসার পূর্বে) আরব ও পারস্যের ব্যবসায়ীদের মারফৎ ভারত এবং ভারতের পূর্ববর্তী দেশ সমূহের পণ্যদ্রব্য স্বদেশে নিয়ে যেত। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা বড় বড় জাহাজ নিয়ে সমুদ্র বন্দরে নোঙর করে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে সমুদ্র বন্দরে নীত পণ্যসমূহ রপ্তানী করত, তাদের রপ্তানীর প্রধান পণ্য ছিল বস্ত্র, চিনি, চাউল, ঘি, বিভিন্ন প্রকার মসলা, আগর ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি। ষোল শতকের প্রথম দিক থেকে পর্তুগীজরা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। তারা আসার পরে এশিয়া এবং আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে। সে যাই হোক, ষোল শতকের শেষ পর্যন্ত, এমনকি সতর শতকের প্রথম সিকিভাগে পর্তুগীজ এবং অন্যান্য পশ্চিম ও পূর্ব এশীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত থাকে। তাতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পায়, বিদেশী ব্যবসায়ীরাও প্রচুর লাভবান হয়।

সতর শতকের গোড়ার দিক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রথমে আসে ডাচ বা ওলন্দাজ কোম্পানী। তারা ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়ায় (জাকার্তা) হেড কোয়াটার স্থাপন করে প্রতি বৎসর জাহাজ পাঠিয়ে প্রথমে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে, পরে ভাগিরথীর তীরে চুঁচূড়ায় তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। এর পরে আসে ইংরেজেরা, তারাও প্রথমে করোমাণ্ডলে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং পরে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। সতর শতকের শেষ দিকে ফরাসী কোম্পানী এসে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করে এবং আরো পরে আঠার শতকের গোড়ার দিক থেকে ডেনমার্কের দিনেমার কোম্পানী এবং অষ্ট্রিয়ার অস্টেন্ড কোম্পানী বাংলাদেশে এসে হুগলীর নিকটে যথাক্রমে গুন্দুল্লাপুরে এবং বাঁকিবাজারে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী হুগলী থেকে কলিকাতায় তাদের ব্যবসা স্থানান্তর করে, শেষ পর্যন্ত তারা কলিকাতায় থাকে এবং সেখানে দুর্গ নির্মাণ করে।

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীর প্রধান রপ্তানী ছিল সুতী বস্ত্র, রেশম এবং রেশম বস্ত্র। তাদের আর একটি প্রধান রপ্তানী দ্রব ছিল শোরা। আগ্নেয়াস্ত্রের বারুদের জন্য শোরা ব্যবহার করা হত, তাই এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শোরার উৎস বাংলাদেশে ছিল না, তা ছিল বিহারে-তবে বাংলায় অবস্থিত কুঠি এবং হুগলী বন্দরের মাধ্যমেই কোম্পানী- গুলো এই পণ্য রপ্তানী করত। তাদের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য সুতী বস্ত্র, রেশম, রেশম বস্ত্র এবং শোরা হলেও তারা কড়ি, গালা, কুচিলা, গোলমরিচ, হলুদ এবং চন্দন

কাঠ, আগর, গম, চট, দড়ি, তেল এবং মাখন রপ্তানী করত। চাউলও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানী পণ্য। প্রত্যক কোম্পানী তাদের বিভিন্ন এশীয় বাণিজ্য কেন্দ্রে চাউল পাঠাত, জাহাজ ভারী করার জন্য ব্যালাস্ট হিসেবেও জাহাজের খোলে চাউল ভর্তি করে পাঠানো হত। চীন থেকে আমদানীকৃত চীনা মাটির তৈজসপত্র এবং চা বাংলাদেশ থেকে পুনঃরপ্তানী করা হত।

ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে বিরাট অংকের লেনদেন করত। তাদের বাৎসরিক রপ্তানী তালিকা পাওয়া যায় না, তবে ইংরেজ ও ডাচ্ কোম্পানীর কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায়। এতে মনে হয় বিভিন্ন কোম্পানী এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের বণিকেরা মিলে কয়েক কোটি টাকার পণ্য দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী করত। রপ্তানী প্রথম দিকে কিছু কম হলেও মোগল আমলের শেষ দিকে বিশেষ করে নবাবী আমলে রপ্তানী ধারণাতীতভাবে বেড়ে যায়। কারণ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন আড়ং বা উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদনকারীদের বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে তাদের উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত করত। উৎসাহ দেওয়ার প্রধান উপায় ছিল অগ্রিম দেওয়া যাকে দাদন বলা হত। কোম্পানীরা স্বদেশ থেকে দক্ষ কারিগর এনেও দেশীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত। অতএব ইউরোপীয় বণিক কোম্পানী এবং এশীয় বাণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রচুর লাভজনক পণ্য বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় বাণিজ্যিক ভারসাম্য সর্বদা বাংলাদেশের অনুকূলে থাকত। ফলে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো বাংলাদেশী পণ্য যেমন রপ্তানী করত তেমনি আমদানীও করত। তবে তাদের আমদানীকৃত পণ্যের চাহিদা এখানে বেশি ছিলনা। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজরা আমদানী করত 'ব্রডক্লথ' এবং 'পারপেচুয়ানুজ' নামক পশমী বস্ত্র এবং সীসা, তামা, লোহা, লৌহ দ্রব্য, তুঁত, মদ, আগ্নেয়াস্ত্র, আয়না এবং সাধারণভাবে দূর্লভ হিসেবে অভিহিত বিভিন্ন সুন্দর বস্ত। ডাচ্রা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় উপনিবেশগুলো থেকে মসলা টিন ও তামা আমদানী করত। কিন্তু রপ্তানীর তুলনায় তাদের আমদানী ছিল অতি নগণ্য। এই দেশে পশমী বস্ত্রের চাহিদা তেমন ছিল না, বাংলাদেশ এমন শীত প্রধান দেশ নয় যে সাধারণ লোকেরা শীত বস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তামা, সীসা, লোহার কিছু চাহিদা ছিল, কিন্তু তাও সামান্য। অতএব কোম্পনীগুলোকে তাদের রপ্তানী পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নগদ অর্থ দিতে হত এবং নগদ অর্থ দেওয়ার জন্য তারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড আমদানী করে শাহী টাকশালে সেগুলি প্রচলিত মুদ্রায় রূপান্তরিত করত। এইজন্য টাকশালে কর দিতে হত। ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের নিকট স্বর্ণ রৌপ্য পিণ্ড বিক্রি করা যেত। যাই হোক, রপ্তানী খাতে বাংলাদেশ যা আয় করত, তা প্রায় সম্পূর্ণ ছিল বাংলাদেশের লাভ এবং এটাই বাংলাদেশের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ।

দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ অন্যভাবেও লাভবান হয়। প্রথমত, এতে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, কারণ পণ্যদ্রব্যের উৎস থেকে

রপ্তানীর স্থান অর্থাৎ সমুদ্র বন্দরে পণ্য সামগ্রী পরিবহনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য কোম্পানী প্রায় সময় নিজেদের নৌকায় তাদের নিজস্ব মালামাল পরিবহন করত, কিন্তু উদ্বৃত্ত মালামালের জন্য তাদের স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হত। তাছাড়া কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য অনেক বণিকও ছিল যাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা ছিলনা। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠিকে ঘিরে একটি স্থানীয় বেনেফিসিয়ারী বা সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এরা উকিল, দালাল, পাইকার, বানিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত হত। সরকারের সঙ্গে যোগযোগ রক্ষার জন্য কোম্পানী উকিল নিযুক্ত করত, দালাল এবং পাইকাররা মুনাফার বিনিময়ে কোম্পানীকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করত, যদিও প্রত্যেক কোম্পানী নিজস্ব ব্যবস্থায় দাদন বা অগ্রিম দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করত। তাদের রপ্তানী এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে নিজস্ব ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ রপ্তানী পণ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হত না। তাই দালাল, পাইকারদের সাহায্য নিতে হত। কোম্পানীগুলোর কুঠিকে ঘিরে বাজারও সৃষ্টি হয় এবং উৎসাহী দেশী স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে দেশের সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের আর্থিক উন্নতির কাজে লিপ্ত থাকত। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজদের আশ্রয় পুষ্ট এই সুবিধা ভোগকারীরা জমিদারে পরিণত হয়।

কোম্পানী, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী, দালাল, পাইকার ইত্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আর্থিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, এরা হল মহাজন, মুদ্রাবদলকারী, স্বর্ণ-রৌপ্যের দালাল, আবার কখনো কখনো ব্যবসায়ী। এরা সাহু বা উত্তর ভারত থেকে আগত, বিশেষ করে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী; জগৎশেঠ এই আর্থিক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যবসা কেন্দ্রে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকত, এবং শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকত, তাদের অধীনেও অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক, এবং এই সব সাহা, শেঠ বা মহাজনী প্রতিষ্ঠানও ছিল এক একটি ব্যাংক। তারা হুণ্ডির ব্যবসা করত, এই হুণ্ডি ছিল বর্তমান কালের চেকের মত। হুণ্ডি নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জমা দিলে নগদ টাকা পাওয়া যেত। জগৎশেঠের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এতই সমৃদ্ধশালী ছিল যে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে এডমাণ্ড বার্ক জগৎশেঠকে ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করেন। মহাজনের ব্যবহৃত হুণ্ডি সাধারণত ৪ প্রকার হত, যেমন (১) দর্শনী হুণ্ডী, এটা দেখামাত্র নগদ টাকা পাওয়া যেত, (২) মিথি হুণ্ডি, এটাতে নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দেওয়ার নির্দেশ থাকত, (৩) শাহযোগ হুণ্ডি, এটা নোটের মত যে কোন লোকের নিকট বিক্রি করা যেত, এবং (৪) জোখামি হুণ্ডি, এটা ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করত, তা বিনিময় বিল বা বিল অব এক্সচেঞ্জের মত ছিল।

মোগল আমলে প্রচুর শষ্য উৎপাদনের ফলে দেশের লোকজন স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। আবার শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়

এবং দেশ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে। মোগল আমলের শেষ দিকে প্রতি বৎসর দেশে কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়, ফলে বাৎসরিক ১ কোটি টাকা রাজস্ব সম্রাটের নিকট পাঠিয়েও দেশে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। এতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর এবং সুলভ ছিল। জনগণ খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। ইউরোপীয় বণিক ও পরিব্রাজকেরা দেশের প্রাচুর্য এবং ভোগ্য পণ্যের সুলভতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সেবাষ্টিয়েন ম্যানরিক বাংলার বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের নাম করেন এবং বলেন যে, খাদ্যদ্রব্য এত সুলভ ছিল যে তাঁর বারবার খেতে লোভ হত এবং নামমাত্র ব্যয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতেন। পণ্য দ্রব্যের সুলভতা এবং দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বাংলাদেশে প্রবেশের হাজারটি দরজা ছিল, কিন্তু বের হওয়ার একটিও ছিল না। শায়েস্তা খান ও সরফরাজ খানের সময় চাউল এত সস্তা হয় যে, টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত। ১৭২৯ সালে মুর্শিদাবাদে কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রতি টাকায়	খুব ভাল চাউল (বাঁশফুল)	প্রথম শ্রেণী	১মণ ১০ সের
ঐ	ঐ	দ্বিতীয় শ্রেণী	১মণ ২৩ সের
ঐ	ঐ	তৃতীয় শ্রেণী	১ম ৩৫ সের
ঐ	মোটা (দেশনা ও পূরবী)		৪মণ ২৫ সের
ঐ	মোটা (মুশসারা)		৫ মণ ২৫ সের
ঐ	মোটা (কুরাশালী)		৭ মণ ২০ সের
ঐ	উৎকৃষ্ট গম প্রথম শ্রেণী		৩ মণ
ঐ	উৎকৃষ্ট গম দ্বিতীয় শ্রেণী		৩ মণ ৩০ সের
ঐ	তৈল প্রথম শ্রেণী		২১ সের
ঐ	তৈল দ্বিতীয় শ্রেণী		২৪ সের
ঐ	ঘৃত প্রথম শ্রেণী		১০$^{১}/_{২}$ সের
ঐ	ঘৃত দ্বিতীয় শ্রেণী		১১$^{১}/_{৪}$ সের

কার্পাস (তুলা) প্রতি মণ ২ থেকে ২$^{১}/_{২}$) টাকা

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম লেখেন যে, মাসিক এক টাকা আয়ে একজন লোক খুব ভাল খাবার খেতে পারত। আষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে বাংলাদেশকে ভারতের স্বর্গ বলা হত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, জীবনযাত্রার স্বচ্ছলতা ইত্যাদি মনে করলে এই খ্যাতির সার্থকতা সহজেই বুঝা যায়।

অতিরিক্ত পাঠের গ্রন্থপঞ্জী ঃ

J. N. Sarkar, ed : History of Bengal, vol. II, Dhaka University, 1948, 2nd Impressian, 1972.

A. Karim : Social History of the Muslims in Bengal, Dhaka 1959, 2nd Impression 1985

: Murshid Quli Khan & His Times, Dhaka 1963.

: History of Bengal, Mughal Preiod, vol-I Rajshahi, 1992; vol-II Rajshahi, 1995.

M. A. Rahim : Social and Cultural History of Bengal, vol.-I, Karachi 1963 ; vol. II, Karachi 1966.

M.R. Tarafdar : Husain Shahi Bengal, Dhaka, 1965.

T. K. Raychoudhury : Bengal under Akbar and Jahangir, Delhi, 1968.

K. M. Karim : Bengal and Bihar Under Shaljahan, Dhaka, 1965.

B. K. Gupta : Sirajuddaula and East India Company.

রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭।

আব্দুল করিম : বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৮।

: বাংলার ইতিহাস : মোগল আমল, ১ম খন্ড, রাজশাহী, ১৯৯২।

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলিকাতা ১৯৬২।

সুশীলা মন্ডল : বঙ্গদেশের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৬৩।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯১৭।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কোম্পানীর শাসন বিস্তার

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। বাংলার নবাব মীর জাফর আগেই কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়, মীর কাসিম এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তির চেষ্টা করায় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, বক্সারের যুদ্ধের পরে উত্তর ভারতের একমাত্র ক্ষমতাবান শুজা উদ্দৌলাও কোম্পানীর নিকট নত হতে বাধ্য হন। এখন থেকে কোম্পানীর কর্মকর্তারা এমন সুচতুরভাবে গুটি চালাতে শুরু করে যে ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ তাদের পদানত হয়।

মীর কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর জাফরকে পুনরায় মসনদে বসাবার সময় (জুলাই ১৭৬৩) তিনি কোম্পানীর সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানীকে দিয়ে মীর কাসিম যে চুক্তি করেন তা বহাল করা হয়, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক রহিত করে মীর কাসিম যে আদেশ দেন, তা বাতিল করা হয়, ইংরেজদের বাণিজ্য শুল্ক শতকরা আড়াই ভাগে নামিয়ে আনা হয় এবং নবাব তাঁর দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার জন্য রাজী হন। তাছাড়া নবাবের সামরিক শক্তি ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ১২ হাজার পদাতিক সৈন্যে সীমিত করা হয়। যদি নবাবের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহলে ইংরেজ গবর্ণর ও কাউনসিলের অনুমতির প্রয়োজন হবে। ইহা স্থির হয় যে নবাব ইচ্ছে করলে ইংরেজ সৈন্যরা তাঁর কাছে থাকবে। এই চুক্তির ফলে নবাবের আর্থিক দূরবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সামরিক ক্ষেত্রেও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু মীর জাফর কুষ্ঠ রোগে বছর দেড়েক পরে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন।

মীর জাফরের মৃত্যু কোম্পানীর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়. মীর জাফরের প্রতি কোম্পানীর তবুও কিছু সহানুভূতি ছিল, কারণ মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে কোম্পানীর পক্ষে পলাশীতে জয়লাভ করা সম্ভব হত না। কোম্পানী এখন মীর জাফরের ছেলে নজমুদ্দৌলাকে মসনদে বসায়, কিন্তু নতুন নবাবের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ভাতা নিতে বাধ্য করা হয়। নজমুদ্দৌলার মৃত্যুর পরে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অল্পবয়স্ক ভাই সাইফুদ্দৌলাকে মসনদে বসান হয়, কিন্তু তাঁর ভাতা কমিয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়। তিনি একটি চুক্তি করে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার নিরাপত্তার সকল দায়িত্ব এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী নিয়োগের অধিকার কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করেন। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন নবাবের মৃত্যু পরে তাঁর অল্পবয়স্ক ভাই মুবারক উদ্দৌলাকে মসনদে বসান হয়, কিন্তু তাঁর ভাতা ২ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন যে নবাব সার্বভৌম নরপতি নন, বরং খড়কুটার তৈরি একটি পুতুল।

কোম্পানীর দিওয়ানী লাভ, ১৭৬৫ ঃ

কোম্পানীর দিওয়ানী লাভ বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মোগল শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে নিজামত এবং দিওয়ানী দুইটি আলাদা শাসন বিভাগ ছিল। সুবাদার বা নাজিমের অধীনে ছিল নিজামত বা সাধারণ সামরিক বেসামরিক শাসন, এবং দিওয়ানী ছিল দিওয়ানের অধীনে, তিনি রাজস্ব সংগ্রহ এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন। নাজিম এবং দিওয়ানের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা এমনভাবে নির্দিষ্ট করা ছিল যে একজন অপরজনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারত না, বরং উভয়ে স্ব স্ব কাজের জন্য সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকত। কিন্তু সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার ফলে বাংলায় নিজামত এবং দিওয়ানী উভয় বিভাগ একজনের উপর অর্থাৎ নাজিম বা সুবাদারের উপর অর্পিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরে নবাবের নিজামত ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইংরেজদের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি করে নবাব তাঁর নিজামত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে তুলে দনে। মীর জাফরের সময়েই তাঁর সামরিক শক্তি সীমিত হয়ে যায়, অর্থাৎ নবাবের নিজামত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলে যায়। কোম্পানী এখন বুঝতে পারে নবাবীর দিওয়ানী ক্ষমতা, অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাও তাদের লাভ করা উচিত। সুযোগও এসে যায়। বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানী সম্রাট শাহ আলম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে কারণ কোম্পানীই শুজা উদ্দৌলার অধীনস্থ কোরা ও এলাহাবাদ সম্রাটকে দেয়, অর্থাৎ শাহ আলম কোম্পানীর আশ্রিত ও অনুগ্রহভাজন। ইতোমধ্যে লর্ড ক্লাইভও বিলেত থেকে এস বাংলার গবর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্রাট পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলার রাজস্ব পেতেন না, এবং বক্সারের যুদ্ধের পরে তিনি বাংলা থেকে রাজস্ব পাওয়ার আশা ছেড়েই দেন। এমতাবস্থায় ক্লাইভ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রচুর উপহার দেন এবং নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী প্রার্থনা করেন। সম্রাট অর্থের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক ফরমান বলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্থায়ী ভাবে দিওয়ান নিযুক্ত করেন। বিনিময়ে কোম্পানী সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। রাজস্বের বাকী সংগৃহীত অর্থ দিয়ে কোম্পানীকে নিজামত বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হয়। কোম্পানীকে দিওয়ান নিযুক্ত করার অর্থ হল বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া। পলাশী পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধাপে ধাপে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রসর হচ্ছে, এই লক্ষ্যেই তারা নবাবের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করে। দিওয়ানী লাভ না করলেও কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করত, কিন্তু দিওয়ানী লাভ করে কোম্পানী তাদের ক্ষমতা বৈধ করে নেয়।

দ্বৈত শাসন ঃ

সম্রাটের ফরমান ইংরেজ কোম্পানীকে দেশ শাসনে বৈধতা দেয়। দিওয়ানী এবং নিজামত ছিল মোগল শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ, এগুলোর সঙ্গে দায়িত্ব এবং অধিকার উভয়ই যুক্ত ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা অধিকার ভোগ করতে চাইলেও দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা ছিল বণিক, অর্থ প্রাপ্তিই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য, ফলে বাংলার শাসনে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই পরিস্থিতি ডুয়েল গবর্নমেন্ট বা দ্বৈত শাসন রূপে অভিহিত হয়। দিওয়ানী লাভের পরে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব কোম্পানীর উপর বর্তায়, কিন্তু কোম্পানী সিদ্ধান্ত নেয় যে নবাবের দরবরাস্থ কোম্পানীর রেসিডেন্ট দিওয়ান রূপে কাজ করবেন, তিনি কোম্পানীর গবর্ণর ও সিলেক্ট কমিটির নিকট তাঁর কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। তাছাড়া রেসিডেন্ট শুধু নবাবের কোষাগার থেকে সংগৃহীত রাজস্ব গ্রহণ করবে, রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্তি, জমিদারী পরিচালনা এবং দিওয়ানী বিচার সম্পাদন করবেন নবাব। অতএব কোম্পানী আর্থিক সুযোগ নেবে কিন্তু দিওয়ানী শাসনের দায়িত্ব নেবে না, অর্থাৎ কোম্পানীর কর্মকর্তারা গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে গাছ থেকে টপকে পড়া পাকা ফল খাবেন। তাঁরা জনগণের পরিশ্রমের ফল ভোগ করবেন, কিন্তু জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য কিছু করবেন না।

নবাব নজমুদ্দৌলাকে মসনদে বসাবার সময় কোম্পানী মুহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করেন, এখন কোম্পানী ঐ একই লোককে নায়েব দিওয়ান নিযুক্ত করে। অনুরূপ ভাবে বিহারে রাজা ধীরাজ নারায়ণকে এবং পরে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা সিতাব রায়কে নায়েব নাজিম ও নায়েব দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এতে এক দ্বৈত শাসনের মধ্যে আরেক দ্বৈত শাসন সৃষ্টি হয় ; নাজিম অর্থাৎ নবাব এবং দিওয়ান অর্থাৎ কোম্পানীর মধ্যে এক দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়, আবার কোম্পানী এবং নায়েব দীওয়ানের মধ্যে আরেক দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়। এর কারণ কোম্পানীর লোকবলের অভাব এবং লোকজন যা ছিল তাদের রাজস্ব শাসনে অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় কোম্পানী দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলনা। রাজস্ব শাসন এমনিতেই জটিল, প্রচুর অভিজ্ঞতা ছাড়া তা সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। রেজা খানকে রাজস্ব প্রশাসনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কোম্পানী কথা দেয় যে তারা রাজস্ব শাসনে প্রচলিত ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন করবে না। ভূমি বন্দোবস্ত, রাজস্ব সংগ্রহ, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকল কাজ রেজা খানের হাতে অর্পণ করা হয়। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পরে সমুদয় অর্থ কোম্পানীকে প্রদান করতেন।

দৈত শাসন ক্লাইভের সৃষ্টি, এবং ক্লাইভ যতদিন ছিলেন ততদিন দ্বৈত শাসনও বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ক্লাইভ আইন করেন যে কোম্পানীর কর্মকর্তারা উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবে না, তিনি এই মর্মে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে লিখিত মুচলেকা গ্রহণ করেন। তিনি আরো আইন করেন যে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নিতে পারবেন না। কিন্তু তিনি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বাড়তি আয় নিশ্চিত করার জন্য লবণ, সুপারি এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য

একটি সংস্থা গঠন করেন। এতে দেশী ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু কোম্পানীর সিনিয়র কর্মকর্তারা লাভবান হয়। ক্লাইভের সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা রেজা খানের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেনি কিন্তু ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে (ফেব্রুয়ারি ১৭৬৭) দ্বৈত শাসনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্লাইভের পরবর্তী গবর্ণর ছিলেন ভেরেলেস্ট (১৭৬৭-১৭৬৯)। এই সময়ে ভূমি রাজস্ব বেশ বৃদ্ধি করা হয় এবং রাজস্ব কঠোরভাবে আদায়ও করা হয়। ক্লাইভ বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেকটরকে পরামর্শ দেন যে বাংলার ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা উচিত হবে না, কলিকাতাস্থ কোম্পানীর কর্মকর্তারাও একই মত পোষণ করেন, তাঁরা পরিষ্কার বলেন যে রাজস্ব বৃদ্ধি দেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। কিন্তু বিলাতে কোর্ট অব ডাইরেকটরস ভিন্নমত পোষণ করে। তারা মনে করে যে বাংলা একটি কামধেনু, তাকে যতই দোহন করা হবে ততই দুধ দেবে। তারা মনে করে তাদের ভারতীয় সকল উপনিবেশের ব্যবসার সমুদয় মূলধন বাংলার রাজস্ব থেকে যোগাবে যাতে বিলেত থেকে কোন মূলধন আনতে না হয়।

ইহার ফল হয় মারাত্মক, রেজা খানের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা নিত্যাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করে। রেজা খান কোম্পানীকে জানান যে একচেটিয়া ব্যবসার ফলে কোম্পানীর কর্মচারীরা কম মূল্যে পণ্যদ্রব্যাদি কিনে অধিক মূল্যে বিক্রি করে, রায়তদেরকে নানাবিধ দ্রব্যদি নাম মাত্র মূল্যে সরবরাহ করতে বাধ্য করে, শুল্ক দিতে অস্বীকার করে এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু কোম্পানী রেজা খানের কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

পলাশীর যুদ্ধের পরে দেশের সম্পদ কমতে থাকে। ক্লাইভ সহ কোম্পানীর সিনিয়র কর্মকর্তারা মীর জাফরের নিকট থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে, এর পরেও ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকলেই এমনভাবে নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজে লিপ্ত হয় যে দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, অথচ রায়ত-কৃষকদের রাজস্বের হার বাড়তে থাকে, কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রেজা খান অভিযোগ করে বলেন যে আলীবর্দীর সময়ে পুর্ণিয়া জিলার রাজস্ব ছিল ৪ লক্ষ টাকা, ১৭৬৯ সালে তা বৃদ্ধি করে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়। দিনাজপুরের রাজস্ব ১২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ লক্ষ করা হয়। কোম্পানীর চাপে রেজা খানকেই এই বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করতে হয়। রায়তরা আমীল, আমীন ইত্যাদি রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কেউ পালিয়ে যায়, কেউ বা পেশা পরিবর্তন করে। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে রেজা খান কোম্পানীকে জানান ঃ ইতোপূর্বে এই দেশ এত সম্পদশালী ছিল যে দূর দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে আসত এবং লক্ষ লক্ষ টাকার পুঁজি খাটাত। এখন ব্যবসা কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারে যাওয়ায় এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে রায়তরা স্বর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকার না হলে মহাবিপর্যয় রোধ করা যাবে না। ক্লাইভের পরবর্তী গবর্ণর ভেরেলেস্টও কোম্পানীর বিলাতস্থ কোর্ট অব ডাইরেকটরসকে জানান ঃ

জটিল এবং বিভক্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে বাংলার রায়তদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে কৃষি এবং ব্যবসার অবনতি হয়েছে, উৎপাদন কমে গেছে এবং দরিদ্র প্রজাদের দূর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ একই সময়ে নবাবের দরবারস্থ ইংরেজ রেসিডেন্ট লিখেন ঃ এই সুন্দর ও মনোরম দেশটি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট ও নবাবের শাসনে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন তা ধ্বংস হওয়ায় পথে।

রাজস্ব শাসন সংস্কারের জন্য ভেরেলেস্ট নিজে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যেক জিলায় একজন ইংরেজ সুপারভাইজার নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তারা রাজস্ব সংগ্রহকারী এবং বিচার বিভাগীয় দেশী আমলাদের তত্ত্বাবধান করবে, অর্থাৎ দেশী কর্মকর্তাদের উপর একজন বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান করা হয়। দেশ শাসনে ইংরেজদের দায়িত্ব নেওয়ার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ভেরেলেস্টের এই পরিকল্পনা তাঁর পরবর্তী গবর্ণর কার্টিয়ারের সময়ে কার্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু সুপার- ভাইজারগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের দায়িত্ব ছিল ব্যাপক, একজন লোকের পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া জমিদার এবং আমীন (রাজস্ব সংগ্রাহক) সকলেই তাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা প্রভাব খাটিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করার সুযোগ পায়। এই সংবাদ জানতে পেরে বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেকটরস সুপারভাইজার প্রত্যাহারের আদেশ দেন। ভেরেলেস্টের সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা স্বার্থপরদের হাতে পড়ে দেশের ঘোলাটে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ ঃ

১১৭৬ বাংলা বা ১৭৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দের দূর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে এক কলংকজনক ঘটনা, ঐ সালের দূর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। দ্বৈত শাসনের ফলে প্রশাসনিক অব্যবস্থা, ইংরেজদের কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নুতা এবং ভূমি রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টির ফলে উৎপাদন হ্রাস এবং ফসলহানি সকল কিছু মিলে এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। দূর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক কারণ ১৭৬৮ এবং ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ এই দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ফসল উৎপাদন না হওয়া; ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দূর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং দূর্ভিক্ষের পরেই শুরু হয় মহামারী। ফলে এক কোটি লোক মৃত্যু বরণ করে, অর্থাৎ বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং যারা কোনক্রমে বেঁচে যায় তারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক কারণ অনাবৃষ্টি ছাড়া কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারী এবং গোমস্তারাও মানুষের দূর্দশা বাড়িয়ে দেয়। তারা খাদ্য শষ্য অধিক মুনাফা লাভের লোভে গুদামজাত করে এবং এমন কি বীজও তাদের নিকট বিক্রি করতে দরিদ্র কৃষকদের বাধ্য করে। মানুষ যখন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য মানুষের মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়, তখনো মুনাফাখোরদের জঘন্য ব্যবসা চলতে থাকে, এমনকি এত দুঃখ দূর্দশা সত্ত্বেও ভূমি রাজস্ব কমাবার পরিবর্তে দশ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। যারা মৃত্যু বরণ করে বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদের রাজস্ব তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে জোর

দূর্ভিক্ষ ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়। কোম্পানী প্রথমে নায়েব দীওয়ান মুহাম্মদ রেজা খানকে কুশাসন এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য দায়ী করে নিজেদের গা বাঁচাবার চেষ্টা করে; রেজা খানের বিরুদ্ধে তদন্ত হল, কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কোম্পানী এখন নিজেই দীওয়ানের দায়িত্ব ভার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ; অন্যদিকে কোম্পানীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩) নামে একটি নতুন আইন পাশ করে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ঃ

কোম্পানী দীওয়ানের দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠায়, এবং তিনি কার্টিয়ারের নিকট থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল এমন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে কোম্পানী এবং দেশবাসী বা রায়ত উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস দীর্ঘদিন বাংলা (এবং ভারতে) ছিলেন এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিতি ছিলেন। তিনি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ একজন কোরনী হিসেবে কলিকাতায় আসেন এবং পদোন্নতি পেয়ে কলিকাতা কাউনসিলের সদস্যও হন, তিনি মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে কোম্পানীর রেসিডেন্ট বা আবাসিক প্রতিনিধিও ছিলেন। প্রায় ১৫/২০ বৎসর বাংলায় থাকলেও তিনি ভূমি বা রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলনা। এখন গবর্ণর নিযুক্ত হয়ে এসে সম্পূর্ণ দিওয়ানী পরিচালনার ভার তাঁর উপরে পড়ে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, অর্থাৎ তিনি ভারতস্থ ইংরেজ অধিকৃত সকল এলাকার শাসন ভার লাভ করেন। এই সময় বাংলার বাইরে ইংরেজদের যুদ্ধ বিগ্রহ হয় এবং রাজ্য বিস্তার হয়, কিন্তু সেই বিষয় আমাদের আলোচনায় এখানে স্থান পাবে না।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানীর অধিকৃত ভারতের সমুদয় এলাকায় শাসনভার একজন গবর্ণর জেনারেল এবং ৪ জন সদস্যভুক্ত একটি কাউনসিলের (শাসন পরিষদ) উপর ন্যস্ত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর কাউনসিল ও গবর্ণরকে গবর্ণর জেনারেল ও কাউনসিলের অধীনস্থ করা হয়। গবর্ণর জেনারেল ও কাউনসিলের সদর দফতর কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্ণর জেনালের বা বড় লাট হিসেবে কাউনসিলের প্রধান বা সভাপতি নিযুক্ত হন। কাউনসিলের অন্য ৪ জন সদস্য হলেন ফ্রান্সিস, মনসন, ক্লেভারিং এবং বারওয়েল। এই আইনে কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়, সুপ্রিম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং ৩ জন নিম্নতর বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয় এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য একাধিক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তা বাংলার ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আলোচনা করা হল না। বাংলায় প্রত্যেক জিলায় একটি দিওয়ানী ও একটি ফৌজদারী

দূর্ভিক্ষ ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়। কোম্পানী প্রথমে নায়েব দীওয়ান মুহাম্মদ রেজা খানকে কুশাসন এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য দায়ী করে নিজেদের গা বাঁচাবার চেষ্টা করে; রেজা খানের বিরুদ্ধে তদন্ত হল, কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কোম্পানী এখন নিজেই দীওয়ানের দায়িত্ব ভার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ; অন্যদিকে কোম্পানীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩) নামে একটি নতুন আইন পাশ করে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ঃ

কোম্পানী দীওয়ানের দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠায়, এবং তিনি কার্টিয়ারের নিকট থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল এমন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে কোম্পানী এবং দেশবাসী বা রায়ত উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস দীর্ঘদিন বাংলা (এবং ভারতে) ছিলেন এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিতি ছিলেন। তিনি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ একজন কোরনী হিসেবে কলিকাতায় আসেন এবং পদোন্নতি পেয়ে কলিকাতা কাউনসিলের সদস্যও হন, তিনি মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে কোম্পানীর রেসিডেন্ট বা আবাসিক প্রতিনিধিও ছিলেন। প্রায় ১৫/২০ বৎসর বাংলায় থাকলেও তিনি ভূমি বা রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলনা। এখন গবর্ণর নিযুক্ত হয়ে এসে সম্পূর্ণ দিওয়ানী পরিচালনার ভার তাঁর উপরে পড়ে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, অর্থাৎ তিনি ভারতস্থ ইংরেজ অধিকৃত সকল এলাকার শাসন ভার লাভ করেন। এই সময় বাংলার বাইরে ইংরেজদের যুদ্ধ বিগ্রহ হয় এবং রাজ্য বিস্তার হয়, কিন্তু সেই বিষয় আমাদের আলোচনায় এখানে স্থান পাবে না।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানীর অধিকৃত ভারতের সমুদয় এলাকায় শাসনভার একজন গবর্ণর জেনারেল এবং ৪ জন সদস্যভুক্ত একটি কাউনসিলের (শাসন পরিষদ) উপর ন্যস্ত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর কাউনসিল ও গবর্ণরকে গবর্ণর জেনারেল ও কাউনসিলের অধীনস্থ করা হয়। গবর্ণর জেনারেল ও কাউনসিলের সদর দফতর কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্ণর জেনালের বা বড় লাট হিসেবে কাউনসিলের প্রধান বা সভাপতি নিযুক্ত হন। কাউনসিলের অন্য ৪ জন সদস্য হলেন ফ্রান্সিস, মনসন, ক্লেভারিং এবং বারওয়েল। এই আইনে কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়, সুপ্রিম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং ৩ জন নিম্নতর বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয় এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য একাধিক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তা বাংলার ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আলোচনা করা হল না। বাংলায় প্রত্যেক জিলায় একটি দিওয়ানী ও একটি ফৌজদারী

আদালত স্থাপিত হয়, রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জিলায় নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারী বা কালেক্টর দিওয়ানী আদালতের বিচার করতেন। ফৌজদারী আদালতে নায়েব নাজিমের অধীনে দেশী লোক বিচারের কাজ করতেন। কলিকাতায় সদর দিওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হয়, ইংরেজ গবর্ণর সদর দিওয়ানী আদলতে এবং একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও অভিজ্ঞ মুসলমান সদর নিজামত আদালতে বিচার করতেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জিলার কালেকটরের পদ বাতিল করে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, দিনাজপুর ও পাটনায় একটি করে প্রাদেশিক কাউনসিল এবং কলিকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি (রেভেনিউ কমিটি) স্থাপিত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-শুল্ক নীতি পরিবর্তন করেন। তিনি দস্তক ব্যবস্থা বাতিল করেন। ফলে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য শুল্ক দিতে হত। এই প্রশ্নটাই ছিল মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের প্রধান কারণ। হেস্টিংস বুঝতে পারেন যে কোম্পানীর কর্মচারীদের শুল্ক দিতে বাধ্য না করলে বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা থেকে যাবে এবং কোম্পানীর রাজস্ব আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বিভিন্ন জমিদারদের অধীনস্থ চৌকি বন্ধ করে দেন এবং কলিকাতা, হুগলী, মুর্শিদবাদ, ঢাকা এবং পাটনায় ৫টি কেন্দ্রীয় শুল্ক ভবন বহাল রাখেন। কোম্পানীর একচিটিয়া ব্যবসার তিনটি পণ্য, অর্থাৎ তামাক, লবণ এবং সুপারি ছাড়া অন্য সকল পণ্যের জন্য আড়াই শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়, এবং এই শুল্ক ইউরোপীয় এবং দেশী সকল ব্যবসায়ীর উপর প্রযোজ্য হয়। এর ফলে বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহারাজা নন্দকুমার প্রথম জীবনে তাঁর পিতার অধীনে রাজস্ব বিভাগে সামান্য চাকরি করতেন এবং নবাব আলীবর্দীর আমলে দুইটি পরগণার রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। সেখানে জমিদারদের উপর অত্যাচার এবং তহবিল তসরুপের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে বরখাস্ত এবং কারারুদ্ধ হন। নন্দকুমারের পিতা নবাবের প্রাপ্য শোধ করে দিলে তিনি মুক্তি পান এবং নবাবের অধীনে পুনরায় চাকরি লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তিনি হুগলীর ফৌজদার পদে কর্মরত ছিলেন। ইংরেজেরা ফরাসীদের কুঠি চন্দননগর আক্রমণ করলে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা নন্দকুমারকে ফরাসীদের সাহায্য করার আদেশ দেন। কিন্তু নন্দকুমার ইংরেজদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং এইভাবে নবাবের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ দেন। তখন নন্দকুমার ফরাসিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বাধা দিলে ফরাসীরা যুদ্ধে জয়লাভ করত এবং পরে নবাবের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। পলাশীর ফলাফলও হয়ত অন্যরূপ হতে পারত। তাই ইংরেজদের বাংলাদেশ বিজয়ে নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতকতা যে বহুলাংশে দায়ী তা অস্বীকার করা যায় না। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে নন্দকুমার ক্লাইভ এবং মীর জাফর উভয়ের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনি ইংরেজদের অধীনে উচ্চ পদ লাভ করে কলিকাতায় বসবাস করতে থাকেন, এই মহারাজা নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে এক

উৎকোচের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন যে মীর জাফরের বিধবা পত্নী মুন্নী বেগমকে তাঁর সতীনপুত্র অল্পবয়স্ক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস মুন্নী বেগমের নিকট থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করেন। তখন কলিকাতা কাউনসিলের ৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন হেস্টিংসের বিরোধী, তাঁরা নন্দকুমারের পক্ষ অবলম্বন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস নন্দকুমারের অভিযোগ কাউন্সিল সভায় উত্থাপন করতে দিলেন না। ইতোমধ্যে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জাল করার অভিযোগ আনেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয় এবং ফাঁসি কার্যকর হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ নন্দকুমারকে নির্দোষ বলতে চান এবং বলেন যে হেস্টিংস প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে নন্দকুমারকে চরম শাস্তি দেন। কিন্তু নন্দকুমারকে খুব একটা নির্মল চরিত্রের লোক বলা যায় না। সিরাজ উদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নন্দকুমার দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাঁকে।

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষা আয়ত্ব করেন। তিনি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, তা কলিকাতা মাদ্রাসা নামে দুইশত বৎসরেরও বেশি সময় ধরে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। তাঁর প্রাচ্য শিক্ষা প্রসারের প্রতি আগ্রহে ও উৎসাহে স্যার ইউলিয়াম জোন্স অনুপ্রাণিত হন। তিনি প্রাচ্য সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার জন্য কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল) স্থাপন করেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যুক্ত হন, এশিয়াটিক সোসাইটি জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় যে অপূর্ব অবদান রাখেন তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। এই সোসাইটি এখনো জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং প্রকাশনায় লিপ্ত রয়েছে, এবং এর অনুকরণ ও অনুসরণে বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশেও এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়েছে। হেস্টিংসের অনুপ্রেরণায় হলহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের আইন শাস্ত্রও অনুবাদ করেন। ওয়ারেন হোস্টিংসের সমর্থনে ও সাহায্যে চার্লস উইলকিন্স বাংলাদেশে ছাপা খানা স্থাপন করেন এবং তাঁর অনূদিত ইংরেজি গীতা প্রকাশ করেন। বাংলা টাইপে হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ সর্বপ্রথম ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হেস্টিংসের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং বিলেতের পার্লিয়ামেন্ট তিনি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরে তাঁকে ইমপীচ্ বা অভিশংসন করে। অবশ্য তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। সে যাই হোক তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কর্মকাণ্ড তাঁকে এখনো ভারতীয় এবং বাঙ্গালীদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

ওয়ারেন হেস্টিংসকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন কলিকাতার গবর্ণর করে পাঠানো হয় তখন বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল, দ্বৈত শাসনের কুফল স্বরূপ বাংলায় এমন

মারাত্মক এক দুর্ভিক্ষ হয় যে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা শ্মশানে পরিণত হয়। অতএব নতুন গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসের উপর ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের দায়িত্ব বর্তায় ; কোম্পানী আশা করে যে হেস্টিংস এমন একটি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন যাতে কোম্পানী ও দেশী কৃষক প্রজা সকলের মঙ্গল হয়। কিন্তু রাজস্ব সংস্কার করতে গিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি কি হবে? মোগল আমলের সময় বাংলার ভূমি জরিপ করার তেমন কোন প্রমাণ না থাকলেও মোগল ভূমি প্রশাসনের একটা ভিত্তি ছিল, তোডরমল্লের বন্দোবস্ত, শাহ শুজা এবং মুর্শিদ কুলী খানের বন্দোবস্ত। জমিদার তালুকদার কানুনগো ইত্যাদির মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন শক্তি নিরূপণ করার একটা পদ্ধতি ছিল, মাঝে মাঝে সীমিত আকারে জরিপও হত। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে বিভিন্ন সময়ে অর্থের লোভে রাজস্ব এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যে ভূমির উৎপাদন শক্তির মান নির্ণয় করার উপায় ছিল না। তাছাড়া পলাশীর পরে রাজস্ব শাসনে অব্যবস্থা এবং দুর্ভিক্ষের ফলে পতিত জমিও বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সম্পর্কে কোন সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় রাজস্ব নির্ধারণের জন্য একটা ভিত্তি মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি বড় অসুবিধা হল রাজস্ব সংগ্রহ করার মাধ্যম কি হবে? দিওয়ানী লাভের পরে কোম্পানী স্বীয় কর্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করেনি, কারণ কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহ করার মত লোকবলও ছিল না, আবার যারাও ছিল তাদের রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই কোম্পানী রেজা খানকে নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে নবাবী আমলের আমীল আমিনদের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করে। হেস্টিংস বুঝতে পারেন যে তখনো কোম্পানীর এত লোক নাই যে প্রত্যেক এলাকায় নিজস্ব এজেন্ট নিযুক্ত করে রায়তদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করবে। তাছাড়া ভাষা, রীতি নীতি, স্থানীয় আচার আচরণ সম্পর্কেও কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিল অজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাহীন; সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহে খরচ ও কম হবে না, তাই ওয়ারেন হেস্টিংস মনে করেন যে দেশী এজেন্টদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতে হবে। তাই হেস্টিংসের তৃতীয় অসুবিধা হল দেশী এজেন্ট নির্ধারণ করা। কাদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে? মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ এবং সর্ব নিম্নস্তর নির্দিষ্ট ছিল, সর্বনিম্ন স্তরে রায়ত বা কৃষক, চাষী; তারাই রাজস্ব প্রদান করে, এই রাজস্ব সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ সরকারের নিকট পৌছে। কিন্তু এই দুই স্তরের মধ্যে ছিল আরো কয়েকটি স্তর এদের মধ্যে একটি স্তর হল জমিদার বা ইজারাদার, আর একটি স্তর হল আমীল, আমিন অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা বা রাজস্ব সংগ্রাহক। ফলে রায়ত বা প্রজা যেই রাজস্ব আদয় করে তা মধ্যবর্তী স্তরের হাত ঘুরে সরকারি কোষাগারে পৌছতে পৌছতে রাজস্বের পরিমাণ বা অংক কমে যেত। এই মধ্যবর্তী স্তর নির্বাচন করাই হল ওয়ারেন হেস্টিংসের আসল সমস্যা। পলাশীর আগে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ছিল, পলাশীর পরে তা নষ্ট হয়ে যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে ভূমি এবং রাজস্ব ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

ওয়ারেন হেস্টিংস মনে করেন যে প্রথমে ভূমি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে, অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ কি, কর্ষিত এবং পতিত ভূমি, খাল, বাস্তভিটা, পুকুর ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারিত না হলে ভূমির কর নির্ধারণ করা যাবে না। ভূমি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী কোন বন্দোবস্তই সফল হবে না। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ আরো মনে করে যে জমিদারেরা এবং তালুকদারেরা কোন মতেই সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত্যু বরণ বা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে যে সকল ভূমি পতিত বা আনাবাদী রয়ে গেছে, সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উপায়ও দেখা গেল না। জমিদার বা আমীল এইতথ্য সরবরাহ করবে এই আশা করা বৃথা। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে সমুদয় জমি পাঁচ বৎসরের জন্য নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে বন্দোবস্ত দেবেন। কোম্পানী মনে করে যে ভূমির সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম না করা পর্যন্ত জমিদারেরা তাদের জমিদারী নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করবে, এতে জমির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পাবে। জমিদারেরাই জমির উৎপাদন শক্তি তথা মূল্য সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ওয়াকিবহাল। অতএব সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট পাঁচ বৎসরের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হল।

ইহা ইজারাদারী ব্যবস্থা, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ডাককারীর সঙ্গে পাঁচ বৎসরের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ জমিদারেরা জমিদারীর প্রকৃত মূল্য জানতেন বলে তারা উচ্চ মূল্যে ডাক দেয়নি, যারা নিলাম ডেকে পাঁচ সনা ইজারা লাভ করে তারা ফটকাবাজারী, প্রায় সকলেই ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে দালালী পাইকারী ব্যবসা করে হঠাৎ করে পয়সাওয়ালা হয়েছে। তাদের হাতে নগদ অর্থ, তাদের ব্যবসাই ছিল মুনাফাখোরী, অতএব জমিদারী কিনে আরো বেশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এবং জমিদার হয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জমিদারী ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। তাদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার শক্তিও ছিল না, ধৈর্য ও ছিল না, তারা মনে করে যে নগদ অর্থ যখন আছে, জমিদার হওয়া যাবে। কিন্তু দু'য়েক বৎসর যাওয়ার পরে তারা বুঝতে পারে তারা যত দিয়েছে জমির মূল্য তত নয়। তাই তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের জন্য তারা রায়তদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকে। তাদের অত্যাচারে অনেক রায়ত বাড়ি ঘর ছেড়ে পলায়ন করে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে হেস্টিংস প্রদেশিক কাউনসিলের নিকট থেকে পাঁচ সনা বন্দোবস্তের ফলাফল জানাবার চেষ্টা করেন। ঢাকা কাউনসিল জানায় যে ইজারদারী বন্দোবস্তের পর থেকে, অর্থাৎ ১৭৭২ সাল থেকে দেশের কৃষি ও কৃষক সমাজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সকল প্রাদেশিক কাউনসিল থেকে একই রূপ রিপোর্ট আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও স্বীকার করেন যে পাঁচ সনা বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষির সমূহ ক্ষতি হয়েছে। ১৭৭৫ সনের ৮ মার্চ তিনি লিখেন ঃ "১৭৭২ সালে দেশের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কোম্পানীর জ্ঞান অতি সীমিত ছিল। তাই আমাদের নিলামী বন্দোবস্ত ছাড়া উপায় ছিল না। জমিদারেরাই শুধু জমির মূল্য জানত, তারা সরকারের নিকট

জমির মূল্য জানিয়ে দেবে এমন আশা করা বাতুলতা। তাই তাদের জমির মূল্য যাচাই করার একমাত্র উপায় ছিল নিলামের মাধ্যমে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া। কিন্তু সমস্যা হল এই যে ফটকাবাজীরা এমন জোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় যে অনেক ক্ষেত্রে জমির মূল্যের অনেক বেশি নিলামে ডাক উঠেছে। ফলে কৃষকদের উপর দারুণ চাপ পড়েছে। প্রকৃত পক্ষে নিলাম ডাককারী ফটকাবাজদের সঙ্গে জমি বা কৃষকের কোন সম্পর্ক ছিলনা, যেমন জমিদারদের সঙ্গে ছিল। জমিদাররা জানত যে তাদের এবং কৃষকদের স্বার্থ অবিচ্ছেদ্য, তাদের নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই জমিদারেরা কৃষকদের উপর এমন অতিরিক্ত চাপ দিত না, যাতে কৃষকদের সমূহ ক্ষতি হয়। কিন্তু ইজারাদারদের বা নিলাম ডাককারীদের কৃষকদের সঙ্গে কোন স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য টাকা খাটিয়ে মুনাফা লাভ। তাদের ভয় ছিল যে মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তারা বকেয়া খাজনা আদায় করার সুযোগ পাবে না। তাই তারা তাদের শোষণ প্রক্রিয়া জোরদার করে।

বিলেতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরস পাঁচ সালা বন্দোবস্তের ব্যর্থতার কথা জানতে পারলে তারা নিলামী ব্যবস্থা বিলোপ করে বাৎসরিক বন্দোবস্ত এবং বিশেষ করে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেন। ফলে নিলামী, ব্যবস্থা যেমন বাদ দেয়া হয়, প্রাদেশিক কাউনসিলও বিলুপ্ত করা হয় এবং কলিকাতায় বোর্ড অব রেভেনিউ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বোর্ড প্রত্যেক জিলায় কালেকটর নিযুক্ত করে বাৎসরিক মেয়াদে ভূমি বন্দোবস্ত দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা নেন। প্রধানতঃ জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া চালু হয়, কিন্তু যদি কোন জমিদার বাৎসরিক বন্দোবস্ত নিতে অপারগ হয়, সেই জমি ইজারাদারদের সঙ্গে বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হয়। অনেক জমিদার উচ্চ রাজস্ব প্রদান করে বন্দোবস্ত নিতে অস্বীকার করেন এবং দশ শতাংশ মালিকানা ভাতার পরিবর্তে জমি ইজারাদারদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেন। ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবস্থার পরিবর্তন হল না, যেখানে ইজারাদারেরা বন্দোবস্ত পায় সেখানে তাদের শোষণ চলতেই থাকে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে পালিয়ামেন্ট পিটস্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করে। ভূমি বন্দোবস্তে স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য এই আইনে কলিকাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ সনে ইংলন্ডে ফিরে যান, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন। কর্নওয়ালিস নিজে ছিলেন একজন বড় এস্টেটের বা ভূ-সম্পত্তির মালিক, বিলেতের পার্লিয়ামেন্টে ও ভূ-স্বামীদের আধিপত্য ছিল। তাই তারা বাংলার জমিদারদের বৃটিশ ভূ-স্বামীদের সমতুল্য মনে করত। কিন্তু বাংলা দেশের জমিদারেরা ছিল রাজস্ব সংগ্রাহক, জমির মালিক ছিল সরকার, নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে তারা রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত হতেন এবং তাদের

বলা হত জমিদার। জমিদারেরা সরকারি রাজস্ব আদায়ের পরে উদ্বৃত্ত টাকা নিজে রাখতেন, তবে মোগল শাসন ব্যবস্থায় জমিদারের উদ্বৃত্ত শতকরা ১০ ভাগের বেশি হত না। সরকার জমির মালিক হলেও সরকার, জমিদার এবং রায়ত সবাই মিলে মালিকানা ভোগ করত। রায়ত সুখী না হলে জমির উৎপাদন বাড়বে না এবং রাজস্ব ক্ষতি হবে, জমিদার খুশী না হলে রাজস্ব আদায় বাড়বে না এবং সরকারি কোষাগারে ঘাটতি পড়বে। তাই মোগল শাসন আমলে শোষণের উপায় ছিল না, সরকারি আমীল আমিনরা দেখত যাতে জমিদারেরা শোষণ না করে, আবার সরকারি রাজস্ব প্রদানে ফাঁকি না দেয়। এই কারণেই দেখা যায় খরা, বন্যা, ইত্যাদির কারণে শষ্য নষ্ট হলে বা উৎপাদন ব্যাহত হলে সরকার তকবী বা কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করত। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া জমিদারেরা সরকারি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হলে জমিদারদের শাস্তি দেওয়া হত, শাস্তি ছিল জরিমানা করা, আটক করা, এমনকি প্রয়োজনে শারীরিক নির্যাতনের কথাও শুনা যায়। কিন্তু জমিদারদের উচ্ছেদ করা হত না, জমিদার নিজে অসমর্থ হলে পরিবারের অন্য কাউকে জমিদারী ছেড়ে দেওয়া হত। রায়তদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা আইন মত খাজনা দিত, প্রাকৃতিক কারণে শষ্য হানি হলে ক্ষতির পরিমাণ মত রেয়াত পেত এমনকি ঋণও পেত, কিন্তু জমিদারেরা তাদের উচ্ছেদ করতে পারত না। সরকার, জমিদার এবং রায়ত একটা নিয়মের মধ্যে বাঁধা ছিল।

বিলেতের ভূ-স্বামীরা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, তাই তারা বাংলার ভূমি ব্যবস্থা বুঝতে পারেনি। তারা পাঁচ সালা বা এক সনা বন্দোবস্ত করে সমস্যার সমাধান করতে চায়, কিন্তু সুফল লাভে ব্যর্থ হয়। কর্নওয়ালিস পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্টের নির্দেশের প্রতি সঙ্গতি রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেন। কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল একটা নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব লাভ করা, ইতোপূর্বে বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় রাজস্ব আদায়ে অনেক ঘাটতি দেখা দেয়। কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারদের সঙ্গে একটি দশ সনা বন্দোবস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা বিলেতের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করলে দশ সনা বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে ঘোষণা করা হবে। অনুমোদন পেয়ে কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সনের মার্চ মাসে দশ সনা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে ঘোষণা করেন। এই এক ঘোষণার ফলে বাংলাদেশের আবহমান ভূমি ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়ে যায়। এর ফলে সরকার জমিদার ও রায়ত সকলের স্বার্থগত পরিবর্তনও সাধিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারেরা জমির মালিকে পরিণত হয়, জমির উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, রায়তরা জমিদারদের প্রজায় পরিণত হয়। এখন থেকে জমিদারেরা জমি বিক্রি করতে, দান করতে বা অন্য কোন ভাবে ব্যবহার করতে পারবে, তাতে সরকারের পূর্ব অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। দশ সনা বন্দোবস্ত কালে ধার্যকৃত রাজস্ব আর বাড়ানো হবে না বলে সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, অর্থাৎ রাজস্ব সর্বকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। জমিদারেরা পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করবে, তবে শর্ত ছিল যে জমিদারদের নিয়মিত রাজস্ব

পরিশোধ করতে হবে, পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের ভূমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। জমিদারদের বিচার এবং শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল, তা এখন থেকে তারা প্রয়োগ করতে পারবে না। সায়ের বা ভূমি-রাজস্ব ছাড়া অন্য রাজস্ব অর্থাৎ শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা থেকে জমিদারেরা বঞ্চিত হয়। অতএব রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা থেকে জমিদারেরা বঞ্চিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা বিশেষ করে রেগুলেটিং এ্যাক্টের ফলে নিযুক্ত কলিকাতা কাউনসিলের সদস্যরা ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেন। যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে ছিল তাদের যুক্তি ছিল যে ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আসলে জমিদারেরা ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে এবং উদ্বৃত অর্থ ভূমির উন্নয়নে ব্যয় করা হবে, ভূমি উন্নত বা উর্বর হবে, কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। ইংলন্ডে ভূ-স্বামীরা কৃষি শিল্পে বিপ্লব আনয়ন করে, তারা মত প্রকাশ করে যে বাংলাদেশেও জমিদারদের নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব । তারা আরো আশা করে যে জমিদারেরা সরকারের অনুগ্রহ ভাজন হিসেবে সরকার প্রদত্ত সুবিধাদির বিনিময়ে সরকারের অনুগত থাকবে এবং সমাজের নেতা হিসেবে জমিদারেরা হবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে সদিচ্ছা বা যুক্তি যাই থাক না কেন, তা যে ইপ্সিত সুফল বয়ে আনে তা বলা যায় না। মোগল আমলে ভূমি ব্যবস্থা যাই থাকুক না কেন বা জমিদারদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন, পলাশীর পরে প্রায় তিন যুগ সময়ের পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং উত্থান পতনের ফলে জমিদার বা ভূ-স্বামীদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন হয়। পাঁচ সনা বন্দোবস্তের ফলে অনেক বুনিয়াদী জমিদার জমিদারী ব্যবস্থাপনা থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের স্থান নেয় ফটকাবাজী, নিলাম ডাককারী নতুন পয়সাওয়ালা লোক, এরা ছিল নতুন পুঁজিপতি, পূর্বে ভূমির সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এদের অধিকাংশই কোম্পনীর কর্মচারী, মুৎসুদ্দী, বানিয়া ইত্যাদি তারা প্রভাব খাটিয়ে ভূমির ইজারা লাভ করে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তারাও তাদের অধীনস্থ বানিয়াদের নামে বেনামীতে ইজারা লাভ করে, এমনকি গবর্নর জেনারে ওয়ারেন হেস্টিংসও বানিয়াদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার ইজারা লাভ করেন। এইভাবে ভূমি সম্পদে বানিয়া ও মুৎসুদ্দীর অনুপ্রবেশের ফলে বাংলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। বানিয়া-মুৎসুদ্দী শ্রেণীর লোকেরাই ধীরে ধীরে ভূ-স্বামী বা জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় এবং বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় তারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আংশিক ভাবে এর উদ্দেশ্য সফল করে। তা এই যে কোম্পানী একটি নির্দিষ্ট আয়ের পথ খুঁজে পায়, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পনীর ভূমি আয় স্থির হয়ে যায়। এর ফলে পলাশীর পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু এতে ভূমিতে প্রজাদের এবং মধ্যস্বত্বানদের স্বত্ব সরকার সম্পূর্ণ অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে। ফলে প্রজারা সম্পূর্ণভাবে জমিদারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেখা যায় এতে সরকারের ভীষণ ক্ষতি হয়, কারণ জমির মূল্য ধীরে ধীরে বহুগুণ বেড়ে গেলেও সরকার জমিদারদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট রাজস্বের এক পয়সাও বেশি দাবী করতে পারত না। সরকারকে আয় বাড়ানোর জন্য জনগণের উপর নানা রকম ট্যাক্স বসাতে হয়, এতে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার সমাজেও বিরাট পরিবর্তন আসে। এই বন্দোবস্ত কোন জরিপের উপর নির্ভর করে হয়নি, ফলে জমিদারদের উপর নির্ধারিত রাজস্বের ভিত্তি ছিল দূর্বল। কোন কোন জমিদারীতে সম্পদের অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারিত হয়, আবার কোন কোন জমিদারীতে রাজস্ব প্রকৃত সম্পদের তুলনায় অনেক কম হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি নিয়ম এই ছিল যে কোন জমিদার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হলে তার জমি নিলামে বিক্রি হবে। তাকে সূর্যাস্ত আইন বলা হত। ইহার ফলে অধিক রাজস্ব আরোপিত জমিদারী গুলো সমস্যায় পড়ে যায়। এই জমিদারী গুলো অল্পকালের মধ্যে সূর্যাস্ত আইনে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। বাংলার বেশ কয়েকটি বৃহৎ জমিদারী সূর্যাস্ত আইনের কবলে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক রাজস্ব দিত ছয়টি বৃহৎ জমিদারী, এগুলি হল বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরের জমিদারী। মোগল আমলে এই জমিদারেরা রাজা মহারাজা উপাধি লাভ করত। কিন্তু একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া বাকী সবগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বৎসরের মধ্যে সূর্যাস্ত নিলামের কবলে পড়ে, যারা এই জমিদারী গুলোর নতুন জমিদার হয় তারা ছিল হয় সরকারি কর্মচারী, বা জমিদারদের কর্মচারী, বা ব্যবসায়ী, মহাজন, বানিয়া মুৎসুদ্দী ইত্যাদি। সূর্যাস্ত আইনের সুযোগে যে সব নতুন জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল কাসিমবাজার জমিদারী। এর প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবু গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যক্তিগত বানিয়া ছিলেন। এর পরে মুর্শিদাবাদের কান্দির জমিদারী, এর প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গা গোবিন্দ সিং ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের মুৎসুদ্দী। যশোরের নড়াইলের জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণরায়, তিনি নাটোর জমিদারীর প্রধান গোমস্তা ছিলেন। কলিকাতা ঠাকুর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা গোপীনাথ ঠাকুর ও দ্বারাকানাথ ঠাকুর প্রথমে সরকারি কর্মচারী ছিলেন কিন্তু পরে ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকার জমিদার খাজা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলিমুল্লা ছিলেন ব্যবসায়ী। খাজা আলিমুল্লা ছিলেন নবাব আবদুল গণির পিতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত এই সব বিশাল জমিদারীর মালিকেরা পরবর্তী কালে রাজা, মহারাজা ও নবাব উপাধি লাভ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে হিন্দু জমিদারেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তারাই ছিল বড় বড় জমিদারীর মালিক। নতুন জমিদার যারা পুরাতনদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু, কারণ তখন মুসলমানদের হাতে অর্থ ছিল না, রাজত্ব হারিয়ে তারা

সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাই সার্বিক বিচারে বলা যায় যে মুসলমানেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ইংরেজ লেখকেরা এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি কুফল হল জমিদারীতে জমিদারদের অনুপস্থিতি এবং সেই সুযোগে পর্যায়ে ক্রমে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দশ বৎসর মেয়াদ শেষ হওয়ার মধ্যেই বাংলার প্রায় অর্ধেক ভূমি নতুন জমিদারদের হাতে যায়। এরা প্রায় সকলেই ছিল ব্যবসায়ী, তারা জমিদারীতে না থেকে তাদের ব্যবসা নিয়েই শহরে থাকে। তাদের নায়েব গোমস্তরাই জমিদারী পরিচালনা করতে থাকে। অনেক জমিদার বিশেষ করে নতুন জমিদারেরা জমিদারী পরিচালনার ঝামেলা এড়াবার জন্য নানা রকম মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে। রায়তদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং বাংলায় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব সমাজে এক নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। শুধু তাই নয় মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অনেকেই আবার নতুন মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে নিজেরা অনুপস্থিত থাকে। এরা সকলে শহুরে জীবনের সুখ শান্তি চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রামকে অবহেলা করতে থাকে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ জমিদার শ্রেণীর দ্বারা কৃষি বিপ্লবের যে আশা করেছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ক্রমে ক্রমে সমাজ বিন্যাসে নতুন নতুন স্তর সৃষ্টি হয় এবং নতুন সমস্যারও জন্ম দেয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে, সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা অন্যান্য উৎসবে, আচারে আচরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

কোম্পানী আমলে শাসন সংস্কার ঃ

ভারতে ইংরেজ শাসন কাল দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে কোম্পানীর শাসন, কোম্পানীই প্রথম শাসন প্রতিষ্ঠা করে। রেগুলিটিং এ্যাক্ট থেকে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট মাঝে মাঝে আইন পাস করে কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনই বহাল থাকে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারত শাসন কোম্পানীর হাত থেকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উপর অর্পিত হয়।

কর্নওয়ালিসের সময় বাংলাদেশ কতকগুলি জিলায় বিভক্ত হয়, জিলা শাসনকার্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে গঠে, প্রথমে জিলার সংখ্যা ছিল ৩৫, পরে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জিলার সংখ্যা কমিয়ে ২৩টি করা হয়। প্রত্যেক জিলায় এবং ৩টি শহরে ইংরেজ বিচারকের অধীনে দিওয়ানী আদালত গঠিত হয়, এবং কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং পাটনা, এই চারটি বড় বড় শহরে ৪টি আপীল আদালত স্থাপিত হয়, কলিকাতাস্থ সদর দিওয়ানী আদালত সর্বোচ্চ আপীল আদালতে পরিণত হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের জন্য ৪টি সেসন আদালত প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেকটিতে দুইজন করে ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত করা হয়। এঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বিচার করতেন বলে এই আদলতকে কোর্ট অব সার্কিট বা ভ্রাম্যমান আদালত বলা হত। সদর নিজামত আদালত গবর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউনসিলের অধীনে ন্যস্ত হয়। কালেকটরের হাত থেকে

দিওয়ানী বিচারের ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়। দিওয়ানী আদালতের ইংরেজ জজগণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন এবং পুলিশ তাঁদের অধীনে ছিল। প্রত্যেক জিলা কয়েকটি থানায় বিভক্ত করে প্রত্যেক থানায় একজন দারোগা নিযুক্ত করা হয়।

কর্নওয়ালিসের আগে দেশ শাসনের উচ্চ পদে ভারতীয়রা নিযুক্ত হত, কিন্তু কর্নওয়ালিসের নীতি ছিল ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিযুক্ত না করা, তিনি ম্যাজিস্টেট, কালেকটর, দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক, উর্ধতন পুলিশ কর্মচারী এবং অন্যান্য উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে ইংরেজদের নিযুক্ত করতেন। কিন্তু এই দেশের সমাজ, জনগণের আচার আচরণ, রীতি নীতি, এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বিদেশ থেকে আগত কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা না থাকায় কর্নওয়ালিসের এই সংস্কার বিশেষ ফলপ্রসু হয়নি। গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ণওয়ালিসের এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। রেজিষ্ট্রার নামধারী একজন অধস্তন ইংরেজ বিচারক প্রতি জিলায় নিযুক্ত হতেন, ইনি দুই শত টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা নিষ্পত্তি করতে পারতেন, নিম্নপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তারা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা বিচার করতে পারতেন। বেন্টিঙ্ক রেজিষ্ট্রারের পদ এবং কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনার ৪টি আপীল আদালত উঠিয়ে দেন, এবং তিনি ভারতীয় বিচারকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। মুনসিফ, সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন যথাক্রমে তিনশত টাকা, এক হাজার টাকা ও পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা বিচার করার অধিকার পান। জিলা আদালতের ইংরেজ জজ যে কোন দাবির মামলা করতে পারতেন, তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেত সদর দিওয়ানী আদালতে, জজেরা মুনসিফ ও সদর আমিনের কার্যাদি পরীক্ষা করতেন।

কর্নওয়ালিসের সময় প্রত্যেক জিলায় ২ জন ইংরেজ প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন, একজন কালেকটর এবং আর একজন জজ। কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত হতেন এবং কলিকাতাস্থ বোর্ড অব রেভেনিউর অধীনে থাকতেন। জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাজও করতেন এবং পুলিশও তাঁর অধীনে ছিল। ১৮০৮ সালে কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের জন্য একজন করে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। বেন্টিকের সময় এই পদগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সময়ে ১৯২৯ সালে কয়েকটি জিলা নিয়ে একটি ডিভিশন বা বিভাগের সৃষ্টি হয়, এবং জিলাগুলো আবার সাব-ডিভিশানে বা মহকুমায় বিভক্ত হয়। জিলার কালেকটরগণ কমিশনার অব রেভেনিউ এবং সারকিটের অধীনস্থ হয় এবং বিভাগীয় কমিশনার পুলিশ বিভাগেরও কর্তা হন। চারটি আপীল আদালত লোপ করে কমিশনারকে ভ্রাম্যমান সেসন আদালতের জজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সেসন জজের কাজ কমিশনারের হাত থেকে নিয়ে জিলা জজের হাতে দেওয়া হয় এবং জজদের নিকট থেকে ম্যাজিস্টেটের কার্যাদি নিয়ে কালেকটরের হাতে দেওয়া হয়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কালেকটর ও ম্যাজিস্টেটের পদ পৃথক করা হয়, কিন্তু

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই দুই পদ আবার একজনের উপরে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে যাদের আমরা ডি.সি.বা ডেপুটি কমিশনার (জিলা প্রশাসক) বলি তখন তাদের বলা হত ডি. এম. বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। বেন্টিংঙ্কের সময়ে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয় এবং আরো কয়েক বৎসর পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়। এই দুই পদে দেশী যোগ্য ব্যক্তিরা নিযুক্তি লাভ করতে পারত। বেন্টিক জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন, পরে তারা এস. ডি. ও. বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার বা মহকুমা প্রশাসক পদে নিযুক্তি লাভ করত। ১৮৩১ সালে রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা মোকাদ্দমা বিচারের ভারও কালেকটরের হাতে দেওয়া হয়, এই ভাবে ম্যাজিস্টেট-কালেকটর জিলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তায় পরিণত হন। জিলা জজের উপর থেকে অতিরিক্ত কাজের বোঝা কমাবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত করা হয়। দেশীয়দের চাকুরি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সদর আমিন, মুনসেফ এবং আরো কয়েকটি অল্প বেতনের পদের সৃষ্টি হয়, অবশ্য তাদের বিচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ জিলা জজের আলাদতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সদর দিওয়ানী আদালতে আপীল করার বিধান করা হয়। জিলা জজের রায়ের বিরুদ্ধেও সদর দিওয়ানী আদালতে আপীল করার বিধান ছিল।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে সদর দিওয়ানী আদলতের গঠন পরিবর্তন করা হয়। পূর্বে গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁর কাউনসিল সদস্যরা এই আদালতে বিচার করতেন, কিন্তু এখন এই উচ্চ আদলতে তিন জন ইংরেজ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮১১ সালে একজন প্রধান জজ বা চীফ জজের পদ সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজন মত জজের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে ক্রমে সদর দিওয়ানী আদালত শুধু আপীল আদালতের কাজ করে, এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতের প্রিভি কাউনসিলে আপীলের ব্যবস্থা করা হয়। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় থেকে সরকারি উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিযুক্তির নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ ২০ বৎসরের জন্য নবায়ন করা হয়। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে পাশ করা এই নতুন সনদ বা চার্টার এ্যাক্টে (১৮৩৩) ঘোষণা করা হয় যে জাতি ধর্ম নিবিশেষে উপযুক্ত ভারতবাসীকে শাসন কার্যের সকল বিভাগে নিযুক্ত করা যাবে। এই সনদে শাসন কার্যেরও নানা রূপ পরিবর্তন করা হয়। এখন থেকে বাংলার বড়লাট বা গবর্ণর জেনারেল ভারতের বড়লাট বা গবর্ণর জেনারেলে পরিণত হন। এতদিন পর্যন্ত শাসন কর্তৃপক্ষের নাম ছিল গবর্ণর জেনারেল অব বেঙ্গল ইন কাউনসিল, অর্থাৎ সপারিষদ বাংলার বড়লাট, যদিও এই কাউনসিল এবং বড় লাট সারা ভরতের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ ছিল। কিন্তু এই সনদে নাম পরিবর্তন করে বলা হয় গবর্ণর জেনারেল অব ইন্ডিয়া ইন কাউনসিল বা সপারিষদ ভারতের গবর্ণর জেনারেল বা বড় লাট। গবর্ণর জেনারেলের কাউনসিলে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্তির বিধান করা হয়, তবে এই সদস্যকে একজন আইনজ্ঞ হতে হবে এবং তিনি শুধু যে সকল সভায় আইন প্রণয়ন করা হত, সে সকল সভায় বসতে পারতেন, তিনি আইন সদস্যরূপে অভিহিত হন। লর্ড মেকলে এর প্রথম আইন সদস্য ছিলেন।

১৮৫৩ সালে নতুন সনদে আইন সদস্য অন্য ৩ জন সদস্যের ন্যায় গবর্ণর জেনারেলের কাউনসিলের পূর্ণ সদস্য হলেন। এতে আরো বিধান করা হয় যে কাউনসিল যখন নতুন আইন প্রণয়ন করবেন তখন কাউনসিলের চারিজন সদস্য ছাড়াও ভারতের সেনাপতি, বাংলার চীফ জাষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি, অন্য একজন জজ এবং বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের একজন করে প্রতিনিধি সহ মোট বার জন কাউনসিলের সদস্য হবেন। কাউনসিলে কোন বে-সরকারি ইংরেজ সদস্য বা ভারতীয় সদস্য ছিল না, বড়লাট ইচ্ছে করলে কাউনসিলের সিদ্ধান্ত ভেটো বা নাচক করে দিতে পারতেন।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বারানসী, রোহিলখণ্ড এবং আসাম, আরাকান, টেনাসেরিম প্রভৃতি সমুদয় এলাকা বাংলা সরকারের অধীনে ছিল। কোম্পানীর ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বাংলা, বাংলা জয়ের পরে যখন যেই এলাকা অধিকৃত হয়, সমগ্র এলাকা বাংলা সরকারের অধীনস্থ হয়। ১৮৩৬ সনে বারানসী ও এর পশ্চিম দিকস্থ ভূ-ভাগ একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। এর নাম হয় আগ্রা প্রদেশ, পরে তা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ নামে অভিহিত হয়। এই প্রদেশও বাংলা প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ হলে এর শাসনভার একজন পৃথক লেফটেন্যান্ট গবর্ণর বা ছোট লাটের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এদিকে গবর্ণর জেনারেল বাংলার গবর্ণরের দায়িত্বও পালন করতেন, ১৮৩৩ সন থেকে তাঁর অনুপস্থিতিতে কাউনসিলের একজন সদস্য ডেপুটি গবর্ণর রূপে বাংলা শাসন করতেন। ১৮৪৩ সন থেকে বাংলাদেশে একটি পৃথক সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একজন সেক্রেটারি (সচিব) এবং দুইজন আন্ডার-সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও একজন লোকের পক্ষে ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং বাংলার গবর্ণর এই দুইটি পদের দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এই জন্য ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য একজন লেফটেনেন্ট গবর্ণর বা ছোট লাট নিযুক্ত করা হয়, ঐ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে লেফটেন্যান্ট গবর্ণর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লর্ড ডালহৌসির সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়। এই সময় পূর্ত বিভাগ বা পি. ডব্লিউ. ডি. (পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট) গঠন করা হয় এবং বড় বড় খাল কাটা ও রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয় এবং স্বল্প খরচে (এক আনা মাশুলে) ভারতের সর্বত্র চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় নীতি মালা প্রণীত হয়। বিলেতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রসিডেন্ট স্যার চার্লস উড তা প্রণয়ন করে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেন। এই অনুসারে লর্ড ডালহৌসি শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করেন এবং স্কুল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বৎসর কোম্পানী শাসন লুপ্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেলদের তালিকা

গবর্ণর

ড্রেক	- পলাশীর সময়
ক্লাইভ	- ১৭৫৮-১৭৬০
হলওয়েল	- ১৭৬০ ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই
ভেনসিটার্ট	- ১৭৬০ - ১৭৬৫
ক্লাইভ (২য় বার)	- ১৭৬৫ - ১৭৬৭
ভেরেলেস্ট	- ১৭৬৭ - ১৭৬৯
কার্টিয়ার	- ১৭৬৯ - ১৭৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস	- ১৭৭২ - ১৭৭৪

গবর্ণর জেনারেল

ওয়ারেন হেস্টিংস	- ১৭৭৪ - ১৭৮৫
ম্যাকফারসন	- ১৭৮৫ - ১৭৮৬
কর্নওয়ালিস	- ১৭৮৬ - ১৭৯৩
স্যার জন শোর	- ১৭৯৩ - ১৭৯৮
এ. ক্লার্ক	- ১৭৯৮ (মার্চ - মে পর্যন্ত)
ওয়েলেসলী	- ১৭৯৮ - ১৮০৫
কর্নওয়ালিশ	- ১৮০৫ (জুলাই - অক্টোবর পর্যন্ত)
জর্জ বারলো	- ১৮০৫ - ১৮০৭
মিন্টো	- ১৮০৭ - ১৮১৩
হেস্টিংস	- ১৮১৩ - ১৮২৩
জন ন্যাডাস	- ১৮২৩ (জানুয়ারি - আগস্ট পর্যন্ত)
আমহার্স্ট	- ১৮২৩ - ১৮২৮
উইলিয়াম বেলী	- ১৮২৮ (মার্চ - জুলাই পর্যন্ত)
উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	- ১৮২৮ - ১৮৩৫
চার্লস মেটকাফ	- ১৮৩৫ - ১৮৩৬
অকল্যান্ড	- ১৮৩৬ - ১৮৪২
এলেনবরা	- ১৮৪২ - ১৮৪৪
উইলিয়াম বার্ড	- ১৮৪৪ (জুন - জুলাই পর্যন্ত)
হার্ডিঞ্জ	- ১৮৪৪ - ১৮৪৮
ডালহৌসি	- ১৮৪৮ - ১৮৫৬
ক্যানিং	- ১৮৫৬ - ১৮৫৮

(ইহার পরে ক্যানিং গবর্ণর জেনারেল এবং ভাইসরয় হন এবং ১৮৬২ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।)

সপ্তদশ অধ্যায়

কোম্পানী আমলে মুসলমানদের অবস্থা

পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে সিরাজ উদ্দৌলার স্থলে মীর জাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন, এই রূপ পরিবর্তন আগেও হয়েছে, কিন্তু কেউ তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেনি যে আগের পরিবর্তনের চেয়ে এই পরিবর্তন কত ভিন্ন। কারণ মীর জাফর মসনদে বসলে ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। ধীরে ধীরে সকলে বুঝতে পারল যে নবাব ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, এবং আরো পরে নবাবীই শেষ হয়ে যায়। নবাবের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের অবস্থারও অবনতি হতে থাকে, এবং তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ে যে শতখানিক বৎসর পরে উইলিয়াম হান্টার লিখেন যে যেই মুসলমানদের এক সময় দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল, তাদের পক্ষে এখন ধনী হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না।

রাজক্ষমতা হারাবার পরে মোটামুটি এক শত বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। শাসন ক্ষমতা, সামরিক চাকুরি এবং লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি হারাবার প্রক্রিয়া, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন এবং সরকারি চাকুরির জন্য ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এই সব কিছু উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই সময়টা ছিল মুসলমান সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সময়েই মুসলমানেরা সমাজের উচ্চ স্তর থেকে নিচু স্তরে নামতে থাকে। পলাশীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার ফলে মুসলমান সমাজের উপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত আসে এবং প্রথম আঘাত আসে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর উপর, উচ্চ পদস্থ সামরিক বেসামরিক অফিসারেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মুসলমানেরা আগাগোড়া সামরিক চাকুরিকে সম্মানজনক ও ভাল উপার্জনের পথ বলে মনে করত। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে ৫০ হাজার সৈন্য ছিল, মীর জাফর দ্বিতীয়বার মসনদে বসার সময় ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিতে মাত্র ১২ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য রাখার অঙ্গীকার করেন। এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য ঐ সময়েই চাকুরিচ্যুত হয়। পরে নবাব পেনশন ভোগি হলে তাঁর সৈন্য রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সামরিক বাহিনী ইংরেজদের হাতে চলে যায়, এবং ইহা জানা কথা যে ইংরেজেরা মুসলমানদের সামরিক বাহিনীতে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি, কারণ তারা মুসলামনদের হাত থেকেই শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দিওয়ানী লাভ করে, অর্থাৎ নিজামত বা শাসন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্বও লাভ করে। কোম্পানী কিছু দিন দেশীয় এজেন্ট বা নায়েব-নাজিমের মাধ্যমে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করলেও

ধীরে ধীরে কোম্পানী রাজস্ব বিভাগও স্বহস্তে তুলে নেয়, জিলা কালেক্টর ও দিওয়ানী আদালতের উচ্চ পদগুলোতে ইংরেজদের নিয়োগ করা হয়। সামরিক বিভাগের পরে বিচার বিভাগেও মুসলমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সামরিক বিভাগ যেমন বিচার বিভাগেও তেমনি মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। বিচার বিভাগে কিছুকাল মুসলমানদের প্রাধান্য টিকে থাকে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেখানেও ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্তি লাভ করতে থাকে, প্রথমে সদর দিওয়ানী আদালত এবং পরে সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়, এবং ইংরেজ গবর্নর সদর দিওয়ানী আদলেতের প্রধান নিযুক্ত হন। জিলা দিওয়ানী আদালতে বিচারের ভার দেওয়া হয় জিলা কালেকটরের উপর। দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে কাজী-উল-কুজ্জাত, কাজী, আমীন, দারোগা, মুফতী, মৌলবী, মুহুরী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন। ফৌজদারী আদালতে মুসলিম আইন বলবৎ ছিল, তাই মুসলমান কর্মচারীর পদও কিছুকাল অব্যাহত থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এক আইনের দ্বারা ভারতীয়দের উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই আইন কর্নওয়ালিস কোড নামে বিখ্যাত। এর ফলে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে তা জিলা-জজ ও জিলা ম্যাজিস্টেটের অধীনস্থ করা হয়, ফলে দেশীয় কর্মচারীদের আধিপত্যের অবসান হয়। রাজস্ব ও বিচার বিভাগ থেকে দেশীয় কর্মচারী অপসারণের প্রক্রিয়া আরো আগে থেকেই শুরু হয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কাজী ও অন্যান্যরা সহযোগিতা না করায় তারা প্রথমে সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু পরে কোম্পানীর কর্মকর্তারা দিওয়ানী বিচার ক্ষমতা ও ফৌজদারী ক্ষমতা দেশীয় কর্মকর্তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। কর্নওয়ালিসের সময়ে দেশীয় কর্মচারীদের উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া আরো সম্প্রসারিত হয়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আঘাতও হানেন লর্ড কর্নওয়ালিশ, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। নবাবী আমল থেকে হিন্দু জমিদারেরা সংখ্যায় অধিক ছিল, এবং বড় বড় জমিদারেরা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানেরাও জমিদার ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরে, বিশেষ করে কোম্পানীর দিওয়ানী লাভের পরে রাজস্ব শাসনে যেমন পরিবর্তন হয়, জমিদারদের ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচ সালা বন্দোবস্তে ইজারাদারী প্রথা বা সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীকে জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার কারণে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন জমিদারেরা ছিল মূলতঃ ইংরেজদের বানিয়া দালাল পাইকার ইত্যাদি যারা কোম্পানীর ব্যবসায়ে সাহায্য সহযোগিতা করে নগদ পয়সার মালিক হয়। এই কথা সত্য যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু জমিদারেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু এতে সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের ক্ষতি হয়নি, কারণ ক্ষমতাচ্যুত জমিদারদের স্থলে যারা নতুন জমিদার হয় তারাও ছিল সকলেই হিন্দু। পার্থক্য শুধু এই যে পুরনো হিন্দু জমিদারদের

স্থলে এক নতুন পয়সাওয়ালা হিন্দু জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মুসলমান জমিদারের সংখ্যা বেশি না হলেও জমিদারদের কর্মচারী গোমস্তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান, কারণ মুসলমান আমলে হিন্দু জমিদারেরা সরকারের সঙ্গে যোগ সূত্র রক্ষার জন্য মুসলমান আমলা গোমস্তা ইত্যাদি নিযুক্ত করত। এই শ্রেণীর সকলেই চাকুরি হারায়, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মুসলমানদের নিযুক্তির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত মুসলমানেরা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে। এরাও ছিল মোটামুটি ভাবে উচ্চ স্তরের লোক, কিন্তু তারা পূর্বের মর্যাদা হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায় যেখানে প্রতিকারের সুফল সাধারণতঃ পৌঁছাত না। উইলিয়াম হান্টার বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল লক্ষ্য ছিল যে সকল নিম্নস্তরের হিন্দু কর্মচারী চাষীদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়িক কাজে কর্মে সম্পৃক্ত তাদেরকে জমির মালিক বা জমিদার করা। এই পর্যন্ত যেই সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোট খাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, তারা সবাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমিদার বনে যায়, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে এবং ধন-দৌলতের অধিকারী হয়। ইংরেজরা মুসলমান আমলের আইন. কানুন, রীতি নীতি পালন করার শর্তে সম্রাটের নিকট থেকে বাংলার দিওয়ানী লাভ করে, কিন্তু তারা শক্তিশালী হয়ে সম্রাটের নিকট প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ করে। দিওয়ানী লাভের ৩০ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তারা ভূমি ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন করে যাতে কিছু ফারসি শব্দের অস্তিত্ব ছাড়া মোগল প্রবর্তিত দিওয়ানী ব্যবস্থার সবকিছুই হারিয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন যে দিওয়ানী ইংরেজদের হাতে আসার পর থেকে ইংরেজ এবং হিন্দুরাই রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে, ফলে মুসলমানেরা তাদের আয়-উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

ইহা স্বত্বেও সংখ্যায় অল্প, হলেও কিছু মুসলমানের ভূসম্পত্তি ছিল, তা ছিল লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি। মুসলমান আমলে সরকার বা ধনী লোকেরা শিক্ষক, সূফী, দরবেশ, ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য জ্ঞানী গুণী ও উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লাখেরাজ ভূমি মঞ্জুর করতেন। সাধারণতঃ এগুলি মঞ্জুর করা হত উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ভরণ পোষণের জন্য। মসজিদ, মন্দির বা দরগাহ নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ, ধর্ম অনুষ্ঠান পালন, এমন কি নিঃস্ব ভিখারী বা মুসাফিরের জন্যও লাখেরাজ ভূমি দান করা হত। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার বিখ্যাত বড় কাটরার উল্লেখ করা যায়, শাহ শুজা এই সুবৃহৎ দালানটি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের থাকার জন্য দান করেন। এইরূপ দান করা ভূমিকে ইনাম বা পুরস্কার, ওজিফা বা বৃত্তি এবং মদদ-ই-মাআশ বা জীবিকা ভাতারূপে অভিহিত করা হত। নবাবী আমলে মঞ্জুরীকৃত এরূপ ২৭টি বিভিন্ন নামের লাখেরাজ দান স্বত্বের কথা পাওয়া যায় যেমন, জায়গীর, আল-তমঘা, মদদ-ই-মাআশ, আয়মা, মসকান, নজুরত, খানকাহ ফীরান, নজর-ই-দরগাহ, নজর-ই-ইমামাইন, জমিন-ই-

মসজিদ, নজরি হজরত, খরচ-ই- মুসাফিরান, মেরামাত-ই-মসজিদ, মাআফি, পীরান, খয়রাতি, খারিজ জমা, মিনহা, ব্রম্মোত্তর, দেবোত্তর, মেহতেরান, মালিক ও মালিকানা, শিবোত্তর, সুরুজ পর্বত, ইনাম ও মানকর। এগুলোর মধ্যে ব্রম্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, মেহতেরান ও সুরুজ পর্বত এই পাঁচটি কেবল হিন্দু জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে এবং জায়গীর, আল-তমঘা, খারিজ জমা, মিনহা, মালিকানা, ইনাম ও মানকর এই সাতটি হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা লাভ করতেন। বাকী পনরটি লাখেরাজ ভূমি-সম্পত্তি শুধু মুসলমানদের জন্য রক্ষিত ছিল। এই বিভিন্ন রকমের ভূ-সম্পত্তি দ্বারা মঞ্জুরী প্রাপ্ত লোকেরা শুধু যে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারত তা নয় বরং তারা অভিজাত রূপে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করত। মঞ্জুরীকৃত জমি তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করত, ফলে জমিদারদের চেয়েও তাদের অবস্থা ভাল ছিল, কারণ জমিদারদের নির্দিষ্ট অংকের খাজনা দিতে হত, লাখেরাজ ভূমির কোন রূপ খাজনা দিতে হত না। কোম্পানী এই সব লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, তারা মনে করে যে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তির অধিকাংশ ভূয়া। ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নেন, কিন্তু ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই উদ্যোগ সফল হয়নি, তখনো মুসলমান সমাজ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েনি, তাই লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে জনমত এতই প্রবল ছিল যে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা তখন সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কোম্পানীর সরকার লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত অনেক পরিবার দীর্ঘদিন পূর্বে তাদের ফরমান বা সনদ লাভ করে, কোন কোন ফরমান কয়েকশত বৎসর আগে মঞ্জুর করা হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়া এমন যে এখানে কাগজ দলিল পত্র বেশি দিন অক্ষত থাকেনা, আবহাওয়ার কারণে বা ইঁদুর পোকার আক্রমণে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তদুপরি এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে মঞ্জুরী প্রাপ্ত পরিবারে ও অনেক পরিবর্তন হয়, ফরমান বা সনদ প্রাপ্তদের বংশবৃদ্ধির ফলেও ফরমান বা সনদের বেনেফিসিয়ারী বা সুবিধা ভোগকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, ভূমি খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। আবার বাংলাদেশ ঝড় তুফান এবং বন্যা প্লাবনের দেশ। এই সব কারণে অনেক পরিবার তাদের মূল ফরমান বা সনদ হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ করে কোম্পানী তাদের মূল দলিল উপস্থাপনের আদেশ দিলে অনেকেই বিপাকে পড়ে যায়। অন্যদিকে যারা মূল দলিল উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় কোম্পানী তাদের লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করে সরকারে খাস করে ফেলে। এর দ্বারা সরকারের ৪০ লক্ষ টাকার বেশি রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে মুসলমানদের যা কিছু ভূ-সম্পদ ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। লাখেরাজ সম্পদের মালিক ছিল প্রধানত মুসলমান ও তাদের শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গুলো। ফলে একদিকে যেমন অনেক মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় তেমনি তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের উপায়ও বন্ধ হয়ে

যায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লোপ পায়, মসজিদ মাদ্রাসা বা খানকাহ সংস্কার বিহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আলেম সমাজও চরম হতাশা ও বিপদের সম্মুখীন হয়।

ভূ-সম্পদ হারা হয়ে মুসলমানদের অবলম্বন রইল রাজভাষা ফারসি এবং বিচার বিভাগের চাকুরি। আদালতে ফারসি ভাষা চালু ছিল, তাই আদালতের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকেই ফারসি ব্যবহার করতে হত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ফারসিতে মুসলিম আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। আইন ব্যবসা অত্যন্ত সম্মান জনক ছিল। বিচার বিভাগে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল, কারণ আলেম, মুফতি, কাজী সকলেই মুসলমান ছিল। পলাশীর পরেও কিছু সময় প্রায় সকল সরকারি কাজকর্ম মুসলমানদের হাতে ছিল, কারণ ফারসি ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম চলত। কোম্পানীও প্রথম প্রথম বিচার বিভাগে উপদেষ্টা হিসেবে মুসলমানদের নিয়োগ করে, কারণ বিচারালয়ে ইসলামী আইন বলবৎ ছিল। প্রথম দিকে কোম্পানী সরকার কলিকাতা মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে বিচার বিভাগের চাকুরি না দেওয়ার আইন বলবৎ করে, ফলে বিচার বিভাগের এই চাকুরিগুলোতে মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া দখল ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষায় পরিণত করে। এতে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি হয়, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি বা বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তারা দীর্ঘ দিন ধরে আরবি ফারসি ভাষা চর্চা করছিল, ১৮২৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হলে মুসলমান ছেলেরা ঐ ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। ফলে বিচার বিভাগে তাদের চাকুরির ভিতও নড়বড়ে হয়ে যায়। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর পরে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের উপর আরো একটি বিরাট আঘাত আসে। ঐ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ আইন করেন যে ইংরেজি শিক্ষিতরাই সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার পাবে। ফলে ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া সরকারি চাকুরির দরজা বন্ধ হয়ে যায়, মুসলমানেরা যেহেতু ইংরেজি শিখেনি সেহেতু তারা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে হিন্দুরা আগে থেকেই ইংরেজি শিখে আসছিল। সরকারি অফিস আদালতে হিন্দুদের চাকুরি হতে থাকল, মুসলমানেরা বাদ পড়ে গেল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে আইন সদস্য লর্ড মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন করা হয় যে কেবল ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো সরকারি সাহায্য পাবে, অন্যান্য গুলো পাবে না। এর চেয়ে ও মারাত্মক নিয়ম করা হল ছাত্র-বৃত্তি এবং শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে। ছাত্র-বৃত্তি সম্পর্কে আইন হয় যে ছাত্রদের প্রদত্ত পুরাতন বৃত্তি চালু থাকবে কিন্তু নতুন ভাবে আর দেওয়া হবে না। আরো নিয়ম করা হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া প্রাচ্য বিদ্যার যে সকল পুস্তক শিক্ষা খাতের টাকায় ছাপানো হত, তা বন্ধ করে, উক্ত টাকায় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়।

অতএব পলাশীর যুদ্ধের পরে একশত বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলার মুসলিম সমাজ চরম অধঃপতনের সম্মুখীন হয়। এই অধঃপতনের কয়েকটি স্তর, অর্থাৎ কয়েকটি স্তরে কোম্পানীর নতুন নতুন আইন প্রণয়নের ফলে মুসলমানেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে দৈন্য দশায় পতিত হয়। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে মুসলমানেরা রাজ্যহারা হয় এবং সামরিক এবং অন্যান্য লোভনীয় চাকুরি থেকে বঞ্চিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান অল্প সংখ্যক জমিদার যারা ছিল তারা জমিদারী হারায় এবং জমিদারী কর্মকাণ্ডে জড়িত মুসলমান আমলারা চাকুরি হারায়। ১৮২৮ সালের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি আইনের ফলে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় এবং ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের সরকারি ভাষা পরিবর্তন আইন এবং ১৮৪৪ সালের চাকুরিতে নিয়োগের ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ আইন, এই সব মিলে মুসলমানদেরকে সমাজের উচ্চস্তর থেকে একেবারে নিম্নস্তরে ঠেলে দেয়। মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, মুসলমান আলিম, আইনবিদ, শিক্ষক, মৌলবি, এবং মুনশী ইত্যাদি জীবিকা হারিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। বস্তুতপক্ষে এই আইনগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য মারণাঘাত, এই সকল বড় বড় আঘাতের ফলে পূর্বের মুসলিম শাসক শ্রেণী নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর জাতিতে পরিণত হয়। এর কারণ কোম্পানীর প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষা নীতি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোম্পানীর নতুন নতুন আইনের ফলে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীই ধ্বংস হয়, কিন্তু মুসলমান কৃষক শ্রমিক শ্রেণীও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকাণ্ডে ধ্বংস হয়। কোম্পানী বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য এই দেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করে এবং কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির ফলে এই দেশের তাঁতিরাও ধ্বংস হয়। অতএব কোম্পানীর শাসনের ইতিহাস হল মুসলমানদের স্বর্বস্বান্ত হওয়ার ইতিহাস।

তীতুমীরের আন্দোলন :

তীতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী, কিন্তু তিনি তীতুমীর নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দাবপুর) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছেলেবেলায় গ্রামের এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি গ্রামের এক ব্যায়ামাগারে অনুশীলন করে একজন কুস্তিগীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮১৫ সালে তিনি কলিকাতায় একজন কুস্তিগীর ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নদীয়ার জমিদারের অধীনে লাঠিয়ালের চাকুরি গ্রহণ করেন। লাঠিয়াল হিসেবে একবার দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে তিনি বিচারে কারারুদ্ধ হন। ছাড়া পেয়ে তিনি দিল্লীর রাজপরিবারের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে মক্কা শরীফে হজ্জ্ব করতে যান। মক্কায় থাকা অবস্থায় তীতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ

আহমদ শহীদ ছিলেন তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের নেতা। এই তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে ইংরেজ শাসকরা ওয়াহাবী আন্দোলন রূপে অভিহিত করে। তীতুমীর এই সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। চার বৎসর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি কলিকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে কিছুদিন বসবাস করে শেষে নারকেল বেড়িয়ার নিকটে হায়দরপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই সময়েই তিনি ধর্ম সংস্কারক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, স্থানীয় অনেক চাষী ও তাঁতী তাঁর অনুসারী হয়। তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন এবং তাঁর ধর্মীয় সংস্কারে মিসকিন শাহ নামে একজন ফকিরের সহায়তা লাভ করেন।

তীতুমীরের শিক্ষা ছিল মুসলমান সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা, এই জন্য তিনি পীর মানা, কবরের উপর মাযার তৈরি করা এবং মৃতদের উদ্দেশ্যে শিরনী দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর শিক্ষা ছিল ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি নিষ্ঠার সাথে পালন করা এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণে যে সকল কুসংস্কার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে তা বর্জন করা। মুসলমানেরা দীর্ঘদিন হিন্দুদের সঙ্গে এক সাথে বাস করে, তাছাড়া হিন্দুদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, নবদীক্ষিত হিন্দুরা তাদের পূর্বে অনুসৃত রীতি নীতি পূর্বের মতই পালন করত। সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সহজে পরিহার করা যায় না, বিশেষ করে জন্ম মৃত্যু উৎসব ইত্যাদিতে পালনকৃত সংস্কারসমূহ। এইভাবে যুগযুগ ধরে হিন্দু মুসলিমের সংমিশ্রণে যে সকল ইসলাম বিরোধী রীতি নীতি মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলোর বিরুদ্ধেই তীতুমীরের আন্দোলন শুরু হয় এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের সেই ভাবেই শিক্ষা দেন। তীতুমীরের শিক্ষার ফলে অনেক মুসলমান তাঁর অনুসরণ করায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার মুসলমানদের মধ্যেও ভিন্ন মতের লোক ছিল, তারা তাদের কুসংস্কারকে এমন আঁকড়ে ধরে যে তারা কিছুতেই তাদের রীতিনীতি ছাড়তে রাজী ছিল না। ফলে তীতুমীর ও তাঁর সংস্কার পন্থীদের সঙ্গে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারেরাই তীতুমীরের সংস্কার আন্দোলনে আতংকিত হয়ে পড়ে, তীতুমীরের অধীনে কৃষক প্রজাদের সংগঠিত হতে দেখে তারা তীতুমীরের সংগঠন ভেঙ্গে দেয়ার উপায় খুঁজতে থাকে।

ফলে তীতুমীরের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। তীতুমীর এবং তাঁর অনুসারীরা নারকেল বাড়িয়া গ্রামের ময়জুদ্দীন বিশ্বাসের বাড়িতে তাঁদের সদর দপ্তর স্থাপন করেন। তীতুমীর এই পরিবারের সমর্থন লাভ করেন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিল বলাই জোলা, ডাকু কারিগর, দায়েম কারিগর, কেদার বক্স কারিগর, পূজতি মল্লিক প্রমুখ। এরা ছিল নারকেল বাড়িয়া গ্রামের জোলা ও রায়ত। ফকির মিসকিন শাহ ও তাঁর অনুগামীরাও তীতুমীরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে বাস করেন, এবং তাদের মিলিত হওয়ার কেন্দ্র ছিল নিকটস্থ একটি মসজিদ। তিন বৎসরের

মধ্যে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ক্রমে তারা কর আদায় করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে জোলা ও চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাজে জোলা ও চাষীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্থান পায়। তাদের কার্যকলাপ কালক্রমে প্রজা বিদ্রোহের রূপ লাভ করে। দলে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়, কিন্তু তাতে জমিদারদের আশঙ্কার কারণ বৃদ্ধি পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারেরা পূর্বের জমিদারদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তাদের নিকট থেকে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল, এবং জমিদারীতে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমির কর এবং বিভিন্ন রকমের কর আদায়ে তাদের কোন বাধা ছিল না। হিন্দু জমিদারেরা তাদের পূজা-পার্বণ উপলক্ষে জোর জবরদস্তি মূলক কর আদায় করত, জমিদারেরা চাষী রায়তদের আটকও করত। এই সকল বেআইনী করারোপ করাকে জমিদারেরা তাদের অধিকার রূপে বিবেচনা করত। তাছাড়া জমিদারেরা যে কোন নতুন ভাবধারার বিরোধী ছিল, মুসলমান প্রজারা তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলেও জমিদারেরা দূর্ব্যবহার করে বা কোন কোন সময় জরিমানা করে প্রতিশোধ নিত। নারকেল বাড়িয়ার অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলমান তাঁতী ও কৃষক, তাই তারা সংগঠিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে জমিদারদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

দাড়িকর আরোপ করায় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জমিদারেরা শুধু যে দাড়ির উপর কর আরোপ করে তাই নয়, জমিদারের লোকেরা জোর পূর্বক রায়তদের দাড়ি কামিয়ে দিত, তীতুমীরের অনুসারীরা সুন্দর ভাবে দাড়ি রাখায় তাদের সহজেই অন্যদের থেকে পৃথক করা যেত, তাই জমিদারের লোকেরা তীতুমীরের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত। দাড়িকর তীতুমীর ও জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষের তাৎক্ষণিক কারণ। তারা গুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ এবং পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদে রায় দাড়িকর সম্পর্কে বাড়াবাড়ি শুরু করে। তীতুমীর ও তাঁর সমর্থকরা দাড়িকর দিতে অস্বীকার করলে জমিদার লাঠিয়াল পাঠিয়ে তাদের উপর হামলা করে এবং তাদের মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়। প্রজারা থানায় নালিশ করে প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হয়, বারাসতের ম্যাজিস্টেটের কোর্টে মামলা দায়ের করেও ফল পাওয়া যায়নি, কলিকাতার কমিশনারের নিকট প্রতিকার চেয়ে ব্যর্থ হলে তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারে যে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় উদাসীন এবং জমিদারদের স্বার্থেই তাদের আইন প্রণীত। তাই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা পুঁড়ায় গিয়ে গরু জবাই করে এবং মন্দিরে গরুর রক্ত লেপন করে দেয়। নওঘাটায় আর এক সংঘর্ষে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। এর পরে জমিদারদের সঙ্গে আরো দুইবার সংঘর্ষ হয়, উভয় সংঘর্ষে তীতুমীরের বাহিনী জয়লাভ করায় তাদের সাহস আরো বেড়ে যায়। এর পরে তাদের আত্মবিশ্বাস এত

বেড়ে যায় যে তারা ইংরেজদের ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়ে ইংরেজ রাজত্বের অবসান এবং মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে। জমিদারেরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তাদের প্ররোচনায় মুল্লাহাটির নীলকর সাহেব ডেভিস তীতুমীরকে আক্রমণ করে পরাজিত হয়। তীতুমীরের দল প্রতিশোধ নিয়ে নীলকুঠি আক্রমণ করে লুট পাট করে এবং কুঠির তত্ত্বাবধায়ককে বন্দী করে নিয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী সম্পূর্ণ এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং জমিদারবর্গ ও নীলকুঠির সাহেবরা সাহায্যের জন্য সরকারের নিকট আবেদন পাঠায়। ইংরেজ সরকারও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নবেম্বর তারিখে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার ১২৫ জনের এক পুলিশ দল নিয়ে নারকেলবাড়িয়ায় পৌছেন, তীতুমীরের দলের প্রায় ৫০০ লোক হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে। এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য আলেকজাণ্ডার প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তিনি এবং তাঁর দলবল পলায়ন করে, দশজন সিপাহি এবং তিনজন বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়। বশিরহাট থানার দারোগা ও বেশ কিছু সংখ্যক বরকন্দাজকে তীতুমীরের দলের লোকেরা আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়, দারোগাকে হত্যা করা হয়। এই বিজয়ের ফলে বিদ্রোহীরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। তারা পার্শ্ববর্তী সকল নীলকুঠি লুট করে এবং কুঠির তত্ত্বাবধায়ক ও তাদের পরিবার বর্গকে বন্দী করা হয়। যারা তীতুমীরের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের সবাইকে সমম্মানে ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরে নদীয়ার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ২৫০ জন পুলিশ, এবং বেশ কিছু হাতি নিয়ে নারকেলবাড়িয়ায় যান, জিলার নীলকুঠির সাহেবরাও তাদের লোক লস্কর নিয়ে উপস্থিত হয়। তীতুমীরের বাহিনী প্রায় ১ হাজার লোক, ঢাল, তলোয়ার, তীর বল্লম ইত্যাদি নিয়ে সরকারি দলকে এমন প্রবল ভাবে আক্রমণ করে যে ম্যাজিস্ট্রেট দলবল নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান এবং ২/৩ মাইল দূরে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। একজন ফৌজদারি নাজির নিহত হয় এবং আরো অনেকে আহত হয়। ডেভিড এন্ড্রুস নামে একজন নীলকুঠি সাহেবের নৌকা লুঠ করা হয়।

ইহার পরে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সুন্দরবন ঘুরে কলিকাতা পৌছেন এবং সরকারকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করাবার চেষ্টা করেন। সরকার এখন পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে নারকেল বাড়িয়ায় নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশী পদাতিক বাহিনীর ১১টি রেজিমেন্ট, কয়েকটি কামান সহকারে গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদল এবং দেহরক্ষী বাহিনীর সৈনিকরা মেজর স্কটের অধীনে বারাসতর দিকে রওয়ানা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নবেম্বর এই বাহিনী বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মিলিত হয়, আলেকজাণ্ডার এবং ক্যাপ্টেন সাদারল্যাণ্ড পরের দিন স্থানটি জরিপ করে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ ১৯শে নবেম্বর আলেকজাণ্ডার ও মেজর স্বটের মিলিত বাহিনী নারকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তীতুমীর সেখানে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন, তিনি কেল্লার বাইরে এসে বীর

বিক্রমে আক্রমণ কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী ছিল সুশিক্ষিত, তাদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তীতুমীরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কামানের গোলার আঘাতে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তীতুমীর নিজে ও তাঁর ৫০ জন অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন, প্রায় ৩০ জন আহত হয় এবং ২৫০ জন বন্দী হয়। শেষ পর্যন্ত অন্য কোন পথ না দেখে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। হিংস্র ও উন্মত্ত ইংরেজ সৈন্যরা তীতুমীর ও তাঁর সহযোগিদের মৃতদেহ তৎক্ষণাত জ্বালিয়ে ফেলে, তারা কেল্লার অভ্যন্তরস্থ সকল দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করে নেয়। পরে কলিকাতায় তীতুমীরের অনুসারীদের বিচার করা হয়, অবশ্য তা ছিল বিচারের নামে প্রহসন, অর্থাৎ একতরফা বিচার, ফলে তীতুমীরের অনুসারীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তীতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, এবং এই ভাবে তীতুমীরের বিদ্রোহ দমন করা হয়।

তীতুমীরের আন্দোলনকে কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কেহ কেহ প্রজা বিদ্রোহ, আবার কেহ কেহ একটা সংস্কার আন্দোলনরূপে অভিহিত করেছেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আগাগোড়া বিবেচনা করলে মনে হয় তাকে এককভাবে চিহ্নিত করা যায় না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বা প্রজা বিদ্রোহ বা সংস্কার আন্দোলন সবকিছুর উপাদানই এই আন্দোলনে রয়েছে। যেভাবে তীতুমীর সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার চেষ্টায় জনগণকে সংগঠিত করেন তাতে মনে হয় তা সংস্কার আন্দোলন হিসেবেই শুরু হয়। তীতুমীর মক্কা শরীফে থাকা কালে ইসলামের মহান সংস্কারক সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর সান্নিধ্যে থাকেন। সেখানে তীতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। দেশে ফিরে এসে তিনি সমাজ সংস্কারে মনযোগ দেন, এবং এই ভাবেই তিনি একদল অনুসারীর নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পান। ইংরেজ অফিসার তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে ইংরেজ সরকারের প্রতি অনীহার কারণেই এইসব আন্দোলন পরিচালিত হয়, ভারতের সকল অংশে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত ছিল, তাই তীতুমীরের আন্দোলনেও বিদ্রোহের ভাব সুস্পষ্ট। যেহেতু জমিদারদের বিরুদ্ধে তীতুমীরকে যুদ্ধ করতে হয় সেহেতু এই বিদ্রোহকে প্রজাবিদ্রোহ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে তাকে কোন মতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। যুদ্ধ হয় জমিদার এবং প্রজার মধ্যে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে নয়। ঘটনাচক্রে জমিদারদের সবাই ছিল হিন্দু এবং তাদের লাঠিয়ালরাও ছিল ঐ ধর্মের অনুসারী, তাই তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। তবে জমিদারেরা তীতুমীরের অনুসারীদের কাজে কর্মে বাধা না দিলে এই সংঘর্ষের সূত্রপাতও হত না। প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে তীতুমীর বা তাঁর অনুসারীরা হয়ত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশাও পোষণ করছিল, তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং মুসলমান রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফরায়েজি আন্দোলন :

তীতুমীরের আন্দোলনের কয়েক বৎসর পরে ফরায়েজি আন্দোলন আরম্ভ হয়। তীতুমীরের আন্দোলন কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিমবঙ্গে বারাসতের নারকেল বাড়িয়ায়, ফরায়েজি আন্দোলন হয়, পূর্ব বাংলায় প্রথমে ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি ১৭৮১ সালে ফরিদপুরের মাদারিপুর জিলার অন্তর্গত শামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জলীল তালুকদার, তিনি শরীয়তুল্লার আট বৎসর বয়সের সময় মারা যান। বাল্যকালে শরীয়তুল্লার তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি, তিনি ১৭৯৯ সালে হজ্ব পালন উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে যান এবং সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে ১৮১৮ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন। এই সময় মক্কায় তিনি মওলানা মুরাদ নামক একজন বাঙ্গালি পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামী শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ১৮২৮ সালে দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে যান, এইবারে তিনি তাহের সম্বল নামক একজন হানাফী শাস্ত্রবিদের নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় জ্ঞান অর্জন করেন। এই সময় তিনি সূফী মতবাদ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন। পরে তিনি দুবছর কায়রোতে গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বাংলায় মুসলমানেরা অনেক বিধর্মী আচার অনুষ্ঠান এবং কুসংস্কার গ্রহণ করে, বিশেষ ভাবে গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কারগুলো প্রচলিত হয়। অনেক লোক ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা তাদের পূর্বের আচার অনুষ্ঠান গুলো বর্জন করতে পারেনি, পূর্বের ধর্মীয় পদ্ধতি এমন কি দেবদেবীদের প্রতিও তাদের আকর্ষণ থেকে যায়। তাদের কেউ কেউ সাপের দেবী মনসা, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণা রায় বা বসন্ত দেবী শীতলা ইত্যাদির পূজা করত। তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ছিল, তাই তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। হাজী শরীয়তুল্লা এইরূপ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজের মধ্যে বড় হয়ে উঠেন, কিন্তু আরবে এবং মিশরে ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তাঁর মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্পৃহা জেগে উঠে। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন বাংলার মুসলমানদের অবস্থা হতাশা ব্যঞ্জক, তারা তখন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, ভূমি হারা চাকুরি হারা হয়ে দিশেহারা, শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত। বাঙলা তথা ভারতের নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে তখন এই অনুভূতি আসে যে ইসলামের মহান শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ায় মুসলমানেরা রাজ্য হারা হয়ে শাসন ক্ষমতা হারিয়ে অধঃপতিত হয়েছে। তাই উত্তর ভারতে যেমন, বাংলাদেশেও তেমনি সংস্কারকের অবির্ভাব হয়। হাজী শরীয়তুল্লা পূর্ব বাংলার মুসলমান বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত।

ফরায়েজ আরবি শব্দ, এর অর্থ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমূহ। অতএব ফরায়েজিরা ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইসলামের ৫টি মৌলিক স্তম্ভ যথা কলেমা (ঈমান বা বিশ্বাস), নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং যাকাত। বাংলার অনেক মুসলমান স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের মৌলিক বিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত না। ফরায়েজিরা এই সব বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন এবং মুসলমানেরা যাতে এই বিষয়ে সজাগ থাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তবে ফরায়েজিরা তৌহিদ বা আল্লাহার একত্বের উপর শুধু মৌখিক বিশ্বাসে সন্তুষ্ট ছিলেন না, ব্যবহারিক জীবনেও যাতে তারা তৌহিদের প্রতি গুরুত্ব দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এমন কোন আচার আচরণ যা তৌহিদ বা আল্লাহর এককত্বকে সামান্য ভাবেও প্রভাবিত করে তা ফরায়েজিরা বর্জন করে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রবর্তিত নয় এরূপ স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানকে হাজী শরীয়তুল্লাহ শিরক্ বা বেদায়াত রূপে গণ্য করতেন এবং তাঁর অনুসারীদের তা বর্জন করার আদেশ দিতেন। ফরায়েজিরা পুতি, ছাতি ও চিল্লার আচার-আনুষ্ঠানের বিরোধি ছিলেন, তাঁরা আকীকা অনুষ্ঠান পালন করতেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাহ্যিক আচার আনুষ্ঠান এবং লৌকিকতা তাঁরা পরিহার করেন এবং মৃত্যু উপলক্ষে অত্যধিক ব্যয়, কবরে ফল মূল ও পুষ্প অর্পণ এবং নানাবিধ ফাতেহা খানি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়। কবর মাটির উপরিভাগে উচ্চ করে তোলা কিংবা ইট বা পাথর ব্যবহার করে চিহ্নিত করা ফরায়েজিদের নিকট নিষিদ্ধ, মাজার তৈরির প্রশ্নই উঠে না। তারা পীর মুরীদ শব্দ ব্যবহার করত না, তাতে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি হয়, পরিবর্তে হাজী শরীয়তুল্লা উস্তাদ ও শিক্ষক শব্দ ব্যবহারের আদেশ দেন, কারণ তাতে প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি হাতে হাত রেখে শিষ্যদের বয়আত করা নিষিদ্ধ করেন, পরিবর্তে অনুতপ্ত হতে এবং ভাল ও সৎ জীবন যাপন করার লক্ষ্যে তওবা করতে বলেন। তিনি জীবিত বা মৃত পীরকে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ইংরেজ শাসিত বাংলা তথা ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব'বলে ঘোষণা করেন এবং এই কারণে এখানে জুমা ও ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত দেন। ফরায়েজিরা এই দুই নামাজ পড়ে না।

হাজী শরীয়তুল্লা উপরোক্ত মতে প্রচারণা শুরু করেন এবং শীঘ্রই অনেক মুসলমান তাঁর শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর শিক্ষার ফলে সনাতন পন্থী মুসলমান ও ফরায়েজীদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। সনাতন পন্থীরা যুগ যুগ ধরে যে আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছিল তা তারা বর্জন করতে রাজী ছিল না। কিন্তু ফরায়েজীরা তাদের আদর্শ অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, এর ফলেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সকল বিবাদে ফরায়েজিরা অসহিষ্ণু হয়ে উৎপীড়নের পথ বেছে নিত এবং তারা তাদের মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করায় মাঝে মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হত। এইরূপ এক সংঘর্ষের ফলে দুইজন ফরায়েজিকে গ্রেফতার করা

হয়, কিন্তু পরে প্রমাণের অভাবে তাদের মুক্তি দেয়া হলেও তাদের নিকট থেকে ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার মুচলেকা নেয়া হয়। সে যাই হউক ফরায়েজি আন্দোলন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, চাষী, জোলা ইত্যাদি লোকেরা ফরায়েজিদের সঙ্গে যোগদেয় এবং ফলে ফরায়েজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফরায়েজিরা একটা নতুন আদর্শে এবং একজন শিক্ষিত আলেমের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়ায় হিন্দু জমিদারেরা আতংকিত হয়ে পড়ে। অবশ্য তাদের ভয় পাওয়ার কারণ ছিল, তারা বৈধ কর ছাড়াও অবৈধ কর আদায় করত এবং মুসলমান প্রজাদের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করত। তাদের এলাকায় তারা গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের পূজোর জন্য বা অন্যান্য পালা পার্বণের সময়ে মুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে অবৈধ কর আদায় করত। হিন্দু দেবদেবীর পূজার জন্য চাঁদা বা কর দেওয়া মুসলমান প্রজারা ঘৃণার চোখে দেখত। হাজী শরীয়তুল্লাও পূজো বা পালা পার্বণে কর দেওয়া পছন্দ করতেন না, তিনি তাঁর অনুসারীদের ঐরূপ অবৈধ কর দিতে নিষেধ করেন। অবশ্য তিনি অহরহ বা যেখানে সেখানে গরু জবাই নিষেধ করেন এবং শুধু কোরবানির সময় গরু জবাই করার অনুমতি দেন। ফরায়েজিরা জমিদারদের অবৈধ কর দিতে অস্বীকার করায় জমিদারদের সঙ্গে তাদের বিরোধ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলতঃ একটি ধর্মসংস্কার আন্দোল। কিন্তু জমিদারদের অবৈধ ক্রিয়া কাণ্ডের বিরোধিতা করায় তা সমাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। তবে ফরায়েজি আন্দোলন কোনমতেই সাম্প্রদায়িক ছিল না, কিন্তু যেহেতু তারা ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া এবং কুসংস্কার বিরোধী ছিল, সেইজন্য তাকে গোঁড়া ধর্মীয় আন্দোলন বলা যায়। সমসাময়িক হিন্দু সংবাদপত্রে শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদের ধর্মান্ধ বলে অভিহিত করে কারণ তারা এই আন্দোলনের মূল কথা বুঝতে পারেনি।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম শামায়েল-এ মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে সেখানেই কবরস্থ করা হয়, পরে আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গনে কবরটি ভেসে যায়। তিনি এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধিবলে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, পবিত্র জীবন যাপন করেন এবং এমন একদল অনুসারী রেখে যান যারা তাঁর আদর্শ দীর্ঘদিন প্রচার করেন। ফরায়েজিরা এখনো মুসলমান সমাজের একটি অংশ। ফরায়েজ বা ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে অমর করে রেখেছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র পুত্র মোহসেন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদুমিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দুদুমিয়া ১৮১৯ সালে বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মুলফতগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার মত জ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ফরায়েজি আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাই তাঁকে ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে। তিনি ফরায়েজিদের মধ্যে শৃঙ্খলা

আনয়ন করে তাকে সুগঠিত করেন। তিনিও পিতার ন্যায় হজ্ব পালন করেন। ফরায়েজিদের নেতৃত্ব নেওয়ার পরে দুদুমিয়া দেখেন যে জমিদারেরা ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তিনি জমিদারদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে গ্রাম বাংলার জমিদারদের প্রতাপ বৃদ্ধি পায়, কর আরোপের ব্যাপারে এবং শান্তি রক্ষার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। গুরুতর রূপে শান্তি বিঘ্নিত না হলে সরকার হস্তক্ষেপ করত না, আবার স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ এমনকি নীলকর সাহেবেরাও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করত, চাষী এবং রায়তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ছিল জমিদার, সেই জমিদারেই যদি চাষী-রায়তদের উপর অত্যাচার করে তখন চাষী-রায়তদের প্রতিকার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। জমিদারেরা ফরায়েজিদের শত্রুরূপে গণ্য করে, তাই ফরায়েজিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য তারা প্রজাদের উপর নিত্য নতুন অত্যাচার করত। যেমন, প্রজাদের দাড়ি রশিতে বেঁধে দেয়, ময়লার গর্তে আবক্ষ ডুবিয়ে রাখা এবং নাভিতে তুরফুলা (এক প্রকার কীট) লেপটে দেওয়া ইত্যাদি। ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ জমিদারেরা এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তারা গরু জবাই করতে দিত না এবং পূজোর সময় জোর পূর্বক টাকা আদায় করত। দুদু মিয়া ফরায়েজিদের একত্রিত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, ফলে জমিদারেরা দুদু মিয়ার দাবি মানতে বাধ্য হয়। ফরায়েজিরা জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ি আক্রমণ করে জমিদারের ভাই মদন নারায়ণকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে নদীতে পুতে ফেলে। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় যে আটশতজনের একদল ফরায়েজি একত্রে জমিদারকে আক্রমণ করে, মারধর ও লুটপাট করে রাত্রেই উধাও হয়ে যায় এবং পরে তাদের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুদু মিয়ার প্রতি প্রজাদের আস্থা বেড়ে যায়, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, পাবনা এবং নোয়াখালী জিলায় দুদু মিয়া ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। জমিদারেরা কোর্টে নালিশ করলে দুদু মিয়াকে বন্দী করা হয় কিন্তু প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পেয়ে যান। তবে তাঁর ২২ জন অনুসারীকে সাত বৎসরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে দুদু মিয়ার অধীনে ৮০ হাজার লোক ছিল এবং তারা সকলে দূর্ধর্ষ বীর এবং একতাবদ্ধ ছিলেন।

জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজিদের উপরোক্ত অভিযান ১৮৪১ ও ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত হয়। ঐ অভিযানের পর থেকে জমিদারেরা ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করতে দ্বিধা করলেও তারা শত্রুতামূলক প্রচারণা চালাতে থাকে। পরে ডানলপ নামে একজন নীলকুঠির মালিকের ব্রাহ্মণ গোমস্তা কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল ফরায়েজিদের উপর অত্যাচার শুরু করে। নীলচাষীদের অনেকেই ছিল ফরায়েজি, তাদের ভাল ভাল জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয়। যারা এই আদেশ মানতনা তাদের নাকে

মরিচের গুঁড়া ছিটানো এবং দাড়ি কর দিতে বাধ্য করা হত। দুদু মিয়া তাঁর এক শিষ্য কাদের বখশ জানকে ঐ ব্রাহ্মণ গোমস্তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে কাদের বখশ ঐ কাঞ্জিলালকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। তাকে হত্যা করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতে ডানলপ ৭/৮ শত লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ি আক্রমণ করে লুটপাট করে সম্পত্তি নষ্ট করে এবং কয়েকজন চাকরকে হত্যা করে। দুদু মিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করলে থানার দারোগা ডানলপের পক্ষ অবলম্বন করে এবং উল্টা অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে দুদু মিয়ার বাড়ি আক্রমণ করে লুটপাট করে। ফরিদপুরের সেসন জজ দুদু মিয়া ও তাঁর ৪৮ জন অনুসারীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেন। কিন্তু এইরূপ শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ঐ জজের না থাকায় তাঁর প্রদত্ত শাস্তি কনফার্ম বা অনুমোদনের জন্য কলিকাতাস্থ সদর নিজামত আদালতে পাঠানো হয়। ঐ উচ্চতর আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে গৃহীত সাক্ষ্যের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মামলা খারিজ করে দেয়। নিজামত আদালতের রায়ে ফরায়েজিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং তাদের কার্যকলাপের উপর দৃঢ় আস্থা ফিরে আসে। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন মোটামুটি এই ভাবেই চলতে থাকে, জমিদারদের অন্যায়ের প্রতি তারা মাথা নত করেনি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে ফরায়েজিদের জন্য এক নতুন বিপদের সূত্রপাত হয়। জমিদারেরা কোন সময় ফরায়েজিদের প্রতি তাদের আক্রোশ বন্ধ করেনি, এখন তারা নতুন ভাবে ষড়যন্ত্র করার একটা সুযোগ পায়। ফরায়েজিরা কোন সময় ইংরেজ সরকারের প্রতি প্রসন্ন ছিলনা, তারা ইংরেজ রাজত্বকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে তাকে 'দারউল-হরব' রূপে আখ্যা দেয়। এর অর্থ এই যে এখানে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা ছিলনা এবং এই জন্য ফরায়েজিরা এখানে জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া আবশ্যক নয় বলে ঘোষণা দেয়। বিদ্রোহ শুরু হলে ফরায়েজিরা তাদের চলা ফেরা এবং কর্মকর্তায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। এর সুযোগ নিয়ে বিরোধি পক্ষ সরকারের নিকট বেনামি চিঠি লিখে অভিযোগ করতে থাকে যে ফরায়েজিরা সিপাহীদের সঙ্গে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফরায়েজিরা বিদ্যালয় থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের ফেরৎ নিচ্ছে। আগামীতে ফরায়েজিরা মুসলমান শাসনের প্রতিনিধি হতে পারে এমন খবরও বেনামী চিঠিতে সরকারের নিকট জানানো হয়। ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সরকারকে জানায় যে ফরায়েজিরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সমর্থনের জন্য সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফরায়েজি নেতা দুদু মিয়া ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হন এবং তাকে কলিকাতা জেলে পাঠানো হয়। ১৮৫৯ সালে সিপাহী বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ফরিদপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে পুনরায় বন্দী করে ফরিদপুর জেলে আটক করে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মুক্তি

দেয়া হয়। মুক্তি লাভের পরে দুদু মিয়া ঢাকায় চলে আসেন, সেখানে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৮৬২ সালে (মতান্তরে ১৮৬০ সালে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুদু মিয়া ফরায়েজি রায়ত ও প্রজাদেরকে জমিদার এবং নীলকর সাহেবদের আত্যচার থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেন। তিনি বলেন সমুদয় জমির মালিক আল্লাহ, অতএব জমির খাজনা দাবী করার অধিকার কারো নেই। ইহা একটি বিপ্লবাত্মক দাবী, তাতে জমিদার, নীলকর সাহেব, এমনকি ইংরেজ সরকারও সচকিত না হয়ে পারেনি, আবার ঐ দাবীর ফলেই অনেক চাষী ও রায়ত তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজ লেখকরা তাঁকে আইন অমান্যকারী, অপরাধি এবং বিদ্রোহের দায়ে দায়ী করেন। মামলার খরচ চালাতে চালাতে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন, তার পরিবারও দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতার আরব্ধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে, তাঁর পুত্ররা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবে সত্য ও ন্যায়ের পথে অসম সাহসী নেতৃত্বদানকারী হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তৎপুত্র দুদু মিয়ার নাম এখনো অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলন

পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন মুসলমানদের পতন এবং ইংরেজদের আগমন, কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফলে দেশের সমাজে, ধর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায় অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তার মূল্য কোন অংশে কম ছিল না। রাজক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানেরা এতই বিমূঢ় হয়ে পড়ে যে প্রায় একশত বৎসর তারা কি করবে তাই ঠিক করতে পারেনি। তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি একে একে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ঘন ঘন দূর্ভিক্ষের ফলে মুসলমান হিন্দু সকলের সামাজিক ভিত নষ্ট হয়ে যায়। মুসলমানেরা তাদের দুর্গতির জন্য ইসলামের মুলনীতি থেকে সরে পড়াকেই দায়ী করে, তাই তারা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। উত্তর ভারতে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন (যাকে সাধারণ ভাবে ওয়াহাবী আন্দোলন বলা হয়) এবং বাংলায় তীতুমীরের আন্দোলন এবং ফরায়েজি আন্দোলন এরই ফলশ্রুতি। অন্যদিকে হিন্দু সমাজেও সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকে হিন্দুরা ইংরেজদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত সমাজ বিভিন্ন ভাবে ইংরেজদের ব্যবসায়িক ব্যাপারে সম্পৃক্ত হয়, কলিকাতায় কোম্পানীর আশ্রয়ে একটা হিন্দু সমাজও সৃষ্টি হয়, তারা ইংরেজদের রীতিনীতি এবং ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজরা ক্ষমতাসীন হলে মিশনারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দিতে থাকে। হিন্দুরা এর সুযোগ নিয়ে রাজভাষা শিখে এবং এই ভাবে তাদের ধর্মে সংস্কার সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। হিন্দু ধর্ম সংস্কারের জন্য যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি অবদান রাখেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম ঃ

উনিশ শতকে বাঙ্গালিদের জীবনে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়, তাদের সকলের মূলে না থাকলেও রামমোহন রায় প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখেন। ধর্ম সংস্কারে তিনি ছিলেন অগ্রনায়ক, এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁকে নবযুগ বা নবজাগরণের সৃষ্টি কর্তা বলা হয়। রামমোহনকে বলা হয় বাংলা তথা ভারতের প্রথম আধুনিক লোক। হুগলী জিলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে) রাম মোহনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় একজন অবস্থাপন্ন ভূম্যধিকারী হলেও মোগল সরকারে স্বল্প বেতনের

রাজকর্মচারী ছিলেন। রামমোহনের বাল্য জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না, তবে ইহা ঠিক যে তিনি বাড়িতে বা গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক ভাবে শিক্ষা লাভ করেন। সেকালে হিন্দু মুসলিম সকলেই' রাজভাষা ফারসি শিখতেন, তাই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ফারসিতেই শুরু হয়। পরে তিনি পাটনায় গিয়ে আরবি ও ফারসি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে তিনি কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষাও শিখেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে রামমোহন আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। পাটনায় থাকা কালে রামমোহন সূফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন, সেই প্রভাব তাঁর মধ্যে সারা জীবন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে তিনি তিববতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন বলে জানা যায়। রামমোহনের সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথমটিতে বলা হয় যে তিনি ১৬ বৎসর বয়সে হিন্দুদের প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে একখানি বই লিখায় পিতার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। তাতে রামমোহন পিতৃ গৃহ ত্যাগ করে ৪ বৎসর ধরে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন, পরে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। দ্বিতীয়টিতে বলা হয় যে পিতার সঙ্গে তিনি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, কিন্তু সদুত্তর না পেয়ে ১৫ বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। তিনি ভিন্ন কোন ধর্মের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য তিব্বতে যান।

বিশ বৎসর বয়স থেকে রামমোহন ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামশা করতেন। ফলে তিনি তাদের আইন কানুন, রীতি নীতি এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কিছু দিন ঢাকা-জালালপুরের (বর্তমান ফরিদপুর) কালেকটর উডফোর্ড সাহেবের দীওয়ান ছিলেন। মুর্শিদাবাদের অন্য একজন ইংরেজ র‍্যামজের সঙ্গে ও তাঁর পরিচয় হয়। ১৮০৫ সাল থেকে জন ডিগবি নামক একজন ইংরেজ রাজস্ব কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর বানিয়া হিসেবে কাজ করেন। তিনি ডিগবির সঙ্গে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত থাকেন এবং বাংলার বিভিন্ন অংশে কাজ করেন। ১৮০৯ সালে ডিগবি রংপুর জিলার কালেকটর নিযুক্ত হলে রামমোহনও তাঁর সাথে রংপুরে গমন করেন এবং ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। সেরেস্তাদারের বেতন ছিল মাত্র মাসিক ৬০ টাকা, কিন্তু ৫ বৎসর সেরেস্তাদারী করে রামমোহন যে অর্থ উপার্জন করেন তা বহুবৎসর স্বাধীন ভাবে চলার জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৮১৪ সালে ডিগবি বিলেত চলে গেলে রামমোহন পরের বৎসর সরকারি চাকুরি ত্যাগ করেন এবং কলিকাতার মানিকতলায় এখানি বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের মালিক কর্মচারীর সম্পর্ক ছাড়াও ভাল বন্ধুত্ব ছিল এবং রামমোহন ঐ সময়ে ভালভাবে ইংরেজি শিখেন, ডিগবির লেখায় জানা যায় যে যদিও রামমোহন ২২ বৎসর বয়সে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন, তিনি তাঁর অধীনে চাকুরি করা কালে উত্তমরূপে ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারতেন, ইংরেজি সংবাদ পত্র

পড়তেন, ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলী জানার জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি নেপোলিয়নের একজন ভক্ত ছিলেন। অতএব রামমোহন যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন তিনি ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারায় জ্ঞান লাভ করেন। ইতোপূর্বে তিনি সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফলে রামমোহন একজন শিক্ষত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হন, ইউরোপীয়রা বিশেষ করে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা সুযোগ পেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম সংস্কার সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান।

রামমোহন রায় ১৮০৩ সালে "তুহফত-উল-মুয়াহহেদীন" (একেশ্বরবাদ সৌরভ) নামে আরবি ও ফারসি ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। প্রায় একই সময়ে তাঁর আর একখানি পুস্তক "মনাজারাতুল আদিয়ান" (বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা) প্রকাশিত হয়। তুহফতের মত এই পুস্তকেও একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে ধর্মীয় জীবনে যে কুসংস্কার জন্ম নেয় তা দূর করে একেশ্বরবাদের উপর হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল রামমোহনের ধর্ম সংস্কারের মূল কথা। ভালকরে ইংরেজি শিখে কলিকাতায় বসবাস শুরু করার পরে রামমোহন ধর্ম সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকৃত, অতএব বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও তাদের প্রতিমা পূজা করা প্রকৃত হিন্দু ধর্মের বিরোধি। তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করা এবং উপনিষদের পৌওলিকতা শূন্য একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য রামমোহন বেদান্ত সূত্রের অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮১৬ সালে এবং পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বাংলায় উপনিষদের ইসা, কেনা, কথা, মুণ্ডক প্রভৃতি খন্ড প্রকাশ করেন। রামমোহন বলেন যে পৌওলিকতা আত্মাকে ধ্বংস করে, সমাজে কলুষতা আনে, মিথ্যা ও ভুল থেকে দেশবাসীকে জাগিয়ে একেশ্বর সর্বব্যাপী ঐক্য প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য।

রামমোহন তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য ১৮১৫ সনে "আত্মীয় সভা" নামে এক সমিতি গঠন করেন। নতুন ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে কলিকাতার প্রভাবশালী অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোক এই আত্মীয় সভার সদস্য ছিলেন। যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য তাঁরা হলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, নন্দকিশোর বসু, নীলরতন হালদার, তেলিনী পাড়ার জমিদার আনন্দ প্রসাদ ব্যানার্জি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীস। এঁরা সকলেই ছিলেন নতুন ধনী, কোম্পানীর বানিয়া মুৎসুদ্দী হিসেবে তাঁদের কর্মজীবন শুরু।

ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসে তাঁরা মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। রামমোহনের বাসভবনে তাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন এবং কিভাবে হিন্দু ধর্মের সংস্কার করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতেন। প্রাচীন শাস্ত্র বিষয়ে রামমোহনকে সাহায্য করতেন পণ্ডিত শিব প্রসাদ মিশ্র, হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামী এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীস। আত্মীয় সভা ১৮১৯ সাল পর্যন্ত চলে, এর পরে এই সভার কার্যাবলী সম্পর্কে জানা যায় না।

রামমোহনের রচনাবলী রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা ক্রমে ক্রমে রামমোহনের বিরোধিতা করে পুস্তক লেখায় নিয়োজিত হয় এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে থাকে। রামমোহনের মতবাদ খ্রিস্টান মহলে প্রশংসিত হয়, ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হয়ে উঠে এবং তারা তীব্র ভাষায় রামমোহনের সমালোচনা শুরু করে। রামমোহন আগেই বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, ইতোপূর্বে বেদান্ত উপনিষদের চর্চা এইদেশে প্রায় বন্ধ ছিল। রামমোহন ১৮২৫ সালে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, এই কলেজে বেদান্ত শিক্ষা ছাড়াও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই কলেজ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮২০ সালে রামমোহন "প্রিসেপ্টস্ অব যীসাস" নামে ইংরেজি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাতে যীশু খৃষ্টের অলৌকিকতাকে চ্যালেঞ্জ করায় তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের সমালোচনার শিকার হন। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাতে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় রামমোহন ও হিন্দু ধর্মের কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। রামমোহনও তাঁর প্রকাশিত "ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে" খ্রিস্টানদের সমালোচনার জবাব দিতে থাকেন। তাঁর প্রতিবাদে তিনি "শিবপ্রসাদ-শর্মা" নাম ব্যবহার করতেন। অতএব হিন্দু রক্ষণশীল এবং খ্রিস্টান উভয় পক্ষ থেকে তিনি সমালোচনার শিকার হন। হিন্দু রক্ষনাশীলদের নেতৃত্ব দেন রাজা রাধাকান্তদেব এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়। রামমোহন উভয় পক্ষের সমালোচনার জবাবে অনেক পুস্তক পুস্তিকা এবং প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। এই আলোচনা সমালোচনার ফলে ধর্ম বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসা বেরিয়ে আসে এবং নতুন ধর্মমত ও পথ সম্পর্কে নব্য ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এবং চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হয়।

রামমোহন ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তারিখে "ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন, ঐ তারিখে ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই সভার অধিবেশনে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করা হত, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হত এবং সঙ্গীত পরিবেশিত হত। দু'এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য একখানি নতুন বাড়ি নির্মিত হয়, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তারিখে এই নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক

ব্রাহ্মণ সহ প্রায় পাঁচ শত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। এই উপাসনালয়ে সকল ধর্মের ও সকল স্তরের লোকের উপাসনা করার অধিকার ছিল। রামমোহন এক লিখিত দলিলে নিয়ম করে দেন যে যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা পারমেশ্বরের উপাসনা করতে আসলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য এই উপাসনালয়ের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। এখানে কোন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উপাসনা করা যাবে না, কোন প্রকার চিত্র বা প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হবে না, প্রাণিহিংসা হবে না, পান ভোজন হবে না এবং কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ করা হবে না। এখানে পরম সৃষ্টিকর্তা, দান, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, নৈতিক চরিত্র, নানা ধর্ম ও মতের মিলন স্থাপন ও সৎগুণের বিকাশ ইত্যাদি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা নিষিদ্ধ হয়। উপরোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে বক্তৃতা,উপদেশ, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি উপযুক্ত কাজ রূপে গণ্য হবে।

প্রথমে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার বেশি ছিল না, কলিকাতার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ধনী লোকদের মধ্যে ইহার আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার পক্ষে জোর সমর্থন জানান, বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন এবং মূর্তি পূজা বর্জন করেন। এর ফলে সাধারণ হিন্দু সমাজ রামমোহনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে, তাঁকে রক্ষণশীলরা সমাজচ্যুত করে, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্ম সমাজের বিপরীতে এবং ব্রাহ্মদের ঠেকাবার জন্য ধর্মসভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে, এর নেতৃত্ব দেন রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানি চরণ বন্দোপধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

রামমোহন শুধু ধর্ম সংস্কার করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষা সংস্কারেও মনযোগ দেন। কুলীন প্রথা বা কৌলীন্য তখন হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকায় সমাজে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। কৌলীন্যের নামে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা একাধিক বিবাহ করত, অনেক কুলীন বিবাহ করাকেই পেশা করে নেয় এবং স্ত্রীর সম্পত্তি পাওয়ার জন্য অনেকে কয়েক ডজন বা এমনকি শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। তারা স্ত্রী বিয়ে করে নিজের ঘরে আনতনা বরং কনের পিত্রালয়ে রেখে দিত, যাকে বিয়ে করে রেখে আসে তাদের দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও অনেকের হত না। কৌলীন্য লাভের আশায় পিতা কন্যাকে কুলীনের হাতে তুলে দিত। কৌলীন্য প্রাপ্ত কন্যারা তার সন্তানাদির ভার বহন করত; কন্যার পিতা অর্থাৎ কৌলিন্য দান কারী স্বামী এক শ্বশুরালয় থেকে অন্য শ্বশুরালয়ে ঘুরে বেড়াত। সমাজের আর একটি কুসংস্কার ছিল বাল্য বিবাহ। অল্পবয়সে কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে, বিশেষ করে দশ এগার বৎসর পার হলে কন্যার পিতার সমাজচ্যুত হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল। সতীদাহ প্রথা ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক কুসংস্কার। স্ত্রীদের মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। রামমোহন এই সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তিনি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নারীর অধিকার

সম্পর্কে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাতে তিনি পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষা ও সম্পত্তি লাভে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরুষের সঙ্গে নারীর সমকক্ষতার কথা প্রচার করেন।

শিক্ষা বিস্তারেও রামমোহন অবদান রাখেন। তিনি পলাশীর পরে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুধাবন করে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন, সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় "এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে ইংরেজি ভাষা এবং বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা দেওয়া হত। সংবাদ পত্র প্রকাশেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁর মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২১ সালে তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হত। পরের বৎসর তিনি ফারসি ভাষায় "মিরাত-উল-আখবার" নামে আরো একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ইউরোপীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা হত। এর উদ্দেশ্য ছিল, এই দেশের লোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগিয়ে তোলা। ইংরেজ সরকার ১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে আইন পাশ করলে রামমোহন তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর প্রতিবাদের কপি প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট এবং পরে বিলাতের প্রিভি কাউনসিলে প্রেরণ করেন। তাতে তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আরবি ফারসি ইংরেজি সকল ভাষায় জ্ঞান থাকায় এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকায় দিল্লীর ক্ষমতাহীন নামমাত্র সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁর দাবী দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করার জন্য রামমোহনকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিনিধি রূপে বিলেতে পাঠান। সম্রাটের প্রতিনিধির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সম্রাট রামমোহনকে রাজা উপাধি দান করেন। তিনি বিলাতে পার্লিয়ামেন্টকে কোম্পানীর শাসনে ভারতীয়দের দূরবস্থার কথা অবহিত করেন। তিনি বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, এর ফলে কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে জানান। তিনি বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত কৃষকদের সঙ্গে জমিদারদের সঙ্গে নয়। বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তিনি পার্লিয়ামেন্টে দাবী জানান। রামমোহন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ভ্রমণ করেন এবং সেখানে ফরাসী চিন্তাবিদদের সংস্পর্শে আসেন, তিনি ফরাসী রাজা লুই ফিলিপির সঙ্গেও সাক্ষাত করেন। পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন ইংলন্ডে ফিরে আসেন এবং

সেখানে বৃষ্টল শহরে ঐ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইউরোপে আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে সেই জ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ তিনি পাননি, কিন্তু বিদেশ যাওয়ার পূর্বে তিনি দেশ ও সমাজের জন্য যে অবদান রাখেন তার ফলে বাংলার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭-১৯০৫ ঃ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের সহকর্মী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সারির একজন সদস্য ছিলেন। রামমোহন রায় ইহা প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে পৌওলিকতা বর্জন এবং একেশ্বরবাদ হিন্দু শাস্ত্র সম্মত, তিনি যুক্তিবাদ এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মণদের মত যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে পড়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে তা কোনমতে টিকে থাকে। সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা কমে যায়, আগের মত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সভায় আচার্যের কাজ করতেন।

দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্র নাথ এই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসায় তাঁর মধ্যে ধর্মভাবের উন্মেষ হয়। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ উপনিষদ ইত্যাদি পাঠ করে জ্ঞান বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর মধ্যে ধর্ম ভাব বেড়ে যায়। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা নামে এক সংগঠন স্থাপন করেন, কিন্তু এর দ্বিতীয় সভায় নাম পালটিয়ে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা নামকরণ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল "সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করা"। এর তিন বৎসর পরে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগাদান করেন, ফলে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে দুইটি সভা যুক্ত হয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করে। এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সদস্য সভায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করলেও নিজের ঘরে প্রতিমা পূজা করতেন। এই সভায়ও পূর্বের মত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদ পাঠ করার পরে তাঁর সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন বেদী থেকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব সমর্থন করে বক্তৃতা করতেন। তখন সমাজের কোন বিধিবদ্ধ আইন কানুন ছিল না, কেউ ইচ্ছা করলে আসত, ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেত, কিন্তু একই সমাজের সভ্য হিসেবে ঐক্যের বন্ধন ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, অতঃপর যাঁরা পৌওলিকতা পরিত্যাগ করে মাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করবেন তাঁদেরই শুধু সমাজের সভ্য রূপে গণ্য করা হবে। সভার সভ্যদের এক ঐক্যবদ্ধ সমাজে পরিণত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয়।

১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত সহ ২১ জন সদস্য প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে আরো ৫০০ জন লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন। প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখা হল যে "সদস্যরা প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমর্পণ করবে।" তাছাড়া তাদের উপাসনার জন্য উপনিষদ থেকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দরূপ মৃতং যদ্ধি ভাতি" এই দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল এবং পরে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" বাক্যটিও উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করা হল। দেবেন্দ্রনাথ উপাসনার প্রণালী নির্দিষ্ট করে দেন এবং এর শেষে একটি প্রার্থনা যোগ করে দেন।

এইরূপে রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দেবেন্দ্রনাথের পরে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব দেন কেশব চন্দ্রসেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। তাঁর সময়ে সমাজের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

উনবিংশ অধ্যায়

কোম্পানী আমলে মুসলিম শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা

মুসলমান শাসন আমলে মুসলমান এবং হিন্দুদের আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মকতব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টোল ও চতুষ্পাঠি বলা হত। শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল না, রাষ্ট্রের খরচে ও তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত ও পরিচালিত হত, তবে এগুলোর সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনায় মাদ্রাসার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, এগুলো রাষ্ট্রের খরচে নির্মিত হয় এবং শিক্ষকের বেতনও রাষ্ট্র বহন করার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু সারা বাংলার অন্য কোথাও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় মাদ্রাসার অস্তিত্ব দেখা যায় না। তবে বিভিন্ন স্থানে মকতব ও মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিল, এই প্রতিষ্ঠান গুলো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হত। আলেম, সৈয়দ ও সূফীরা মোগল এবং নবাবের সরকার থেকে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি লাভ করত, এইরূপ লাখেরাজ ভূমি ইনআম, ওজিফা বা মদদ-ই-মাআশ রূপে পরিচিত হত। মুসলিম আলেমরা ইসলামী শিক্ষা প্রদানকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য রূপে মনে করত, এবং স্বীয় উদ্যোগে নিজ মসজিদে বা বসত বাটিতে বা আলাদা ভবন তৈরি করে মাদ্রাসা পরিচালনা করত। তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সাহায্য বা সমর্থন দেওয়ার জন্য সম্রাট বা নবাবেরা ভূমি সম্পত্তি দান করতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ অসংখ্য মকতব এবং মাদ্রাসার অস্তিতের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোম্পানী আমলে এডওয়ার্ড এ্যাডাম নামক একজন ইংরেজ বাংলার হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ জরিপ করে রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় যে সারা দেশ ব্যাপী অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তবে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এ্যাডাম জরিপ চালানোর সময় অনেক মুসলিম মকতব মাদ্রাসা ধ্বংসের পথে বা ধ্বংস হয়ে গেছে। মসজিদে কোরান শরীফ পাঠ শিক্ষা দেওয়া হত এবং মুসলিমদের অবশ্য করণীয় বিষয়াদি যথা নামাজ পাঠ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হত। কলেমা এবং ইসলামী বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানও মসজিদে দেওয়া হত, কিন্তু মকতবে আরো একটু উচ্চতর জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মসজিদে মকতবের শিক্ষা ছিল মোটামুটি ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের তবে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান, আরবি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হত মাদ্রাসায়, কোন কোন মাদ্রাসা উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। এ্যাডাম এরূপ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের বিবরণ দেন, এই সকল মাদ্রসায় প্রয়োজন মত আরবি ও ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত থাকতেন, উচ্চতর মাদ্রাসায় হাদিস, ফেকাহ,

তফসির, ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য নুহু,ছরফ বা ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। বর্তমান কালের মত কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ছিল না, কোন পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষক নিজে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতেন, পাঠ্যসূচি হচ্ছে কোন ছাত্র কোন কোন পুস্তক পড়ার উপযুক্ত তা নির্ধারণ করে দেওয়া, শিক্ষক এবং ছাত্র নিজে পুস্তক নকল করে নিজে পড়তেন এবং অন্যকে পড়ার সুযোগ দিতেন। সুন্দর হস্তাক্ষর অনুশীলন করাও পাঠ্য সূচির অন্তর্ভুক্ত করা হত। মুসলমান আমল তথা মোগল আমলে আরবি ফারসিতে লিখন পদ্ধতি বিজ্ঞানে পরিণত হয়, হস্ত লিখন পদ্ধতি এত উন্নতি করে যে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। হস্তলিখন পদ্ধতি উন্নতি করার কারণ তখনো ছাপা বা মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কৃত না হওয়ায় হাতের লেখার মাধ্যমেই জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি শিখতে হত। কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা খানা প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলমানরা আরবি ফারসি ছাপার কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাদের পুস্তক ছাপতে পারেনি। তাই তাদের পুস্তক হাতেই লিখে নিতে হত। মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে পরীক্ষাও চালু ছিল না, শিক্ষক বিচার করতেন কার শিক্ষার মান কতটুকু, এবং এই বিষয়ে শিক্ষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হত। সেকালে ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধও ছিল না। শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসতেন, ছাত্ররা একজন একজন করে শিক্ষকের নিকটে গিয়ে পড়া নিয়ে আসত, এবং পাঠ শিখা হয়ে গেলে আবার শিক্ষকের নিকট গিয়ে নতুন পাঠ নিয়ে আসত।

পলাশীর যুদ্ধের আগে মুসলমানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকলেও কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ধীরে ধীরে অবনতি হতে থাকে, ১৮২৮ থেকে লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির পর থেকে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লোপ পেতে থাকে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তির উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, এই মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আরবি ও ফারসি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম আইন শিক্ষা দেওয়া যাতে বিচারালয়ে উপযুক্ত বিচারকের অভাব না হয়। প্রথম দিকে সরকারের নির্দেশ ছিল যে কলিকাতা মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ছাড়া বিচার বিভাগে চাকুরি দেওয়া হবে না। ফলে বিচার বিভাগে মুসলমানদের চাকুরির নিশ্চয়তা হয়, কিন্তু পরে এই নিয়ম বাতিল করা হয়। মুসলমানেরা তখনো ইংরেজি শিক্ষার কথা চিন্তা করেনি। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজে হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে মুসলিম মুনশী মৌলবিরাও ছিলেন। এক সময় তাদের সংখ্যা ৩০ জনের ও অধিক ছিল, কিন্তু এরা ছিল মুসলিম আমলে শিক্ষালাভ করা লোক। যাই হউক লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি, ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা এবং ইংরেজি জ্ঞান না থাকলে সরকারি চাকুরির দরজা বন্ধ করা ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষিত না হওয়ায় সরকারি চাকুরি থেকে বিতাড়িত হয়।

মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে। তাই যেখানে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি চাকুরি সহ সমাজের সর্বস্তরে এগিয়ে যায়, সেখানে মুসলমানেরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করার কারণ প্রধানত দুইটি-১ম, খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়, ২য়, মুসলমানেরা মনে করত যে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই তাদের প্রধান এবং প্রাথমিক কর্তব্য ; ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলে ধর্ম শিক্ষা ব্যাহত হবে, তাই ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় তারা আগ্রহী ছিলনা। ইংরেজি জ্ঞান না থাকায় সরকারি চাকুরি বন্ধ হয়ে গেলে মুসলমানদের বোধোদয় হয়, তারা বুঝতে পারে যে তাদেরও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু ততদিনে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করার আর্থিক সঙ্গতি তারা হারিয়ে ফেলে। ১৮২৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, প্রথম বৎসর ছাত্র ছিল ৪২ জন। ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়, সেখানে ইংরেজি বিভাগে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩১ জন (হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯৪৮ জন)। অতএব যেখানে ধর্ম শিক্ষা সহ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ছিল সেখানে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতি শুরু হয়। কোম্পানী আমলে ইংরেজি শিক্ষায়তনগুলো কলিকাতা কেন্দ্রিক ছিল, কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি অঞ্চলের লোকেরাই স্বল্প খরচে ইংরেজি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। শুধু ইংরেজি শিক্ষাই নয়, কলিকাতার ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও হিন্দুরা অংশ নেয় এবং লাভবান হয়। রাজক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে গ্রাম মুখী হয়ে যায়, তাদের ছেলেদের কলিকাতা গিয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ তখন ছিল না। এই কারণেও মুসলমানেরা ইচ্ছা থাকলেও ইংরেজি শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়।

কোম্পানী আমলে মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন একজন প্রধান ইংরেজি শিক্ষিত নেতা ছিলেন নবাব আবদুল লতীফ। নবাব আবদুল লতীফ ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে ঐ সময়ে মাত্র আর একজন মুসলমান ছাত্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন, তিনি ওয়াহিদুন্নবী। ঐ সময়ে সৈয়দ ওয়ারেস আলী এবং মুসা আলী হুগলী কলেজ থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন, এঁরা সকলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলন। আবদুল লতীফ সর্বপ্রথম মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টায় ব্রতী হন। তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ১০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহবান করেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের উপকারিতা এবং

সেই শিক্ষার গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ জমা পড়ে, বোম্বাই এর সৈয়দ আবদুল ফত্তাহ নামক একজন আরবি-ফারসি শিক্ষক ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৫ সালে কলিকাতায় প্রথম মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান "আঞ্জুমান-ই-ইসলামী" বা মোহামেডান এসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম আইন ব্যবসায়ী মুহাম্মদ মজহার এর নেতৃত্ব দেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের কাজী-উল-কুজ্জাত (বর্তমান লিগেল রিমেমব্রাঞ্চার) কাজী ফজলুর রহমান আঞ্জুমানের সভাপতি এবং আবদুল লতীফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এই আঞ্জুমানের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া সরকারের গোচরীভূত করা। আবদুল লতীফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার করা। এই সময় থেকে কলিকাতার অভিজাত মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং ইংরেজি ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও তাদের ভাবধারার পরিবর্তন হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ঃ

মুসলমানদের যেমন মকতব মাদ্রাসা ছিল হিন্দুদেরও তেমনি টোল চতুষ্পাঠী ছিল, টোলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং চতুষ্পাঠীতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং পলাশীর যুদ্ধের আগেই তারা ইংরেজি শিক্ষা প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজ ব্যবসায়ী ও বণিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য কলিকাতায় অবস্থানরত হিন্দুরা ইংরেজি শিখার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। এইসব হিন্দুরা ছিল হয় ইংরেজদের বানিয়া, দালাল, পাইকার বা ইংরেজ কোম্পানীর চাকুরে। কিন্তু কোম্পানী ক্ষমতা লাভের পরেও দীর্ঘদিন এই দেশের লোককে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেনি, প্রথমে তাদের ইচ্ছা ছিল দেশীয় লোকদের মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় (অর্থাৎ ফারসি ভাষায়) শাসন কার্য পরিচালনা করবে। তাই কোম্পানী ফারসি আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আসে ভিন্ন দিক থেকে। খ্রিস্টান মিশনারীরা খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা বাংলা শিক্ষা করে এবং বাঙ্গালীদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়, তাদের প্রচেষ্টায় প্রথমে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পলাশীর যুদ্ধের ২৬ বৎসর পূর্বে ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট এনুড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ একটি

অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করে। এখানে এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই কলিকাতার অনেক লোক ভালরূপে ইংরেজি শিখত এবং জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ মোটামুটি ইংরেজি শিখার চেষ্টা করত। এরা নিজের চেষ্টায় বা ইংরেজ বা ইংরেজি জ্ঞানে অভিজ্ঞ লোকদের সাহচর্যে ও সহায়তায় ইংরেজি শিখে আর্থিক উন্নতি লাভ করে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এইরূপ নিজের চেষ্টায় ভালরূপে ইংরেজী শিখেন। প্রসন্ন ঠাকুর আইনজীবি হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন। এইরূপ আরো অনেকেই ইংরেজি শিখেন এবং প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। অতএব ইংরেজি শিক্ষার কদর বেড়ে যায় এবং ইংরেজি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনও অনুভূত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতক শেষ হতে হতে ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি এবং মধ্য কলিকাতায় ড্রামন্ড সাহেব ধর্মতলা একাডেমী নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ফোর্বেশ সাহেব চুঁচুড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কেরী ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আসেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের এলাকায় মিশনারীদের প্রচারকার্য চালাতে দিত না, তাই কেরী ডেনমার্কের কোম্পানীর এলাকা শ্রীরামপুরে বসবাস করেন, জসুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড নামক আরো দুইজন মিশনারী তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং বিদ্যালয় ও ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ বহু স্কুল স্থাপন করে এবং ১৮১৭ সনের মধ্যে এই সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় সাত হাজারে বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে আরো বেশ কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সাহিত্য, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮১৭ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় তথা ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। স্কুলের উপযোগী ইংরেজি ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বইগুলো কখনো স্বল্পমূল্যে বা কখনো বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারী এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক এই সোসাইটি পরিচালনা করত। ১৮১৮ সালে কলিকাতার পাঠশালার উন্নতির জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই উদ্দেশ্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখে প্রাথমিক স্কুলে বিতরণ করেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইষ্ট হাইড এবং অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙ্গালি হিন্দুদের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে বিশেষ ভাবে বাংলা, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং সম্ভব হলে হিন্দুস্তানী ও ফারসি, ইংরেজি ধরণে নীতি শিক্ষা, গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঐরূপ প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ডেভিড হেয়ার এবং জি. এ. টার্নবুল প্রত্যেকে একটি করে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ ১৮১০ সনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্কচ্ মিশনারীরা ডাফ্ সাহেবের নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করত, বাঙ্গালি হিন্দু এবং খ্রিস্টান মিশনারীরা আরো বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ এইচ. এইচ. উইলসন ১৮৩৬ সালে কলিকাতা ত্যাগ করার প্রাক্কালে মন্তব্য করেন যে তখন প্রায় ৬ হাজার যুবক ইংরেজি শিক্ষা লাভ করত। বাঙ্গালি হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ভাষা ও শিক্ষার প্রতি এতই অনুরাগী হয়ে উঠে যে কোম্পানীর সরকার কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলে রাজা রামমোহন রায় এর প্রতিবাদ করে ১৮২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর জেনারেলের নিকট চিঠি লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি চিঠিতে যুগোপযোগী ও কার্যকরী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন এবং তিনি বলেন যে শুধু শহরে বিদ্যায়তন স্থাপন না করে বিদ্যালয় গ্রামে গঞ্জেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার প্রসার ঘটে।

শিক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানীর সরকারি নীতি ঃ

আগেই বলা হয়েছে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এর পরে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জনাথান ডানকান কাশীতে হিন্দু শাস্ত্র, আইন ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে অনেকদিন গত হলেও কোম্পানী নিজের উদ্যোগে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেনি। এই সময়ে বিলেতের কয়েকজন কোম্পানীর উপর প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতীয়দের শিক্ষাদান সম্পর্কে আন্দোলন করেন। এরা আবার দুই দলে বিভক্ত ছিল, প্রথম দল ভারতীয়দের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর করার জন্য খৃষ্টধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পক্ষে মত প্রকাশ করে, আর অন্যদল জনহিতবাদের আদর্শে অনুপ্রণিত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দানের পক্ষে মত দেয়। ১৮১৩ সনে কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় নির্দেশ দেওয়া হয় যে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য

কোম্পানী বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের এই দেশে বসবাসের অনুমতিও দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানীর ভারতস্থ কর্মচারীদের মধ্যে নীতির বিষয়ে মতের মিল না হওয়ায় দশ বৎসর পর্যন্ত এই বরাদ্দ অর্থ অব্যয়িত থেকে যায়। ইংরেজ এবং বাঙ্গালিদের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেখানে ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কথা বিবেচনা করে কোম্পানীর সরকার বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তা নির্ণয় করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে, এই কমিটি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান বা জনশিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ সভা। পরের বৎসর ১৮২৪ সনে বিলেতের কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্ট নির্দেশ জারী করে হিন্দু বা মুসলিম শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সমর্থন করে। ফলে পূর্বোক্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ নিরসন হওয়ার আগে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন, তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুমোদন করেন। গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদন সত্ত্বেও শিক্ষা-কমিটির সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ চলতে থাকে। প্রায় অর্ধেক সদস্য প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার পক্ষে এবং বাকী অর্ধেক সদস্য আধুনিক যুগোপযোগী প্রগতিশীল শিক্ষার পক্ষে মত দেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলে গবর্ণর জেনারেলের কাউনসিলের আইন সদস্য রূপে ভারতে আসেন। শিক্ষা নীতি সম্পর্কে তিনি এক সুদীর্ঘ মন্তব্য সভায় পেশ করেন, তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রাচীন পদ্ধতির নিন্দা করেন এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রবর্তন সমর্থন করেন। গবর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক পূর্ব থেকেই এই মতের সমর্থক ছিলেন, তাই মেকলের মন্তব্য পেয়ে তিনি ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তের সারমর্ম এই যে অতঃপর এই দেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সরকারি নীতি বলে গণ্য হবে এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে। এই ভাবেই অনেক চিন্তা ভাবনার পরে শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নীতি গৃহীত হয় এবং এই সময় থেকে ইংরেজি শিক্ষা এই দেশে প্রবর্তিত হয়।

বেসরকারি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। এই সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দু কলেজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়ন, অধ্যাপকদের অধ্যাপনা, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন ইত্যাদি আদর্শ স্থানীয় ছিল। এই কলেজের তরুণ অধ্যাপক লুই হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও এই কলেজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ডিরোজিও একজন স্বনামধন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত একজন ইউরেশিয়ান এবং ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং ড্রামণ্ড সাহেবের সংস্কারমুক্ত মন এবং যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ডিরোজিও ১৮২৬ সনের মে মাসে হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে সেখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এই স্বল্প সময়ে তিনি তাঁর আদর্শে ও ভাবধারায় ছাত্রদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে এই দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এর তুলনা পাওয়া যায় না। ডিরোজিও ক্লাসের বাইরেও ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন এবং আলোচনা সভা ও কলেজের পত্রিকার মাধ্যমে বিবিধ বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা জীবনে মত ও পথ স্থির করবে, কোন সংস্কার অন্ধ ভাবে অনুসরণ করবেনা, জীবনে মরণে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন করবে, সৎগুণ অনুশীলন করবে এবং অন্যায় ও অসত্য পরিহার করবে। তিনি প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেশপ্রেম, ন্যায়নীতি, মানবিক গুণ এবং স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের পড়ে শুনাতেন। তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শ চরিত্র ফুটিয়ে তুলতেন। ফলে ছাত্ররা অভিভূত হয়ে এই সব চরিত্র অনুসরণ ও অনুকরণ করত।

ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর অসামান্য প্রভাব দেখে একদল হিন্দু শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ ডিরোজিও ছিলেন যুক্তিবাদী এবং সংস্কার মুক্ত। তাদের বিরোধিতায় ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে হয়, তবে কয়েক মাস পরে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। (২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১)। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বৎসর ৮ মাস। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের ইতিহাসে ডিরোজিওর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রগতিশীল মতবাদের আলোচনার জন্য হিন্দু কলেজে কয়েকটি ছাত্র পরিষদ ও পত্রিকা ছিল। সর্বপ্রথম ১৮২৮ সনে ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। তাতে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশপ্রেম ইত্যাদি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আলোচিত হত। তারা যুক্তির সাহায্যে বিচার করে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অনেক রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহারের নিন্দা করত। হিন্দুদের খাদ্যাখাদ্য বিচার, গুরু ও পুরোহিতের আধিপত্য; জাতিভেদ, স্ত্রীজাতির অবনতি, প্রতিমাপূজা ইত্যাদি তাদের আলোচনার

বিষয়বস্তু ছিল। আর একটি সংগঠন ছিল "জ্ঞানোপার্জিকা সভা"। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তার করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। তাতে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষার মাধ্যমে আলোচনা করা হত, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের বিষয়ও এই সভায় আলোচনা হত। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হত। প্রবন্ধগুলো নির্বাচন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থাও ছিল। কলেজের ছাত্ররা পত্রিকাও পরিচালনা করে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঃ

হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পরে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি এডুকেশন কাউনসিল স্থাপিত হয় এবং এই কাউনসিলের তত্ত্বাবধানে দেশের বড় বড় শহরে কয়েকটি সরকারি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের আগ্রহ এবং চেষ্টায় কলিকাতায়ও কয়েকটি কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা কিছুপূর্বে ঢাকা, হুগলী ও কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হয় তবে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিষ্ঠা ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

১৮৫২ সালে কলিকাতায় কলরব উঠে যে হিন্দু কলেজে অহিন্দু অর্থাৎ মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাত্র ভর্তি করা হবে, ইহাতে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। কলিকাতার হিন্দু পত্র পত্রিকায়ও তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদের প্রধান কারণ হল এই হিন্দু কলেজ হিন্দুদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ স্বরূপ অর্থাৎ হিন্দু কলেজকে মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করায় হিন্দুরা ১৮৫৩ সালে হিন্দু মেট্রোলপলিটান কলেজ স্থাপন করে, হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র এই নতুন কলেজে ভর্তি হয়।

সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দুই ভাগে বিভক্ত হবে, জুনিয়র বিভাগে শুধু হিন্দু ছাত্ররাই থাকবে, সিনিয়র বিভাগে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করতে পারবে। পরিণামে জুনিয়ার বিভাগ হিন্দু স্কুলে এবং সিনিয়র বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। আরো স্থির হয় যে হেয়ার সাহেবের স্কুলও এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এই স্কুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করতে

পারবে। প্রেসিডেন্সী কলেজ একটি প্রধান বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, এখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৫৪ সালে বিলেতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড্ তাঁর বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপাচ বা শিক্ষাবিষয়ক অনুশাসন লিপিবদ্ধ করেন, এই অনুশাসন আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী উন্নতির সূচনা করে। এই দেশের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয় ঃ

(১) শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি পৃথক বিভাগ, অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা,

(২) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে পৃথক তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা,

(৩) সকল শ্রেণীর স্কুলের শিক্ষকের শিক্ষার নিমিত্ত নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা,

(৪) বিদ্যমান সকল সরকারি স্কুল কলেজের পরিচালনার সুব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা,

(৫) নতুন নতুন মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা,

(৬) প্রাথমিক পাঠশালা সমূহের উন্নতি সাধন করা,

(৭) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা, এবং তা কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ে সীমিত না করা,

(৮) সাধারণ লোকের জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা,

(৯) মেধাবী ছাত্রেরা যাতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারে তার জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা,

(১০) উচ্চ শিক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এবং প্রাথমিক ও নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রদানের সিদ্ধান্ত,

(১১) স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সরকারি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা,

(১২) সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের জন্য শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার করা, অর্থাৎ সকল প্রকার সরকারি চাকুরিতে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত লোকের দাবীর প্রাধান্য দেওয়া।

এই সকল প্রস্তাব অনুসারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ও অনুসরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে সাধারণ শিক্ষা বা কলা বিষয়ক শিক্ষা ছাড়াও

আইন, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজকে আদর্শ কলেজে পরিণত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

চার্লস উডের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের পাঁচ বৎসরের রিপোর্টে দেখা যায় যে পাঁচ বৎসরে সরকারি সাহায্যে ইংরেজি উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি যেমন হয়েছে, সংখ্যাও তেমনি বেড়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকের আগ্রহের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি বা প্রসার হয়নি। এর প্রতিকারের জন্য সরকার প্রতি জিলায় গড়ে ১০০ বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যে উন্নীত করার, ৬টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৪ জন সাব ইন্সপেকটর নিযুক্তির উদ্যোগ নেয়। তা ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে সস্তায় পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই সকল পুস্তকে গণিত, কৃষি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সহজ হিসাব-নিকাশ, চুক্তি পত্র, খত, দলিল ও সাধারণ চিঠি পত্র লেখা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক বৎসর পরে বিদ্যালয়ের গুরু বা শিক্ষকদের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল :

নতুন নতুন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষক ছাত্রদের আলোচনা এবং বির্তক সভার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। স্কুল কলেজ ছাড়াও কতগুলো ভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। স্যার উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতে আসার সময় জাহাজে বসেই জাতীয় ও এশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিল্প অনুসন্ধান বিষয়ে একটি স্মারক-লিপি তৈরি করেন। এতে ছিল (১) হিন্দু ও মুসলমান আইন, (২) প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস, (৩) ধর্মশাস্ত্রের মান ও ব্যাখ্যা (৪) মহাপ্লাবন বিষয়ে কিংবদন্তী ও অনুমান, (৫) হিন্দুস্তানের আধুনিক রাজনীতি ও ভূগোল (৬) বাংলাদেশ শাসন করার সর্বোচ্চ পন্থা, (৭) এশীয়দের গণিত, জ্যামিতি ও মিশ্র বিজ্ঞান, (৮) ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, শল্যবিদ্যা ও শরীর তত্ত্ব, (৯) ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, (১০) এশীয়দের কবিতা, ছন্দ ও নীতি শাস্ত্র, (১১) পূর্ব দেশীয় জাতিসমূহের সংগীত, (১২) চীনাদের ৩০০টি গাথাকাব্য, (১৩) তিববত ও কাশ্মীরের বিশদ ইতিহাস, (১৪) ভারতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি ব্যবস্থা, (১৫) মোগল শাসন ব্যবস্থা এবং (১৬) মারাঠাদের শাসন ব্যবস্থা সহ ১৬টি

সহকর্মী গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, এবং রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা গদ্যে রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একাধিক পুস্তক রচনা করেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তারিনীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুনশী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রাসাদ রায়ের লিখিত কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ও বেশ কয়েকখানি বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা করেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের স্থান অতি উচ্চে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা কারে অনেক প্রবন্ধ লিখেন, এগুলো প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তাকাকারে ছাপা হয়। তাঁর আত্মজীবনীও উৎকৃষ্ট রচনা। এছাড়া সেকালে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং তারাশঙ্কর বাংলা গদ্যে অবদান রাখেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য পুস্তক রচনা করেন। তাঁর লিখিত ১৩ খণ্ডে বিভক্ত প্রথম বাংলা এনসাইক্লোপেডিয়া "বিদ্যাকল্পদ্রুম" পণ্ডিত্য পূর্ণ প্রকাশনা রূপে সমাদৃত। এর পরে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজে যোগ দেন, তিনি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর ঐ কলেজের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিত ছিলেন। পরে ১৮৪৭ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত তিনি কলেজের কেরানি এবং খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম দুইটি গ্রন্থ "বাসুদেব চরিত" এবং "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ঐ কলেজের পাঠ্য পুস্তক রূপে রচিত হয়। প্রথমটি মুদ্রিত না হলেও দ্বিতীয়টি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক বাংলা গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস' এবং আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পারীচাঁদ মিত্র এবং কালি প্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত মূলক সাধু ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ বিরল লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে আরো অগ্রসর করে দেন। প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল" ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম" ছদ্মনামে কলিকাতা সমাজের ব্যঙ্গচিত্র "হুতোম প্যাঁচার নকশা" ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। দুই জনেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রধান সংস্কারক রূপে পরিচিত। তাঁদের পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার আগেই কোম্পানীর শাসন শেষ হয়ে যায়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ঃ

কোম্পানী আমলে মুসলমানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল পায়নি, তারা প্রথমে

পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন করে পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল অনুধাবন করতে পারলেও তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আর্থিক সঙ্গতি তারা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে প্রথম থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা অবশ্যই সুফল বয়ে আনে, কিন্তু প্রথম দিকে হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা হিন্দু সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিও করে। কোম্পানীর সরকার কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বেই বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলিকাতা ও আশে পাশে এক হাজারের ও বেশি যুবক ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ছাত্রদের মনে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হয়, ফলে হিন্দুধর্ম ও সমাজের চিরাচরিত প্রথা, সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তাদের মনে প্রবল বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। ইংরেজি শিক্ষিতদের স্বীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ছাড়াও তারা আচারে ব্যবহারে, চাল চলনে, কথাবার্তায় ইংরেজদের অনুকরণ করত, এমন কি মদ্যপান ইত্যাদি কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ত। অনেক অভিভাবক তা পছন্দ করত না এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা চিঠি পত্রও লিখত। একজন অভিভাবক পত্রিকায় লিখেন যে তাঁর ছেলে ঘরের কাজকর্ম দেখত, ডাকলে নিকটে আসত এবং কথার উত্তর দিত। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে তার চলাফেরা বিপরীত হয়ে গেল, ভিন্ন দেশের অনুকরণে পোষাক, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার শুরু করে, গলায় মালা ব্যবহার করে না, বিনা স্নানে আহার করে, শুচি অশুচি মানে না। বরঞ্চ এই বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে 'ননসেন্স' বলে। আর এক অভিভাবক অভিযোগ করে ইংরেজি শিক্ষিতরা পরস্পর ইংরেজিতে কথা বলে, একটা বাংলা বাক্যও ব্যবহার করে না, চিঠি পত্রও বাংলায় লিখেনা। আর এক অভিভাবক তার ইংরেজি শিক্ষিত ছেলেকে কালীঘাটে দেবী দর্শনে গিয়ে দেবীকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বলে কিন্তু ছেলেটি "গুড মর্নিং ম্যাডাম" বলে দেবীকে সম্বোধন করে। অভিভাবক তখন আক্ষেপ করে বলে যে ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে তার জাত গেল। একজন পত্র লেখক কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা ছাত্রদের দাড়িয়ে প্রস্রাব না করার, গলায় মালা পরার, ফিরিঙ্গি জুতা না পরার এবং ফিরিঙ্গি পোষাক না পরে ধুতি পরার উপদেশ দেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেন যে বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে গোলদীঘির নিকট একটি উদ্যান ছিল, সেখানে তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ সমবেত হয়ে মদ পানও নিষিদ্ধ মাংস আহার করত। অতিরিক্ত মদ পানের ফলে তাঁর নিজের শরীর এমন ভেঙ্গে পড়ে যে ১৮৪৪ সনে তিনি কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি আরো লিখেন যে হিন্দু কলেজের ছেলেরা সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে মদ পান করত।

প্রথম প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ছেলেদের মধ্যে এইরূপ অনেক সমস্যা দেখা দেয়, এমন কি কেহ কেহ খ্রিস্ট ধর্মও গ্রহণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালিদের মননে ও জীবন যে বৈপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে তার মূল্যও অপরিসীম। বাঙ্গালি হিন্দুরা বহির্জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, মধ্যযুগে সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের বাইরে সকল দেশেই স্লেচ্ছদের বাস, এই কারণে হিন্দুদের স্থলপথেও বিদেশ যাত্রা রহিত হয়। মুসলমানদের এই রূপ কোন বাধ্য বাধকতা না থাকলেও তারাও শিক্ষা দীক্ষায় নির্জীব হয়ে পড়ে। আব্বাসী খেলাফত আমলে মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি সাধন করে যে ইউরোপও তাদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলা ভারতের মুসলমানেরা বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। ফলে পাশ্চাত্য জগতে রেনেসাঁর ফলে যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন হয় এবং নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ হয়, তার কোন সংবাদ বাংলা তথা ভারতে পৌছায়নি। ইউরোপে নিউটন, লাইবনিৎজ, বেকন প্রমুখ মনিষীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই বাঙ্গালিরা তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়। আর একটি উদাহরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার মানব সভ্যতায় যুগান্তর আনয়ন করে—এই তিনটি হল মুদ্রণ যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র এবং চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্র। এইগুলো যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তা জগতে, যুদ্ধে এবং সমুদ্র যাত্রায় অদ্ভুত উন্নতি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে পাশ্চাত্য জগতে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় কিন্তু বাঙ্গালিরা এই সমুদয় আবিষ্কারের খোঁজখবর রাখেনি যদিও ঐসব আবিষ্কারের পরে বহু চীন দেশীয় রাজদূত বাংলার সুলতানদের দরবারে এসেছিলেন।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজি ভাষা শিখে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করে বাঙ্গালিরা কূপমন্ডুকতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। ইউরোপের সমাজে যুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রাধান্য লাভ করে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পরে মানুষ স্বাধীন স্বত্ত্বা ও অধিকার সম্পর্কে নতুন প্রেরণা লাভ করে। অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য, বিবেক ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে এদেশীয়রা সজাগ হয়ে উঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে আঘাত করে। যেই সকল ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে বিনা বিচারে ভগবানের অমোঘ বিধান রূপে গ্রহণ করত, এখন তারা সেগুলো যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শুরু করে। ধর্ম এবং সমাজে যাই কিছু প্রচলিত আছে তাই সত্য, এই বিশ্বাস হিন্দুরা এখন পরিত্যাগ করে। পশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করে হিন্দুদের মধ্যে এখন নতুন নতুন চিন্তার উদ্রেক হয়, তারা প্রশ্ন করতে শিখে

এবং ভালমন্দ বিচার করে গ্রহণ ও বর্জন করার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। হিন্দুরা দেব দেবীর মুর্তি গড়ে পূজা করত, বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করত, শিশুপুত্রকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিত, জাতিভেদ প্রথা কঠোর ভাবে মানত, কুলীন প্রথায় একাধিক, কোন কোন সময় শতাধিক ব্রাহ্মণ কন্যাকে মৃত্যুপথ যাত্রী কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জাতি রক্ষা করত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই সকল বিষয়ে হিন্দুদের বিশ্বাসে চিড় ধরে, তাদের মনে জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে নতুন আদর্শের জন্ম দেয়। এক কথায় বলতে গেলে কোম্পানী আমলে নতুন হিন্দু সমাজের জন্ম, ঐ একই সময়ে মুসলমানেরা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

হাজার ছিল ইংরেজ। বাংলার সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,৫১,০০০, তার মধ্যে মাত্র তেইশ হাজার ছিল ইংরেজ। বাংলার সৈন্যদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বাংলার সৈন্যরা বাঙ্গালি ছিল না, তাদের উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যা এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকা থেকে রিক্রুট বা ভর্তি করা হত। বাংলার এই দেশী সৈন্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের সংখ্যা বেশি ছিল, ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা এই দেশে প্রবল হয়ে উঠলেও ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতেরা তাদের বর্ণ ভেদ প্রথা সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি। বর্ণভেদ ছাড়াও এই সৈন্যরা একই এলাকার লোক হওয়ায় এবং তারা একই সামাজিক গণ্ডী থেকে আসায় তাদের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য ছিল এবং তাদের মধ্যে সহমর্মিতা বিরাজ করত। তাছাড়া সিপাহীদের বেতন ছিল কম এবং তাদের পদোন্নতির উপায়ও বিশেষ ছিল না। সাহস এবং দক্ষতায় কোন ভাবে হীন না হলেও ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাদের সুযোগ সুবিধা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ব্রিটিশ সরকার তখন ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাইরে বার্মা, আফগানিস্তান, পারস্য ইত্যাদি এলাকায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সিপাহীদের মাঝে মাঝে ঐ সকল যুদ্ধে অংশ নিতে হত। সিপাহীদের তা পছন্দ ছিল না, কারণ তাতে তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ পালনে অসুবিধা হত। ১৮২৪ সালে বার্মা যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলে কলিকাতার নিকটে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, ১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই কারণে সরকার শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং গুর্খা সৈন্য নিয়ে নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করার উদ্যোগ নেয়। তাছাড়া লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সালে জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এ্যাক্ট পাস করেন। এই আইনে বলা হয় যে সিপাহীদের যেখানে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে সেখানেই যেতে হবে। এর ফলে বাংলার বাহিনীর উত্তর ভারতীয় সৈন্যদের অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়।

সিপাহী বিপ্লবের অনেক কারণের মধ্যে তাৎক্ষণিক কারণ হল জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এ্যাক্ট এবং এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন। প্রথমটিতে অর্থাৎ জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এ্যাক্ট পাশ করার ফলে সিপাহীদের জন্য আদেশমত সমুদ্র যাত্রাও বাধ্যতামূলক করা হয়। এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ভরার পূর্বে এর একাংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সিপাহীদের মধ্যে গুজব রটে যায় যে এই টোটায় শূকর এবং গরুর চর্বি মিশ্রিত আছে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতি নষ্ট করার জন্য এই টোটা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সত্যি সত্যি টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত হয়েছিল। এই সংবাদ প্রচার হলে প্রথমে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ বহরমপুরের সিপাহীরা ১৮৫৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারেডে অংশ নিতে অস্বীকার করে। পরের দিন তারা অবশ্য প্যারেড করে কিন্তু সরকার তাদের নিরস্ত্র করে সৈন্যদল ভেঙ্গে দেয়। একমাস পরে

মার্চ মাসের ২৯ তারিখে কলিকাতার নিকটে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে নামক একজন সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে, একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁকে বাধা দেওয়ায় তিনি সৈন্যাধ্যক্ষকে গুলী করে আহত করেন। মঙ্গল পান্ডের বিচার করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। ব্যারাকপুরের সৈন্যদলও ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনাগুলোর খবর নানা গুজবে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে দেয়। ১০ই মে তারিখে মীরাটের সিপাহীরা টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করায় তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। তাতে অন্য সিপাহীরা একযোগে বিদ্রোহ করে কারারুদ্ধ সহকর্মীদের উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ইংরেজ কর্মচারীকে তারা হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানেও তারা ইংরেজদের হত্যা করে ও তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। তারা মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট রূপে ঘোষণা করে।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে বাংলাদেশের ঢাকা এবং চট্টগ্রামেও যে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তার বিবরণ আলোচনা করা হচ্ছে। ঢাকা কলেজের তদানিন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ ব্রেনান্ড এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

৩০ জুলাই ১৮৫৭ - কলেজে এক সভা হয় এবং অস্ত্র বহনে সক্ষম এইরূপ ৬০ জন ইউরোপীয় পূর্ব ভারতীয় লোক সভায় উপস্থিত হয়। সভায় দুইটি সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেজর স্মিথকে পদাতিক বাহিনীর এবং লেফটেন্যান্ট হিচিনসকে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয়।

১১ আগষ্ট ১৮৫৭ - অনেক আর্মেনীয় ঢাকা ছেড়ে কলিকাতার দিকে যাচ্ছে, ইউরোপীয়রা তাদের কারখানা রক্ষার ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাতে পাহারা দিচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সাহেবদের এই তৎপরতার কারণ কিছুই বুঝতে পারে না।

১৫ আগষ্ট ১৮৫৭ - সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জলপাইগুড়ির সিপাহীরা বিদ্রোহ করলে এখানকার (ঢাকার) সিপাহীদের সংবাদ পাওয়া মাত্র নিরস্ত্র করা হবে। কালেকটরেটে ৫০ জন সিপাহি আছে, প্রথমে তাদের নিরস্ত্র করা হবে, পরে লালবাগ দূর্গে গিয়ে সেখানে অবস্থানরত সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে এবং তাদের অধীনস্থ অস্ত্রগুলো সরিয়ে আনতে হবে।

৩০ আগষ্ট ১৮৫৭ - গতকাল রবিবার মহরম উৎসব ছিল। অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকরা সারারাত পাহারা দেয়, তাদের ভাষ্যমত ঢাকা

শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তি বিরাজ করে। আগের মত লোকজন বেশি জমা হয়নি। হোসেনী দালানে মাত্র ৫০ জন উপস্থিত ছিল। মনে হচ্ছে যে মুসলমানেরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

২৬ নবেম্বর ১৮৫৭ - ভারতে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল (সিপাহী বিপ্লব) তা ঢাকায় শান্তিতে পার হয়ে যায় কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে দুঃসংবাদ আসে। তাই সন্ধ্যা ৬টায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে এবং পরের দিন সকাল ৫ টার মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত থাকার আদেশ দেওয়া হয়। পরের দিন কমিশনার, জজ এবং অন্যান্য কয়েকজন বেসামরিক কর্মকর্তা সহ ২৫/৩০ জন উপস্থিত হয়। তখনও অন্ধকার, তাই সকলে সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করে। পরিকল্পনা ছিল যে কোষাগারের প্রহরীদের নিরস্ত্র করে তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হবে, এবং নৌসেনারা লালবাগ দুর্গে যাবে। সবকিছু পরিকল্পনা মত হয়, কোষাগারের প্রহরীদের নিরস্ত্র করা হয়। নৌসেনারা লালবাগে গিয়ে দেখে যে সিপাহীরা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা নিশ্চয়ই তাদের নিরস্ত্র করা সম্পর্কিত আমাদের সিদ্ধান্ত আগে ভাগে জেনে ফেলে। এখানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়, কিন্তু সিপাহীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ৪০ জন সিপাহী নিহত হয়, যারা পলায়ন করে তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়। পলাতকদের একদলকে ধরে আনা হয়, তাদের ৪ জনের ফাঁসি দেওয়া হয়, অন্যদের ও ফাঁসির সিদ্ধান্ত হয়।

পরের দিন সোমবার আমরা সকলেই যার যার কাজে যোগ দিই, যেন কিছুই ঘটেনি।

ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের বিবরণ এখানে শেষ হয়। বিদ্রোহীদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন করে দণ্ড দেওয়া হয় তারা কথা এই বিবরণে নাই। ঢাকার একজন নাগরিক নিম্নরূপ বিবরণ দেন ঃ অতএব তাদের (সিপাহীদের) সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ঢাকা বিদ্রোহের অবসান হয়। আন্ত ঘরের ময়দানে (ভিকটোরিয়া পার্ক বা বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) সিপাহীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, এই কারণে ঢাকার লোকেরা এই ময়দানকে দীর্ঘ দিন ভয়ের চোখে দেখত, পার্শ্ববর্তী মহল্লা

বাংলাবাজার শাঁখারি বাজার এবং কলতা বাজারের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে বলাবলি করত যে ফাঁসি দেওয়া লোকদের গোঙানী রাতে শুনা যেত। একদিকে যেমন এই কাহিনী প্রচলিত থাকে, অন্য দিকে বালক বালিকারা সন্ধ্যার পরে সেদিকে চলাফেরা করত না।

চট্টগ্রামেও সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। ঐ সময়ে ৩৪ রেজিমেন্টের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ কোম্পানীর পদাতিক সৈন্যরা চট্টগ্রামে অবস্থান করত। চট্টগ্রামের সিপাহীরা প্রথম থেকে শান্ত ছিল এবং চট্টগ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ চ্যাপম্যান ৭ই জুন (১৮৫৭) সরকারকে জানান যে চট্টগ্রামের সিপাহীরা দিল্লী গিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। গবর্ণর জেনারেল তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু সিপাহীরা শান্ত থাকলেও চট্টগ্রামের খ্রিস্টান অধিবাসীরা তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। ১৯ই জুন তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট হেন্ডারসন রিপোর্ট করেন যে শহরের ইউরোপীয় এবং পর্তুগীজ জনগণ আশঙ্কা করছে যে সিপাহীরা তাদের আক্রমণ করবে এবং সম্পদ লুটপাট করবে। অনেকেই তাদের পরিবারবর্গকে জাহাজে তুলে দেয়। কিন্তু বেশ কিছু দিন সিপাহীরা শান্তই থাকে। ১৮ই নবেম্বর প্রথম গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায়, ৩টি কোম্পানীর সিপাহীরাই একযোগে রাত ১১টার সময় জেলখানায় গিয়ে কনস্টেবলদের হত্যা করে, কয়েদীদের মুক্ত করে দেয় এবং সেখানে লুটপাট করে ৩টার সময় সরকারের ৩টি হাতি, গোলাবারুদ এবং সম্পদ নিয়ে পলায়ন করে। সিপাহীরা কোন লোককে হত্যা করেনি, কোন ঘরবাড়ি লুঠ করেনি, শুধু অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা সরকারের কোন রেকর্ড পত্রও নষ্ট করেনি।

সিপাহীরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করে উত্তর দিকে চলে যায়, ২২শে নবেম্বর তারিখে তারা ফেনী নদী পার হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রী লোক, শিশু এবং জেলখানা থেকে মুক্ত কয়েদী সহ তাদের সংখ্যা ছিল ৫০০। তারা চট্টগ্রামে এবং পথে কোন লুঠপাট করেনি, তারা বিনা পয়সায় কোন খাবারও যোগাড় করেনি, কিন্তু তারা পরে ভয়ানক দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, খাদ্যাভাবে কয়েকজন মারাও যায়। সিপাহীরা পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে সিলেট ও কাছাড় যায়। সিলেটের অনুগত সৈন্য এবং কুকীদের হাতে পড়ে তারা মারা যায়।

অন্যসূত্রে জানা যায় যে সিপাহীরা চট্টগ্রামের সরকারি ট্রেজারীর তালা ভেঙ্গে ২,৭৮,২৬৭ টাকা ৩ আনা ১ পাই (মতান্তরে ৩ লাখ টাকা) নিয়ে যায় এবং পথে খরচ করে ফেলে। তখন পিলখানা (হাতীশালা) ছিল বর্তমান ষোল শহর রেল স্টেশন এবং মির্জাপুরের মধ্যবর্তী এলাকায়, এখান থেকেই তারা ৩টি হাতী নিয়ে যায়। সিলেটের নিকটে সাঠু নামক স্থানে সরকারি অনুগত বাহিনীর সাথে তাদের যুদ্ধ হয়, এর পরে

মোহনপুর ও ঝিনানকান্দিতেও যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে তারা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়, কিছু কুকীদের দ্বারা নিহত হয়, আর কিছু কুকীদের সঙ্গে মিশে যায়।

বীর সিপাহী হাবিলদার রজব আলী খান চট্টগ্রাম সিপাহী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন।

সিপাহী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল ভারত তথা বাংলাদেশে কোম্পানী শাসনের অবসান। মহারাণী ভিকটোরিয়া এক ঘোষণা পত্র জারী করে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং তাঁর প্রতিনিধি মারফৎ ভারত শাসন করেন। মহারাণীর প্রতিনিধিকে ভাইসরয় বলা হত। অতঃপর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভাইসররের পদও লাভ করেন, অর্থাৎ ক্যানিং মহারাণীর প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে শাসক হিসেবে গবর্ণর জেনারেল উভয় পদে অধিষ্ঠিত হন।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য গ্রন্থপঞ্জী

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, আধুনিক যুগ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১,
পি. ই. রবার্টস : হিস্টরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৯৫২।
ভি. এ. স্মিথ : অক্সফোর্ড হিস্টরি অব ইন্ডিয়া, টি. জি. পি. স্পিয়ার কর্তৃক সংশোধিত, ১৯৫৮।
মুইন-উদ-দীন আহমদ খান : দি ফরায়েজী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, করাচী, ১৯৬৫।
এ. আর. মল্লিক : ব্রিটিশ পলিসি এ্যান্ড দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৮৫৭ ঢাকা ১৯৫৬।
অনিলচন্দ্র ব্যানার্জি : দি নিউ হিষ্টরি অব মডার্ণ ইন্ডিয়া ১৭০৭-১৯৪৭, কলিকাতা ১৯৯২।
ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা ১৯৮৫,
মুহাম্মদ ইনামুল হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা ১৯৯৫।
এ. এফ. এস. আহমদ : সোস্যাল আইডিয়াজ এ্যান্ড্ সোশ্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল, ১৮১৫-১৮৩৫, কলিকাতা, ১৯৭৬
নরহরি কবিরাজ : ওয়াহাবী এ্যান্ড ফরায়েজী রেবেলস্ ইন বেঙ্গল, নয়াদিল্লী ১৯৮২।